চৌ
র
ঙ্গী
শংকর

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যা'ও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল, বিশেষ করে পুরোনো বাংলা বইয়ের। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, কিছু ভুল থাকতে পারে। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

প্রাপ্তিস্থানঃ দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

প্রকাশকঃ সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং

প্রচ্ছদঃ অজিত গুপ্ত

সৌজন্যঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ ঈগল লিথোগ্রাফিক কোম্পানি

উপদেষ্টাঃ নিতাই মল্লিক

গ্রন্থনঃ কালিপদ ঘোষ
দীননাথ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

প্রথম প্রকাশঃ জুন,১৯৬২

দে’জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে

প্রকাশকের নিবেদন

২৫ বছর ধরে পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে আরোহণ করে থাকা যে-কোনো বইয়ের পক্ষে এক পরম সৌভাগ্যের ঘটনা। চৌরঙ্গীর এই স্বাক্ষরিত বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে আমরা সকলকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

বিগত পচিশ বছরে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস চৌরঙ্গী বাংলার সীমানা পেরিয়ে দেশের সর্বত্র এবং বিদেশেও সাড়া জাগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের পর আর কোনো বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ হিন্দী সাহিত্যেও এমন আলোড়ন জাগায়নি। গুজরাতী, মালয়ালাম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাতেও এই উপন্যাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপন্যাসের মাধ্যমে বিদেশীরা বাংলা শিক্ষা করেছেন। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশিনী গবেষক এই উপন্যাস সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পত্রিকার সংবৃহৎ আলোচনা করেছেন। এই উপন্যাসের রুশ সংস্করণে সোভিয়েত পণ্ডিতসমাজের প্রশংসা ও পাঠকদের প্রীতি অর্জন করেছে।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগের ফলে আমরা নামমাত্র মূল্যে আধুনিক সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ ফসলকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহসী হলাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় অসম্ভব এই প্রচেষ্টায় আমরা আপনার আশীর্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনা করি। এই প্রচেষ্টা সফল হলে আমরা নতুন দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ হবো।

জুন, ১৯৮৭

উৎসর্গ

আমার সাহিত্য-জীবনের

প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার

শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে

চৌরঙ্গী লেখবার প্রথম অনুপ্রেরণা যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই শ্রদ্ধেয় বিদেশী এখন পরলোকে। জীবিত এবং মৃত, দেশী এবং বিদেশী, পরিচিত এবং অপরিচিত অনেকে প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার রইলো।

শংকর

"Our life is but a winter's day:
Some only breakfast and away;
Others to dinner stay and are full fed;
The oldest man but sups and goes to bed;
He that goes soonest has the least to pay."

-A. C. MAFFEN

৬০

চৌরঙ্গী

শংকর

সে অনেকদিন আগেকার কথা, কলকাতা শ্যামপুকুরে রামকৃষ্ণ মন্দিরের খুব কাছে একখানা ঘরের ভাড়াটিয়া অধিবাসিনী দিদিমার কাছে মামার বাড়ির আদর খাবার লোভে হাজির হয়েছিলাম। সব ভালো কিন্তু সামান্য ঠান্ডা লেগে একবার হাঁচলেই হই হই ব্যাপার! অতি উদ্বিগ্না দিদিমা অমৃতবালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন—বালাই ষাট। শেষের দুটি শব্দের বানান ও অর্থ বোঝা দায়, ইংরিজি হলে Shut বালাই বন্ধ করার আবেদন। এই অভ্যাস দিদিমার কন্যারও হয়ে গিয়েছিল। হাঁচি শুনলেই মা বলে উঠতেন বালাই-shut। এতদিন পরে জুনের সাতসকালে আজ মনে হচ্ছে, শব্দটা বোধহয় ষাট যা মোটেই 'বালাই' নয়, আমার জীবনের স্মরণীয় বই চৌরঙ্গী উপন্যাস প্রকাশের ৬০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে।

প্রকাশক ও বন্ধু সুধাংশুশেখর দে সানন্দে সৎসাহস দিলেন, ষাট বছর তো অনেক বাংলা বইয়ের হয়েছে এবং হবে, কিন্তু বইও আছে লেখকও আমাদের মধ্যে রয়েছেন এমন তো সবসময় হয় না। আপনি বোধহয় একটু দূরদর্শী, ১০.৬.৬২ তারিখটা শিলমোহর আকারে সেই কবে প্রথম সংস্করণের প্রথম পাতায় বসিয়ে দিয়েছিলেন, শোনা যায়, ওটা আপনার বিবাহ-তারিখও বটে, আজ আপনি আছেন, বইয়ের অপরিবর্তনীয় কিছু পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু বউদি বন্দনা নেই। সেদিনের প্রধান উৎসাহী উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র একজন ডা: সুব্রত রায়চৌধুরী এখন অরবিন্দ আশ্রমের কাছে মস্ত সাইজ পণ্ডিচেরি AIMS হাসপাতালে ডাক্তার-জামাই, ডাক্তার-কন্যা, ডাক্তার-গৃহিণীর সারাক্ষণের পর্যবেক্ষণে নজরবন্দি হয়ে আছে। তার খুব ইচ্ছা আমি কোনো ছুতোয় পদুচেরি অরবিন্দ আশ্রমে একদিনের জন্যে চলে আসি, বিবাহদিনে আমার লজ্জা পাবার মতো অস্বস্তিকর কিছু ঘটনা তার কাছে এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় জমা হয়ে আছে। এসবের একমাত্র সাক্ষী কমলও তো এখন দূরে, আর যারা আমাকে বিপদে ফেলার মতো অনেক খবর দিতে পারত তাদের কেউই আর ইহজগতে নেই।

প্রথমেই ধরা যাক দাদা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথা, তাঁকে চৌরঙ্গীর উৎসর্গপত্রে যা লিখেছিলাম তা ছিল ওঁর কাছে সম্পূর্ণ সারপ্রাইজ। 'আমার সাহিত্যজীবনের প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে।' একেবারে ছাপার অক্ষরে এই উৎসর্গপত্র না দেখলে তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না, বলতেন না ভাই, আমি স্পোর্টস ও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছেড়ে বহুনিন্দিত সিনেমা-থিয়েটারে যেতে পারব না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে তোমার উচিত ছিল আমার আগাম অনুমতি নেওয়া, যাকে কিছু উৎসর্গ করা হচ্ছে, তারও তো অন্তত একটা মৌখিক সম্মতি প্রয়োজন।'

পরবর্তীকালে আরও অনেক মজা হয়েছে, তখন ওপার বাংলায় চৌরঙ্গীর নানা নিষিদ্ধ সংস্করণ ছাপা হয়েছে। শঙ্করীদা দু'একটা পাইরেটেও কপি দেখে বললেন, কপিরাইট চোরদের বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র বক্তব্য নেই, কারণ তারা আমার নামে উৎসর্গ পত্রে একটুও হাত দেয়নি, অর্থাৎ আমি সাধুতেও আছি চোরেতেও আছি। আমি এখন তোমাকেও 'ডোন্ট কেয়ার' করতে পারি, হাওড়ার বিশিষ্ট আইনজীবী প্রফুল্ল রায় (ছেঁচো দা) আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন, কোনো বই একবার কাউকে উৎসর্গ করলে তা কোনো অছিলাতেই ফেরত নেওয়া যায় না।'

আমার বিবাহে উত্তরপাড়ায় বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন শঙ্করীদা, সেসব ঐতিহাসিক প্রমাণ কোথায় গেল আমি জানি না। আমার কাছে আজ জীবনসায়াহ্নে চিত্রপরিচয় কিছু নেই।

আমার সুখ দুঃখের অপর গার্জেনদ্বয় অধ্যাপক অসিতদা-বিনীতাদি দুঃখ করেছিলেন, শংকর বেচারার প্রতি পদে পদে বাধা, বিয়েটাও শান্তিতে হবার নয়, তবে সব বাধা সব দুঃখ আগাম মিটিয়ে নেওয়াই ভালো, তাহলে পরে পড়ে থাকে অনেক নির্ভেজাল সুখ, অনেক অনেক শান্তি!

দুটো প্রারম্ভিক ধাক্কার কথা আমার গর্ভধারিণীকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথম বন্দনা গৃহে আকস্মিক মৃত্যু, পিতার মাতৃসমা কাকিমার দেহান্তকালে অশৌচ, সেই অবস্থায় পঞ্জিকামতে বিবাহাদি ইত্যাদি শুভকর্ম নিষিদ্ধ। সেবার বন্দনার বাবা অসুস্থ শরীরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অবশেষে পুরোহিতের বিশেষ ব্যবস্থা, বিবাহে বাবা-মা অবশ্যই অনুপস্থিত থাকবেন, আইন বাঁচিয়ে শাস্ত্রীয় বিবাহ হবে বন্দনার বড় মামার তত্ত্বাবধানে, বিয়ে হয়ে যাবার পরে বাবা-মা একবার আসবেন, দূর থেকে দেখতে, বাট নো আশীর্বাদ।

জনক জননীর অশৌচ অবস্থায় পাত্রীর বিবাহ আমার মায়ের মনঃপূত হয়নি, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে তিনি বাধা দেননি, তবে তাঁর ভয় সারাক্ষণ ছিল, এই বিবাহের সব কিছু শেষপর্যন্ত মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।

এর আগেও চুপিচুপি আর একটা বড় বাধা এসেছিল, আমার তথাকথিত 'মদ্যপান স্বভাব' সন্দেহ সম্পর্কে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে রাখা যেতে পারে। ভাইঝির বিবাহযোগে বন্দনার চিরকুমার কিন্তু সাহিত্যপ্রেমী কাকা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, তিনি মনের সাধে দুনিয়ার বই পড়তেন।

কোনো একসময় হঠাৎ আমার নিরীহ ছা-পোষা ভাবীশ্বশুর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে এমার্জেন্সি দৌত্যে ভাইকে পাঠালেন, আমার পানাসক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিতে। আমি কখনও মদ খাইনি, ওতে আমার আগ্রহও নেই, তাই শুনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি দাদার কাছে ফিরে গেলেন, নিয়মিত মদ পান করে এমন কারুর হাতে আদরের মেয়েকে তুলসীদাস বাবু তুলে দিতে চান না।

বিনা অপরাধে আসামির কাঠগোড়ায় উঠতেও আমার তেমন উৎসাহ নেই। কিন্তু পরেরদিন বন্দনার কাকা উদ্বিগ্ন হয়ে চুপি চুপি আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, কিছু মনে করো না, আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। তুমি বললে মদ খাও না, আর দাদার বন্ধু অমুকবাবু রেগুলার চৌরঙ্গীর মধুশালায় ড্রিংক করেন, তিনি দাদাকে বললেন, পাত্র মিথ্যে কথা বলল, আর আপনি বিশ্বাস করে গেলেন। প্রতি শনিবার গ্র্যান্ড হোটেলের তলায় আর্কেডে মদের দোকানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিজের চোখে তাকে দেখে আসছি। মাতাল হলেও নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না!

ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রথম প্রকাশক নিউ এজ-এর জানকীনাথ সিংহরায় শনিবারের অপরাহ্নে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া থেকে আমাকে নিয়ে চৌরঙ্গীর মদের দোকানে যেতেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার বিরাট ব্যবসায়িক সাফল্যের পিছনে কী আছে? অন্যেরা বলতেন 'শ্রোম', আর পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে তিনি বলতেন 'শ্রম'। দোকানের তালাটা কয়েকবার টেনে তিনি আমাকে নিয়ে বাসে চড়ে চলে আসতেন গ্র্যান্ড হোটেল আর্কেডের মদের দোকানে, সোজা উঠে যেতেন বার-এর দোতলায় এবং নির্দিষ্ট অর্ডার দিতেন তাঁর নির্দিষ্ট প্রিয় পানীয়ের। আমি পেতাম নির্দিষ্ট এক গেলাস লেম্বু-পানি।

প্রায়ই দু'একজন অতিথি নিউ এজ আসরে যোগ দিতেন—যেমন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে নিয়ে রসিকতা করতেন, তুমি মদ্যপান না করেও মদের এ-টু জেড্ আমাদের কাছ থেকে জেনে যাবে, যেমন বিলেত না গিয়েও লন্ডনের সব গলিঘুঁজির নাম আমার মুখস্থ। সাগরময়ের খুব ইচ্ছে, কলকাতার আমি এবার সশরীরে বিলেত চলে গিয়ে ধারাবাহিক লিখি। উৎসাহী সাগরময় বললেন, আমি অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি, সাপ্তাহিক দেশের আগামী সংখ্যা থেকে অদ্বিতীয় লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধারাবাহিক বহু প্রতীক্ষিত বিলেতভ্রমণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, সাগর, বাড়াবাড়ি করো না, আগে আমি বিলেত যাই, কখনও তো এর আগে যাইনি, তারপর তো দেশ পত্রিকা।

সাগরময়বাবু আর একটা ড্রিংক অর্ডার দিয়ে বললেন, বিলেতের তোড়জোড় করতে করতে চারটে সপ্তাহ হুড়মুড় করে কেটে যাবে, ততক্ষণেই আপনার লেখা জমে উঠবে। আমি লেম্বুপানি পান করতে করতে অবাক হয়ে যাচ্ছি, লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন, সাগর তুমি যাযাবরের দিল্লিভ্রমণ 'দৃষ্টিপাত' দেশে মিস করেছ, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' মিস করেছ, এবার আর তুমি ধৈর্য ধরতে রাজি নয়!

আমি বেশ মজা পাচ্ছি, কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেল আর্কেডের অন্য নিয়মিত আগন্তুকরা যে আমাদের লক্ষ্য করছেন তা মনে হয়নি, এখন নতুন পরিস্থিতিতে তাঁরাই আমার বিপদ।

আমি প্রতি শনিবার আর্কেড মধুশালায় যাই, কয়েক ঘণ্টা সময় কাটাই কিন্তু আমার বিশ্বসংসারকে আমার লেম্বুপানি নির্ভরতা কে বোঝাবে?

বন্দনার কাকা কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করলেন, এবং বাড়ি ফিরে নিরীহ দাদাকে বোঝালেন, অযথা পরের বাগড়া শুনবেন না, স্বয়ং পাত্রই যখন বলছে, সে মদ এবং সিগারেট কোনোটাই ট্রাই করেনি, নৈতিক কারণে নয়, স্রেফ বেজায় খরচের কথা ভেবে!

এখন মনে পড়ে যাচ্ছে, ক্যালকাটা ক্লাবের রেসিডেন্ট নোয়েল বারওয়েল সায়েব এক শনিবার ঠান্ডা বিয়র আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন টেস্ট করো। সেই প্রথম টেস্ট আমার মোটেই ভালো লাগেনি। 'বেজায় তেঁতো!' সায়েব হেসে বলেছিলেন, 'এই তেঁতো ভাব কিন্তু দু'এক চুমুকেই ঘুচে যায়।

কিন্তু আমার ভালো লাগছে, এই তেঁতো ভীতি তোমাকে বিয়র থেকে একটু সরিয়ে রাখবে।'

পরবর্তীকালে এই মদ খাওয়ার ব্যাপারে সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার আমাকে নিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিলেন সি আর অ্যাভিনিউ-এর চাংওয়া রেস্তোরাঁয়। রাস্তায় আমাকে পাকড়াও করে সস্নেহে সাগরময় বলেছিলেন আজ ছাড়ছি না। আমি সানন্দে রাজি, মনে পড়ল এই পবিত্রস্থানেই শিব্রাম চকরবত্তির আকস্মিক কবিত্ব লাভ হয়েছিল বহুযুগ আগের মহাকবি বাল্মীকির মতন। এইখানেই রসসাগর, দাপুটে লেখক ও সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দেখা, তাঁর খুব ভালো লেগেছে প্রেমেন্দ্রের সাম্প্রতিককালের একটি কবিতা, তিনি কারও কোনো কথা না মেনে অকস্মাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চুম্বন করলেন, আর সেই প্রকাশ্য দৃশ্য দেখে গদ্যলেখক শিব্রাম অকস্মাৎ কবি হয়ে গিয়ে একটা পেপার ন্যাপকিন কাগজে লিখে ফেললেন —'গল্প না বৎস, না কল্পনা চিত্র, হেমেন্দ্র চুম্বিত প্রেমেন্দ্র মিত্র!'

শিব্রামের এই কবিত্ব লাভ সংবাদ ওপাড়ার ভক্তরা অনেকেই জানত।

আমরা এরপর একটা মদ্যপান কিউবে ঢুকে পড়লাম। ঘোষ-গাঙ্গুলি দুটো ড্রিংকসের অর্ডার দিয়েছেন, আর আমি হোস্ট হিসেবে একটা গেলাসের জলে সামান্য একটু চাইনিজ সস ঢেলে দিয়ে খেতে খেতে ওঁদের সান্নিধ্য দিচ্ছি। কিন্তু একজন চাইনিজ সায়েব ঘন ঘন আমাদের কিউবে অকারণে ঢুকছেন।

তারপর সেই অঘটন ঘটল। চাংওয়ার চিনা সায়েব সোজা এসে অভব্যভাবে বললেন, তোমাদের এখান থেকে এখনই যেতে হবে, ইট ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড। তোমরা আমাদের নিয়মকানুন ভেঙে, পয়সা বাঁচাবার জন্য বাইরে থেকে লুকিয়ে সস্তার বেআইনি ড্রিংক নিয়ে এসেছ। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় এঁরা নাকি কখনও পড়েননি। তর্ক করে কিছু ফল হচ্ছে না, চাইনিজ সায়েব আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, চিনা সায়েবের ধারণা, আমি ড্রিংক অর্ডার না দিয়ে কী করে বেআইনি ড্রিংক করছি? আমার সামনেই তো পানীয় রয়েছে!

সাগরময় বললেন, চিনা সায়েব ভাবছেন, তিনি বাইরে থেকে ড্রিংকস আনা হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন।

সেসব অনেকদিন আগেকার কথা, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। হেমেন্দৰ চুম্বিত প্রেমেন্দৰ মিত্র থেকে বাংলা সাহিত্যের অনেক বড় বড় চরিত্রকে মদ্যপানের মধুশালায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে অকারণে। সাগরদা বললেন, এরপরে কখনও তোমাকে নিয়ে এখানে এলে আমরা কিছুতেই কিউবে ঢুকে মানসিক শান্তি পাব না, আমরা বাইরেই বসব, না হলে চিনা সায়েবকে দিয়ে তোমাকে আগাম সার্চ করিয়ে নেব।

এতদিন পরে মনে হয়, মানুষ যা তেমন চায় না, তাই ঈশ্বর রসিকতা করে তার ঘাড়ে বদনাম চাপিয়ে দিয়ে দূর থেকে মজা দেখেন।

আমার পরবর্তী জীবনেও তাই ঘটেছিল। ডানলপের ইন্ডিয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান ছাবড়িয়া ও তাঁর ভাই কিশোর এদেশের অন্যতম বৃহৎ মদ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছিলেন এবং পাকেচক্রে আমিও তাঁদের কাজে জড়িয়ে পড়ে কর্মসূত্রে প্রতিদিন শ'ওয়ালেশ কোম্পানিতে যেতাম। পরবর্তী সময়ে আর একজন ভারতবিখ্যাত মদ নির্মাতার উপদেষ্টা ও আমার এককালীন সহকর্মী আমাকে বাঙালোরে মদ কোম্পানির প্রচারে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু নেওয়ার সাহস হয়নি। আসলে কলকাতা আমাকে বড্ড টানে, স্রেফ কলকাতায় থাকবার লোভে একাধিক চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। এ-বিষয়ে আমার নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা স্বয়ং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনায় তাঁর নিজস্ব বাটি মিথিলায় আমাকে বলেছিলেন, যদি পারো কলকাতা কখনও ছেড়ো না, মোটা

টাকা রোজগারের টানে বম্বে টকিজে আমি চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে সকালবেলায় বাজারে কেউ গেলে বলে না আপনার এবারের লেখাটা কিসসু হয়নি। লেখকের পক্ষে এটা মস্ত একটা পাঠক অভাব, গোরুকে একটু হ্যাট হ্যাট করলে খুব ভালো ফল হয়, বুঝলে, তাতে যদি একটু আর্থিক টানাটানি হয় তাও একজন ভেতো বাঙালি লেখকের পক্ষে ভালো।

চেষ্টা করো, পারলে কলকাতায়, না হলে ঢাকায় বসবাস করতে। বাবার আর্থিক সেফ কাস্টডিতে ছেলে বউ জমা রেখে মুঙ্গের টু ক্যালকাটা আমিও মেস বাড়িতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছিলাম, এ বিষয়ে শিবপুরে গিয়ে রাজাধিরাজ শরৎচন্দ্রের সিক্রেট অ্যাডভাইসও ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভবিতব্য ছিল মুম্বাইতে, মানসিক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অনেক।

ক্যালকাটা বনাম বম্বে, বাঙালোর, দিল্লি সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখবার সময় এখন নয়, হিসেব করতে বসেছি চৌরঙ্গীর ষাট বছরের কথা।

দেশ পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশের সমাপ্তির দু'সপ্তাহ আগে নতমস্তকে সম্পাদক সাগরময়কে আগাম নোটিশ দেওয়ায় তিনি একটু চমকে উঠলেন, বললেন, ধারাবাহিক শুরু করবার আগে তুমি কথা দিয়েছিলে, সাপ্তাহিক ধারাবাহিকের কিস্তি ছাড়া আর কিছুতে তোমার লক্ষ্য থাকবে না, এখন কথা রাখছ না, বাকি তিনটে কিস্তিতে দেশের অভিজ্ঞ পাঠক সামান্য ধড়ফড়ানি লক্ষ্য করবে, যেন কোনোরকমে লেখা শেষ করে তুমি প্রতিশ্রুতি মুক্ত হতে চাও! দেখো, সম্পাদকের কিছু এসে যায় না, আমি তো কেবল স্টেজ ভাড়া দিই, যে যেমন আর্টিস্ট, দর্শকের থেকে সে তেমন নাম উপার্জন করে নেয়!

'আপনি তো সব জানেন, কেমন করে গিয়েছে আমার এক বছরের সাপ্তাহিক যুদ্ধ।' সাগরদা বললেন, তোমার মনের মধ্যে একটা চাপা অভিমান ছিল প্রথম ধারাবাহিক গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়, বিরক্ত হয়ে ছিলাম, প্রকাশক নির্বাচনে কর্তাদের কেউ কেউ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেয়েছিল।

আমি চুপ করে রইলাম, আপনাদের কর্তাব্যক্তি ও তাঁর তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট রমাপদ চৌধুরী আমাকে তড়িঘড়ি তাঁদের নির্বাচিত এক প্রিয় প্রকাশকের কাছে তৎক্ষণাৎ সই করাতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি সামান্য একটু সময় চাইলাম, তার ফলে উপরের মহলে বেজায় বিরক্তি ও অভিমান। কেউ কেউ বললেন, যে একজন বিরক্ত শক্তিমান তোমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজালেন, এখানে তোমার কাজ করার সুযোগ রইল না।

আমি সামান্য মানুষ, হাওড়া থেকে সেকেন্ড ক্লাসের ট্রামে রোজগারের জন্য খরচ বাঁচিয়ে কলকাতায় আসি, একজন শক্তিমান কর্তাব্যক্তি আমার তথাকথিত ঔদ্ধত্যে এখন চটে উঠলেন, এখন দেখা হলেও কথা বলেন না।

তখনই সংবাদ পত্রের শক্তিমান মহলে আমার নতুন মূল্যায়ন, কত অজানারে এক উকিলের মুহুরির প্রিয় প্রভুর কথা, এদের বলে 'ওয়ান বুক অথর', এরা বেগুন বা ঢেঁড়শ গাছ নয় যে মাঝে মাঝে ফল দিয়ে যাবে, এরা আলুগাছ, একবার শিকড় ধরে টেনে তুললেই সব খেলা খতম, সব পয়সা হজম।

কথাটা খুবই মনে আঘাত দিয়েছিল—একজন নতুন লেখকের মান ও প্রাণ নিয়ে টানাটানি, হে মা কালী, আর যাই কর আমাকে 'ওয়ান-বুক- অথর' কোরো না। আমাকে কষ্টে ভেঙে পড়তে দেখে আমার গর্ভধারিণী জননী বলতেন, তেমন তেমন বই একখানা লিখেই কবিরা অমর হয়ে থাকেন। সহজ কথা—একখানা কৃত্তিবাসী রামায়ণই তো কবির পক্ষে যথেষ্ট।

সাগরময় মুখ খুলতে চাইলেন না, বললেন, আমরা ভেবেছিলাম, এখানে রূপদর্শীর মতন তোমারও একটা লেখার পাকা চাকরি জুটে যাবে, সেটা অবশ্য হবে না, আমি কী বলব বলো। উনি ভীষণ রাগী লোক।

মাতৃ উপদেশে প্রাণবন্ত না হয়ে, আমার তখন একমাত্র স্বপ্ন : ওয়ান-বুক-অথরের গ্লানি যে করেই হোক শরীর থেকে মুছে ফেলতে হবে, সেই মোছার চেষ্টায় কত বছর যে গভীর যন্ত্রণায় কেটে গেল!

পরের সাহিত্য প্রচেষ্টায় বড্ড সময় কেটে যাচ্ছে, কেউ প্রশ্ন করলে বলি নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে, সময়মতো সব জানতে পারবেন। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক একদিন প্রকাশ্যে রসিকতা করলেন, 'আর কতদিন আপনার এই গর্ভিণী ভূমিকা?' আমার বিখ্যাত ডাক্তার বন্ধুরা বলে, 'মাতৃগর্ভে অস্বাভাবিক বেশি সময় কাটলে, মাতা ও শিশুর দু'জনেরই পক্ষে ব্যাপারটা খারাপ। জননীগর্ভে বসবাসের একটা সময় নির্ধারিত হয়ে আছে।'

ওয়ান-বুক-অথর তার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্য রাতের নিদ্রা খুইয়েছি তা কাউকে বলতে ইচ্ছা করে না। আমার নতুন কর্মক্ষেত্রে রেলের বন্ধুরা বলেন, পূর্ব রেলপথকে কেন্দ্র করুন, বাংলা সাহিত্যের কল্যাণে রেলের বেজায় বদনাম, এবার নতুন পথ খুলে যাক, রবি ঠাকুরের হাফটিকিট নিয়ে পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অন্যায় ফাইন চার্জ করা এখনও কেউ ভোলেনি।

রেলের কথা যে একবার ভাবিনি তা নয়, কিন্তু এগোতে সাহস হয়নি, বড্ড বড় ব্যাপার, তা ছাড়া, পান থেকে চুন খসলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের বিমল মিত্রের সব অভিজ্ঞতা তো সুখের নয়।

হঠাৎ হাওড়া চৌধুরীবাগানের এক বিনিদ্র রজনীতে মনে হল আমার হাতেই তো জব্বর স্পেনসেস হোটেলের প্রাণময় জীবনকথা রয়েছে, স্বয়ং নোয়েল বারওয়েল সায়েব ওখানে মাসিক হারে থাকতেন, সেখানে দারোওয়ান, লিফটম্যান, কুক, বেলি ডান্সার থেকে কাকে না আমি চিনতাম। এরা ছিল ধৈর্যহীন, সুযোগ পেলেই ওয়েলেসলি স্ট্রিট ছেড়ে বহু বছরের পুরনো উইলসন সায়েবের হোটেলে কেউ কেউ চলে যেত, নতুন হোটেলেও আমার অগাধ প্রতিপত্তি, সেখানেই তো স্যাটাদা নামের এক চরিত্রের আকস্মিক সৃষ্টি।

শুধু স্পেনসেস হোটেলের কর্মী নয়, পরিচিত হয়েছিলাম হোটেলের উপভোক্তাদের সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সায়েব অভ্যাগতরা। এঁদের কেউ কেউ ট্রেনে হাওড়ায় আসতেন শনিবারের ভোরে, শনিবার সারাদিন রোগী দেখে তাঁরা আবার ওইদিন সন্ধ্যায় ট্রেন ধরবার জন্য হাওড়া স্টেশনে ছুটতেন, এঁদের সান্নিধ্যে আমি কিছু উপার্জনও করেছি। শুনেছি, বিখ্যাত ডাক্তারের সহধর্মিণী এদেশের এক মেয়ে।

এবার ফেরা প্রয়োজন চৌরঙ্গীর মূল গল্পে। স্পেনসেস ও উইলসন হোটেলকে কেন্দ্র করে বারওয়েল সায়েবের বিচিত্র গল্পটাই আমার একমাত্র ভরসা মনে হচ্ছে, সেকেন্ড বুক লেখকের সন্দেহটা কাটলেই আমি আর কিছুই চাইব না। লেখক হিসেবে আমি অর্থ চাই না, সম্মান চাই না, খ্যাতি চাই না।

সেই কঠিন সময়ে বিকেলবেলায় আমি মাঝে মাঝে এসপ্ল্যানেডের বিখ্যাত কে সি দাশের মিষ্টান্নভাণ্ডারের সামনে হাজির হতাম, শুদ্ধ স্পঞ্জ রসগোল্লার স্বাদ আহরণে নয়, দাশের প্রবেশদ্বারে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকানে, যে কোনো পুরনো বই সেখানে তিনটাকায় নেওয়া যেত, সুবিধা এই, পড়ে সেই বই ফেরত দিলেই নগদ দু'টাকা রিফান্ড। অনেক সস্তায় বাজিমাৎ করবার অমৃত সুযোগ। অনেক পাঠক এই রিফান্ড সিস্টেমে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বই নিত, পছন্দ হলেই বইটা নিজের সংগ্রহে রেখে দাও।

সেদিন সন্ধ্যা হব হব, চৌরঙ্গীর আকাশ কালো মেঘে ভরা, প্রবল বেগে বৃষ্টি হল। বাধ্য হয়ে একব্যাগ পুরনো বই কিনে বৃষ্টিকে ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় ফেলা গেল, আজকের বেপরোয়া বৃষ্টি কখন যে ছুটি নেবে, আমি আমার পরিচিত হাওড়ায় ফিরে যাব। সেদিন এতই বৃষ্টি, কিছুই স্পষ্ট নয়,

এমন সময় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, কিছুক্ষণের জন্য আলোয় আলো ভরা খ্যাতনামা গ্র্যান্ড হোটেলের নিওন সাইন দূর থেকে দৃশ্যমান হল। সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল স্পেনসেস, উইলসন ও অপেক্ষাকৃত নবীন গ্র্যান্ড হোটেল আমার মনের মধ্যে একাকার হয়ে নতুন একটা রূপকথার হোটেল হয়ে যাচ্ছে, যার নাম তাজমহল হোটেল নয়, তার নাম এক মহিমান্বিত সম্রাটের নামাঙ্কিত শাজাহান।

সময় কাটাবার জন্য আরও একখানা পুরোনো বই সংগ্রহ করে ফেলেছি, কে সি দাশের শোরুমের আলোয় নতুন সংগ্রহের একটা ছড়া নজর বুকের মধ্যে হঠাৎ বিধে গেল—

Our life is but a winter's day;
Some only breakfast and away
Others to dinner stay and are full fed;
The oldest man but sups and goes to bed;
He That goes soonest has the least to pay.

অখ্যাত কবির অখ্যাত রচনা, এ সি ম্যাফেনের নাম আমি ছাড়া এতদিন কেউ লক্ষ্য করেননি, কিন্তু আমরা সবাই শীতের দিনের এক হোটেলে রয়েছি, আমাদের কেউ প্রভাতের ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলে যাব, কেউ সন্ধ্যার ডিনার খেয়ে বিদায় নেব, কেউ সাপার-এর পরে বিছানায় আশ্রয় নেবে, শুধু মনে রেখো যে যত দ্রুত এখান থেকে বিদায় নেবে হোটেলে তার বিলের পরিমাণ তত কম হবে।

গ্র্যান্ড হোটেলের বর্ষাবিধৌত নৈশ জীবনের নিয়ন আলো আমাকে হঠাৎ যেন সব কিছু উপহার দিয়ে দিল, আমি খুঁজে পেলাম আমার চৌরঙ্গীকে, আমি অবশ্যই আর ওয়ান-বুক লেখক থাকছি না।

আমার প্রযোজক, পরিচালক, সুরকার শঙ্করীপ্রসাদ বসু কঠিন প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাহলে ‘চৌরঙ্গী’ উপন্যাসের প্রকৃত লেখক কে? এ সি ম্যাফেন, না হাওড়া চৌধুরীবাগানের শংকর? অস্বস্তিকর কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে না হওয়ায়, আমার নিবেদন—দুজন, প্রথম জন স্পেনসেস হোটেলনিবাসী নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল সায়েব এবং দ্বিতীয় জন বিখ্যাত বড় কাগজের রাগী কর্তাব্যক্তি যাঁর হুকুম না মানায় আমাকে ওয়ান বুক অথরের কালিমা লাগিয়ে বঙ্গসাহিত্য অঙ্গ থেকে চিরতরে বিতাড়িত করবার হুকুম জারি হয়ে গিয়েছে এবং তাঁরাই আমার বিখ্যাত পরবর্তী কাহিনি ‘গল্প হলেও সত্যি’, সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী মারফত আসন্ন পূজাসংখ্যা থেকে রিজেক্ট করেছিলেন। সেই লেখায় ছিল, দাম্ভিক জাতীয় সরকার তিতিবিরক্ত হয়ে গল্প লেখাটা

ন্যাশনালাইজ করে এই পেশা সচল রাখতে সি আর অ্যাভিনিউতে জাতীয় ছোটগল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তারই মহাশক্তিমান ডিরেক্টর জেনারেল হচ্ছেন এই নিষ্ঠুর কাহিনির নায়ক। পরবর্তী কালে এই ন্যাশনালাইজ গল্পের বিষয় খুব ভালো লেগেছিল আমার অন্যতম সাহিত্যগুরু সৈয়দ মুজতবা আলীর, উৎসাহ দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, কাউকে তোয়াক্কা না করে উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলাটাই ভালো প্লেয়ারের একমাত্র কর্ম। চালিয়ে যাও।

এসব কঠিন কথা এতদিন পরে আবার ভেবে কী লাভ! শুধু মনে পড়ে যায় কোনো কোনো নির্দয় শাসক পরবর্তী সময়ে শক্তির কেন্দ্র থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন এবং একসময়ে আমাকে বলেছিলেন, সম্পাদক অশোক আনন্দ পাবলিশার্স সৃষ্টি করেছে বাংলার লেখকদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে,

আমিও এবার প্রকাশনা শুরু করলাম লেখকদের পথ সুগম করতে, আমি আপনার কাছে নতুন বই চাই।

আমার বিশেষ দুঃখ ওয়ান-বুক অথরের কঠিন প্রবক্তাকে শেষ পর্যন্ত পছন্দমতো বই দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। সাবধানী সাগরময় কিন্তু তাঁর নিয়োগকর্তার নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে ভুলেও কোনো মন্তব্য করতেন না। আর আমার সব সুখ-দুঃখের আধার শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলতেন, এই ওয়ান বুক অথরের নির্মম বিরক্তি থেকেই তো আমরা পেয়ে গেলাম চৌরঙ্গী।

চৌরঙ্গী গ্রন্থাকারে প্রকাশের ছয় দশকের সময় মূল চৌরঙ্গী থেকে অকারণে সরে যাওয়াটা মোটেই আমার লক্ষ্য নয়। বলে রাখা ভালো, একদিন রাত্রে মেড ইন হাওড়া চৌধুরীবাগানে 'চৌরঙ্গী' লেখা শুরু হয়েছিল। এই লেখক একরাত্রিও কোনো তারকাখচিত হোটেলের অতিথি হয়নি।

প্রথম যে সপ্তাহে চৌরঙ্গী দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হল তখন আমি রেলের কর্মসূত্রে পাটনা জংশনে এবং আমার রাত্রিযাপন দানাপুর রেল যাত্রী নিবাসে। ভেবেছিলাম আমার জানাশোনা এসপ্ল্যানেড ম্যানসন সহকর্মীরা আমাকে সস্নেহে উৎসাহ দেবেন। কিন্তু অনেক লেখকের পথ কোনোকালেই অত সহজ ও সুখের নয়।

সাগরময় বললেন, প্রশংসা ত কিছু এসেছে, আবার সন্দেহও আসছে যথেষ্ট পরিমাণে, হাওড়ায় বসে যে লেখক ওমলেটকে 'ডবল ডিমের মামলেট' লিখতে অভ্যস্ত সে আবার গ্র্যান্ড-গ্রেট ইস্টার্নের কথা কী করে লিখবে?'

সাগরময় বললেন, এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা সম্পাদককে জানিয়েছেন, আমাকে লিখতে বলতে পারতেন, আনাড়ি নতুন লেখকরা তো 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট-এর সঙ্গে

'ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টের তফাত করতে পারছে না।

দেশ পত্রিকার সাইকেল পিওন সেইসব চিঠি হাওড়ায় দ্রুত নিয়ে আসত শনিবার, আমি দুপুরের খাওয়া বন্ধ করে দুরু দুরু বক্ষে সেইসব মন্তব্য পড়তে শুরু করতাম, আমার মা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন, বলতেন, নিজের খিদেটা নষ্ট করিস না, আগে বেঁচে থাকা, তারপর তো লেখাজোখা, তোর বাবারও তো একসময় এই দুশ্চিন্তা ছিল, একটা আধটা ছেলে কোহিনুর থিয়েটারের এই বদ অভ্যাসে পড়ে নিজের সর্বনাশ করবে। একূল-ওকূল দুকূলই যাবে!

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা প্রখ্যাত লেখিকার সঙ্গে আমার একান্তে দেখা করার কথা উঠেছিল, সাগরময় নিজেই কিন্তু ওই চক্র থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন, দেশ-বিদেশের হোটেল সম্বন্ধে যিনি এতই জানেন তিনি এতবছর পরেও সেসব লিখতে গেলেন না কেন? শঙ্করীদা বললেন, গাঁটের পয়সা দিয়ে বিভিন্ন হোটেলে রাত কাটানো, আর সেই হোটেলের টেমপোরারি কর্মী হওয়া এক জিনিস নয়। তুমি কারও কথায় কান দিয়ে লাভবান হবে না, তুমি চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের ঝাড়ুদার, বালিশবাবুদের মধ্যে আশ্চর্য এক হোটেলকে খুঁজে বেড়াও।

ঘন ঘন রেলের কাজে আমাকে তখন দানাপুরে আসতে হচ্ছে, আমি দেশপত্রিকার সাপ্তাহিক কপি নিয়ে ভাবছি, হাওড়া চৌধুরীবাগানের স্বপ্নেই প্রিয় চৌরঙ্গীকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে।

কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কোন প্রতিষ্ঠান এই হোটেলে শাজাহান? আমি ভয়ে ভয়ে আছি, অজান্তে কোথাও অজ্ঞাতে কারও মানহানি করে না বসি।

শঙ্করীদাই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কলকাতার একটা ম্যাপ নিয়ে বসতে হবে তোমাকে, তারপর রাস্তাঘাটে এমনভাবে গোলমাল পাকিয়ে দিতে হবে, কেউ না বুঝতে পারে এটা স্পেনসেস, না উইলসন, না গ্র্যান্ড, না অন্য কিছু। সেই হেঁয়ালি চেষ্টায় বোধ হয় কিছুটা সফল হয়েছি, সবার নজর উইলসনের দিকেই একটু বেশি, সেখানকার স্যাটাদার কথাবার্তা তখন অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। আর একজন সত্যসাধন বোস তখন রেলের নামী অফিসার, তিনি আমাদের অফিসার শিবুদাকে একদিন ট্রেনে বললেন, তুমি কে কে দাসের অফিসে কাজ করো? আমার নাম স্যাটা বোস। ঠোঁটকাটা শিবদাস ব্যানার্জি বলে উঠলেন, আমি জানি সত্যবাবু, আপনার নাম স্যাটা বোস। তবে শুনুন, দাসের অফিসে আমি কাজ করছি না, আমি ও মিস্টার কে কে দাস একই অফিসে দাসত্ব করি, আমাদের মালিক দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া!

আমাদের এসপ্ল্যানেড্ রেল অফিসেও এক সত্য বোস ছিলেন, তাঁকেও সবাই স্যাটা বোস বলত। তিনিও বেশ মজা পেতেন, বলতেন আপনাদের যৌথ মন্ত্রে আমি স্যাটা বোস মনে হচ্ছে

স্মরণীয় হয়ে যাব।

প্রতিসপ্তাহে একটু একটু করে আমার লেখা বেরুচ্ছে এবং সমালোচকের সংখ্যা ক্রমশ কমবে এই আশা রয়েছে।

সেই সময় বারওয়েল সায়েবের বিশেষ স্নেহধন্য অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে লালদিঘির হাঁটাপথে দেখা। অমিয়দা তখন সরকারি লিকার বিভাগের প্রধান। তিনি বললেন, এই যে দেখা হয়ে গেল, খুব ভালো লাগল। তুমি কি আজকাল একটু ড্রিংক করো? আমি লেম্বুপানি শুনে, অমিয়দা বললেন, তোমার ড্রিংকে ভুল কিছু হলে, বদনামটা আমার হবে, তা আমি সহ্য করব না। বারওয়েল সায়েব অভিশাপ দেবেন।

সে এক মস্ত গল্প। অমিয়দা আমাকে তাঁর বিবাদী বাগ অফিস নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার বিশ্বস্ত মিস্টার ব্যানার্জিকে বলে দিচ্ছি, সে তোমাকে যে কোনো ক্যালকাটা ব'-এ যখন ইচ্ছে নিয়ে যাবে, ইস্টইন্ডিয়া নাগাল্যান্ড থেকে ট্রেনি অফিসার বলে পরিচয় করিয়ে দেবে।' অমিয়দার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, তিনি পাশে না থাকলে কলকাতার পানীয় জগতের খুঁটিনাটি আমার আয়ত্তে আসত না। আমেরিকায় বিবাহ হওয়া তাঁর কন্যা স্বামীর দেহাবসানের পরে তাঁর কোম্পানির পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অমিয়দার শুভেচ্ছায় ধর্মতলার খিদিরপুরী জাহাজিদের প্রিয় পানশালায় আমার চোখ খুলে দিয়েছেন তখনকার নর্তকীরা, ওঁরা অর্থ পেলে রিকশ চড়ে অতিথির আবাসনেও উপস্থিত হতেন, সে এক বিচিত্র জীবন কথা, নৃত্যরতা নগর রমণীদের বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি।

সেসব কথা আবার বললে চৌরঙ্গী নাটকের নৃত্যরতা রমণীর রঙ্গকথার কিছু বাকি থাকে না এবং তারই সূত্র ধরে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার পরবর্তী উপন্যাস সম্রাট ও সুন্দরীর কথাও বলতে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে তা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখন আমার বিষয় শাজাহান হোটেল, চৌরঙ্গী ও ১০ জুন, যেদিন ওই বইয়ের প্রথম প্রকাশ ও আমার বিবাহ।

বিবাহ আলোচনাকালে উত্তরপাড়ায় পাত্রীর পিতৃগৃহে গিয়ে আমার মা একসময় পাত্রী বন্দনাকে বলেছিলেন, 'ওর প্রথম বইটার পিছনে ছিল বারওয়েল সায়েবের স্মৃতি এবং বারওয়েল মেমসাহেবের আশীর্বাদ, এবার দেখা যাবে তোমার ভাগ্যগুণ, কয়েকবছর ধরে ওর মাথার ঠিক নেই, সারাক্ষণ ওই শাজাহান হোটেলের আজব স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

বাক্ সাহিত্যের প্রকাশক শচীনবাবু আমাকে ঘন ঘন প্রুফ পাঠাচ্ছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখে দিচ্ছি, যাতে ছাপা দ্রুত এগিয়ে যায়। মুদ্রণ ব্যাপারে কিন্তু কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ভারতবন্দিত লিথোগ্রাফ কোম্পানির প্রধান অবনীবাবু আমার প্রকাশককে বলেছিলেন, তিনি অফসেটে এই বইয়ের প্রচ্ছদ ছাপবেন, যদিও বাংলা বই তখনও মোটেই অফসেটমুখী হয়নি। প্রচ্ছদশিল্পী ও বন্ধু অজিতগুপ্তর সঙ্গে আলাপ করার জন্য এক রবিবার রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে হাজির হয়েছি, এবং রবিবার খোলা রাসবিহারী পোস্টাপিস থেকে বিরাট একশিট কমদামি স্ট্যাম্পশিট কিনে অজিতবাবুর হাতে দিয়ে বলেছি, এই শিটের উপরেই একটা ছবি এঁকে দিন।

অজিত গুপ্ত খুব খুশি হলেন স্বপ্নাদ্য ডাকটিকিটের ইঙ্গিত পেয়ে। কিন্তু তিনি বললেন, আপনার আইডিয়ার সবটা কিন্তু নিলুম না, একটা ডাকটিকিটের বারংবার পুনরাবৃত্তি এক ঘেয়েমি না করে, সমস্ত প্রচ্ছদ জুড়ে আঁকব নানা হোটেল দৃশ্য যা ঈগলের অধীশ্বর অবনীবাবুর মনে ধরবে। ঈগল লিথোগ্রাফিক মুদ্রণ কোম্পানির প্রধান অবনীবাবু বই পাড়ায় এসে শচীনবাবুকে বলেছিলেন, চৌরঙ্গী প্রচ্ছদ সত্যিই তাঁর মনে ধরেছিল। তারপর এই ছ'দশক ধরে সেই প্রচ্ছদের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, আজ ঈগল নেই, অবনীবাবু নেই, অজিত গুপ্ত নেই, কিন্তু ঈগলের সেই মুদ্রণ নেগেটিভ আজও অক্ষত রয়েছে। বিবাহের আগেই বন্দনাকেও শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই প্রচ্ছদ দেখিয়েছিলেন, সেদিন কেউ কোনো মন্তব্য করেননি, পাগল লেখকের ততোধিক প্রচ্ছদ পাগলামো নিঃশব্দ সহ্য করে নেওয়া ছাড়া নান্যা পন্থা বিদ্যতেয়ম। সুদূর পুনা থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি দ্রুত এসে গেল। মুঙ্গেরে এক ফাঁকিবাজ লোভী উকিলের কাছে আসামির এমার্জেন্সি চিঠি এসে গিয়েছে, আমার ফাঁসির চিঠি এসে গিয়েছে, আপনি এখনও কিছু করলেন না। জাঁহাবাজ উকিল তৎক্ষণাৎ জানাল, মা দুর্গা বলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ো, আমরা অবশ্যই আপিলে দেখে নেব। শরদিন্দু আমাকে লিখলেন, সেই কথাই তোমাকে জানাচ্ছি।

বিমল মিত্র আমাকে বললেন, ওয়ান বুক অথরের গ্লানি যখন কাটল, তখন এবার মন খুলে লেখা আরম্ভ করুন। ন্যাশনাল লাইব্রেরির নকুলবাবু বললেন, আপনার গ্রহ নক্ষত্রের কাগজপত্তর আবার চেক করেছি, আপনার প্রত্যেক বইতে কিছু ম্লেচ্ছ সংসর্গ রেখে চলবেন, যে যাই বলুক।

বললাম, ম্লেচ্ছ সংসর্গ বলতে আপনি সায়েব-মেম ভাবছেন? নকুলবাবু বললেন, অন্তত ননবেঙ্গলি সম্পর্ক, ওই যে আপনি চৌরঙ্গীর ফ্রন্ট পেজে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্যাচুকে ফার্স্ট টেনেছেন ওইরকম একটা কিছু।

১০ জুন বিয়ের দিনের আগের আগে প্রকাশক শচিনবাবু খবরের কাগজে মুড়ে একটা নবমুদ্রিত চৌরঙ্গী দিলেন। বিয়ের দিনে শঙ্করীদাকে বললাম, সর্বনাশ হয়েছে, দু'একটা ফর্মা উধাও হয়ে গিয়েছে। বিয়ে মাথায় উঠে গেছে! আইনকানুন না মেনে শঙ্করীদাকে নিয়ে আমি প্রকাশকের কাছে ছুটে এলাম। ব্যাপারটা কত সিরিয়াস তা তিনি বুঝছেন, কিন্তু কিছু কপি তো চুপি চুপি বাজারে ছাড়া হয়ে গিয়েছে! এখন আর কিছু করবার নেই, যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গিয়েছে। তবে ওটা টপ সিক্রেট থাকবে, আপনি ও আমি ছাড়া বিশ্বসংসার কেউ জানবে না। আর একজন নিঃশব্দে কিছু বুঝেছিল। চৌরঙ্গীর ষাট বছর বয়সে সে আজ কাছে নেই, বন্দনা বলেছিল, বেশি তড়বড় করলে জীবনে কিছুই হয় না।

বন্দনার এই মূল্যবান কথাটি ঠিকমতো বুঝতে আমার ষাট বছর লেগে গেল। ১০ জুন ২০২২ জানা-শোনাদের কাউকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না, কেউ আর বলছে না, ওয়ান-বুক অথরের গোলমাল তো কেটে গিয়েছে, কিন্তু তুমি হঠাৎ ছ'দশক পরে দেখতে পাচ্ছ। ৬০ বছর আগের চৌরঙ্গীর প্রচ্ছদ ছাড়া আপনজনরা, নিন্দুকরা, শত্রুরা, মিত্ররা কেউ সামনে নেই, কেবল আমিই একা একা বসে আছি শাজাহান হোটেলের পাহারাদার হিসেবে।

দশ বছর আগের স্নেহভাজন সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য অফিসে এসে জোর করে আমাকে কে সি দাশের দোকানের সামনে নিয়ে গেলেন, তারপর হুকুম করলেন,

এবার কোনদিকে যাবেন বলুন? আমি অনুগত লেখক হিসেবে ওকে নিয়ে কার্জনপার্কের স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার স্ট্যাচুর কাছে গেলাম। 'এবার কোথায়?'

বললুম লাটসায়েবের বাড়ির নর্থ গেটে, যার নাম ছিল ওয়েলেসলি স্ট্রিট। সেখানেই ঐতিহাসিক বাড়িটা আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—স্পেনসেস হোটেলটা একটা ব্যাংক হয়েছে, সম্ভবত স্মৃতি হয়েছে ফিকসড ডিপোজিট। এইখানেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একদিন মাইকেল মধুসূদনকে দেখতে এসেছিলেন। তারপর কত বছর ধরে এখানে কত কী হয়ে গিয়েছে এই স্পেনসেস হোটেলে, তারই কয়েকটা ছবি আমি নতমস্তকে এঁকে গেলাম শাজাহান হোটেল নামক কাহিনির পাতায়, যা ছয় দশক পরেও বিশ্বজোড়া মানুষের ভালো লাগবে তা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। ছয় দশকের অন্তে সবাইকে আমার প্রণাম জানাই, প্রণাম জানাই আমার সাগরদাকে, যিনি আশ্রয় না দিলে, ওয়ান-বুক অথরের গ্লানি নিয়ে আমি যে কোথায় হারিয়ে যেতাম কে জানে!

পরবর্তী সময়ে শঙ্করীদা বলতেন, তোমার ওয়ান-বুক-অথর রক্ষা করেছিলেন বোধ হয় সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, তিনি কর্তাব্যক্তিদের রাগ থেকে নিজেকে একটু দূরে রেখেছিলেন।

বহুবছর পরে তিনি পার্ক স্ট্রিটের স্কাই রুমে তাঁর প্রিয় ভেটকি মেওনিজ খেতে খেতে, আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে বলেছিলেন, আমার খুব ইচ্ছে, তুমি দেশ-এ জয়েন করো, আমি আর ক'দিন আছি!

আমি স্তম্ভিত। যিনি আমাকে ওয়ান-বুক-লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে সময়ের ডাস্টবিনে ফেলে দেবার কথা ভেবেছিলেন তাঁর কথা শব্দহীন ভাষায় মনের মধ্যে জেগে উঠল।

সাগরময় বললেন, আমি আমার সম্পাদক অশোক সরকারের আদেশবাহক, তিনি তোমার উপরে কখনও বিরক্ত হননি, জেলে আমার গান শুনে তিনিই আমাকে এই কাগজ এনে দিয়েছিলেন। তাঁর নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের তো অভাব হয়নি। তোমাকে কতবার তিনি বলেছেন, বাঙালিকে পরিশ্রমের কাজ থেকে সরিয়ে দেবেন না। শ্রমকে ভয় করে আমাদের জাতের সর্বনাশ হয়ে গেল।

সবসময় কিন্তু তিনি সাগরময়ের কথা শুনতেন না, তিনি তাঁর স্ত্রীর কথায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ভক্ত। একবার বললেন, আগামী পূজা সংখ্যায় দেশে ওঁর লেখা নিন। "আমি সেই ইচ্ছামতো বোম্বাইতে চিঠি লিখলাম। উনি লিখলেন, কত পারিশ্রমিক দেবেন? উল্টোরথ পত্রিকা ইতিমধ্যে আমাকে ....টাকা দিতে চেয়েছে। আমি রেগে লিখলাম, আপনি লেখাকে নিলামে চড়িয়েছেন, আমার জানা ছিল না, নিলামে চড়াইয়া লেখা নেওয়ার অভ্যাস দেশ পত্রিকার নাই।"

কিছুদিন পরে সম্পাদক অশোক জিজ্ঞেস করলেন, কেমন সব কিছু এগোচ্ছে? সাগরময় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন, কিন্তু ফল উল্টো হল, সম্পাদক অশোক সরকার মৃদু হেসে বললেন, ওসব ভুলে যান, ওঁকে আবার লিখুন আপনি যা পাচ্ছেন, তার থেকে বেশি দিলে, আপনার কী হবে?

'আশ্চর্য আমার সম্পাদক মশাই, আমাকে তাই করতে হল। আর একবার আমাদের দীর্ঘদিনের লেখক বিমল মিত্র সম্বন্ধে, তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দামূলক লেখা বের হল, আহত হয়ে তিনি অশোকবাবুকে লিখলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আপনার সম্পাদক আমাকে ধারাবাহিক লেখার জন্য নিরন্তর অনুরোধ করে যাচ্ছেন, আর আপনার দৈনিক কাগজ আমার নিন্দায় মুখর।

অশোক সরকার পরবর্তী জেনারেশনের সম্পাদককে বললেন, এটা ঠিক হয়নি, যদি প্রিয় কাউকে সমালোচনা করতে হয় তাহলে তার আগে আত্মসমালোচনা দিয়ে শুরু করাই তো সঙ্গত।

সাগরময় ঘোষ বললেন, এই আমাদের সম্পাদক অশোককুমার সরকার, সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। আপনি তাই সম্পাদক রোষে পড়েননি, তিনি সব দেখেও আপনাকে কখনও ওয়ান-বুক অথরের

মার্কা দিতে রাজি হননি।

'কী বুঝলে তুমি?' জিজ্ঞেস করেছিলেন সাগরময়? আমি কিছু না বুঝে সাগরময় ঘোষকে বলেছিলাম, এমন সম্পাদককেই তো প্রাণ খুলে বলতে হয়—যুগ যুগ জিও! এঁরা ছিলেন বলেই, চৌরঙ্গী উপন্যাস ছয় দশক বেঁচে রইল। তাঁকে আর একবার প্রণাম, এই ১০ জুন ২০২২ সালে।

লেখক বিমল মিত্র মাঝে মাঝে বলতেন, সব ঘটনার যেমন একটা অবশ্যম্ভাবী শেষ আছে, তেমন সব শেষের পরে আর একটা শুরু আছে। এতদিন পরে চৌরঙ্গীর ৬০ বছরে মনে হচ্ছে চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের শেষ কোথায় হল?

এই লেখা শেষ করার আগে আরেকটা দৃশ্য আমার মনকে বেদনাময় করে তুলছে, আমি চোখের সামনে কলকাতা বুক ফেয়ারের একটা দৃশ্য আবার দেখতে পাচ্ছি— যাযাবর অমনিবাস গ্রন্থের প্রকাশ উপলক্ষে যাযাবর দিল্লি থেকে এসেছেন, তাঁর ইচ্ছায় আমি সভাপতি, এবং তাঁর বন্ধু অশোককুমার সরকার প্রধান অতিথি, তিনি কিন্তু তখনও আসেননি, অথচ উদ্বোধনী কক্ষ এখনই ছেড়ে দিতে হবে, সাগরদা বললেন, আরম্ভ করে দাও।

অতএব আমি যাযাবরকে পাশে রেখে আমার বক্তব্য শুরু করে দিলাম, এমন সময় পুত্রবধূদের নিয়ে অশোককুমার সরকার সভাগৃহে প্রবেশ করতে করতে বললেন, আমি কিন্তু বলেছিলাম, আমার কয়েক মিনিট দেরি হতে পারে।

আমার সামনের মাইক তাঁর দিকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, আপনিই আজকের পথপ্রদর্শক। অশোককুমার আগে বলা শুরু করলেন।

তারপর সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটল, তাঁর বক্তব্য হঠাৎ থেমে গেল, আমার মনে হল, তিনি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তাঁকে ধরলাম, তীব্র একটা আওয়াজ হল, ওইখানেই তাঁর শেষ কথা। দ্রুত তাঁকে বুক ফেয়ারের এমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্সে শোওয়ানো হল, আমি ও যাযাবর হাঁটতে হাঁটতে পিজি হসপিটালে রওনা হলাম।

সেখানে একটা টেবিলে সম্পাদক অশোক কুমারের প্রাণহীন দেহ শায়িত রয়েছে। পরবর্তী সম্পাদক ও তাঁর ভাই অরূপ কিছুক্ষণের মধ্যে চলে এসেছেন।

আগামীকাল কি কাগজ বন্ধ থাকবে? নতুন সম্পাদক অভীক সরকার কথা বললেন প্রখ্যাত সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে, ঠিক হল কাগজ বন্ধ থাকবে না, সন্তোষকুমার আমাকে বললেন, কালকের প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট আপনাকে লিখতে হবে, এই নিন কয়েকটা সাদা কাগজ। ঝটপট

আমি সেই রিপোর্ট কীভাবে লিখেছিলাম, তা আজও ভুলিনি। কেউ কেউ বিলম্বে এসে আগে চলে যান, আবার কেউ কেউ হতভাগ্য আগে এসে পরের সেই দৃশ্য দেখে যায়।

উপস্থিত সাগরময় পরে আমাকে বলেছিলেন, সংসারে এমনই হয়ে থাকে, তুমি আমার সম্পাদক অশোক সম্বন্ধে শেষ লেখাটা লিখতে পারলে, এটা আমার পক্ষে খুব স্বস্তির।

এতদিন পরে আরও কত কথা মনে পড়ছে। কিন্তু যাঁরা শুরু থেকে আমার সব ঘটনার সাক্ষী, তাঁদের কাউকে আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু মনে আসছে, চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের নিওন আলো সান্ধ্য বৃষ্টিকে অমান্য করে নিভছে এবং জ্বলছে, জ্বলছে আর নিভছে।

এই জীবনে সত্যিই অনেক কিছু আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত ঘটে যায়। স্মৃতির শেষ লাইনটা লিখতে চলেছি, ঠিক সেইসময় আমার কনিষ্ঠা কন্যা তনয়াকে বলার চেষ্টা করছি যে সে দিনের সাক্ষী প্রকাশক সুধাংশু, সে ছাড়াও আমার চেনাশোনার বাইরে সবাই হারিয়ে গিয়েছে। তনয়া বলল, আজ অদ্ভুত একজনের সঙ্গে দেখা হল, যাযাবরের তৃতীয় ভাইয়ের কন্যা সুস্মিতার সঙ্গে, সে ওই দিনে বালিকা বয়সে তার বাবার সঙ্গে সভাগৃহে উপস্থিত ছিল। “আমি বাবার সঙ্গে জ্যেঠামশায়ের অনুষ্ঠানে (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩) বুক ফেয়ারে উপস্থিত ছিলাম। কি আশ্চর্য! তাই না?” সুস্মিতা আরও জানাল, “আমার জেঠু বিনয় মুখার্জি বলতেন, আমার ছোট ভাই আমার থেকে ঠিক ২৫ বছর ছোট!”

নতুন সংস্করণ উপলক্ষে

প্রকাশকের নিবেদন

ছয় দশক ধরে পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে আরোহণ করে থাকা যে-কোনো বইয়ের পক্ষে এক পরম সৌভাগ্যের ঘটনা। চৌরঙ্গীর এই সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে আমরা সকলকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস চৌরঙ্গী বাংলার সীমানা পেরিয়ে দেশের সর্বত্র এবং বিদেশে সাড়া জাগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের পর আর কোনো বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ হিন্দি সাহিত্যেও এমন আলোড়ন জাগায়নি। গুজরাতি, মালয়ালাম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভারতীয় ভাষাতেও এই উপন্যাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপন্যাসের মাধ্যমে বিদেশিরা বাংলা শিক্ষা করেছেন। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশিনী গবেষক এই উপন্যাস সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পত্রিকায় সুবৃহৎ আলোচনা করেছেন। এই উপন্যাসের রুশ সংস্করণ, ইংরিজি, ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, চাইনিজ সংস্করণ পণ্ডিতসমাজের প্রশংসা ও পাঠকদের প্রীতি অর্জন করেছে।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার জোয়ারে আমরা আধুনিক সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ ফসলকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলাম। অসম্ভব এই প্রচেষ্টায় সাফল্যের জন্য আমরা সকলকে নমস্কার জানাই।

জুন ২০২২

সুধাংশুশেখর দে

দে'জ পাবলিশিং

শংকর

জন্ম ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৩, পথের পাঁচালীর দেশ বনগ্রামে, তদানীন্তন যশোহর জেলায়। আইনজীবী পিতৃদেব হরিপদ মুখোপাধ্যায় ভাগ্যসন্ধানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর আগেই কলকাতার পশ্চিম পারে হাওড়ায় চলে আসেন, সেখানেই ইস্কুলের শিক্ষা, বড় হয়ে ওঠা এবং সাহিত্যসাধনার শুরু। সাহিত্যজীবনের প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে পরিচয় এই হাওড়াতেই বিবেকানন্দ ইস্কুলে।

১৯৪৭ সালে পিতৃদেবের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে মাতৃদেবী অভয়ারানির অভয়ারণ্যে কঠিন জীবনসংগ্রামের শুরু বিচিত্র সব জীবিকার মাধ্যমে— কখনও পথের ফেরিওয়ালা, কখনও টাইপরাইটার ক্লিনার, কখনও প্রাইভেট টিউশনি, কখনও হাওড়ার খ্যাতনামা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা, কখনও অখ্যাত জুট-গানি ব্রোকারের কনিষ্ঠ কেরানি। কখনও টাইপিস্ট, কখনও স্টেনো এবং কোনো একসময় কলকাতার শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েলের বাবু হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ। ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল-এর আইনী চেম্বার আর এক জীবনের শুরু। অনন্য এই অভিজ্ঞতা থেকে ১৯৫৪ সালে শুরু 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা 'কত অজানারে'। তারপর থেকে বিরতিহীন সৃষ্টির সাধনা, শরৎচন্দ্রের পর বাংলার সর্বস্তরে এমন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে আজও লিপিবদ্ধ হয়নি।

মধ্যপর্বে কোনো একসময়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই-এ পাশ এবং বৌবাজার বঙ্গবাসী রাত-কলেজ থেকে বি এ ডিগ্রি লাভ। একই সঙ্গে আরও অনেক আজব বৃত্তি থেকে কখনও ক্ষুধানিবৃত্তি, কখনও-বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এক দশকের ঐকান্তিক অনুসন্ধানে চৌরঙ্গী উপন্যাসের সৃষ্টি। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ ১৯৬১ সাল থেকে, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১০ই জুন ১৯৬২।

CHOWRINGHEE
A Bengali novel
by Sankar
Published by
Sudhangshu Sekhar Dey
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street.
Kolkata 700073
Telephone : (033) 2241-2330
(033) 2219-7920
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
Rs. 400/-

ISBN 978-81-295-1537-7

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা :
দিলীপ দে
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক :
সুভাষচন্দ্র দে
বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদশিল্পী
অজিত গুপ্ত

৪০০ টাকা

প্রথম বাক্ সংস্করণ :
—জুন ১৯৬২
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯
দ্বিতীয় সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৬২
—আষাঢ় ১৩৬৯
তৃতীয় সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ১৯৬২
—ভাদ্র ১৩৬৯
চতুর্থ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৬২
—অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
পঞ্চম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৬৩
—মাঘ ১৩৬৯
ষষ্ঠ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৬৩
—চৈত্র ১৩৬৯
সপ্তম সংস্করণ :
—মে ১৯৬৩
—বৈশাখ ১৩৭০
অষ্টম সংস্করণ :
—জুন ১৯৬৩
—আষাঢ় ১৩৭০
নবম সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
—ভাদ্র ১৩৭০
দশম সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
—মাঘ ১৩৭০
একাদশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৬৪
—বৈশাখ ১৩৭১
দ্বাদশ সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৬৪
—শ্রাবণ ১৩৭১
ত্রয়োদশ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৬৪
—পৌষ ১৩৭১
চতুর্দশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৬৫
—বৈশাখ ১৩৭২
পঞ্চদশ সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৬৫
—শ্রাবণ ১৩৭২
ষোড়শ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৬৬
—বৈশাখ ১৩৭৩
সপ্তদশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৬৬
—শ্রাবণ ১৩৭৩
অষ্টাদশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৬৭
—ফাল্গুন ১৩৭৩
ঊনবিংশ সংস্করণ :
—অক্টোবর ১৯৬৭
—আশ্বিন ১৩৭৪
বিংশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৬৮
—বৈশাখ ১৩৭৫
একবিংশ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৬৮
—অগ্রহায়ণ ১৩৭৫
দ্বাবিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৭০
—ফাল্গুন ১৩৭৬
ত্রয়োবিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
—মাঘ ১৩৭৯
চতুর্বিংশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৫
—শ্রাবণ ১৩৮১
রজত জয়ন্তী সংস্করণ
—মে ১৯৭৮
—বৈশাখ ১৩৮৫
প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬
দ্বিতীয় সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬
তৃতীয় সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬

চতুর্থ সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬

পঞ্চম সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬

ষষ্ঠ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—শ্রাবণ ১৩৮৬

সপ্তম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

অষ্টম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

নবম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

দশম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

একাদশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

দ্বাদশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৭৯
—ভাদ্র ১৩৮৬

ত্রয়োদশ সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৮০
—পৌষ ১৩৮৬

চতুর্দশ সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৮০
—মাঘ ১৩৮৬

পঞ্চদশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
—মাঘ ১৩৮৬

ষোড়শ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮০
—ফাল্গুন ১৩৮৬

সপ্তদশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮০
—ফাল্গুন ১৩৮৬

অষ্টাদশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৮০
—বৈশাখ ১৩৮৭

ঊনবিংশ সংস্করণ :
—মে ১৯৮০
—বৈশাখ ১৩৮৭

বিংশ সংস্করণ :
—অক্টোবর ১৯৮০
—কার্তিক ১৩৮৭

একবিংশ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮০
—কার্তিক ১৩৮৭

দ্বাবিংশ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮০
—অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

ত্রয়োবিংশ সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৮১
—পৌষ ১৩৮৭

চতুর্বিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
—মাঘ ১৩৮৭

পঞ্চবিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮১
—ফাল্গুন ১৩৮৭

ষড়বিংশ সংস্করণ :
—জুন ১৯৮১
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

সপ্তবিংশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৮১
—শ্রাবণ ১৩৮৮

অষ্টাবিংশ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৮১
—পৌষ ১৩৮৮

ঊনত্রিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮২
—মাঘ ১৩৮৮

ত্রিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮২
—ফাল্গুন ১৩৮৮

একত্রিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮২
—চৈত্র ১৩৮৮

দ্বাত্রিংশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৮২
—বৈশাখ ১৩৮৯

ত্রয়স্ত্রিংশ সংস্করণ :
—মে ১৯৮২
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৮২
—শ্রাবণ ১৩৮৯

পঞ্চত্রিংশ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮২
—অগ্রহায়ণ ১৩৮৯

ষট্‌ত্রিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮৩
—ফাল্গুন ১৩৮৯

সপ্তত্রিংশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৮৩
—বৈশাখ ১৩৯০

অষ্টাত্রিংশ সংস্করণ :
—মে ১৯৮৩
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

ঊনচত্বারিংশ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৮৩
—শ্রাবণ ১৩৯০

চত্বারিংশ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৮৩
—পৌষ ১৩৯০

একচত্বারিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
—মাঘ ১৩৯০

দ্বাচত্বারিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮৪
—ফাল্গুন ১৩৯০

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ সংস্করণ :
—জুন ১৯৮৪
—আষাঢ় ১৩৯১

চতুশ্চত্বারিংশ সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮৪
—অগ্রহায়ণ ১৩৯১

পঞ্চচত্বারিংশ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
—ফাল্গুন ১৩৯১

ষট্‌চত্বারিংশ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮৫
—চৈত্র ১৩৯১

সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ :
—এপ্রিল ১৯৮৫
—বৈশাখ ১৩৯২

অষ্টচত্বারিংশ সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
—ভাদ্র ১৩৯২

ঊনপঞ্চাশতম সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৮৫
—অগ্রহায়ণ ১৩৯২

পঞ্চাশতম সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
—মাঘ ১৩৯২

একপঞ্চাশতম সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮৬
—ফাল্গুন ১৩৯২

দ্বাপঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—মে ১৯৮৬
—বৈশাখ ১৩৯৩

ত্রয়পঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৮৬
—ভাদ্র ১৩৯৩

চতুঃপঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৮৭
—চৈত্র ১৩৯৩

পঞ্চপঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৮৭
—ভাদ্র ১৩৯৪

ষট্‌পঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—মে ১৯৮৮
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫

সপ্তপঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৮৮
—পৌষ ১৩৯৫

অষ্টপঞ্চাশৎ সংস্করণ :
—জুন ১৯৮৯
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

ঊনষষ্টিতম সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮৯
—অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

ষষ্টিতম সংস্করণ :
—জুন ১৯৯০
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭

একষষ্টিতম সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
—মাঘ ১৩৯৭
দ্বাষষ্টিতম সংস্করণ :
—জুন ১৯৯১
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮
ত্রয়ঃষষ্টিতম সংস্করণ :
—জুন ১৯৯২
—আষাঢ় ১৩৯৯
চতুঃষষ্টিতম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৯৩
—মাঘ ১৩৯৯
পঞ্চষষ্টিতম সংস্করণ :
—জুলাই ১৯৯৩
—শ্রাবণ ১৪০০
ষট্‌ষষ্টিতম সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
—মাঘ ১৪০০
সপ্তষষ্টিতম সংস্করণ :
—অক্টোবর ১৯৯৪
—আশ্বিন ১৪০১
অষ্টষষ্টিতম সংস্করণ :
—মার্চ ১৯৯৫
—ফাল্গুন ১৪০১
ঊনসপ্ততিতম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৯৫
—শ্রাবণ ১৪০২
সপ্ততিতম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৯৬
—মাঘ ১৪০.
একসপ্ততিতম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ১৯৯৭
—পৌষ ১৪০৩
দ্বাসপ্ততিতম সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ১৯৯৭
—অগ্রহায়ণ ১৪০৪
ত্রয়সপ্ততিতম সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৯৮
—অগ্রহায়ণ ১৪০৫
চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ :
—আগস্ট ১৯৯৯
—শ্রাবণ ১৪০৬
শততম মিলিত সংস্করণ :
—জুন ২০০০
—জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭
১০১ সংস্করণ :
—আগস্ট ২০০১
—শ্রাবণ ১৪০৮
১০২ সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ২০০২
—আশ্বিন ১৪০৯
১০৩ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০০৩
—কার্তিক ১৪১০
১০৪ সংস্করণ :
—জানুয়ারি ২০০৫
—পৌষ ১৪১১
১০৫ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ২০০৬
—মাঘ ১৪১২
১০৬ সংস্করণ :
—জুন ২০০৭
—জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
১০৭ সংস্করণ :
—আগস্ট ২০০৮
—ভাদ্র ১৪১৫
১০৮ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০০৯
—অগ্রহায়ণ ১৪১৬
১০৯ সংস্করণ :
—জুন ২০১০
—জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
১১০ সংস্করণ :
—মে ২০১১
—জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
১১১ সংস্করণ :
—জুন ২০১২
—জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
১১২ সংস্করণ :
—জুলাই ২০১২
—শ্রাবণ ১৪১৯
১১৩ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ২০১২
—অগ্রহায়ণ ১৪১৯
১১৪ সংস্করণ :
—জুন ২০১৩
—জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
১১৫ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০১৩
—অগ্রহায়ণ ১৪২০
১১৬ সংস্করণ :
—এপ্রিল ২০১৪
—বৈশাখ ১৪২১
১১৭ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০১৪
—অগ্রহায়ণ ১৪২১
১১৮ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০১৫
—অগ্রহায়ণ ১৪২২
১১৯ সংস্করণ :
—নভেম্বর ২০১৬
—অগ্রহায়ণ ১৪২৩
১২০ সংস্করণ :
—আগস্ট ২০১৭
—শ্রাবণ ১৪২৪
১২১ সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ২০১৮
—আশ্বিন ১৪২৫
১২২ সংস্করণ :
—জুলাই ২০১৯
—আষাঢ় ১৪২৬
১২৩ সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ২০২০
—মাঘ ১৪২৭
১২৪ সংস্করণ :
—ডিসেম্বর ২০২১
—পৌষ ১৪২৮
১২৫ সংস্করণ :
—জুন ২০২২
—জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

ওরা বলে—এসপ্ল্যানেড। আমরা বলি—চৌরঙ্গী। সেই চৌরঙ্গীরই কার্জন পার্ক। সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত শরীরটা যখন আর নড়তে চাইছিল না, তখন ওইখানেই আশ্রয় মিলল। ইতিহাসের মহামান্য কার্জন সায়েব বাংলাদেশের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন। সুজলা-সুফলা এই দেশটাকে কেটে দু''ভাগ করবার বুদ্ধি যেদিন তাঁর মাথায় এসেছিল, আমাদের দু'র্ভাগ্যের ইতিহাস নাকি সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগেকার কথা। বিশ শতকের এই মধ্যাহ্নে মে মাসের রৌদ্রদগ্ধ কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আমি ইতিহাসের বহুধিকৃত সেই প্রতিভাদীপ্ত ইংরেজ রাজপুরুষকে প্রণাম করলাম: তাঁর পরলোকগত আত্মার সদগতি প্রার্থনা করলাম। আর প্রণাম করলাম রায় হরিরাম গোয়েঙ্কা বাহাদু'র কে টি, সি আই ই-কে। তাঁর পায়ের গোড়ায় লেখা— Born June 3, 1862. Died February 28, 1935.

আমাকে মনে আছে কী? অনেক দিন আগে কাসুন্দের এক অপরিণত বুদ্ধি বালক বিভূতিদার হাত ধরে রামকেষ্টপুর ঘাট থেকে অম্বা স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে হাইকোর্ট দেখতে এসেছিল।(এই লেখকের 'কত অজানারে') সায়েব ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেয়েছিল সে। ছোকাদার স্নেহ পেয়েছিল। জজ, ব্যারিস্টার, মক্কেল সবার ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সে প্রাণভরে বাবুগিরি করেছিল, আর দু'টি বিস্মিত চোখ দিয়ে এক অপরিচিত জগতের রূপ রস গন্ধ উপভোগ করেছিল।

দুঃখ আর দৈন্যের অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে বিশ্বপ্রেমিক বিদেশীর মরুদ্যানে আশ্রয় পেয়ে, আমার ক্লান্ত প্রাণ অকস্মাৎ অতীতকে ভুলে গিয়েছিল। ভেবেছিল, এ আশ্রয় বুঝি চিরকালের। কিন্তু সংসারের সদা-সতর্ক অডিটররা হিসেবে ভুল ধরার জন্য সর্বদাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমারও ভুল ধরা পড়তে দেরি হলো না। সায়েব চোখ বুজলেন। মরূদ্যানের তাঁবু, আমাদের মতো অভাগাদের কল্যাণে, সামান্য ঝড়েই ধ্বংস হয়ে গেলো। 'আবার

চলো। ফরওয়ার্ড মার্চ'—বিজয়ী বিধাতার হৃদয়হীন সেনাপতি পরাজিত বন্দীকে হুকুম দিলেন। প্রাণ না চাইলেও, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মনটাকে ক্লান্ত দেহের ঠেলা-গাড়িতে চড়িয়ে আবার যাত্রা শুরু করতে হলো। Onward, Onward! Don't look back -- সামনে সামনে। পিছনে তাকিও না।'

আমার পিছনে এবং সামনে কেবল পথ। যেন রাত্রের অন্ধকারে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের অচেনা সরাইখানায় আশ্রয় পেয়েছিলাম। এখন ভোরের আলোয় পথকে আবার ঘর করেছি। হাইকোর্টের বাবুরা এসেছিলেন। চোখের জল ফেলেছিলেন। ছোকাদা বলেছিলেন, “আহা, এই বয়সে স্বামী হারালি! একেবারে কাঁচা বয়েস্।”

আমি কিন্তু কাঁদিনি। একটুও কাঁদিনি। বজ্রাঘাতে আমার চোখের সব জল যেন ধোঁয়া হয়ে গিয়েছিল।

ছোকাদা কাছে ডেকে বসিয়েছিলেন। শিখের দোকান থেকে চা আনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বুঝি ভাই, সব বুঝি। কিন্তু এই পোড়া পেটটা যে কিছুই বুঝতে চায় না। সামান্য যা হয় কিছু মুখে দে, শরীরে বল পাবি।”

ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে সেই আমার শেষ চা-খাওয়া। ছোকাদা অবশ্য বলেছিলেন, “ভাবিস না, এই পাড়াতেই কিছু একটা জুটে যাবে। তোর মতো বাবুকে কোন সায়েবের না রাখতে ইচ্ছে হয় বল? তবে কিনা এক স্ত্রী থাকতে, অন্য কাউকে নেওয়া—। সবারই তো বাবু, রয়েছে।”

জোর করে কথা বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু সেদিন চুপ করে থাকতে পারিনি। জোর করেই বলেছিলাম, "ছোকাদা, আমি পারবো না। চাকরি পেলেও এ-পাড়ায় আর থাকতে পারবো না।”

ছোকাদা, অর্জুনদা, হারুদা সবাই সেদিন আমার দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। বিষণ্ণ ছোকাদা বলেছিলেন, “আমাদের দ্বারা তো হলো না। যদি কেউ পারে তো তুই পারবি। পালিয়ে যা— আমরা জানবো এই সর্বনাশা গোলকধাঁধা থেকে অন্তত একজনও বেরিয়ে যেতে পেরেছে।”

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমিও টিফিন কৌটো সমেত কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পশ্চিম আকাশের বিষণ্ন সূর্য সেদিন আমার চোখের সামনেই অস্ত গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর? সেদিন কি আমি জানতাম, জীবন এতো নির্মম? পৃথিবী এতো কঠিন, পৃথিবীর মানুষরা এতো হিসেবী?

চাকরি চাই। মানুষের মতো বেঁচে থাকবার জন্যে একটা চাকরি চাই। কিন্তু কোথায় চাকরি?

ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট হাতে কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাঁরা। আমার আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় তাঁদের প্রাণে যে কত আঘাত দিয়েছে তাও জানিয়েছেন। কিন্তু চাকরির কথাতেই আঁতকে উঠেছেন। বলেছেন, দিনকাল বড়ই খারাপ। কোম্পানির ফাইনান্সিয়াল অবস্থা 'হ্যাপি' নয়। তবে ভেকান্সি হলে নিশ্চয়ই খবর পাঠাবেন।

আর এক আপিসে গিয়েছি। ওঁদের দত্ত সায়েব এক সময় বিপদে পড়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমারই অনুরোধে সায়েব বিনা ফিতে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু দত্ত সায়েব দেখা করলেন না। স্লিপ হাতে বেয়ারা ফিরে এলো। সায়েব আজ বড়ই ব্যস্ত। দেখা করতে না পারার জন্য স্লিপের উপর পেন্সিলে আফসোস প্রকাশ করেছেন। এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ যে তিনি কর্মব্যস্ত থাকবেন এবং যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার সুমধুর সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারবেন না, তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

বেয়ারা বলেছিল, চিঠি লিখিয়ে। লজ্জার মাথা খেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। বলা বাহুল্য, উত্তর আসেনি।

আরও অনেক আবেদন পত্র পাঠিয়েছি। পরিচিত, অপরিচিত, বক্স নম্বর, অনেকের কাছেই আমার গুণাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ পেশ করে পত্র দিয়েছি। কিন্তু সরকারী পোস্টাপিসের রোজগার বৃদ্ধি ছাড়া তাতে আর কোনও সুফল হয়নি।

হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দু'র্দিনের জন্য সঞ্চয় করিনি কোনোদিন। সামান্য যা পুজি ছিল তাও শেষ হয়ে এলো। এবার নিশ্চিত উপবাস।

হা ঈশ্বর! কলকাতার হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের শেষ বাবুর কপালে এই লেখা ছিল?

ফেরিওয়ালার কাজ পাওয়া গেলো অবশেষে। ভদ্রভাষায় নাম সেলসম্যান। ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট বিক্রি করতে হবে আপিসে আপিসে। কোম্পানির নাম শুনলে শ্রদ্ধায় আপনার মাথা নত হয়ে আসবে। ভাববেন, ম্যাগপিল এণ্ড ক্লার্ক কোম্পানিটি বার্মাশেল, জার্ডিন হেণ্ডারসন বা এন্ড্রু ইউলের সমপর্যায়ের। কিন্তু এই কোম্পানির কর্ণধার এম জি পিল্লাই নামক মাদ্রাজী ছোকরার দু'টো প্যান্ট ও একটা নোংরা টাই ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ছিল না। ছাতাওয়ালা লেনের এক অন্ধকার বাড়ির একখানা ঘরে তার ফ্যাক্টরি, আপিস, শো রুম, মায় শোয়ার এবং রান্নার ঘর। এম জি পিল্লাই ম্যাগপিল হয়েছেন। আর ক্লার্ক সায়েব? উনি কেউ নন, ম্যাগপিলের ক্লার্ক!

তারের পাকানো ঝুড়িগুলো আমাকে বিক্রি করতে হবে। টাকায় চার আনা কমিশন। প্রতি ঝুড়িতে চার আনা। সে যেন আমার কাছে স্বর্গ।

কিন্তু তাও বিক্রি হয়নি। ঝুড়ি হাতে আপিসে আপিসে ঘুরেছি, আর বাবুদের টেবিলের তলায় তাকিয়েছি। অনেকে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, "ওখানে কী দেখছো?"

বলেছি, "আজ্ঞে, আপনার ছেড়া-কাগজ ফেলবার ঝুড়িটা।" সেটা জরাজীর্ণ দেখলে কি আনন্দই যে হয়েছে। বলেছি, "আপনার ঝুড়িটার আর কিছুই নেই। একটা নতুন নিন না, স্যর। খুব ভাল জিনিস। একটা কিনলে দশ বছর নিশ্চিন্ত।"

বড়বাবু, ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, "কণ্ডিশন তো বেশ ভালই রয়েছে। এখনও হেসে-খেলে বছরখানেক চলে যাবে।"

বড়বাবুর মুখের দিকে করুনভাবে তাকিয়ে থেকেছি। কিন্তু আমার মনের কথা তিনি বুঝতে পারেননি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, 'ঝুড়িটার না হয় হেসে-খেলে আরও বছরখানেক চলে যাবে। কিন্তু আমার? আমার যে আর একদিনও চলতে চাইছে না।'

কিন্তু বলার ইচ্ছে থাকলেই চার্নক সায়েবের এই আজব শহরে সব কিছু বলা যায় না। তাই নীরবে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

স্যুট-পরা, টাই-বাঁধা বাঙালী সায়েবদের সঙ্গেও দেখা করেছি। জুতোর ডগাটা নাড়তে নাড়তে সায়েব বলছেন, "ভেরী গুড্। ইয়ং বেঙ্গলীরা যে বিজনেস লাইনে এণ্টার করছে এটা খুবই আশার কথা।" বলেছি, "আপনাকে তাহলে ক'টা দেবো, স্যর?"

স্যর আমার দিকে তাকিয়ে একটুও দ্বিধা না করে বলেছেন, "আমার ছ'টা দরকার। কিন্তু দেখবেন আমাদের শেয়ারের কথাটা যেন ভুলে যাবেন না।" ছটা ঝুড়ি বিক্রি করে আমার দেড় টাকা লাভ। বিক্রির টাকা পেয়ে, সেই দেড় টাকা হাতে নিয়ে বলেছি, "ছ'টা ঝুড়িতে আমার এই থাকে স্যর। আপনার যা বিচার হয় নিন।"

সিগারেট টানতে টানতে সায়েব বলেছেন, "অন্য কারুর কাছে পারচেজ করলে ইজিলি থার্টি পারসেন্ট পেতাম। তা হাজার হোক আপনি বেঙ্গলী, সুতরাং টোয়েন্টিফাইভই নিলাম।" এই বলে পুরো দেড়টা টাকাই আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। তারপর দুঃখ করেছেন, আমাদের জাতের অনেষ্টি বলে কিচ্ছু নেই। "এর মধ্যেই বেশ এক্সপার্ট হয়ে উঠেছেন তো। কী করে বললেন যে ছ'টা ঝুড়িতে আপনার দেড় টাকার বেশী থাকবে না? আমরা কি grass-এ মুখ দিয়ে চরি?"

কোনো উত্তর না দিয়েই সেদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। অবাক হয়ে এই অদ্ভুত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থেকেছি।

আশ্চর্য! এই পৃথিবীকেই একদিন কত সুন্দর বলে মনে হয়েছিল আমার। এই পৃথিবীতেই আমি একদিন মানুষকে শ্রদ্ধা করতাম। বিশ্বাস করতাম, মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন। হঠাৎ মনে হলো, আমি একটি গর্দভ। সংসারের সংখ্যাহীন আঘাতেও আমার শিক্ষা হয়নি। আমার জ্ঞান-চক্ষু কি কোনোদিন উন্মীলিত হবে না? না না, অসম্ভব। আমাকে চালাক হয়ে উঠতেই হবে।

সত্যিই আমি চালাক হয়ে উঠলাম। এক টাকার ঝুড়ির দাম বাড়িয়ে পাঁচসিকে বলেছি। যিনি কিনলেন তাঁকে বিনা দ্বিধায় চার আনা পয়সা দিয়ে বলেছি, "কিছুই থাকে না, স্যর। যা কম্পিটিশনের মার্কেট। টিকে থাকার জন্যে উইদাউট মার্জিনেই বিজনেস করছি।"

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বটে, কিন্তু তাতে কোনো কষ্ট হয়নি আমার। শুধু মনে হয়েছে, স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি একা আমাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে,

চালাকি করে বে'চে থাকতে হবে, পথ তৈরি করতে হবে, এবং এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের কোনো আনন্দের আয়োজনে আমরা নিমন্ত্রিত অতিথির সমাদর পাবো না, সুতরাং প্রয়োজন মতো জোর করেই ভাগ বসাতে হবে।

সেই সময়েই একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের একটা আপিসে গিয়েছিলাম। মে মাসের কলকাতা। রাস্তার পিচ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটছে। দু'পরের রাজপথ মধ্যরাতের মতো জনমানবহীন। শুধু আমাদের মতো কিছু, হতভাগা তখনও যাতায়াত করছে। তাদের থামলে চলবে না। তারা এ-আপিস থেকে ও আপিসে যাচ্ছে, আর ও-আপিস থেকে এ-আপিসে আসছে, যদি কোথাও কিছু জুটে যায়।

ঘামে গায়ের জামাটা ভিজে উঠেছিল—যেন সবেমাত্র লালদীঘিতে ডুব দিয়ে উঠে এসেছি। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পথের ধারে ঘোড়াদের জল খাওয়ার সুবেন্দোবস্ত রয়েছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের জন্য কিছুই নেই। বেকার ক্লেশ নিবারণ তো আর পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির দায়িত্ব নয়, সুতরাং তাঁদের দোষ দিতে পারিনি।

একটা বড়ো বাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সামনেই লিফট। লিফটে উঠে হাঁপাচ্ছি। গেট বন্ধ করে লিফটম্যান হাতল ঘুরিয়ে দিলো। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়লো, আমার হাতে দু'টো ঝুড়ি। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েই অভিজ্ঞ লিফটম্যানের বুঝতে বাকি রইলো না আমি কে। সুতরাং আবার হাতল ঘুরলো, লিফট্ আবার স্বস্থানে ফিরে এলো।

আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে লিফটম্যান আমাকে বের করে দিয়েছিল। এবং তার আগে জানিয়ে দিয়েছিল, "এই লিফট্ কেবল সায়েব এবং বাবুদের জন্যে। তোমার মতো নবাববাহাদু'রদের সেবা করবার জন্যে কোম্পানি আমাকে মাইনে দিয়ে রাখেনি।"

সত্যিই তো, আমাদের মতো সামান্য ফেরিওয়ালার জন্যে কেন লিফট হতে যাবে? আমাদের জন্যে তো পাকানো সিড়ি রয়েছে, হেটে হেটে উপর তলায় যাও।

তাই করেছি। কোনো অভিযোগ করিনি—নিজের অদৃষ্টের কাছেও নয়। ভেবেছি, সংসারের এই নিয়ম। উপরে উঠবার লিফট সবার জন্যে নয়।

দিনটাই খারাপ আজ। একটাও বিক্রি হয়নি। অথচ তিন আনা খরচ হয়ে গিয়েছে। এক আনা সেকেন্ড ক্লাশের ট্রামভাড়া, এক আনার আলু-কাবলী। তারপর আর লোভ সামলাতে পারিনি। বেপরোয়া হয়ে এক আনার ফুচকা খেয়ে ফেলেছি। খুব অন্যায় করেছি। ক্ষণেকের দূর্বলতায় এক আনা পয়সা উড়িয়ে দিয়েছি।

আপিসে ঢুকে টেবিলের তলায় তাকিয়েছি। সব টেবিলের তলায় ঝুড়ি আছে। দরজার গোড়ায় এক প্রৌঢ়া মেমসায়েব কাজ করছিলেন। আমাকে দেখেই বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী চাই?”

বললাম, “ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট। ভেরি গুড ম্যাডাম। ভেরি স্ট্রং, এন্ড ভেরি ভেরি ডিউরেবল।”

কিন্তু বক্তৃতা কাজে লাগলো না। মেমসায়েব তাড়িয়ে দিলেন। ক্লান্ত পা দু’টোকে তোকে কোনোরকমে চালিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আপিসের দরজার সামনে বেঞ্চিতে বসে ইয়া গোঁফওয়ালা এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান খৈনি টিপছিলেন। মাথায় তাঁর বিরাট পাগড়ি। পরনে সাদা তকমা। বুকের কাছে ঝকঝকে পিতলের পাতে কোম্পানির নাম জ্বল জ্বল করছে।

দরোয়ানজী আমাকে পাকড়াও করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, একটা ঝুড়ি বিক্রি করলে আমার কত থাকে।

বুঝলাম দারোয়ানজীর আগ্রহ আছে। বললাম, “চার আনা লাভ থাকে।” ঝুড়ির দাম জিজ্ঞাসা করলেন দারোয়ানজী। এবার আর বোকামি করিনি। সোজাসুজি বললাম, “পাঁচ সিকে।”

দারোয়ানজী আমার হাতের ঝুড়িটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে নিবেদন করলাম, “খুব ভাল মাল, একটা কিনলে দশ বছর নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।”

ঝুড়িটা হাতে করে দারোয়ানজী এবার আপিসের ভিতরে ঢুকে গেলেন। মেমসায়েব বললেন, “আমি তো বলে দিয়েছি ঝুড়ির দরকার নেই।” দারোরানজী কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, "ঘোষবাবুর ঝুড়ি নেই। মিত্তিরবাবুর ঝুড়ি ভেঙে গিয়েছে।

বড়সায়েবের ঝুড়ির রং ও চটে গিয়েছে। ইস্টক মে ভি দো চারঠো রাখনে কো জরুরৎ রয়েছে।”

সুতরাং মেমসায়েবকে হার মানতে হলো। আমার একসঙ্গে ছ'টা ঝুড়ির অর্ডার মিললো।

প্রায় লাফাতে লাফাতে ছাতাওয়ালা লেনে ফিরে এসেছি। আধ ডজন তারের ঝুড়ি এক সঙ্গে বেঁধে, মাথায় করে আপিসে চলে এলাম। দারোয়ানজী বাইরেই বসেছিলেন। আমাকে দেখে মৃদু' হাসলেন।

ঝুড়িগুলো স্টকে পাঠিয়ে দিয়ে, মেমসায়েব বললেন, “টাকা তো আজ পাওয়া যাবে না। বিল বানাতে হবে।”

ফিরে আসছিলাম। দারোয়ানজী গেটে ধরলেন। “রুপেয়া মিলা?” বোধহয় ভেবেছেন, আমি ভাগ না দিয়েই পালাচ্ছি। বললাম, “আজ মিললো না।”

“কাঁহে?” দারোয়ানজী আবার উঠে পড়লেন। সোজা মেমসায়েবের টেবিলে।

কথাবার্তায় প্রচুর অভিজ্ঞতা দারোয়ানজীর। বললেন, “মেমসাব, গরীৱ আদমী। হরেক আপিস মে যানে পড়তা”, এবার আমার ডাক পড়লো। দারোয়ানজী বীরদর্পে বললেন, “পেমেন্ট করোয়া দিয়া।” একটা ভাউচারের কাগজ এগিয়ে দিয়ে দারোয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সই করতে জানি কিনা। সই না জানলে টিপসই লাগাতে পারি। আমাকে ইংরেজীতে সই করতে দেখে দারোয়ানজী রসিকতা করলেন, “আরে বাপ্, তুম আংরেজী মে দস্তখত্, কর দিয়া?”

টাকাটা হাতে করে বেরিয়ে এলাম। দারোয়ানজীদের আমার চেনা আছে। কমিশনের ভাগ দিতে হবে। এবং সে ব্যবস্থা তো আমি আগে থেকেই করে রেখেছি।

দারোয়ানজী আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। দেড় টাকা ওঁর দিকে এগিয়ে বললাম, “এই আমার কমিশন। যা ইচ্ছে হয়..."

সঙ্গে সঙ্গে এমন যে হতে পারে আমার জানা ছিল না। দারোয়ানজীর সমস্ত মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিলো। আমার বেশ মনে আছে, বিশাল বনস্পতির মতো ওঁর দীর্ঘদেহটা হঠাৎ কাঁপতে আরম্ভ করলো। রাগে, অপমানে সমস্ত মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আমি ভাবলাম, বোধহয় ভাগ পছন্দ হয়নি। বলতে যাচ্ছিলাম, "বিশ্বাস করুন, দারোয়ানজী, ছটা ঝুড়িতে আমার দেড় টাকার বেশী থাকে না।" কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো। শুনতে পেলাম, দারোয়ানজী বলছেন, "কেয়া সমঝা তুম্?"

দারোয়ানজীকে আমি ভুল বুঝেছি। "কেয়া সমঝা তুম্? তুমকো দেখকে হামারা দু'খ হুয়া।...তুমি ভেবেছো কি? পয়সার জন্য তোমার ঝুড়ি বিক্রি করে দিয়েছি! রাম রাম!"

সেদিন আর চোখের জল থামিয়ে রাখতে পারিনি। পৃথিবী আজও তাহলে নিঃস্ব হয়নি। দারোয়ানজীর মতো মানুষরা আজও তাহলে বেঁচে আছেন।

দারোয়ানজী আমাকে কাছে বসিয়েছিলেন। ভাঁড়ে করে চা খাইয়েছিলেন। চা খেতে খেতে আমার পিঠে হাত রেখে দারোয়ানজী বলেছিলেন, "খোকাবাবু, ভয় পেও না। স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার নাম শুনেছো? যাঁর ব্রোঞ্জমূর্তি লাট সায়েবের বাড়ির সামনে রয়েছে? তিনিও তোমার মতো একদিন অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন।"

দারোয়ানজী বলেছিলেন, "বাবুজী, তোমার মুখে চোখে আমি সেই আগুন দেখতে পাচ্ছি। তুমিও একদিন বড়ো হবে, স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার মতো বড়ো।"

দারোয়ানজীর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থেকেছি। চোখের জলকে তখনও সংযত করতে পারিনি।

যাবার আগে দারোয়ানজী বলেছিলেন, "মনে রেখো, উপরে যিনি রয়েছেন, তিনি সর্বদাই আমাদের দেখছেন। সৎপথে থেকে তাঁকে সন্তুষ্ট রেখো। তাঁকে ঠকিও না।"

সে-দিনের কথা ভাবতে গেলে, আজও আমি কেমন হয়ে পড়ি। সংসারের দীর্ঘ পথে কত ঐশ্বর্য, কত চাকচিক্যের অন্তহীন সমারোহই তো দেখলাম। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সুখ, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য আজ আমার আয়ত্তের বাইরে নয়। সমাজের যাঁরা প্রণম্য, ভাবীকালের জন্য যাঁরা বর্তমানের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন; শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের যন্ত্রণাময় যুগকে ব্যাধিমুক্ত করার সাধনা করেছেন, তাঁদের অনেকের নিকট-সান্নিধ্য লাভের বিরল সুযোগও আজ আমার করায়ত্ত। কিন্তু ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের অখ্যাত আপিসের সেই অখ্যাত দারোয়ান আজও আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে

রইলেন। সেই দীর্ঘদেহী পশ্চিমা মানুষটির স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে হলো দারোয়ানজী আমাকে বিশ্বাস করলেন, অথচ আমি মিথ্যেবাদী, আমি চোর। প্রতিটি ঝুড়ির জন্য আমি চার আনা বেশী নিয়েছি। আমি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিনি।

ডালহোসি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এসেছি চৌরঙ্গীর কার্জন পার্কে। যাদের আপিস নেই, অথচ আপিস যাবার তাগিদ আছে; যাদের আশ্রয় নেই, অথচ আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে; সেই সব হতভাগাদের দু'দণ্ডের বিশ্রামস্থল এই কার্‌জন পার্ক। সময় এখানে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে গতি নেই, ব্যস্ততা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। সব শান্ত। ঘাসের ঘনশ্যাম বিছানায় গাছের ছায়ায় কত ভবঘুরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। এক জোড়া কাক স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার কাঁধে চুপচাপ বসে আছে।"

যাঁদের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে কার্জন পার্ক তৈরি হয়েছিল, মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালাম, কার্জন সায়েবকেও বাদ দিলাম না।

আর স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা? মনে হলো, তিনি যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাঁর পদতলে বসে আমার ঠোঁট থর থর করে কেঁপে উঠলো। হাত জোড় করে সভয়ে বললাম, "স্যর হরিরাম, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কোনো দোষ নেই। ক্লাইভ স্ট্রীটের এক স্বল্পবুদ্ধি নিরক্ষর দারোয়ান আমার মধ্যে আপনার ছায়া দেখেছে। আমার কোনো হাত ছিল না তাতে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে অপমান করার কোনো অভিসন্ধিই ছিল না আমার।"

কতক্ষণ একভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আপিসের ফাঁকিবাজ ছোকরা কেরানীর মতো সূর্যও কখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের দপ্তর গুটিয়ে ফেলে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন। শুধু আমি বসে আছি।

আমার কী আছে?

আমি কোথায় যাবো?

“হ্যালো স্যর।" হঠাৎ চমকে উঠলাম।

আমারই সামনে এ্যাটাচি কেস হাতে কোট-প্যান্ট-পরা এক সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গায়ের রং আমার থেকেও কালো। (মা নিতান্ত স্নেহবশেই, আমাকে উজ্জ্বল শ্যাম বলতেন।)

এ্যাটাচি কেসটা দেখেই চিনেছি। বায়রন সায়েব। পার্কের মধ্যে আমাকে ঘুমোতে দেখে বায়রন সায়েব অবাক হয়ে গিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বায়রন সায়েব বললেন, “বাবু!”

বায়রন সায়েবের আশ্চর্য হয়ে যাবারই কথা। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে আমার প্রতিপত্তি এক সময় তিনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন।

সেই দিনটার কথা আজও ভুলিনি। বেশ মনে আছে, চেম্বারে বসে টাইপ করছিলাম। এমন সময় এ্যাটাচি কেস হাতে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। আবলুস কাঠের মতো রং। কিন্তু সে রংয়েরও কেমন একটা জেল্লা আছে—ঠিক যেন ধর্মতলা স্ট্রীটে চার আনা-দিয়ে-রং-করা সু।

সায়েব প্রথমেই আমাকে সুপ্রভাত জানালেন। তারপর আমার বিনা অনুমতিতেই সামনের চেয়ারে এমনভাবে বসে পড়লেন, যেন আমাদের কতদিনের আলাপ। চেয়ারে বসেই পকেটে হাত ঢোকালেন, এবং এমন এক ব্রান্ডের সিগারেট বার করলেন যার প্রতি প্যাকেট সেই দুর্মুল্যের বাজারেও সাত পয়সায় বিক্রি হতো।

সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “একটা ট্রাই করে দেখুন।"

আমি প্রত্যাখ্যান করতেই হা-হা করে হেসে উঠলেন। “এই ব্রান্ড বুঝি আপনার পছন্দ হয় না? আপনি বুঝি খুব ফেথফুল? একবার যাকে ভালবেসে ফেলেন, তাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না!”

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, উনি বোধহয় ঐ সিগারেট কোম্পানির সেলসম্যান। কিন্তু, আমার মতো অরসিকের কাছে রস নিবেদন করে যে লাভ নেই, এই বক্তব্যটি যখন পেশ করতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আবার মুখ খুললেন, “কোনো কেস আছে নাকি?”

কেস? আমরাই তো অন্য লোকের কাছ থেকে কেস নিয়ে থাকি। আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে, বায়রন সায়েব নিজেই বললেন, "যে কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে আমাকে পাওয়া যেতে পারে।"

বায়রন আরও বললেন, “এনি কেস্। সে কেস যতই জটিল এবং রহস্যময় হোক না কেন, আমি তাকে জলের মতো তরল এবং দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেবো।”

আমি বললাম, “আমার হাতে এখন কোনো কেস্ নেই।"

টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বায়রন উঠে পড়লেন। 'দ্যাটস্, অল রাইট। দ্যাটস, অল রাইট! কিন্তু কেউ বলতে পারে না—কবে, কখন আমাকে দরকার পড়বে। তোমার দরকার না পড়ুক, তোমার ফ্রেন্ডদের দরকার পড়তে পারে।"

সেই জন্যই বায়রন সায়েব আমাকে একটা কার্ড´ দিলেন। ওঁর নাম লেখা আছে— B. Byron, your friend in need. টেলিফোন নম্বর: তার পাশেই লম্বা দাগ। কিন্তু কোনো নম্বর নেই।

বায়রন বললেন, “টেলিফোন এখনও হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে হবেই। সেই জন্যে জায়গা রেখে দিয়েছি।”

বায়রন বলেছিলেন, "হবে, ক্রমশ আমার সব হবে। শুধু টেলিফোন কেন, গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, মস্ত আপিস হবে। বাবু, ইউ ডোন্ট নো, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ তেমন ভাবে কাজ করলে কী হতে পারে; তোমাদের চীফ জাস্টিসের থেকেও সে বেশী রোজগার করতে পারে।”

প্রাইভেট ডিটেকটিভ! এতোদিন তো এদের কথা শুধু, বইতেই পড়ে এসেছি। বর্ণ-পরিচয়ের পর থেকেই কৈশোরের শেষ দিন পর্যন্ত এই শখের গোয়েন্দাদের অন্তত হাজারখানেক কাহিনী গোপনে এবং প্রকাশ্যে গলাধঃকরণ করেছি। ছাত্রজীবনে যে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে ব্যোমকেশ, জয়ন্ত-মানিক, সুব্রত-কিরীটি ও ব্লেক-স্মিথের পুজো করেছি, তার অর্ধেকও যদি যাদব চক্রবর্তী, কে পি বসু, আর নেসফিল্ডের সেবায় ব্যয় করতাম, তাহলে আজ 'আমার এই দুর্দশা হতো না। কিন্তু এতোদিন কেবল আমারই মনোরাজ্যে এই

সব সত্যানসন্ধানী রহস্যভেদীরা বিচরণ করতেন। এই মরজগতে—এই কলকাতা শহরেই ——যে তাঁরা সশরীরে ঘোরাফেরা করেন তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সহকারে বায়রন সায়েবকে আবার বসতে অনুরোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, চা পানে আপত্তি আছে কি না।

একবার অনুরোধেই উনি রাজী হলেন। চা-এর কাপটা দেড় মিনিটে নিঃশেষ হয়ে গেলো। বিদায় নেবার আগে বায়রন বললেন, "আমাকে তা হলে ভুলো না।"

আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দাদের আবার কাজের জন্য লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় নাকি? আমি তো জানি, গোয়েন্দা যখন ভোরবেলায় লেক প্লেসের বাড়িতে টোস্ট এবং ওমলেট সহযোগে চা খেতে খেতে সহকারীর সঙ্গে গল্প করতে থাকেন, তখন হঠাৎ টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বাজতে আরম্ভ করে। একটু বিরক্ত হয়েই নরম সোফা থেকে উঠে এসে রহস্যভেদী টেলিফোন ধরেন। তখন তাঁকে শিবগড় মার্ডার কেস্ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। নিহত রাজাবাহাদুরের বিধবা মহিষী কিংবা তাঁর একমাত্র কন্যা নিজে করুণ কণ্ঠে রহস্যভেদীকে অনুনয় করেন, 'এই কেসটা আপনাকে নিতেই হবে। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি যা চাইবেন তাই দেবো।'

কিংবা কোনো বর্ষামুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় যখন কলকাতার বুকে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়, বাইরে বেরোবার কোনো উপায় থাকে না; তখন আপাদমস্তক রেন কোট চাপা দিয়ে কোনো অজ্ঞাত পরিচয়, অতিথি রহস্যভেদীর ড্রইং রুমে ঢুকে পড়েন। মোটা অঙ্কের একটা চেক টেবিলের উপর রেখে দিয়ে আগন্তুক তাঁর রহস্যময় অতীতের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। একটুও বিচলিত না হয়ে, রহস্যভেদী বার্মা সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে ঠাণ্ডা মাথায় বলেন, 'পুলিসের কাছে গেলেই বোধহয় আপনার ভাল হতো।'

আগন্তুক তখন চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তাঁর হাত দু'টি ধরে করুণ কণ্ঠে বলেন, প্লিজ, আমাকে নিরাশ করবেন না।'

কিন্তু বায়রন সায়েবের একি অবস্থা? নিজেই কাজের সন্ধানে বেরিয়েছেন!

ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের আদালতী কর্মক্ষেত্রে কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। ভেবেছিলাম বায়রন সায়েবকে সাহায্য করতে পারবো। আমারই অনুরোধে আমারই কোনো পরিচিত জনের রহস্য ভেদ করে বায়রন সায়েব হয়তো ভারত-জোড়া খ্যাতি অর্জন করবেন। তাই তাঁকে বলেছিলাম, "মাঝে মাঝে আসবেন।"

বার্নিশ করা কালো চেহারা নিয়ে বায়রন সায়েব আবার টেম্পল চেম্বারে এসেছিলেন। এবার ওঁর হাতে কতগুলো জীবনবীমার কাগজপত্র। প্রথমে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সামান্য কয়েক মাসের চাকরি জীবনে আমাকে অন্তত দু'ডজন এজেন্টের খপ্পরে পড়তে হয়েছে। আড় চোখে বায়রন সায়েবের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করছিলাম। কিন্তু বায়রন যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। চেয়ারে বসে বললেন, "ভয় নেই, তোমাকে ইনসিওর করতে বলবো না।"

লজ্জায় আমার মুখে লাল হয়ে উঠেছিল। আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই বায়রন বললেন, "ডিটেকটিভের কাজ করতে গেলে অনেক সময় বহুরূপী হতে হয়। ইন্সিওরের দালালিটাও আমার মেকআপ।"

বায়রন সায়েবের জন্য চা আনিয়েছি। চা খেয়ে উনি বিদায় নিয়েছেন।

সত্যি আমার লজ্জা লাগতো। যদি ওঁর কোনো উপকার করতে পারতাম তাহলে বিশেষ আনন্দিত হতাম। কিন্তু সাধ থাকলেই সাধ্য হয় না, কোনো কাজই যোগাড় করতে পারিনি। ছোকাদাকে বলেছিলাম, "আপনাদের কোনো এনকোয়ারি থাকলে বায়রনকে দিন না।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোকাদা বলেছিলেন, "তোমার হালচাল তো সুবিধে মনে হচ্ছে না, ছোকরা। ঐ টেঁসো সায়েবের জন্যে তোমার এতো দরদ কেন? খুব সাবধান। এলিয়ট রোডের ঐ মালেদের পাল্লায় পড়ে কত ছোকরার যে টুয়েলভ-ও-ক্লক হয়ে গিয়েছে তা তো জানো না।"

ছোকাদার কথায় কান দিইনি। বায়রনকে বলেছি, "আমার লজ্জা লাগে। আপনি কষ্ট করে আসেন অথচ কোনো কাজ দিতে পারি না।"

বায়রন আশাবাদী। হা-হা করে হাসতে হাসতে বলেছেন, “কে যে কখন কাকে সাহায্য করতে পারে কিছুই বলা যায় না। অন্তত আমাদের লাইনে কেউ বলতে পারে না।”

এই সামান্য পরিচয়ের জোরেই বায়রন সায়েব কার্জন পার্কে আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। “হ্যাল্লো বাবু! হোয়াট ইজ্ দি ম্যাটার?”

উত্তর না দিয়ে, স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার মূর্তির দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলাম। বায়রন সায়েব কিন্তু ছাড়লেন না। আমার হাত দু'টো চেপে ধরলেন। আমাকে না-জিজ্ঞেস করেও এবার বোধহয় সব বুঝতে পারলেন। বললেন, "দিস, ইজ ব্যাড। ভেরী ব্যাড।”

“মানে?”

'মানে, বি এ সোলজার। সৈন্যের মতো ব্যবহার করো। এই আনফ্রেন্ডলি ওয়ার্ল্ড-এ আমাদের সবাইকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। ফাইট টু দি লাস্ট।” বায়রন সায়েবের দেহের দিকে এতোক্ষণে ভাল করে নজর দিলাম। বোধ হয় ওঁর দিনকাল একটু ভাল হয়েছে। ধপধপে কোট-প্যান্ট পরেছেন। পায়ে চকচকে জুতো।

জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ বায়রন সায়েব হড় হড় করে বর্ষণ করলেন। হয়তো ভেবেছেন, খেয়ালের বশে জীবনটাকে খরচ করে ফেলার সর্বনাশা অভিসন্ধি নিয়েই আমি এখানে বসে রয়েছি।

উপদেশ বস্তুটি কোনো দিনই আমার তেমন সহ্য হয় না। ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে বললাম, “পাষাণ-হৃদয় স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা কে.টি, সি.আই.ই-র চোখের সামনে ঐ গাছটাতে অনেক অশান্ত প্রাণ চিরদিনের শান্তি লাভ করেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। কিন্তু ভয় নেই, মিস্টার বায়রন, আমি ওই রকম কিছু একটা করে বসবো না।”

আমার দার্শনিক উত্তরের উপর বায়রন সায়েব কোনো গুরুত্বই আরোপ করলেন না। নিজের মনেই বললেন, “চিয়ার আপ। আরও খারাপ হতে পারতো। আরো অনেক খারাপ হতে পারতো আমাদের।”

দূরে পিতলের ঘড়া থেকে এক হিন্দুস্থানী চা বিক্রি করছিল। বায়রন সাহেব হাঁক দিয়ে চা-ওলাকে ডাকলেন। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না। পকেট থেকে ডাইরি খুলে বললেন, “এক কাপ শোধ করলাম। এখনও বিয়াল্লিশ কাপ পাওনা রইলো।”

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ফর্সা কোট প্যান্ট আছে?" বললাম, “বাড়িতে আছে।”

বায়রন সায়েব আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। “তাহলে আর ভাববার কিছু নেই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। না-হলে আজই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেন?”

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বায়রন সায়েব বললেন, “সবই বুঝবে। সময় হলে সবই বুঝতে পারবে। শাজাহান হোটেলের মেয়েটাকে আমিই কি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম!”

কথা থামিয়ে বায়রন সায়েব ঘড়ির দিকে তাকালেন। “কতক্ষণ লাগবে? বাড়ি থেকে কোট প্যান্ট পরে এখনই ফিরে আসতে হবে।”

“কোথায় যেতে হবে?”

“সে সব পরের কথা। এক ঘণ্টার মধ্যে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার স্ট্যাচুর তলায় তোমাকে ফিরে আসতে হবে। পরের প্রশ্ন পরে করবে, এখন হারি আপ —কুইক।"

চৌরঙ্গী থেকে কিভাবে সেদিন যে চৌধুরী বাগানে ফিরে এসেছিলাম ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তাড়াতাড়ির মাথায় বাসে উঠতে গিয়ে অনেকের পা মাড়িয়ে দিয়েছি। বাসের প্যাসেঞ্জাররা হাঁ হাঁ করে উঠেছেন। কিন্তু আমি বেপরোয়া। কিল-চড়-ঘুষি খেয়েও বাসে উঠতে প্রস্তুত ছিলাম।

দাড়ি কামিয়ে এবং সবেধন নীলমণি স্যুটটি পরে যখন কার্জন পার্কে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চৌরঙ্গীর রাত্রি ইতিমধ্যেই মোহিনী রূপ ধারণ করেছে। চোখ ধাঁধানো নিয়ন আলোর ঝলকানিতে কার্জন পার্ক-কেও যেন আর-এক কার্জন পার্ক—মনে হচ্ছে! দু'পুরে যে কার্জন পার্কের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সে যেন কোথায় উবে গিয়েছে। বহু দিনের বেকার ছোকরা যেন হঠাৎ হাজার-টাকা-মাইনের চাকরি পেয়ে বান্ধবীর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

কাব্য বা কোটেশন কোনোটারই ভক্ত নই আমি। কিন্তু অনেকদিন আগে পড়া কয়েকটা কবিতার লাইন মনে করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এই কার্জন পার্ক' দেখেই সমর সেন লিখেছিলেন:

আজ বহু দিনের তুষার স্তব্ধতার পর
পৰ্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।
তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে
বক্রদেহ নায়কের দল
বিগলিত বিষণ্নতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে
ময়দানে নষ্টনীড় মানুষের দল।
ফরাসী ছবির আমন্ত্রণে, ফিটনের ইঙ্গিতে আহ্বানে
খনির আগুনে রক্ত মেঘ সূর্যাস্ত এল।

দেখলাম মালিশওয়ালা, বাদামওয়ালা, চা'ওয়ালারা দল বেঁধে পার্কের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। ধোপভাঙা স্যুটে আমাকেও যে আর বেকারের মতো দেখাচ্ছিল না, তার প্রমাণ হাতে-নাতে পেলাম। মালিশওয়ালা কাছে এগিয়ে এসে বললে, "মালিশ সাব্"

"না", বলে এগিয়ে যেতে, মালিশওয়ালা আরও কাছে সরে এসে চাপা গলায় বললে, "গার্ল ফ্রেণ্ড সাব্? কলেজ গার্ল— পাঞ্জাবী, বেঙ্গলী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান...।" তালিকা হয়তো আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু আমি তখন বায়রন সায়েবকে ধরবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। আমার জন্য অপেক্ষা করে করে হয়তো তিনি এতোক্ষণে চলে গিয়েছেন। হয়তো চিরদিনের জন্য একটা অমূল্য সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো।

না। বায়রন সায়েব চলে যাননি। স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার পায়ের তলায় চুপচাপ বসে আছেন। রাতের অন্ধকারের সঙ্গে ওঁর কালো দেহটা যেন একেবারে মিশে গিয়েছে। ওঁর শাদা শার্ট আর প্যান্টটা যেন কোনো অদৃশ্য মানুষের লজ্জা নিবারণ করছে।

আমাকে দেখেই বায়রন সায়েব উঠে পড়লেন। বললেন, "তুমি যাবার পর অন্তত দশটা সিগারেট ধ্বংস করেছি। ধোঁয়া ছেড়েছি আর ভেবেছি, ভালই হলো। তোমারও ভাল হবে, আমারও!"

কার্জন পার্ক' থেকে বেরিয়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিকে বাঁ দিকে রেখে সেন্ট্রাল এভিন্যু ধরে আমরা শাজাহান হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি।

হাঁটতে হাঁটতে বায়রন সায়েবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে তাঁর কোনো উপকারই করতে পারিনি। হঠাৎ মনে হলো, আমি ভালভাবে চেষ্টাও করিনি। অনেক এটর্নির সঙ্গেই তো আমার পরিচয় ছিল——সায়েব ব্যারিস্টারের বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে বেশ মুশকিল হতো। কিন্তু নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সেদিন কারুর কাছে মাথা নত করিনি। আর আজ বায়রন সায়েবই আমার জীবনপথের দিশারী। বায়রন সায়েব বললেন, "তোমার চাকরি হবেই। ওদের ম্যানেজার আমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

"ঐ শাজাহান হোটেল"—বায়রন দুর থেকে দেখালেন।

কলকাতার হোটেলকুলচুড়ামণি শাজাহান হোটেলকে আমিও দেখলাম। গেটের কাছে খান পচিঁশেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও গাড়ি আসছে। দারোয়ানজী বুকে আট-দশখানা মেডেল ঝুলিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর মাঝে মাঝে গাড়ি-বারান্দার কাছে এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিচ্ছেন। রাতের পোশাক-পরা এক মেমসায়েব টুপ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর পিছনে বো-টাই পরা এক সায়েব। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটটা সামান্য বেকিয়ে ঢেকুর তোলার মতো কায়দায় মেমসায়েব বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ'। সায়েব এতোক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মেমসায়েব সেটিকে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দারোয়ানজী সেই সুযোগে বুটের সঙ্গে বুট ঠুকে সামরিক কায়দায় সেলাম জানালেন। প্রত্যুত্তরে ওঁদের দু'জনের মাথাও স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো একটু নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেলো।

দারোয়ানজী এবার বায়রন সায়েবকে দেখতে পেলেন। এবং বিনয়ে বিগলিত হয়ে একটা ডবল সাইজের সেলাম ঠুকলেন।

ভিতরে পা দিয়েই আমার মানসিক অবস্থা যা হয়েছিল তা ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে। হাইকোর্টে সায়েবের দৌলতে অনেক বিলাসকেন্দ্রই দেখেছি। হোটেলও দেখেছি কয়েকটা কিন্তু শাজাহান হোটেলের জাত অন্য। কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন তুলনা চলে না।

বাড়ি নয়তো, যেন ছোটোখাটো একটা শহর। বারান্দার প্রস্থ কলকাতার অনেক স্ট্রীট, রোড, এমন কি এভিন্যুকে লজ্জা দিতে পারে।

বায়রন সায়েবের পিছন পিছন লিফটে উঠে পড়লাম। লিফট থেকে নেমেও তাঁকে অনুসরণ করলাম। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। মে মাসের সন্ধ্যায় যেন ডিসেম্বরের শীতের নমুনা পেলাম।

বায়রন সায়েবের পিছনে পিছনে কতবার যে বাঁ দিকে আর ডান দিকে মোড় ফিরেছিলাম মনে নেই। সেই গোলকধাঁধা থেকে একলা বেরিয়ে আসা যে আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল তা নিশ্চিত। বায়রন সায়েব অবশেষে একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

বাইরে তকমা পরা এক বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, "সায়েব কিছুক্ষণ হলো ফিরেছেন। কিচেন ইন্সপেকশন ছিল। ফিরেই গোসল শেষ করলেন। এখন একটু বিশ্রাম করছেন।"

বায়রন মোটেই দমলেন না। কোঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বেয়ারাকে বললেন, "বলো বায়রন সায়েব।"

মন্ত্রের মতো কাজ হলো। বেয়ারা ভিতরে ঢুকে চার সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়ে এলো। বিনয়ে ঝুকে পড়ে বললে, "ভিতর যাইয়ে।"

শাজাহান হোটেলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মার্কোপোলোকে এই অবস্থায় দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটা হাতকাটা গেঞ্জি আর একটা ছোট্ট আন্ডার প্যান্ট লাল রংয়ের পুরুষালি দেহটার প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে কোনোরকমে ঢেকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বস্ত্র স্বল্পতা সম্বন্ধে ওঁর কিন্তু কোনো খেয়াল নেই, যেন কোনো সুইমিং ক্লাবের চৌবাচ্চার ধারে বসে রয়েছেন। কিন্তু আমাকে দেখেই মার্কোপোলো আঁতকে উঠলেন। "এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি", বলতে বলতে উনি তড়াং করে বিছানা থেকে উঠে আলমারির দিকে ছুটে গেলেন। ওয়ারড্রোব খুলে একটা হাফপ্যান্ট বার করে তাড়াতাড়ি পরে ফেললেন। তারপর পায়ে রবারের চটিটা গলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। দেখলাম সায়েবের গলায় মোটা চেনের হার; হারের লকেটটা কালো রংয়ের, তাতে কী সব লেখা। বাঁ হাতে বিরাট উল্কি। রোমশ বুকেও একটা উল্কি আছে; তার কিছুটা গেঞ্জির আড়াল থেকে উকি মারছে।

ভেবেছিলাম বায়রন সায়েবই প্রথম কথা পাড়বেন। কিন্তু ম্যানেজারই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো খবর আছে নাকি?"

বায়রন মাথা নাড়লেন। "এখনও নেই।" একটু থেমে আবার বললেন, "কলকাতা একটা আজব শহর, মিস্টার মার্কোপোলো। আমরা যতো বড়ো ভাবি কলকাতা তার থেকে অনেক বড়ো।"

মার্কোপোলোর মুখের দীপ্তি এবার হঠাৎ অর্ধেক হয়ে গেলো। বললেন, "এখনও নয়? আর কবে?—আর কবে?"

পুরনো সময় থাকলে ওঁর হতাশায় ভরা কণ্ঠ থেকে কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন কোনো কিছুতেই আমার আগ্রহ নেই; সমস্ত কলকাতা রসাতলে গিয়েও যদি আমার একটা চাকরি হয়, তাতেও আমি সন্তুষ্ট।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বায়রন এবার কাজের কথাটা পাড়লেন। 'আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, "একে আপনার হোটেলে ঢুকিয়ে নিতেই হবে, আপনার অনেক কাজে লাগবে।"

শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, "কোনো উপায় নেই। ভাড়া দেবার ঘর অনেক খালি আছে, কিন্তু চাকরি দেবার চেয়ার একটাও খালি নেই। স্টাফ বাড়তি।"

এই উত্তরের জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। বহুবার বহু জায়গায় ঐ একই কথা শুনেছি। এখানেও না শুনলে আশ্চর্য হতাম।

বায়রন কিন্তু হাল ছাড়লেন না। চাবির রিঙটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "কিন্তু আমি জানি তোমার ভেকান্সি হয়েছে।"

"অসম্ভব", ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন।

"সবই সম্ভব। পোস্ট খালি হয়েছে। আগামী কালই খবর পাবে।" "মানে?"

"মানে অ্যাডভান্স খবর। অনেক খবরই তো আমাদের কাছে আগাম আসে। তোমার সেক্রেটারী রোজী...।"

ম্যানেজার যেন চমকে উঠলেন—"রোজী? সে তো উপরের ঘরে রয়েছে।"

গোয়েন্দাসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বায়রন বললেন, “বেশ তো, খবর নিয়ে দেখো। ওখানকার বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো, গতকাল রাত্রে মেমসায়েব নিজের ঘরে ছিলেন কিনা।”

মার্কোপোলোরও গোঁ চেপে গিয়েছে। বললেন, "ইমপসিবল।" চিৎকার করে তিনি তিয়াত্তর নম্বর বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন।

গত রাত্রে তিয়াত্তর নম্বরের নাইট ডিউটি ছিল। আজও নাইট ডিউটি। সবেমাত্র সে নিজের টুলে গিয়ে বসেছিল। এমন সময় ম্যানেজার সায়েবের সেলাম। নিশ্চয়ই কোনো দোষ হয়েছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

ম্যানেজার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন কাল সারারাত সে জেগে ছিল কি না।

তিয়াত্তর নম্বর বললে, “ভগবান উপরে আছেন হজুর, সারারাত জেগে ছিলাম, একটিবারও চোখের দু’টো পাতা এক হতে দিইনি।”

মার্কোপোলোর প্রশ্নের উত্তরে বেয়ারা স্বীকার করলে, ৩৬২-এ ঘর সারারাতই বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। বোর্ডে সারাক্ষণই সে চাবি ঝুলে থাকতে দেখেছে।

মৃদু’ হেসে বায়রন বললেন, “গতরাত্রে ঠিক সেই সময়েই চৌরঙ্গীর অন্য এক হোটেলের বাহাত্তর নম্বর ঘরের চাবি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

“মানে?” মার্কোপোলো সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

“মানে, সেই ঘরে শুধু রোজী নয়, আরও একজন ছিলেন। তিনি আবার আমার বিশেষ পরিচিত। আমারই এক ক্লায়েন্টের স্বামী! এসব অবশ্য আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি আমাকে ফী দিয়ে লাগিয়ে রেখেছেন। তাঁর স্বামী কতদূর এগিয়েছেন, তার রিপোর্ট আজই দিয়ে এলাম। নো হোপ! কোনো আশা নেই। আজ সন্ধ্যায় আপনার সহকারিণী এবং ব্যানার্জি দু’জনেই ট্রেনে চড়ে পালিয়েছেন। পাখি উড়ে গিয়েছে। সুতরাং এই ছেলেটিকে সেই শূন্য খাঁচায় ইচ্ছে করলেই রাখতে পারেন।”

আমি ও ম্যানেজার দু’জনেই স্তম্ভিত। বায়রন হা-হা করে হেসে উঠলেন। “খবর দেবার জন্যই আসছিলাম, কিন্তু পথে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।”

এরপর মার্কোপোলো আর না বলতে পারলেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন, "রোজী চাকরি ছাড়েনি, দু'দিন পরে সে যদি আবার ফিরে আসে... "

"তখন ইচ্ছে হলে একে তাড়িয়ে দিও।" বায়রন আমার হয়েই বলে দিলেন। শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বা রাজী হয়ে গেলেন। আর আমারও চাকরি হলো। আমার ভাগ্যের লেজার খাতায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয়ই এই রকমই লিখে রেখেছিলেন।

আমার নবজন্ম হলো। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের শেষ বাবু আজ থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলো। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের উপর দাঁড়িয়ে সে আর বাবুদের সঙ্গে গল্প করবে না, চেম্বারে বসে সে বিচারপ্রার্থীদের সুখদুঃখের কাহিনী শুনবে না। আইনের সঙ্গে তার সম্পর্ক' চিরদিনের মতো শেষ হলো। কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি। সাইক্লোনে ক্ষতবিক্ষত জাহাজ মারমুখী সমুদ্রের বুক থেকে যেন আবার বন্দরের নিশ্চিত আশ্রয়ে ফিরে আসছে।

পরের দিন ভোরে স্নান সেরে, শেষ সম্বল প্যান্ট আর শার্টটা চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দুর থেকেই শাজাহান হোটেলের আকাশ চুম্বী হলদে রংয়ের বাড়িটা দেখতে পেলাম।

বাড়ি শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না। প্রাসাদ। তাও ছোট রাজ রাজড়াদের নয়। নিজাম বা বরোদা নিঃসংকোচে এই বাড়িতে থাকতে পারেন— রাজন্যকুলে তাতে তাঁদের ঐশ্বর্য গৌরব সামান্য মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

ঐ সকালেই রাস্তার ধারে বেশ কয়েকখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নম্বর দেখেই বোঝা যায় যে, সব গাড়ির মালিক এই কলকাতা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা নন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী থেকে আরম্ভ করে ময়ূরভঞ্জ এবং ঢেঙ্কানল স্টেটের প্রতিনিধিত্ব করছে, ইংলণ্ড, জার্মানী, ইটালী এবং আমেরিকার কারখানায় তৈরি নানা মডেলের মোটরগাড়ি। ঐসব গাড়ির দিকে তাকিয়ে যে-কোনো পর্যবেক্ষক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিতে পারেন। মোটর সোসাইটিতে কাস্ট সিস্টেম বা জাতিভেদ প্রথার যে এখনও প্রবল প্রতাপ, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। গাড়ির আকার অনুযায়ী হোটেলের দারোয়ানজী সেলাম ঠুকছেন। দারোয়ানজীর বিরাট গোঁফ, পরনে মিলিটারি পোশাক। বুকের উপর আট-দশটা বিভিন্ন আকারের মেডেল ঝলমল করছে। এই সাত-সকালে অতগুলো মেডেল বুকে এ'টে দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য কী, ভাবতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই দারোয়ানজী যে কায়দায়

আমার উদ্দেশ্যে সেলাম ঠুকলেন তার খানিকটা আন্দাজ পেতে পারা যায় এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল বিমান প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে। দারোয়ানজীর সঙ্গে বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত এয়ার ইন্ডিয়া মহারাজার আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা আজও আমাকে বিস্মিত করে। শুনলে আশ্চর্য হবো না, শাজাহান হোটেলের এই দারোয়ানজীই হয়তো বিমান প্রতিষ্ঠানের শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

সেলামের বহর দেখেই বুঝলাম, দারোয়ানজী ভুল করেছেন। ভেবেছেন, "শাজাহান হোটেলের নতুন কোনো আগন্তুক আমি।

গেট পেরিয়ে শাজাহান হোটেলের ভিতর পা দিয়েই মনে হলো, যেন নরম মাখনের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছি। নিজের চাপে প্রথমে যেন মখমলের বিছানায় তলিয়ে গেলাম, তারপর কোনো স্নেহপরায়ণা এবং কোমলস্বভাবা পরী যেন আলতোভাবে আমাকে একটু উপরে তুলে দিলো। পরবর্তী পদক্ষেপে আবার নেমে গেলাম, পরী কিন্তু একটুও বিরক্ত না হয়ে পরম যত্নে আমাকে আবার উপরে তুলে দিলো। পৃথিবীর সেরা কার্পেটের যে এই গুণ তা আমার জানা ছিল না; তাই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, সেই অদৃশ্য অথচ সুন্দরী পরী আমার দেহটাকে নিয়ে কার্পেটের টেবিলে কোনো বান্ধবীর সঙ্গে পিং পং খেলছে।

প্রায় নাচতে নাচতে কার্পেটের অন্যপ্রান্তে যেখানে এসে পৌঁছলাম তার নাম 'রিসেপশন'। সেখানে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর চোখে সমস্ত রাত্রির ক্লান্তি জমা হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন—গুড মর্নিং।

একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুপ্রভাত ফিরিয়ে না দিয়ে, নিজের পরিচয় দিলাম। "এইখানে একটা চাকরি পেয়েছি। গত রাতে আপনাদের ম্যানেজার মিস্টার মার্কোপোলোর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আজ সকাল থেকে আসতে বলেছিলেন। ওঁর সঙ্গে এখন কি দেখা করা সম্ভব?"

চকিতে ভদ্রলোকের মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো। পোশাকী ভদ্রতার পরিবর্তে মুখে হাল্কা ঘরোয়া হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, "আসুন, আসুন, নমস্কার। Orient's oldest hotel welcomes its youngest staff! প্রাচ্যের প্রাচীনতম হোটেল তার তরণতম কর্মচারীকে স্বাগত জানাচ্ছে।"

ভয় পেয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভদ্রলোক করমর্দনের জন্যে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার নাম সত্যসুন্দর বোস—অন্তত আমার বাবা তাই রেখেছিলেন। এখন কপালগুণে স্যাটা বোস হয়েছি।"

বোধহয় ওঁর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। স্নেহমাখানো মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন, "এই পোড়ামুখ দেখে দেখে অরুচি ধরে যাবে। শেষ পর্যন্ত এমন হবে যে আমার নাম শুনলে আপনার গা বমি বমি করবে। হয়তো এ্যাকচুয়ালি বমি করেই ফেলবেন। এখন কাউন্টারের ভিতরে চলে আসুন। শাজাহান হোটেলের নবীন যুবরাজের অভিষেক-কার্য— সম্পন্ন করি।"

আমি বললাম, "মিস্টার মার্কোপোলোর সঙ্গে একবার দেখা করবার..." "কিচ্ছু দরকার নেই।" সত্যসুন্দরবাবু, জবাব দিলেন। "গতকাল রাত্রে উনি আমাকে সব বলে রেখেছেন। এখন আপনি স্টার্ট নিন।"

"মানে?"

"মানে ফুল ফোর্সে চলতে গেলে গাড়িতে পেট্রল বোঝাই করে যেমনভাবে স্টার্ট নিতে হয়, ঠিক তেমনভাবে স্টার্ট নিন।"

সত্যসুন্দরবাবুর কথার ভঙ্গিতে আমি হেসে ফেললাম। উনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-এ-বি'র নাম শুনেছেন?"

"অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! ওঁদের দু'টো কম্পিটিশন হয়। স্পীড কম্পিটিশন—কে কত জোরে গাড়ি চালাতে পারে। আর এনডিওরেন্স টেস্ট–কে কতক্ষণ একনাগাড়ে গাড়ি চালাতে পারে। আমাদের এখানে কিন্তু দু'টি মিলিয়ে একটি কম্পিটিশন "স্পীড কাম এনডিওরেন্স টেস্ট।

কত তাড়াতাড়ি কত বেশীক্ষণ কাজ করতে পারেন, শাজাহান ম্যানেজমেন্ট তা যাচাই করে দেখতে চান।”

মিস্টার বোসের পাশের টেলিফোনটা এবার বেজে উঠলো। আমার সঙ্গে কথা থামিয়ে, কৃত্রিম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভঙ্গীতে সত্যসুন্দর বোস বললেন, "গুড মর্নিং। শাজাহান হোটেল রিসেপশন।...জাস্ট-এ-মিনিট...মিস্টার এন্ড মিসেস সাতারাওয়ালা...ইয়েস...রুম নাম্বার টু থার্টি টু...নো মেনসন প্লিজ...

ওঁর টেলিফোন সংলাপ কিছুই বুঝতে পারলাম না। সত্যসুন্দর বোস আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, “এখন কান খুলে রেখে শুধু শুনে যান, সময়মতো সব বুঝতে পারবেন। শুধু মরচেপড়া স্মৃতিশক্তিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করে একটু চকচকে রাখবেন। বাকি সবকিছু, এমনিতেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। যেমন ধরুন রুম নাম্বার। কোন ভিজিটর কোন ঘরে রয়েছে, এটা মুখস্থ থাকলে খুব কাজ দেয়।”

রিসেপশন কাউন্টারটা এবার ভাল করে দেখতে লাগলাম। কাউন্টারের ভিতর তিনটে চেয়ার আছে—কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাটাই রীতি। ভিতরের টেবিলের উপর একটা টাইপরাইটার মেসিনও রয়েছে। পাশে গোটাকয়েক মোটা মোটা খাতা—হোটেল রেজিস্টার। দেওয়ালে একটা পুরনো বড়ো ঘড়ি অলসভাবে দু’লে চলেছে। যেন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে, ঘড়িটা কোনো উদ্ভট চিন্তায় বুদঁ হয়ে রয়েছে।

সত্যসুন্দর বোস বললেন, “ভিতরে চলে আসুন।”

আমার মুখের উপর নিশ্চয়ই আমার মনের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সেইজন্যই বোধহয় সত্যসুন্দরবাবু, বললেন, “কী, এরই মধ্যে অবাক হচ্ছেন?”

লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলাম, "কই? না তো!”

মিস্টার বোস এবার হেসে ফেললেন। চারিদিকে একবার সতর্কভাবে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, “এখনও তো শাজাহান হোটেলের ঘুম ভাঙ্গেনি। তখন আরও আশ্চর্য লাগবে।”

কোনো উত্তর না দিয়ে কাউন্টারের ভিতরে এসে ঢুকলাম। এমন সময় টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। অভ্যস্ত কায়দায় টেলিফোনটা তুলে নিয়ে, বোস বাঁকা ও চাপা স্বরে

বললেন, “শাজাহান রিসেপশন।" তারপর ওদিককার স্বর শুনেই হেসে বললেন, “ইয়েস, স্যাটা হিয়ার!” এবার টেলিফোনের অপর প্রান্তের সঙ্গে বোধহয় কোনো রসিকতা বিনিময় হলো—মনে হলো দু'জনেই একসঙ্গে হাসতে আরম্ভ করেছেন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বোস বললেন, “স্টুয়ার্ড এখনি আসছেন।

ওঁকে একটু 'বাটার' দিয়ে প্লিজ করবার চেষ্টা করবেন।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি বিশাল দেহকে দুর থেকে দেখতে পাওয়া গেলো। যেন চলন্ত মৈনাক পর্বত। অন্তত আড়াই মণ ওজন। অথচ হাঁটার কায়দা দেখে মনে হয় যেন একটা পায়রার পালক হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সায়েবের গায়ের রং পোড়া তামাটে। চোখ দু'টো যেন এক জোড়া জ্বলন্ত টিকে।

ভদ্রলোক আমার দিকে গাঁক গাঁক করে তেড়ে এলেন। “ও, তাহলে তুমিই সেই ছোকরা যে রোজীকে হটালে!”

উত্তর দেবার কোনো সুযোগ না দিয়ে স্টুয়ার্ড তাঁর বিশাল বাঁ হাতখানা আমার নাকের কাছে এগিয়ে আনলেন। ওঁর হাতঘড়িটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন যে, আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট রেডী হবে। গত রাত্রে ব্রেকফাস্ট কার্ড তৈরি হয়নি; সুতরাং এখনই ও কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

ভদ্রলোক যে ইংরেজ নন, তা কথা থেকেই বোঝা গেলো। আধো-আধো কন্টিনেন্টাল ইংরিজীতে চিৎকার করে বললেন, "তেক দাউন, তেক দাউন কুইকলি।”

একটা শর্টহ্যাণ্ডের খাতা এগিয়ে দিয়ে মিস্টার বোস চাপা গলায় বললেন, "লিখে নিন।"

একটুও অপেক্ষা না করে স্টুয়ার্ড হড় হড় করে কী সব বলে যেতে লাগলেন। কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ, এর পূর্বে কোনোদিন শুনিনি, কানে ঢুকতে লাগলো—“চিলড পাইন-অ্যাপেল জুইস, রাইস ক্রিসপিজ, এগ্‌সবয়েল্ড, ফ্রায়েড, পোড, স্ক্র্যাম্বল্ড”...একটা বিরাট ঢোক গিলে স্টুয়ার্ড' চিৎকার করে নামতা পড়ার মতো বলে যেতে লাগলেন, ওমলেট—প্রণ, চীজ অর টোমটো। আরও অসংখ্য শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে তুবড়ির ফুলঝুরির মতো বেরিয়ে আসতে লাগলো। শেষ কথা-কফি।

তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই হিন্দীতে বললেন, “জলদি জলদি মাঙতা” এবং আমাকে কিছু প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমার কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। জীবনে কখনও ঐসব অদ্ভুত খাবারের নাম শুনিনি। যতগুলো নাম সায়েব বললেন, তার অর্ধেকও আমি লিখে নিতে পারিনি।

মিস্টার বোস বললেন, "পঞ্চাশটা ব্রেকফাস্ট কার্ড এখনই তৈরি করে ফেলতে হবে।”

আমার মুখের অবস্থা দেখে, মিস্টার বোস সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। “কিছু মনে করবেন না। ও ব্যাটার স্বভাবই ওরকম। সব সময় বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করছে।”

“আজকের ব্রেকফাস্টের লিস্ট আমি লিখে নিতে পারিনি”। —আমি কাতরভাবে ওঁকে জানালাম।

মিস্টার বোস বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “তার জন্যে চিন্তা করবেন না। জিমির ফিরিস্তি আমার মুখস্থ আছে। আপনি আস্তে আস্তে টাইপ করুন, আমি বলে যাচ্ছি। এ-হোটেলে যেদিন থেকে ঢুকেছি, সেদিন থেকেই ঐ এক মেনু দেখছি। তবু ব্যাটার রোজ় নতুন কার্ড ছাপানো চাই। আগে আমারও ভয় করতো, আর এখন যেন, কার্ডের নাম শুনলে হাসি লাগে। কত অদ্ভুত নাম আর উচ্চারণই না শিখে ফেলেছি। দু''দিন পরে স্টুয়ার্ডের মুখ দেখে আপনিও বলে দিতে পারবেন, কী মেনু হবে। Salad Italienne হলেই আমাদের ইতালীয় স্টুয়ার্ড যে Consomne friod en Tasse আর Potage Albion এর ব্যবস্থা করবেন, তা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে।"

মেনুতে অনভিজ্ঞ আমি টাইপ করতে করতে সেদিন অনেক ভুল করে ছিলাম। আমাকে চেয়ার থেকে তুলে দিয়ে সত্যসুন্দর বোস তাই নিজেই টাইপ করতে বসলেন। আর আমি কাউন্টার থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগলাম।

শাজাহান হোটেলে তখনও যেন জীবন শুরু হয়নি। শুধু কিচেন-এ চাপা ব্যস্ততা। বেয়ারারা মিল্কপটে দুধ ঢালছে, কাপ-ডিস সাজাচ্ছে, কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে ছুরি এবং কাঁটাগালোকে চকচকে করছে।

কাউন্টারে ফিরে এসে দেখলাম, মিস্টার বোস দ্রুতবেগে টাইপ করে চলেছেন। কতই বা বয়স ভদ্রলোকের? বত্রিশ তেত্রিরিশের বেশী নয়। এককালে বোধহয় ক্রিকেট কিংবা টেনিস খেলতেন। পেটানো লোহার মতো শরীর, শরীরে একটুও বাড়তি মেদ নেই। অমন সুন্দর শরীরে ধবধবে কোট-প্যান্ট এবং ঝকঝকে টাই সুন্দর মানিয়েছে।

'আমার টাইপ-করা কার্ডের জন্য অপেক্ষা করলে লাঞ্চের আগে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু বোসের অভ্যস্ত আঙুলগুলো ফরাসী শব্দের মধ্য দিয়ে যেন দ্রুততালে নাচতে লাগলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি বুঝি ফরাসী জানেন?"

মুখ বেকিয়ে তিনি বললেন, "ফরাসী! পেটে বোমা মারলেও ও-ভাষায় একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরবে না। তবে খাবারের নাম জানি। ও-সব নাম, আমাদের হেডকুক, যে টিপ-সই দিয়ে মাইনে নেয়, তারও মুখস্থ।" কার্ডগুলো সাজাতে সাজাতে বোস বললেন, "ইংরেজদের এতো বুদ্ধি, কিন্তু রাঁধতে জানেনা, একটা ভদ্র খাবারের নামও আপনি জন বুলের ডিক্সনারীতে পাবেন না।

পাশ্চাত্য ভোজনশাস্ত্রে আমার অরিজিন্যাল বিদ্যার দৌড় রিপন কলেজের কাফে পর্যন্ত। ওখানে যে দু'টি জিনিস ছাত্র জীবনে প্রিয় ছিল, সেই চপ ও কাটলেটকে ইংরেজ সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই জানতাম। 'মামলেট' নামক আর এক মহার্ঘ ইংরিজী খাদ্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ছিল। এখন শুনলাম চপ কাটলেট আবিষ্কারের পিছনে ইংরেজের কোনো অবদান নেই, এবং মামলেট আসলে ওমলেট এবং ইউরোপীয় রন্ধনশাস্ত্রে এত রকমের ওমলেট প্রস্তুত প্রণালী আছে যে, ডিক্সনারী অফ ওমলেট নামে সুবিশাল ইংরিজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সায়েবের সঙ্গে যখন কোথাও খেয়েছি, তখন খাবারকেই আক্রমণ করেছি, নাম নিয়ে মাথা ঘামাইনি। সায়েবের কাছেই শুনেছিলাম, এক সৎ এবং অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোনো খাবারের 'ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টোরি' না-জেনে তিনি সেই খাবার খাবেন না; এবং তার ফলে বেচারাকে যে শেষ পর্যন্ত অনাহারে মারা যেতে হয়েছিল, সে-খবরও খুব গম্ভীর এবং বেদনার্ত কণ্ঠে সায়েব আমাকে জানিয়েছিলেন।

কার্ডগুলো ডাইনিংরুমে পাঠিয়ে দিয়ে মিস্টার স্যাটা বোস বললেন, "অষ্টম হেনরীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? দাড়িওয়ালা ঐ বিশাল মোটা লোকটার ছবি ইতিহাসের বইতে দেখে আমার এমন রাগ হয়েছিল যে, ব্লেড দিয়ে ভদ্রলোককে সোজা কেটে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম যে, ভদ্রলোক আমাদের এইভাবে ডুবিয়ে গিয়েছিলেন; তা হলে শুধু ব্লেড দিয়ে কেটে নয়, ছবিটাকে আগুনে পুড়িয়ে শান্তি পেতাম।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"শুধু বিয়ে করতে নয়, অষ্টম হেনরী খেতেও খুব ভালবাসতেন," মিঃ বোস বললেন। "একবার উনি এক ডিউকের বাড়িতে নেমতন্ন খেতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য অন্য হোমরা-চোমরা যাঁরা খেতে বসেছিলেন, তাঁরা ডিনার টেবিলে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলেন। অষ্টম হেনরী মাঝে মাঝে তাঁর টেবিলে রাখা একটুকরো কাগজের দিকে নজর দিচ্ছেন, তারপর আবার খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। লর্ড, ডেপুটি-লর্ড, কাউণ্ট, আর্ল এবং পারিষদরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ওটা কী এমন মূল্যবান দলিল যে, হিজ্, ম্যাজেস্টিকে খাবার মধ্যেও তা পড়তে হচ্ছে? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর টপ-সিক্রেট সংবাদ দূত মারফত সবেমাত্র এসে পৌঁচেছে। খাওয়া শেষ হলে সম্রাট কিন্তু কাগজটা টেবিলের উপর ফেলে রেখেই ডিউকের ড্রইংরুমে চলে গেলেন। সাঙ্গোপাঙ্গরা সবাই তখন টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কিন্তু হায়! রাজ্যের কোনো গোপন সংবাদ কাগজটাতে নেই—শুধু কতকগুলো খাবারের নাম লেখা। ডিউক ভোজসভার জন্য কী কী খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, তা একটা কাগজে লিখে সম্রাটকে দিয়েছিলেন। সবাই তখন বললেন, "বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি তো। আজে বাজে জিনিসে, পেট ভরিয়ে তারপর লোভনীয় কোনো খাদ্য এলে আফসোসের শেষ থাকে না। মেনু মারফত পূর্বাহ্নে আয়োজনের পূর্বাভাস পেলে, কোনটা খাবো, কোনটা খাবো না, কোনটা কম খাবো, কোনটা বেশী টানবো আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া যায়।"

মিস্টার বোস একটু হেসে বলতে লাগলেন—"সেই থেকেই মেনুকার্ড চালু হলো। সম্রাটকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আমাদের মতো হোটেল কর্মচারীদের সর্বনাশ করা হলো। প্রতিদিন শাজাহান হোটেলের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের মেনুকার্ড টাইপ করো,

টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। খাওয়া শেষ হলে কার্ড গুলো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবার স্টোররুমে পাঠিয়ে দাও। বাণ্ডিল-বাঁধা অবস্থায় কার্ডগুলো ধূলোর পাহাড়ে বছর খানেক পড়ে থাকবে। তারপর একদিন স্যালভেশন আর্মির লোকদের খবর দেওয়া হবে। তারা লরি করে এসে পুরনো কাগজপত্তর সব নিয়ে ঘরটাকে খালি করে দিয়ে চলে যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সত্যসুন্দরবাবু বললেন, 'সময়কে এখানে আমরা অন্যভাবে ভাগ করে নিয়েছি, বেড-টী দিয়ে এখানে সময়ের শুরু হয়। তারপর ব্রেকফাস্ট টাইম। বাইরের লোকেরা যাকে দুপুর বলে, আমাদের কাছে সেটা লাঞ্চ টাইম। তারপর আফটারনুন টী টাইম, ডিনার টাইম, এবং সেইখানেই শেষ ভাববেন না। ক্যালেন্ডারের তারিখ পাল্টালেও আমরা পাল্টাই না। সে-সব ক্রমশ বুঝতে পারবেন।”

দেখলাম, ব্রেকফাস্টের সময় থেকেই হোটেলের কাউন্টারে কাজ বেড়ে যায়। কথা বলবার সময় থাকে না। রাতের অতিথিরা নিজেদের সুখশয্যা ছেড়ে লাউঞ্জে এসে বসেছেন। কাউন্টারের পাশ দিয়ে যাবার সময়, যন্ত্রচালিতের মতো সুপ্রভাত' বিনিময় হচ্ছে। গেস্টরা কাছাকাছি এসে, কাউন্টারের দিকে একএকটি ‘গুড্ মর্নিং’ ছুড়ে দিচ্ছেন, আর মিস্টার বোস, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতো সেটা লুফে নিয়ে, আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন —“গুড, মর্নিং মিস্টার ক্লেবার —গুড মর্নিং ম্যাডাম, হ্যাড এ নাইস স্লিপ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?"

এক বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলা কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এলেন। “ঘুম? মাই ডিয়ার বয়, গত আট বছর ধরে ঘুম কাকে বলে আমি জানি না। প্রথম প্রথম পিল খেয়ে ঘুম হতো, তারপর ইনজেকশন নিতাম। এখন তাতেও কিছু হয় না। সেইজন্য ওরিয়েন্টে এসেছি—ম্যাজিক দিয়ে পুরনো দিনে এদেশে অসাধ্যসাধন হতো, যদি তার কিছুটাও এখন সম্ভব হয়।”

মিস্টার বোসকে সহানুভূতি প্রকাশ করতে হলো। “আহা! পৃথিবীতে এত্তো পাজী দুষ্টু, এবং বদমাস লোক থাকতে ঈশ্বর তোমার মতো ভালোমানুষের উপর নির্দয় হচ্ছেন কেন? তবে, তুমি চিন্তা কোরো না, এ-রোগ সহজেই সেরে যায়।”

গভীর হতাশা প্রকাশ করে ভদ্রমহিলা বললেন, “এই জন্মে আর ঘুমোতে পারবো বলে তো মনে হয় না।"

“কী যে বলেন। বালাই ষাট। আমার পিসিমারও তো ঐ রকম হয়েছিল। কিন্তু তিনি তো ভাল হয়ে গেলেন।”

“কেমন করে? কী ওষুধ খেয়েছিলেন?” ভদ্রমহিলা এবার কাউন্টারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

“ওষুধ খেয়ে নয়। প্রার্থনা করে—বাই প্রেয়ার। পিসিমার মতে, প্রেয়ারের মতো শক্তি নেই। প্রেয়ারে তুমি পর্বতকে পর্যন্ত নড়াতে পারো।” বৃদ্ধা মহিলা যেন অবাক হয়ে গেলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ এবং কামেরাটা কাউন্টারের উপর রেখে মাথায় বাঁধা সিল্কের রুমালটা ঠিক করতে করতে বললেন, “তাঁর কী কোনো সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে?”

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই আর-এক ভদ্রলোক কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছ'ফুট লম্বা, সুদর্শন বিদেশী। কাঠামোখানা যেন ডরম্যান লং কোম্পানির পেটানো ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বোস তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, “গুড মর্নিং ডক্টর।”

চশমার ভিতর থেকে তির্যক দৃষ্টি হেনে ডাক্তার শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, “আমি কি দশটা টাকা পেতে পারি?” “নিশ্চয়, নিশ্চয়।” ডানদিকের ক্যাশ বাক্সটা খুলে, এক টাকার দশখানা নোট বার করে বোস ডাক্তার সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলেন। একটা ছাপানো ভাউচার বাঁ হাতে খসখস করে সই করে দিয়ে ভদ্রলোক আবার হোটেলের ভিতর চলে গেলেন।

মেমসায়েব ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, “লোকটি কে?” বোস বললেন, “ডক্টর সাদারল্যান্ড। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাজে এদেশে এসেছেন।”

ভদ্রমহিলা এবার একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, “তোমাদেরও মাথা খারাপ। তোমরা তোমাদের এনসিয়েন্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্ধারের জন্য কোনো চেষ্টা করছো না। ইউ পিপল, জানো, এইসব ডাক্তাররা—যাদের তোমরা ডেমি গডের মতো খাতির করে বিদেশ থেকে আনছো, যাদের কমফর্টের জন্য তোমাদের কান্ট্রি লাখ লাখ ডলার খরচ করছে—তারা একজন অর্ডিনারি আমেরিকান সিটিজেনকে ঘুম পাড়াতে পারে না। অথচ এই

কান্ট্রির নেকেড ফকিররাও ইচ্ছে করলে একশো বছর, দেড়শো বছর একটানা ঘুমিয়ে থাকতে পারে।”

উভয় সঙ্কটে পড়ে বোস চুপ করে রইলেন।

ভদ্রমহিলা তখন বললেন, “আমি তোমাদের সাদারল্যান্ডে ইন্টারেস্টেড নই: আমি ইন্টারেস্টেড তোমার পিসিমাতে। আমি সেই গ্রেট লেডির সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রয়োজন হলে, আমি চিঠি লিখে এই গ্রেট লেডির টেলিভিশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করবো। তোমরা জানো না, স্টেট্‌সে তোমার পিসিমার অভিজ্ঞতার কি প্রয়োজন রয়েছে—US A needs her."

মিস্টার বোসের চোখ দু’টো এবার ছলছল করে উঠলো। পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

ভদ্রমহিলা বিব্রত হয়ে বললেন, "কী হলো? আমি কি না জেনে তোমাকে কোনো আঘাত দিয়েছি?”

চোখ মুছতে মুছতে সত্যসুন্দর বোস বললেন, “না না, তোমার দোষ কী? তুমি কী করে জানবে যে হতভাগা আমি মাত্র দু’-মাস আগে পিসিমাকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছি?”

“কিছু মনে কোরো না, মিস্টার বোস। আই অ্যাম অ্যফুলি স্যরি। তোমার পিসিমার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।” বলতে বলতে ভদ্রমহিলা ট্যাক্সির খোঁজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মিস্টার বোসকে হঠাৎ এইভাবে ভেঙে পড়তে দেখে আমিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কোনোরকমে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, “বোসদা, সংসারে কেউ কিছু চিরদিন বে'চে থাকতে পারেন না। আমার বাবা বলতেন, পৃথিবীতে আমাদের সকলকেই একা থাকবার অভ্যাস করতে হবে।”

বোসদা এবার হেসে ফেললেন। ওঁকে হাসতে দেখে আমি আরও ভড়কে গেলাম। উনি তখন বললেন, “আমার বাবার কোনো বোনই ছিল না। সব বানানো! পিসিমাকে

তাড়াতাড়ি না মেরে ফেললে, বুড়ী আমার আরও একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট করতো। অথচ অনেক কাজ জমা হয়ে রয়েছে।” আমি অবাক।

সত্যসুন্দরবাবুকে বললাম, “সেন্ট জন চার্চের কাছে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে যে হাইকোর্ট রয়েছে, সেখানে আপনার যাওয়া উচিত ছিল: 'এই বুদ্ধি ওখানে খাটালে এতোদিনে সহজেই গাড়ি বাড়ি করতে পারতেন।”

স্যাটা বোস এবার যেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন। নিজের মনেই বললেন, "গাড়ি বাড়ি? নাঃ থাক, তুমি নতুন মানুষ, এখন সেসব শুনে কাজ নেই।”

হয়তো আরও কথা হতো, কিন্তু বেয়ারা এসে খবর দিলে, ম্যানেজার সায়েব রান্নাঘর ইন্সপেকশনে নিচেয় নেমেছেন।

বোস বললেন, “মার্কোপোলো সায়েবের চাঁদমুখটা একবার দেখে আসুন। ওঁর সঙ্গেই তো আপনার ঘরসংসার করতে হবে।”

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “লোক কেমন?”

“আপনার কেমন মনে হয়?” উনি উল্টো প্রশ্ন করলেন।

“নামটা রোমান্টিক। এমন নাম যে এখনও চালু আছে জানতাম না।”

বোস বললেন, "হ্যাঁ, রোমান্টিকই বটে। আসল মার্কোপোলোকে শেষ জীবন জেলে কাটাতে হয়েছিল, ইনি কোথায় শেষ করেন দেখুন।"

"সে রকম কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না না। এমনি বলছি। খুবই কাজের লোক। পাকা ম্যানেজার। জানেন তো ওমর খৈয়াম কী বলে গিয়েছেন? 'ভালো প্রধানমন্ত্রী পাওয়া যে-কোনো দেশের পক্ষেই কঠিন ব্যাপার; কিন্তু ভালো হোটেল ম্যানেজার পাওয়া আরও কঠিন।' দে আর বর্ন অ্যান্ড নট্ মেড। অপদার্থ মন্ত্রীর হাত থেকে কোনো কোনো দেশকে রেহাই পেতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু অপদার্থ ম্যানেজারের মুঠো থেকে কোনো হোটেলকে আজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি,” বোস হাসতে হাসতে বললেন।

স্যাটা আরও বললেন, “ভদ্রলোক রেঙ্গুনের সব চেয়ে বড়ো হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন। এখানকার ডবল মাইনে পেতেন। কিন্তু মাথায় কী এক ভুত চাপলো, কলকাতায়

কাজ করতে এলেন। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো কোনো গণ্ডগোল বাধিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু ওখানকার স্টুয়ার্ড ফ্রান্সে ফিরে যাবার পথে, আমাদের হোটেলে দু''দিন ছিল। সে বললে, রেঙ্গুন হোটেল মার্কোপোলো সায়েবকে এখনও ফিরে যেতে অনুরোধ করছে।"

"মেঝে কেন পরিষ্কার করা হয়নি? ধাপার মাঠ যে এর থেকে পরিষ্কার থাকে," রান্নাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার সায়েব চিৎকার করছিলেন। দেখলাম, হেড-কুক ও মশালচি ব্যস্ত হয়ে এ-দিক ও-দিক ছোটাছুটি করছে, আর মার্কোপোলো ঘরের সমস্ত কোণ খাটিয়ে খুটিয়ে ময়লা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। আমার পায়ের শব্দ পেয়েই সায়েব মুখ তুললেন। “হ্যালো, তুমি তাহলে এসে গিয়েছো?”

আমি সুপ্রভাত জানালাম।

“কাজকর্ম' একটু-আধটু দেখতে আরম্ভ করেছো তো?” সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

হেড-কুক নিধনযজ্ঞের এবার বোধহয় বিরতি হলো। কারণ সায়েব আমাকে নিয়ে আপিস ঘরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

আপিস ঘরটা ছোট্ট। মাত্র খান তিনেক চেয়ার আছে। পাশে একটা টাইপরাইটারও রয়েছে। টেবিলে একরাশ কাগজপত্তর। এক কোণে দু'টো লোহার আলমারীও দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকের দেওয়ালে আর একটা দরজা, বোধহয় ঐটা খুলে মার্কোপোলো সোজা নিজের বেডরুমে চলে যেতে পারেন।

নিজের চেয়ারে বসে মার্কোপোলো চুরুট ধরালেন। দীর্ঘ পুরুষালি দেহ। বয়সের তুলনায় শরীরটা একটু ভারি। মাথায় সামান্য টাক। কিন্তু চুলটা ছোট করে ছাঁটা বলে, টাকটা খুব চোখে পড়ে না। চুরুটের গুণে গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। থিয়েটারে উইনস্টন চার্চিলের ভূমিকায় ওঁকে সহজেই নামিয়ে দেওয়া যায়।

চিঠি ডিক্টেশন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, মার্কোপোলো আমার মুখের দিকে তাকালেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সাচ এ গুড গার্ল। রোজীর মতো মেয়ে হয় না। ওর জন্য আমার আপিসের কাজে কোনো চিন্তাই ছিল না। যখনই ডেকেছি, হাসিমুখে চিঠি টাইপ

করে দিয়েছে এমন কি মিডনাইটেও। হোটেলে এমন সব চিঠি আসে যা ফেলে রাখার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে হয়।”

মার্কোপোলো এবার দু’ একটা চিঠি ডিক্টেশন দিলেন। ইংরাজি খুব ভাল নয়, কিন্তু বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কোথায় যে কী পানীয় পাওয়া যায় তার পুঙ্খানুপঙ্খ খবর যে তিনি রাখেন তা বুঝতে পারলাম। সম্প্রতি কয়েকটি মদ ডাইরেক্ট ইমপোর্ট করিয়েছেন। তাই একটা সার্কুলার ডিক্টেশন দিয়ে সগর্বে ঘোষণা করলেন—'এই বিশ্ববিখ্যাত পানীয় ভারতবর্ষে একমাত্র আমরাই আমদানি করতে সমর্থ হয়েছি।'

ডিক্টেশন শেষ করে ম্যানেজার সায়েব আবার বেরিয়ে পড়লেন। অনেক কাজ বাকি রয়েছে। বড়ো হোটেল চালানো থেকে একটা ছোটোখাটো রাজত্ব চালানো অনেক সহজ। যদি দু’শো জন অতিথি এখানে থাকেন, তাহলে প্রতি মিনিটে দু’শো সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এবং সে-সবের সমাধান ম্যানেজারকেই করতে হবে।

চিঠি টাইপ করা আমার নতুন পেশা নয়। সুতরাং ঐ কাজে বেশী সময় ব্যয় করতে হলো না। সই-এর জন্য চিঠিগুলো সায়েবের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, আপিসের কাগজপত্তরগুলো গোছাতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে রোজী আমাকে ডুবিয়ে গিয়েছে। কোথায় কী আছে জানি না। কোথায় কোন ফাইল আছে তারও কোনো লিস্টি খুঁজে পেলাম না। কেবল মাত্র একজোড়া চোখ এবং দু’টো হাতের উপর ভরসা করে ফাইলের পাহাড় আবার ঢেলে সাজাতে আরম্ভ করলাম।

আমার টেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ারগুলো খুলতেই দেখলাম রোজীর ব্যক্তিগত মালপত্তর কিছু রয়েছে। একটা নেল পালিশ, নতুন ব্লেড এবং একটা ছোট আয়নাও ওখানে পড়ে রয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কার জন্য ফাইলগুলো সাজাচ্ছি? আগামী কালই হোটেলের সর্বজনপ্রিয়া যুবতী মহিলাটি হয়তো আবার আবির্ভূর্তা হবেন; তখন আমাকে আবার কার্জন পার্কে ফিরে যেতে হবে। দু’'দিনের জন্য মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

কাজের মধ্য দিয়ে দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো, খেয়াল করিনি। ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চের ঘর পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা কখন যে সান্ধ্য চা-এর সময়ও অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তা নজরে আসেনি।

“বাবুজী, আপনি তো সারাদিনই কাজ করে যাচ্ছেন। একটু চা খাবেন না?” মুখে তুলে দেখলাম ম্যানেজার সায়েবের বেয়ারা।

মিষ্টি হাসি দিয়ে সে আমাকে নমস্কার করলে। বয়স হয়েছে ওর! মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে এসেছে। কিন্তু পেটা লোহার পাতের মতো চেহারা। ও বললে, “আমার নাম মথুরা সিং!”

বললাম, “মথুরা সিং, তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।” মথুরা সিং বললে, “বাবুজী, আপনার জন্য একটু চা নিয়ে আসি।”

“চা? কোথা থেকে নিয়ে আসবে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“সে আমি নিয়ে আসছি, বাবুজী। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সম্বন্ধে এখনও কোনো সিলিপ ইসু হয়নি; অর্ডার হয়ে গেলে তখন আপনার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হবে না,” মথুরা সিং বললে।

আপিস ঘরের মধ্যেই মথুরা চা নিয়ে এলো। চা তৈরি করে, কাপটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে, মথুরা বললে, “শেষ পর্যন্ত বাবুজী, আপনি এখানে এলেন?”

“মথুরা, তুমি কি আমাকে চিনতে?” আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আপনি তো ব্যারিস্টার সায়েবের বাবু ছিলেন?” মথুরা বললে, "কলকাতা শহরে ঐ সায়েবকে কে চিনতো না বাবু? ওঁর বেয়ারা মোহনের বাড়ি আমাদের গ্রামে।”

“তুমি তা হলে কমায়ুনের লোক?”

“হ্যাঁ, হুজুর। মোহনের সঙ্গে দেখা করতে আমি আপনাদের ওখানে অনেকবার গিয়েছি; আপনাকে কয়েকবার আমি দেখেছি।”

বড়ো আনন্দ হলো। অপরিচিতের হাটে এতোক্ষণে যেন আপনজন খুঁজে পেলাম। বাংলাদেশ যদি আমার মাতৃভূমি হয়, কমায়ূন আমার দ্বিতীয় মা। কুমায়নের প্রাকৃতিক

ঐশ্বর্য আছে, বিখ্যাতদের পদধূলি লাভ করে ইদানীং সে আরও প্রখ্যাত হয়েছে, তাকে ভালবাসার লোকের অভাব নেই। কিন্তু কুমায়ূন যদি পৃথিবীর জঘন্যতম স্থানও হতো, ম্যালেরিয়া, আমাশয় এবং ডেঙ্গুজ্বরের ডিপো হতো, তা হলেও আমি তাকে ভালবাসতাম। এই পোড়া দেশে এখনও যে এমন জায়গা আছে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ওখানে বাড়ির চারিদিকে কেউ পাঁচিল দেয় না, মনের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল তুলতেও ওখানকার লোকেরা আজও শেখেনি।

মথুরা বললে, “বাবুজী, এই চাকরিতে আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। তবে ঘাবড়ে যাবেন না। এমন অনেক কিছুই হয়তো দেখবেন, যা এর আগে কখনও দেখেননি, হয়তো কানেও শোনেননি। কিন্তু ভয় পাবেন না। এই চল্লিশ বছর ধরে আমিও তো কম দেখলাম না। কিন্তু মাথা উচু করে এতোদিন তো বে'চে রইলাম। আপনাদের আশীর্বাদে আমার ছেলেটাও চাকরি পেয়েছে।"

“কোথায়? এই হোটেলে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“মাপ করুন, হজুর। জেনে শুনে এখানে কেউ নিজের ছেলেকে পাঠায়?” আমি বললাম, "মথুরা, নিজের কর্মস্থান সম্বন্ধে সকলেরই একটা অবজ্ঞা থাকে। যাকে জিজ্ঞাসা করো সেই বলবে, আমি নিজে ভুগেছি, ছেলেকে আর ভুগতে দেবো না।”

মথুরা বললে, "বাবুজী, ব্যারিস্টার সায়েবের কাছে তো অনেক দেখেছেন! এবার এখানেও দেখুন। শিউ ভগবানের দয়ায় আপনার চোখের পাওয়ার তো কমে যায়নি।”

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বললাম, “মথুরা, এখানে ছুটি কখন হয়?” “বাবুজী, ব্রিটিশ রাজ্যে তবু কোভি কোভি সান-সেট হোয়, কিন্তু হোটেলের আলো কখনও নেভে না। ছুটি এখানে কখনই হয় না। তবে আপনাকে কতক্ষণ কাজ করতে হবে, কিছু বলেনি?”

বললাম, “না।”

“আজ প্রথম দিন তাহলে চলে যান।" মথুরা বললে।

“ম্যানেজার সায়েবের সঙ্গে দেখা করে যাই।” আমি বললাম।

“ওঁর দেখা তো এখন পাবেন না হুজুর।" মথুরা বললে ।

“কেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে মথুরা যেন প্রস্তুত ছিল না। সে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লো। কী উত্তর দেবে সে ঠিক করে উঠতে পারছে না। “এখন ওঁর ঘরে কারো ঢুকবার অর্ডার নেই,” মথুরা ফিসফিস করে বললে। “আপনি চলে যান, উনি জিজ্ঞাসা করলে, আমি বলে দেবো।”

আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিড়ির সামনে হাজির হলাম। ঘরের ভিতর সব সময় আলো জ্বালা থাকে, তাই বুঝতে পারিনি, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি এসেছে। শাজাহান হোটেলের আলোগুলো যেন মেছোবাজারের গুণ্ডা। ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে নিরীহ রাত্রিকে দূরে স্যরিয়ে রেখেছে, ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম কার্পেটের উপর প্রতি পদক্ষেপে হোটেলের নাম লেখা। কাঠের রেলিংটা এতো মসণ যে ধরতে গিয়ে হাত পিছলে গেলো। সিড়ির ঠিক বাঁকের মুখে একটা প্রবীণ ‘দাদামশায় ঘড়ি’ আপন মনে দু’লে এই হোটেলের প্রাচীন আভিজাত্যের সংবাদ ঘোষণা করছে। অতিথিরা লিফটে সাধারণতঃ ওঠা-উঠি করেন। দু’-একজন ক্রীড়াচ্ছলে সঙ্গিনীর হাত ধরে নৃত্যের তালে সিড়ি দিয়ে দ্রুতবেগে উপরে উঠে যাচ্ছেন।একবার ধাক্কা খেতে খেতে কোনোরকমে বেঁচে গেলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে বেশ ভিড়। সত্যসুন্দর বোস তখনও কাজ করছেন। টেলিফোনটা প্রায় প্রতিমুহূর্তেই বেজে উঠছে। লাউঞ্জের সব চেয়ার এবং সোফাগুলো বোঝাই।

আমাকে দেখতে পেয়ে এরই মধ্যে একটু চাপা গলায় বোস বললেন, “সারাদিন ম্যানেজারের আপিসেই পড়ে রইলেন?”

বললাম, “প্রথম দিন, অনেক কাজ ছিল।”

মিস্টার বোস কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোর্টারের মাথায় মাল চাপিয়ে একদল নতুন যাত্রী কাউন্টারের সামনে এসে হাজির হলেন। “আচ্ছা, পরে কথা হবে,” বলে বিদায় নিলাম।

দরজার সামনে মেডেল-পরা দারোয়ানজী তখন দ্রুতবেগে একের পর এক সেলাম উপঢৌকন দিয়ে চলেছেন।

গাড়ি-বারান্দার সামনে একটা সুদৃশ্য বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। হলিউডে তৈরি ইংরিজী ছবিতেই এমন বাস দেখেছি। আমাদের এই বুড়ী কলকাতাতেও যে এমন জিনিস আছে, তা জানা ছিল না। কলকাতার বাসদের মধ্যে কোনোদিন যদি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে এই বাসটাই যে মিস ক্যালকাটা হবে তা জোর করে বলতে পারি। পোর্টাররা পিছন থেকে মাল নামাচ্ছে। আর বাস-এর সামনের দরজা দিয়ে যাঁরা নেমে আসছেন তাঁরা যে কোনো বিমান প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তা দেখলেই বোঝা যায়। মাথার টুপিটা ঠিক করতে করতে পুরুষ এবং মহিলা কর্মীরা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন । এঁদের পাশ কাটিয়ে, সেন্ট্রাল এভিন্যু ধরে আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার সামনে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গীর রাত্রি যেন কোনো নৃত্যনিপুণা সুন্দরী। দিন ওখানে রাত্রি। রাত্রি ওখানে দিন। সন্ধ্যার অবগাহন শেষ করে সুসজ্জিতা এবং যৌবনগর্বিতা চৌরঙ্গী এতক্ষণে যেন নাইট ক্লাবের রঙ্গমঞ্চে এসে নামলেন। ওদিকে কার্জন পার্কের অন্ধকারে কারা যেন দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে বন্দী করে বেঁধে রেখে গিয়েছে। এই দুষ্টের দল জাতীয়তার জনককে যেন তাঁর প্রিয় কন্যার নির্লজ্জ নগ্নরূপ না দেখিয়ে ছাড়বে না। বৃদ্ধ দেশনায়ক অপমানিত বন্দী দেহটাকে নিয়ে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘৃণায় এবং অবজ্ঞায় আর কিছু না পেরে শুধু মুখটা কোনোরকমে দক্ষিণ দিকের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

হাঁটতে হাঁটতে কাজ'ন পার্কের পশ্চিমতম প্রান্তে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার কাছে এসে দাঁড়ালাম। স্যর হরিরাম এখনও সেই ভাবে রাজভবনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন প্রশ্ন করছেন, বণিকের মানদণ্ড কি সত্যই রাজদণ্ড থেকে দুর্বল?

ইতিহাসের এই অভিশপ্ত শহরে শত শত বৎসর ধরে কত বিচিত্র মানুষের পদধূলি পড়েছে। নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এসে তাঁদের কত জনই তো অফুরন্ত বৈভবের অধিকারী হলেন। তাঁদের রক্ত বিভিন্ন, ভাষা বিভিন্ন, পোশাক বিভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য একই। আর মহাকাল যেন

বিশ্বকর্পোরেশনের 'হেড ঝাড়ুদার, ঝাঁটা দিয়ে খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র, দেশী-বিদেশী সবাইকে মাঝে মাঝে সাফ করে বিস্মৃতির ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছেন। শুধু দু'একজন সেই ঝাঁটাকে ফাঁকি দিয়ে কোনোরকমে বেঁচে রয়েছেন। এই মৃত্যুমুখের ভাগীরথী-তীরে কয়েকজনের প্রস্তরীভূত দেহ তাই আজও টিকে রয়েছে। সেই মৃত শহরের মৃত নাগরিকদের অন্যতম স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কাকে নমস্কার করে বললাম, "কাল আপনি আমাকে যে অবস্থায় দেখেছেন, আজ আমার সে অবস্থা নেই। আমি কাজ করছি। শাজাহান হোটেলে। আপনি যখন বেঁচে ছিলেন, এই শহরের বাণিজ্য সাম্রাজ্য যখন পরিচালনা করছিলেন, তখনও শাজাহান হোটেলের রাত্তিরটা দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আপনি নিজেও নিশ্চয় সেখানে অনেকবার গিয়েছিলেন।"

হঠাৎ নিজেই হেসে উঠলাম। পাগলের মতো কীসব বকছি? স্যর হরিরাম সম্বন্ধে আমি কতটকু জানি? হয়তো তিনি গোঁড়া ধর্মভীরু লোক ছিলেন, হোটেলের ধারে কাছেও যেতেন না কখনও। তারপর নিজের ছেলেমানুষিতে নিজে আরও অবাক হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেলো, ক্লাইভ স্ট্রীটের এক দারোয়ানজী নিজের অজ্ঞাতে পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার সঙ্গে আমাকে আত্মীয়তাসুত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন।

দূরে হোয়াইটওয়ে লাডলোর বাড়ির ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। রাত্রি অনেক হয়েছে। বাড়ি ফেরা দরকার। বাড়ি ফিরতে এখন আমার সঙ্কোচ কী? আমার বাড়ি আছে, আমার আপনজন আছে এবং সবচেয়ে বড়োকথা আমার এখন একটা চাকরি আছে।

“**পৃথিবীর** এই সরাইখানায় আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রেকফাস্ট খেয়েই বিদায় নেবে, কয়েকজন লাঞ্চ শেষ হওয়া মাত্রই বেরিয়ে পড়বে। প্রদোষের অন্ধকার পেরিয়ে, রাত্রে যখন আমরা ডিনার টেবিলে এসে জড়ো হবো তখন অনেক পরিচিত জনকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না; আমাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনই সেখানে হাজির থাকবে। কিন্তু দুঃখ কোরো না, যে যত আগে যাবে তাকে তত কম বিল দিতে হবে” বোসদা বললেন।

"এ-যে দার্শনিকের কথা হলো,” আমি বললাম।

“হ্যাঁ, এ আমার নিজের কথা নয়—কোনো ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখানে অনেকদিন ছিলেন, তিনি প্রায়ই লাইনগুলো আবৃত্তি করতেন। আমি যেন কোথায় লিখেও রেখেছিলাম। যদি খুঁজে পাই, দেবো’খন।”

আমি বললাম, “সুন্দর ভাবটি তো। যে যত বেশী সময় এই দুনিয়ায় থাকবে সংসারের বিল সে তত বেশী দেবে।”

"কিন্তু কবি ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোনো হোটেলে চাকরি করেননি। যদি করতেন, তাহলে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব ধ্বংস করে, বিলটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, যে-সব লোক পৃথিবী থেকে সরে পড়েছে, তাদের কথা নিশ্চয় লিখতেন। আর আমাদের কথাও কিছু লিখে যেতেন। আমরা যারা প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার ধ্বংস করছি, অথচ বিল দিচ্ছি না; কিন্তু গতর খাটিয়ে দেনা শোধ করবার চেষ্টা করছি।”

একটু থেমে স্যাটা বোস বললেন, “সত্যি কথা বলতে কি, আমি মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি।”

বোসদা বললেন, “তাতে অবশ্য কষ্ট পাওয়াই সার হচ্ছে। কারণ হাঁপানিতে কেউ একটা সহজে মরে না। আমাদের যে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। সর্বনাশা এক মোহের

আফিম ছড়ানো রয়েছে এখানে। একবার ঢুকলে আর এড়ানো যায় না। দরজা খুলে দিলেও, যাওয়া হয় না।”

টাইপ করতে করতে ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম।

এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্যাটা বোস বললেন, “মুখ চোখ বসে গিয়েছে কেন? রোজীর ভয়ে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না বুঝি?”

সত্যি কথা বলতে হলো। “মেয়েটার এখনও খোঁজ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ এসে না হাজির হয়।”

"চিন্তারই কথা।” বোসদা বললেন। “তবে নিজের জমিটা ইতিমধ্যে যত্ন করে লাঙ্গল দিয়ে তৈরি করে রাখো। কর্তাকে খুশী রাখা প্রয়োজন।”

কর্তাকে কী করে খুশী রাখতে হয়, তা কর্তার কাছেই শিখেছিলাম। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ওমর খৈয়াম কী আর সাধে লিখেছিলেন, 'এই দু’নিয়ায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বড়ো বড়ো কেতাব লেখার জন্যে জাঁদরেল পণ্ডিতের অভাব নেই; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করবার জন্যে সাহসী পুরুষও অনেক পাওয়া যায়; সসাগরা সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন এমন রাজনৈতিক প্রতিভাও অনেক আছেন; কিন্তু হায়, সরাইখানা চালাবার লোকের বড়ই অভাব।”

হোটেলে প্রতি মুহূর্তে কতরকমের সমস্যরই যে উদ্ভব হয়। সে সব সমাধানের দায়িত্ব বেচারা ম্যানেজারের। চোর দায়ে তিনি যেন সব সময়ই ধরা পড়ে রয়েছেন। স্নানের জল যদি বেশী গরম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বেয়ারাকে খবর না দিয়ে, অনেকে টেলিফোনে তাঁকেই ডেকে পাঠান। হোটেল অতিথিদের অনেকেই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বাসী; নিম্ন পর্যায়ে আলোচনা করে যে কি সমস্যর সমাধান করা সম্ভব, তা তাঁরা মনে করেন না। ফলে, স্নানের জল যদি একটু ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও বেচারা ম্যানেজারের ডাক পড়বে। ঘুমোতে যাবার সময় কেউ যদি আবিষ্কার করেন, বিছানার চাদরের রং দরজা-জানালার পর্দার রংয়ের সঙ্গে ম্যাচ করেনি তাহলে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠেন। এবং সেই রাত্রেই পাগলের মতো ম্যানেজারকে সেলাম পাঠান। আমার চোখের সামনেই একদিন ঘটনাটা

ঘটলো। টেলিফোনে এস-ও-এস পেয়ে মার্কোপোলো প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কী ব্যাপার জানবার জন্যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে এলাম। নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় মার্কোপোলো সায়েব টোকা মারলেন। ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে শব্দ এলো, "কাম্‌, ইন প্লিজ।"

ভদ্রমহিলা মধ্যবয়সী। জাতে ইংরেজিনী। মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ম্যানেজারকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বললেন, "আপনারা ডেঞ্জারাস। আপনারা মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারেন। মার্ডারার ছাড়া এমন 'কালার কম্বিনেশন' আর কেউ পছন্দ করতে পারে না! এমন ভয়াবহ রং আমি জীবনে কোনো হোটেলে দেখিনি; আর একটু হলেই আমি ফেণ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম।"

রাগে আমার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। মার্কোপোলো কিন্তু রাগ করলেন না। রাগের নার্ভটা নাকি হোটেল ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষার ইস্কুলে ঢোকবার সময় কেটে দেওয়া হয়। মার্কোপোলো প্রথমেই হাজারখানেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "আহা! আশা করি ইতিমধ্যে আপনার কোনো শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হয়নি। আমি এখনই তিনটে চাদর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনটের মধ্যে আপনার যেটা খুশী পছন্দ করে নিন। তবে ঐ যে-রংয়ের চাদরটা অপনার বিছানায় পাতা রয়েছে, ওটা আমেরিকান ট্যুরিস্টরা কেন যে পছন্দ করেন জানি না। বাধ্য হয়ে ঐ ধরনের চাদর আমাকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করাতে হয়েছে। কিন্তু তখন কি জানতাম যে আপনি এই ঘরে আসছেন।"

বিজয়গর্বে বিগলিত ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে বললেন, "পৃথিবীর যেখানেই যাচ্ছি দেখছি ওরা রুচি নষ্ট করে দিচ্ছে। চিউইং গাম চুষতে চুষতে ওরা সৌন্দর্যের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, পয়সা হয়তো ওদের আছে, কিন্তু রুচি শিখতে এখনও অ্যানাদার ফাইভ হানড্রেড ইয়ারস্‌।"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে মার্কোপোলো বেরিয়ে এলেন। পরে স্যাটা বোসের কাছে শুনেছি, যদি ভদ্রমহিলা আমেরিকান হতেন, তা হলে মার্কো বলতেন, 'ইংরেজরা কেন যে এই সেকেলে রং পছন্দ করে বুঝি না। অথচ আমরা নিরুপায়—

গতকাল পর্যন্ত ক্যালকাটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। তবে এখন আমরা উঠে পড়ে লেগেছি—ব্রিটিশ ইমপিরিয়ালিজমের সব চিহ্ন এখান থেকে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।'

গেস্টদের কাছে নরম মেজাজের শোধটা ম্যানেজার অবশ্য কর্মচারীদের উপর দিয়ে তুলে নেন। বেয়ারা, ফরাশ, খিদমতগার, বাবুর্চির প্রাণ বড়ো সায়েবের দাপটে ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

মার্কোপোলো সায়েব একদিকে আরও ভয়াবহ। ওঁর মেজাজ কখন যে কত ডিগ্রিতে চড়ে রয়েছে তা সব সময় বোঝা যায় না।

আমাকে কাজ দেওয়ার সময়ও মার্কো কেমন গম্ভীর হয়ে থাকেন। সব - সময়েই যেন অন্যমনস্ক। সন্ধ্যের সময় মাঝে মাঝে হাফ প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট পরে, ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় যান কেউ জানে না। ডিনারের সময়, যখন ডাইনিং হল-এ তিলধারণের স্থান থাকে না, তখনও তাঁকে দেখা যায় না। বেচারা স্টুয়ার্ড এবং সত্যসুন্দরবাবুকে সব সামলাতে হয়।

স্টুয়ার্ড বলে, "স্যাটা এমনভাবে কতদিন চলবে?"

স্যাটা বলেন, "অতো মাথা ঘামিও না, সায়েব। দেড়শ বছর ধরে যে জিনিসটা চলে আসছে, সেটা ঠিক নিজের জোরেই চলবে। তোমার কিংবা আমার ব্রেনের ব্যাটারি সে-জন্যে অহেতুক খরচ করে লাভ নেই।"

ম্যানেজার সায়েব যখন ফিরলেন, তখন তাঁর অন্য মেজাজ। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিজের ঘরে ঢুকে সায়েব জামা জুতো একটা একটা করে খুলে চারদিকে ছুড়ে ফেলতে আরম্ভ করেন। বেচারা মথুরা সিং চুপচাপ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরে ঢুকে কোনো লাভ নেই, নেশার ঝোঁকে সায়েব হয়তো জুতো ছুড়েই মারবেন।

একটু পরেই মথুরা সিং-এর ডাক পড়ে। ঘরে ঢুকতেই জড়িত কণ্ঠে সায়েব বলেন, "হেড, বারম্যান কো বোলাও।"

সেলাম পেয়েই হেড় বারম্যান রাম সিং ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কোমরে লাল পট্টি, ডান হাতে লাল ব্যান্ড এবং মাথায় লাল পাগড়ি পরে সে পেগ-মেজারে মদ ঢালছিল।

অন্য কারুর হাতে দায়িত্ব দিয়ে, তাকে সায়েবের ঘরে ঢুকে সেলাম দিতে হয়।

সায়েব তখন ষাঁড়ের মতো ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করেন। জিজ্ঞাসা করেন, "রাম সিং, মাই ডার্লিং রাম সিং, হাওয়া কী রকম?"

কোমর থেকে ঝোলা ঝাড়নে হাতটা মুছতে মুছতে হেড বারম্যান বলে, হুজুর বার আজ বোঝাই। দু'টো ডাস্পুল হেগ, তিনটে হোয়াইট হর্স এর বোতল শেষ হয়ে গিয়েছে। অনেক খদ্দের এসেছে—রেসের দিন।" রাম সিং বিনিত নিবেদন করে, আরও খদ্দের আসছে। বার-এ তখন তার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করে সায়েব বলেন, "ওই সব ছারপোকাগুলোকে নরকে যেতে দাও। তুমি এখানে আমার সঙ্গে গল্প করো।"

রাম সিং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মথুরা সিং-এর মুখের দিকে তাকায়। মথুরা সিং মুখে কিছু বলে না, মনে মনে খুশী হয়। থাকো এখন দাড়িঁয়ে। রোজই তো মাতালদের চুষে অনেক রোজগার করছো, আজ না-হয় একটু কম কামালে। অন্য লোকগুলো একটু চান্স পাক।'

নেশার ঘোরে সায়েব এবার গান ধরেন। সায়েব বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন। অন্নপূর্ণা আজ ভিখারিণী হয়েছেন। শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বার রসনা নিজের সেলারে তৃপ্ত হয়নি; তাই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার এক কুৎসিত বস্তিতে দেশী মদ টেনে এসেছেন। মুখের দুর্গন্ধে, বিলিতী মদে অভ্যস্ত রাম সিং-এর বমি ঠেলে আসছে। কিন্তু তাও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

সায়েবের এখনও মন ভরেনি। তাই গান ধরলেন। এ-গান অনেক দিনের পুরনো; কলকাতার প্রাচীন বিষাক্ত রক্তের সঙ্গে হাস্যরসিক ডেভি কারসনের এই গান মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। শাজাহান হোটেলের বার-এ এই গান অনেক মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছে। মদন দত্ত লেন, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন অনেক বিদেশী কণ্ঠ ঊনিশ শতাব্দীর মধ্যরাত্রে এই গান গেয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানিয়েছে, বেয়ারাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে—

"জলদি যাও,

হাই খিদমতগার, ব্রাণ্ডি শরাব, বেলাটী পানী লে আও।”

মার্কোপোলোর মত দেহে আজ অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া বাধাবন্ধহীন কলকাতার সেই উচ্ছৃঙ্খল আত্মা যেন ভর করেছে। সায়েব সুর করে গাইতে লাগলেন—

"To Wilson's or Spence's Hall
On Holiday I stay ;
With freedom call for the mutton chops
And billiards play all day;
The servant catches from after the hukum
'Jaldi Jao Hi Khitmatgar, brandy shrab Bilati pani lao.""

সায়েবের তৃষ্ণা এখনও মেটেনি। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন— “লে আও...লে আও...হুইস্কি শরাব, ব্লাতি পানি লে আও।"

তারপর মদে চুর হয়ে যাবেন মার্কোপোলো সায়েব। গেঞ্জি আর অন্তর্বাস পরা ঐ বিশাল উন্মত্ত দেহটা দু''জন চাকরের পক্ষে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সায়েব গেলাস ভাঙবেন, শূন্য মদের বোতল মেঝেতে ছুড়ে ফেলবেন। রাম সিংকে বুকে জড়িয়ে ধরে নাচবেন, আর গাইবেন। তারপর হঠাৎ যেন তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। “ডার্লিং, মাই সুইট ডার্লিং", বলে রাম সিংকে চুম্বন করতে গিয়ে চমকে উঠবেন।

ওঁর সবল দু’ই হাত দিয়ে রাম সিংকে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়বেন। তখন সাবধানে ওঁর ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে হবে। অতি সন্তর্পণে ওঁর বুক পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঘণ্টাখানেক পরে মথুরা সিংকে আবার আসতে হবে। এবার আলোটা জ্বেলে ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কারণ ভোরবেলায় সায়েব যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন কিছুই মনে থাকবে না। হয়তো সারা ঘরময় ছড়ানো ভাঙা কাঁচের টুকরোয় নিজের পা কেটে বসবেন।

সেবার ঐ রকম হয়েছিল। রাত্রে তাঁর ঘরে কেউ ঢুকতে সাহস করেনি। আর ভোরবেলায় ওঁর পা কেটে গেলো। মথুরাকে ডেকে সায়েব বললেন, ‘মাতাল হয়েছিলাম বলে, তোমরা আমাকে এইভাবে শাস্তি দিলে? তোমরা কেউ কী আমাকে ভালবাস না?”

সেই থেকে মথুরা গণ্ডগোলের রাতে ঘুমোয় না। সায়েবের ঘরের বাইরে, একটা টুলের উপর সারারাত জেগে বসে থাকে। আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকায়, কখন এই অসহ্য রাত্রির শেষে, সর্বপাপঘ্ন সূর্যের উদয় হবে। অশিষ্ট, অপ্রকৃতিস্থ পৃথিবী আবার দিনের আলোয় শান্ত হবে; নিজের জ্ঞান ফিরে পাবে।

রাত্রের এই নাটকের কাহিনী আমি মথুরার কাছেই শুনেছি। কিন্তু পরের দিন ব্রেকফাস্টের পর ম্যানেজারকে দেখে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। পরিশ্রমের অফুরন্ত উৎস যেন ওর শরীরের মধ্যে রয়েছে; দেহের উপর অত অত্যাচারের পরও পশুর মতো খাটতে দেখেছি তাঁকে।

মার্কোপোলো যেন আমাকে একটু সুনজরে দেখতে শুরু করেছেন। অন্য লোকের কাছে গম্ভীর হয়ে থাকলেও, আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এক একদিন কাজের শেষে বলেছেন, “এখনও বসে রয়েছো কেন? তুমি কি সাধু বনে গিয়েছো?”

বলতাম, “কই না তো?”

তা হলে, এখনও এই হোটেলের বন্ধ ঘরে বসে রয়েছো কেন? কলকাতা "শহরে কত ফুর্তি পাখি হয়ে এখন উড়ে বেড়াচ্ছে। যাও, তার দু’ একটা ধরে উপভোগ করে নাও।”

বায়রন সায়েবের খোঁজ পড়লো একদিন। সেই যে এক রাত্রে বায়রন সায়েব হোটেলে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন, তারপর আর কোনো খোঁজ নেই। আমার উপকার করবার জন্যই স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার মর্মর মূর্তির সামনে আবির্ভূত হয়ে, তিনি যেন আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করলেন, "বায়রনের সঙ্গে দেখা হয় তোমার?” বলতে হলো, “না।”

"সেই রাত্রের পর তোমার সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি? উনিও দেখা করতে আসেননি, আর তুমিও যাওনি?”

“আজ্ঞে না।"

মার্কোপোলো বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার নজর দিলেন। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের একটুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, কিন্তু সন্ধ্যা হতেও বেশী দেরী নেই।

এবার তিনি যা বললেন, তা শোনবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে, চোখ দু'টো ছোট করে বললেন, "তুমি অত্যন্ত চতুর। অনেক জেনেও তুমি মুখটাকে 'ইনোসেন্ট' রাখতে পেরেছো।"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁর কথাতে একটু রহস্যের গন্ধ পেলাম। তিনি হয়তো সন্দেহ করছেন, আমি কিছু সংবাদ জানি, অথচ বলছি না। বললাম, "আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যর।" মার্কোপোলো এবার লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন, "না না, তুমি রাগ কোরো না, এমনি মজা করছিলাম।"

হঠাৎ কথা বন্ধ করে মার্কোপোলো এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর ঐ বিশাল চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকিয়ে থাকার মতো সাহস বা শক্তি আমার ছিল না। তাই চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। একটু পরে আবার ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হলো, বড়ো করুণভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ধীরে ধীরে মার্কোপোলো বললেন, "আমার একটা উপকার করবে? বায়রনের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে? প্লিজ।"

না বলতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলতে হবে?"

"না, কিছুই বলতে হবে না। যদি ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, ওকে জানিও, আমি অধৈর্য হয়ে পড়েছি।"

তখনই বেরোতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সায়েব বাধা দিলেন। বললেন, "ম্যান, চা-এর সময় হয়ে গিয়েছে। এখনই চা আসবে। আগে চা খাও।"

মার্কোপোলো বেল টিপলেন। হোটেলের ঘড়ির কাঁটা তখন চায়ের ঘরেই হাজির হয়েছে। দু'শো, আড়াইশো ঘরে একই সঙ্গে চা পৌঁছে দিতে হবে। বেয়ারারা এতোক্ষণে প্যান্ট্রির সামনে দাঁড়িয়ে, চাপা গলায় বলছে—জলদি, জলদি।

বেলের উত্তরে বেয়ারা এসে হাজির হলো না। সে নিশ্চয় ততক্ষণ প্যান্ট্রির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে দু'জন লোক দ্রুতবেগে কেটলির মধ্যে গরম জল ঢালছে। আর একজন লোক যন্ত্রের মতো প্রতি কেটলিতে চা ঢেলে যাচ্ছে। বেয়ারারা ইতিমধ্যেই ফ্রিজ থেকে দুধ এবং আলমারি থেকে চিনি বার করে নিয়েছে। এতো কেটলি এবং ডিস কাপ যে একসঙ্গে হাজির হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ম্যানেজার সায়েবের ঘরে চা আসতে দেরি হলো না। কেটলির টোপর খুলে দিয়ে মথুরা সিং সেলাম করে দাঁড়ালো। এই সেলামের জিজ্ঞাসা, "সায়েব নিজের খুশিমতো চা তৈরি করবেন, না সে দায়িত্ব মথুরার উপর অর্পণ করবেন।"

মার্কোপোলো মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক হ্যায়।" মথুরা সিং আর একটা সেলাম দিয়ে বিদায় নিলো।

অভ্যস্ত হাতে কেটলির ভিতরটা চামচে দিয়ে নেড়ে নিয়েই ম্যানেজার সায়েব আঁতকে উঠলেন। বললেন, "খারাপ কোয়ালিটির চা।"

মথুরার ডাক পড়লো। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, "না হুজুর, সকালে যে চা খেয়েছেন, সেই একই চা।"

ম্যানেজার সায়েব স্টুয়ার্ডকে সেলাম দিলেন। তিনিই হোটেলের ভাঁড়ারী সুতরাং কোনো দোষ বেরুলে প্রথম ঘা তাঁকেই সামলাতে হবে।

দরজায় টোকা পড়তেই ম্যানেজার জিমিকে ভিতরে আসতে বললেন। চেয়ারে বসতে দিয়ে ম্যানেজার বললেন, "তোমার সঙ্গে চা খাবার জন্য প্রাণটা আইঢাই করছিল, তাই ডেকে পাঠালাম!" ব্যাপারটা যে সুবিধের নয়, তা জিমি ভাবে বুঝলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো কিছু খারাপ আছে নাকি?"

ম্যানেজার এবার বোমা ফাটালেন। "মাইডিয়ার ফেলো, তোমার এই চা খেয়ে কোনো গেস্ট যদি এই হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়, তা হলে আমি আশ্চর্য হবো না। তোমার ঐ চা স্টম্যাকে গেলে খুন করবার ইচ্ছেও হতে পারে।"

অপ্রস্তুত স্টুয়ার্ড' বললেন, "বোধহয় আপনাদের কেটলিতে কোনো গোলমাল হয়ে গিয়েছে।"

মুখ খিঁচিয়ে ম্যানেজার বললেন, “এ প্রশ্নের উত্তর এখানকার নিকটতম আস্তাবলের ঘোড়ারা দিতে পারবে।”

বিনয়ে গলে গিয়ে স্টুয়ার্ড বললেন, “নতুন প্যাকেট খুলে চা তৈরি করে আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

মার্কোপোলো এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। বললেন, “জিমি, তুমি পারবে। খুব শিগ্‌গির তুমি আমার চেয়ারে বসতে পারবে।” আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “তোমাদের ফিউচার বড়ো সায়েবকে দেখে রাখো।”

মথুরা সিং আবার নতুন চা নিয়ে এলো। চা তৈরি করে, আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মার্কোপোলো বললেন, “মুখের জোরেই হোটেল চলে। তোমাদের কলকাতাতেই একজন হোটেলওয়ালা ছিলেন। নাম স্টিফেন। কথার জোরে রাজত্ব করে গেলেন।”

“হু ওয়াজ হি?” স্টুয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

"কলকাতার সবচেয়ে বড়ো হোটেলের ফাউন্ডার। কলকাতার বাইরেও একটা নামকরা হোটেল তাঁর কীর্তি। আর ডালহৌসির স্টিফেন হাউস তো তোমরা রোজই দেখছো। গল্প আছে, উনি তোমার থেকেও খারাপ অবস্থায় পড়েছিলেন। চা-এর কেটলিতে চামচ চালাতে গিয়ে, এক ভদ্রলোক দেখলেন, শুধু চা নয়, চা-এর সঙ্গে একটা আরশোলাও গরম জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, “তখন কী হলো?”

“ভদ্রলোক টি-পট হাতে করে সোজা স্টিফেনের ঘরে এসে ঢুকলেন। রাগে তিনি ঠক ঠক করে কাঁপছেন। কিন্তু স্টিফেন ঘাবড়ে যাবার পাত্র নন। অমায়িক ভাবে নিজের বেয়ারাকে ডেকে আর এক পট চা আনতে বললেন। তারপর নিজের হাতে চা তৈরি করে, ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

“ভদ্রলোক দেখলেন স্টিফেন যেন মনে মনে কী একটা হিসেব করবার চেষ্টা করছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হিসেব করছেন?' “আজ্ঞে, আমাদের পাঁচশো ঘর। তার মানে পাঁচশো পট চা! একটা আরশোলা। তার মানে পাঁচশোয় একটা।”

গল্প শেষ করে ম্যানেজার আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

স্টয়ার্ড হা-হা করে হাসতে আরম্ভ করলেন। "বাঃ! চমৎকার ব্যাখ্যা। ভদ্রলোকের আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল।"

"হু"। কিন্তু দিনকাল দ্রুতবেগে পাল্টাচ্ছে, জিমি। এখন শুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজছে না," ম্যানেজার গম্ভীর হয়ে বললেন। "খুব সাবধানে না চললে অনেক দূর্ভোগ পোয়াতে হবে।" জিমি উঠে পড়লেন, আমাকেও উঠতে হলো।

মার্কোপোলো বললেন, "হোটেলের গাড়িতে তোমাকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু জিনিসটা জানাজানি হোক আমি চাই না।"

নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় নেমে ট্রামের শরণাপন্ন হওয়া গেলো।

কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোক দলবদ্ধভাবে কোথাও বাস করলে সে পাড়ার বাতাসে পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্য যে কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে আমি বুঝতে পারি না। ছাতাওয়ালা গলির সঙ্গে ডেকার্স লেনের যে পার্থক্য আছে, তা আমার চোখ বেঁধে দিলেও বলে দিতে পারি। ব্যক্তি জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো কেন যে গন্ধেও ধরা দেয় তা বলা শক্ত। এসপ্লানেড-পার্ক সার্কাসের ট্রামটা যখন ওয়েলেসলীর মধ্য দিয়ে এলিয়ট রোডে ঢুকে পড়লো, তখনও এক ধরনের গন্ধ পেলাম। সত্যি কথা বলতে কী, এই গন্ধ কেউ বিশেষ উপভোগ করেন না। নোংরামির দিক থেকে এই অঞ্চল কলকাতা কর্পোরেশনের খাতায় কিছু প্রথম স্থান অধিকার করে নেই, এর থেকেও অনেক নোংরা গলিতে প্রতিদিন বহু সময় অতিবাহিত করি, কিন্তু কখনও এমন অস্বস্তি বোধ করি না।

পার্ক সার্কাসের ট্রাম থেকে নেমে পড়ে, বায়রন সাহেবের গলিটা কোনদিকে হবে ভাবছিলাম। আমার সামনেই গোটাকয়েক অর্ধউলঙ্গ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাচ্চা দেশী মতে রাস্তার উপর ড্যাংগুলি খেলছিল। ছেলেরা যেখানে ঘোরাঘুরি করে খেলাধুলা করে, সে জায়গার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু মাত্র গজ কয়েক পরেই একটা মদের দোকান। রাস্তার উপর থেকে সাইনবোর্ড ছাড়া দোকানের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাইনবোর্ডের উপর একটা নিষ্প্রভ ইলেকট্রিক বাতি অকারণে রহস্য সৃষ্টি করে নিষ্পাপ পথচারীদের মনে নিষিদ্ধ কৌতূহল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

ড্যাংগুলি খেলা বন্ধ করে ছেলেরা এবার আমার দিকে নজর দিলে।

পকেট থেকে কাগজ বার করে লেনের নাম জিজ্ঞেস করাতে ছেলেরা রাজভাষা ও রাষ্ট্রভাষার ককটেলে তৈরি এক বিচিত্র ভাষায় আমাকে পথ দেখিয়ে দিলো।

ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসছিলাম। কিন্তু ওদেরই মধ্যে সিনিয়র এক ছোকরা এসে বললে, যে-সার্ভিস তারা দিয়েছে তার প্রতিদানে তারা কিছু আশা করে। ট্যাক্সি ধরে দেবার জন্য চৌরঙ্গীতে ছোকরাদের পয়সা দিতে হয় জানতাম, কিন্তু ঠিকানা খুজে দেবার জন্য কলকাতা শহরে এই প্রথম চার আনা খরচ করে যখন বায়রন সায়েবের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

প্লাসটিকের অক্ষর দিয়ে দরজার সামনে বোধহয় নাম লেখা ছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ অক্ষর কোন সময়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে দরজা থেকে বিদায় নিয়েছে, শুধু RON অক্ষরগুলো মালিকের মায়া কাটাতে না পেরে, কোনোরকমে ভাঙা আসর জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

দরজায় বেল ছিল। কয়েকবার টেপার পরও কোনো উত্তর না পেয়ে বুঝলাম, ঐ যন্ত্রটির শরীরও সুস্থ নয়। তখন আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় পদ্ধতিতে ধাক্কা মারা শুরু করলাম। এবার ফল হলো। ভিতর থেকে এক শৃঙ্খলবদ্ধ কুকুরের স্বাধীনতার দাবি জানানো স্লোগান শুনতে পেলাম। দরজা খোলার শব্দ হলো; এবং পরের মুহূর্তেই যিনি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি খোদ বায়রন সায়েব।

চোখ মুছতে মুছতে বায়রন বললেন, "আরে, কী ব্যাপার?"

প্রচুর আদর করে তিনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এই ভরসন্ধ্যাবেলায় উনি কী ঘুমোচ্ছিলেন?

একটা ছে'ড়া বেতের চেয়ারে বসতে বলে বায়রন সায়েব চোখে মুখে জল দেবার জন্যে বাথরুমে গেলেন। দেখলাম, টেবিলের উপর এক কাঁড়ি পুরনো আমেরিকান ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন ছড়ানো রয়েছে। দেওয়ালের কোণে কোণে ঝুল এবং নোংরা জড়ো হয়ে আছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে একটা ময়লা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বায়রন বললেন, "খুব অবাক হয়ে গিয়েছো, তাই না? ভাবছো লোকটা এখন ঘুমোচ্ছিল কেন? তার উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। আগে একটু, চা তৈরি করি।"

বললাম, “এইমাত্র খোদ মার্কোপোলোর সঙ্গে চা খেয়ে এসেছি।”

"মার্কোপোলোর সঙ্গে বসে তুমি সেন্ট পারসেন্ট পিওর 'আগমার্কা' অমৃত খেলেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে একটু চা খাবে না, তা কী হয়? তোমার এখনও বিয়াল্লিশ কাপ চা পাওনা।”

বায়রন সায়েব নিজেই চা-এর ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন। বললেন, "আমার স্ত্রী আজ ফিরবেন না। আপিস থেকে সোজা বাটানগরে এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাবেন।”

হিটারে কেটলি চাপিয়ে বায়রন বললেন, "যা বলছিলাম, আমাকে ঘুমোতে দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গিয়েছো। কিন্তু এটা জেনে রাখো, আমরা ডিটেক্টিভরা যা করি তার প্রত্যেকটারই পিছনে একটা গোপন উদ্দেশ্য থাকে।”

“তা তো বটেই,” আমি সায় দিলাম।

“হ্যাঁ,” বায়রন সায়েব বললেন। “আমার স্ত্রীকেও সব সময় ঐ কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তুমি যেমন সহজেই আমার স্টেটমেন্ট মেনে নিলে, তিনি তা করবেন না। তিনি তখন হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। অথচ, সব সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। গোপনীয়তাটাই আমাদের ব্যবসা। আমাদের প্রফেশনে এমন অনেক কথা আছে, যা নিজের স্ত্রীকেও বল সেফ নয়। হাজার হোক আমরা ইণ্ডিয়াতে বাস করছি। দেওয়ালের কান যদি কোথাও থাকে তো সে এই দেশেতেই,—পার্টিকুলারলি এই ক্যালকাটাতেই আছে।” বললাম, “আপনার তাহলে বেশ কষ্ট হয়।”

বায়রন সায়েব ঘাড় নাড়লেন। “সেই জন্যই আমাদের ডিটেক্টিভ ওয়ার্লডে একটা মতবাদ আছে, ডিটেক্টিভদের বিয়ে করাই উচিত নয়।”

“অ্যাঁ!” নতুন থিওরির কথা শূনে আমি চমকে উঠলাম।

বায়রন সায়েব বললেন, “এতে চমকাবার কিছু নেই। পাদ্রীরা বিয়ে করবে, না চিরকুমার থাকবে এই নিয়ে চার্চে যেমন অনেকদিন মতদ্বৈধ ছিল, এটাও তেমনি। চিরকুমার স্কুল অফ ডিটেকটিভরা বলছেন, এই পেশার পক্ষে ওয়াইফরা পজিটিভ নুইসেন্স।”

"হাইকোর্টের অনেক বড়ো বড়ো ব্যারিস্টারও গোপনে এ মত পোষণ করেন," আমি বললাম।

"করতে বাধ্য। প্রত্যেকটি উচ্চাভিলাষী অথচ বদ্ধিমান লোক ঐ কথা বলবেন।"

হিটার থেকে কেটলিটা নামিয়ে বায়রন সায়েব বললেন, "তবে কি জানো, আমার ওয়াইফকে আমি দোষ দিতে পারি না। 'সাসপিশন' অর্থাৎ সন্দেহটাও আমাদের পেশার প্রথম কথা—শেষ কথাও বটে। আমার সেই গুণ আছে, অথচ আমার ওয়াইফের সন্দেহবাতিক থাকবে না, সেটাও ভাল কথা নয়। হাজার হোক, একটা ব্রেন সব সময় নিখুঁত কাজ করতে পারে না, ডবল ইঞ্জিন থাকলে বিপদের আশঙ্কা কম।"

আমি চুপচাপ তাঁর কথা শুনছিলাম। গরম চা এক কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "যা বলছিলাম, কেন এই অসময়ে ঘুমোচ্ছিলাম জানো? আজ রাত্রে আমার হয়তো একটুও ঘুম হবে না। সারারাত আমাকে একজনকে খুজে বেড়াতে হবে। কাকে খুঁজে বেড়াবো, তার নাম হয়তো তোমার জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন নয়, পরে বলবো। এই সিক্রেটটা গভর্নমেন্টের বাজেটের মতো; যতক্ষণ না পার্লামেন্টে অ্যানাউন্স করছি ততক্ষণ টপ সিক্রেট, কিন্তু তারপরই জনসাধারণের প্রপার্টি।"

বায়রন সায়েব এবার আমার খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর কী? কাজকর্ম ঠিক চলছে তো?"

বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ। মেয়েটা এখনও ফেরেনি।"

"হু", রোজীর খবরটা তো নেওয়া হয়নি। কয়েকদিন খুব ব্যস্ত আছি। মেয়েটা ফিরবে কিনা, খবরটা নিতেই হচ্ছে এবার। মিসেস ব্যানার্জিও খুব উত্তলা হয়ে পড়েছেন। দশ দিন ওঁর মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।" বায়রন সায়েব এতোক্ষণে ম্যানেজারের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমাকে বলতে হলো, তাঁর জন্যই এই সন্ধ্যাবেলায় আমি এখানে এসেছি।

'কিছু বলেছেন তিনি?" বায়রন প্রশ্ন করলেন।

"মার্কোপোলো খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, এ কথাটাই আপনাকে জানাতে বলেছেন।"

বায়রন এবার বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। চা-এর কাপটা পাশে স্যরিয়ে দিয়ে, পকেট থেকে একটা সস্তা দামের সিগারেট বার করে ধরালেন। বললেন, "বাবু, বড়ো ডাক্তার হওয়ার বাধা কী জানো? ইউ মাস্ট নট ফিল টু মাচ ফর দি পেসেণ্ট—রোগী সম্বন্ধে তুমি খুব বেশী অভিভূত হবে না। আমাদেরও তাই। বিপদে পড়ে এসেছো। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে চেষ্টা করলাম, এই পর্যন্ত। পারলাম ভাল, না পারলে বেটার লাক নেকস্ট টাইম। কিন্তু পারি না। জানো, চেষ্টা করেও পারি না। বেচারা মার্কোপোলো। ওর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়।"

একটা অশিক্ষিত, আধা-ভাঁড়, দরিদ্র এবং অখ্যাত ফিরিঙ্গির মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মুখের সিগারেট শেষ করে ভদ্রলোক আর একটা সিগারেট ধরালেন। বদ্ধ ঘরের মধ্যে অনেকটা ধোঁয়া জমে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

বায়রন বললেন, "তোমার অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু জানালাটা খুলে দিলে এখনই চারপাশের বাড়ির আধপোড়া কয়লার ধোঁয়া ঢুকে অবস্থা আরও খারাপ করে তুলবে।"

একটু থামলেন বায়রন। তারপর বললেন, "জীবনটাই ওই রকম। নিজের দুঃখের ধোঁয়ায় কাতর হয়ে, বাইরে গিয়ে দেখেছি সেখানে আরও খারাপ অবস্থা। আমার দুঃখকে ছাপিয়ে, সে-দুঃখ জীবনকে আরও দু'র্বিষহ করে তুলেছে। তুমি তো আইনপাড়ায় অনেকদিন ছিলে। জীবনকে তুমি তো শাজাহান হোটেলের রঙীন শো-কেসের মধ্য দিয়ে দেখোনি। মার্কোপোলো বেচারার ইতিহাস তোমার ভাল লাগবে।"

বায়রন সায়েবের মুখে সেদিন মার্কোপোলোর কাহিনী শুনেছিলাম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভেনিসের অভিজাত বংশীয় যে সন্তান অজানার আহ্বানে কুবলাই খানের দরবারে হাজির হয়েছিলেন, এ-কাহিনী আমার কাছে তার মতোই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল।

"বাইরে থেকে এঁকে দেখলে খুবই সুখী মনে হয়, তাই না?" বায়রন সায়েব জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "দু' হাজার টাকা মাইনের চাকরি।"

"দু' হাজার টাকা!" আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

“আজ্ঞে হ্যাঁ। যুদ্ধের পর ইউরোপে একটা জিনিস হয়েছে, কাজের মানুষ আর বেশী বেঁচে নেই। যারা আছে, তাদের সস্তা দামে পাওয়া যায় না। বড়ো হোটেল ভালোভাবে চালাতে গেলে ঐ মাইনেতে আজকাল ম্যানেজার পাওয়া যায় না। রেঙ্গুনে ভদ্রলোক এ ছাড়াও বিক্রির উপর কমিশন পেতেন।

কিন্তু মার্কোপোলোর জীবন চিরকাল কিছু এমন সুখের ছিল না। মিডল-ইস্টে এক গ্রীক সরাইওয়ালার ছেলে। বিদেশে বেশ কিছুদিন থেকে, সামান্য পয়সা জমিয়ে সরাইওয়ালা নবজাত শিশু এবং স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পথে দুঃখের অভিজ্ঞতা প্রস্তুত হয়ে ছিল। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা আরবের এক শহরে হাজির হলেন। রাত্রি কাটাবার জন্যে ওরা শহরের এক হোটেলে ঘর ভাড়া করলেন। কিন্তু সেই হোটেলের বিল তাঁদের শোধ করতে হয়নি; হোটেলের ঘর থেকে তাঁদের আর বেরিয়েও আসতে হয়নি। সেই রাত্রেই এক সর্বনাশা ভূমিকম্পে শহরটা ধ্বংস হয়ে যায়। দেশ-বিদেশের লোকেরা প্রকৃতির এই অভিশপ্ত শহরকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। কয়েক হাজার লোক নাকি সেবার ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

ঐ শহর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে একদল ইতালীয় পাদ্রী সেই সময় কাজ করছিলেন। তাঁবু ফেলে তাঁরা চোখের চিকিৎসা করেন। দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিদানের জন্য পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোই তাঁদের কাজ। দুটো রেডক্রুশ চিহ্নিত আম্বুলেন্সের মধ্যে মালপত্তর চড়িয়ে সার্কাস পার্টির মতো তাঁরা কোনো গ্রামে এসে হাজির হন। মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়ে। আকাশে পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। পোর্টেবল লোহার খাটগুলো জোড়া লাগিয়ে গোটা-পনেরো বিছানার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর-একটা ছোট তাঁবুর মধ্যে, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি হয় অপারেশন থিয়েটার।

স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানদের আগে থেকে খবর দেওয়া থাকে। ঢাক বাজিয়ে, পোস্টার বিলিয়ে, দুর-দূরান্তে জানিয়ে দেওয়া হয়—অন্ধজনকে আলো দেবার জন্য ফাদাররা এসে গিয়েছেন। নদীর ধারে গ্রামের তাঁবুতে তাঁরা দিন পনেরো থাকেন, বহু রকমের সর্বনাশা চোখের রোগের চিকিৎসা করেন, প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার করেন। তারপর কাজ শেষ হলে ক্যাম্প গুটিয়ে আবার অন্য গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যান।

ভূমিকম্পের খবর পেরে ক্যাম্প থেকে ইতালীয় ফাদাররা ছুটে এলেন। ধ্বংসস্তূপ সরাতে গিয়ে তাঁরা এক ইউরোপীয় শিশুকে আবিষ্কার করলেন। তারই অনতিদূরে শিশুর বাবা ও মার প্রাণহীন দেহ পাওয়া গেলো। পিতৃমাতৃহীন শিশুকে ফাদাররা সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ইতালীতে ফিরে নিজেদের অনাথ আশ্রমে মানুষ করতে লাগলেন।

শিশুর নাম কী হবে? প্রধান পুরোহিত বললেন, "এর ভ্রমণ যোগ আছে। কোথায় এর জন্ম, কোথায় একে আমরা আবিষ্কার করলাম, এবং কোথায় একে আমরা নিয়ে এলাম। এর একমাত্র নাম হতে পারে মার্কোপোলো।"

ভ্রমণের ভক্ত ছিলেন বোধহয় সেই ফাদার, আর সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও। অন্য কেউ-ই তেমন অপত্তি করলেন না। ফলে বিংশ শতকে ইতালীর ভৌগোলিক সীমানায় ভেনিসের মার্কোপোলো আবার জন্মগ্রহণ করলেন।

বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনাথ শিশুরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে ধর্মীয় পিতাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। মার্কোপোলোকে তাঁরা পাঠালেন কলেজ অফ হোটেলিং-এ। এ-দেশে যার আর কিছু হয় না, সে হোমিওপ্যাথি করে, শর্টহ্যাণ্ড শেখে, নয় হিন্দু হোটেল খুলে বসে। ওদেশে তা নয়। কন্টিনেণ্টে লোকেরা, বিশেষ করে সুইশ এবং ইতালিয়ানরা, হোটেল ব্যবসাকে হাল্কাভাবে নেয়নি। হোটেল বিজ্ঞানে পণ্ডিত হবার জন্য দেশ-বিদেশের ছাত্ররা এখানকার হোটেল-কলেজে পড়তে আসে। এই কলেজের ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি পাওয়া ছেলেদের পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে বড়ো বড়ো হোটেলে দেখতে পাওয়া যায়।

এই একটি ব্যবসা, যেখানে ইংরেজরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। নিজেদের রাজত্ব এই কলকাতা শহরেই, দু'-একটা ছাড়া সব হোটেল, এবং কনফেকশনারী দোকান কন্টিনেন্টের লোকদের হাতে ছিল। এবং যে দু'-একটার মালিকানা ইংরেজদের ছিল, তাদের উপরের দিকের কর্মচারী সবই সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স কিংবা ইতালি থেকে আসতো।

হোটেল-কলেজ থেকে পাস করে পিতৃমাতৃহীন নিঃসঙ্গ মার্কোপোলো চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পাস করলেই কিছু বড়ো চাকরি পাওয়া যায় না। অনেক নিচ থেকে আরম্ভ করতে হয়। আর কাজ শিখতেও সময় লাগে। হোটেলের লোকেরা বলেন, 'কিচেন জানতেই পাঁচ বছর লাগে। দু'' বছর শুধু মদের নাম-ধাম এবং জন্মপঞ্জী কণ্ঠস্থ করতে।

আরও দু'' বছর হিসেবনিকেশ শিখতে। তারপর বাকি জীবনটা মানব-চরিত্রের রহস্য বুঝতে বুঝতেই কেটে যায়।'

মার্কোপোলোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। চাকরির ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে মার্কোপোলো একদিন কলকাতায় হাজির হলেন। যে-হোটোলের আণ্ডারম্যানেজার হয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন, অনন্ত-যৌবনা কলকাতার বুকের উপর সে-হোটেল এখনও নিয়ন ও নাইলনের ভিড়ে উচ্চকিত হয়ে রয়েছে।

ধর্মভীরু এবং কৃতজ্ঞ মার্কোপোলো তাঁর জীবনদাতা রোমান ক্যাথলিক ফাদারদের ভোলেননি। প্রতি রবিবারে শত বাধা সত্ত্বেও চার্চে— গিয়েছেন : তাঁর জীবন রক্ষার জন্য পরম পিতার উদ্দেশে শত-সহস্র প্রণাম জানিয়েছেন। সময় পেলে ওরই মধ্যে ট্রেনে করে ব্যাণ্ডেল চার্চে পর্যন্ত হাজির হয়েছেন। ভার্জিন মেরীর মূর্তির সামনে রঙিন মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেছেন। হোটেলে থেকে এবং বার-এর তদারক করে যে জীবনের মধ্যে তিনি ঢুকে পড়তে পারতেন, তার থেকে মার্কোপোলো নিজেকে সর্বদা সযত্নে দূরে স্যরিয়ে রেখে দিয়েছেন।

ঐ সময়েই একজন মিস মনরোর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। নিজের হোটেলের হৈ-হৈ হট্টগোল থেকে খানিকক্ষণ শান্তি পাবার জন্য মার্কোপোলো পার্ক স্ট্রীটের একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় রাত্রে খেতে গিয়েছিলেন। এখানেই সুশান মনরো গান গাইছিল।"

মার্কোপোলোর গল্প বলতে বলতে বায়রন সায়েব এবার একটু থামলেন। টেবিল থেকে অ্যাটাচি কেসটা টেনে এনে, একটা পরোনো খবরের কাগজের টুকরো তার ভিতর থেকে বার করলেন। টুকরোটা সময়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো অনেক জায়গায় ঘোরো। এই মেয়েটিকে কোনোদিন কোথাও দেখেছো?"

জীবনে যতো বিজাতীয় মেয়ে দেখেছি, তাদের সঙ্গে ছবিটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই অমন কাউকে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

বায়রন বললেন, "অনেক কষ্টে ছবিটা স্টেটসম্যান অফিস থেকে যোগাড় করেছি। সেই সময় একদিন রেস্তোরাঁর মালিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই সংখ্যাটা টাকা দিয়েই কিনতে হলো।"

এই পুরোনো খবরের কাগজ থেকে সুশান মনরোর সমস্ত রূপটা মানসপটে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। "ভদ্রমহিলা দেখতে এমন কিছু সুন্দরী ছিলেন না," বায়রন সায়েব বললেন। কিন্তু মার্কোপোলোর মনে হলো, মৃদলতার একটা ছন্দিত ভঙ্গী যেন তাঁর চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে।

ডিনার বন্ধ করে মন দিয়ে সুশান মনরোর গান শুনলেন মার্কোপোলো। গান শেষ হলে নিজের টেবিলে গায়িকাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

"কেমন গান শুনলেন?" মিস মনরো ওঁর টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন।

"চমৎকার! একদল বিশিষ্ট অন্ধ অতিথির সামনে, আপনি যেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের এক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন।" মেয়েটি হাসলো। আস্তে আস্তে বললে, "কী করবো বলুন, সমজদার শ্রোতা কোথায় পাবো?"

"এই শহরের সব লোক কি কালা?" মার্কোপোলো হেসে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কালা, কিন্তু কানা নয়! চোখটা খুব সজাগ, দৃষ্টি খুবই প্রখর। এখানকার রেস্তোরাঁ মালিকরা তা জানেন, তাই শ্রোতব্য শব্দ থেকে গায়িকার দ্রষ্টব্য অংশের উপর বেশী জোর দেন।"

দু'জনের জন্যে দু' বোতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে, মার্কোপোলা হেসে ফেলেছিলেন। মেয়েটিকে বলেছিলেন, "কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি চমৎকার গাইতে পারেন; ইউরোপে এমন গান গাইলে আপনার কদর হতো!"

"আপনাদের হোটেলে কোনো সুযোগ পাবার সম্ভাবনা আছে?" মিস মনরো এবার জিজ্ঞাসা করলেন।

মার্কোপোলো চমকে উঠলেন, "আমাকে চেনেন আপনি?"

করুণে হেসে মেয়েটি বললে, "ছোটো জায়গায় গান গাই বলে, বড়ো জায়গার খবর রাখবে। না?"

মার্কোপোলো এবার মুষড়ে পড়লেন গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমাদের হোটেল যাঁরা চালান এবং সেই হোটেলে যাঁরা আনন্দ করতে আসেন,

মেড ইন ক্যালকাটা কোনো জিনিসের সঙ্গেই তাঁরা সম্পর্ক রাখেন না। আমাদের হোটেলে নাচবার জুনো, গাইবার জন্যে যাঁরা আসেন, তাঁরা মেড ইন ইউরোপ, কিংবা মেড ইন ইউ-এস-এ। এমন কি, মেড ইন টার্কী বা ইজিপ্ট হলেও তাঁদের আপত্তি নেই; কিন্তু কখনই কলকাতা নয়।"

মেয়েটি গান গাইবার জন্য আবার উঠে পড়েছিল। বিয়ারের বোতল দু'টো স্যরিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিল, "আপনার কোয়ায়েট ডিনারের যদি কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকি, তবে তার জন্যে ক্ষমা করবেন।"

মার্কোপোলো সেই দিনই তাঁর মধ্যবিত্ত হৃদয়টি পার্ক স্ট্রীটের অখ্যাত সুশান মনরোর কাছে বন্ধক দিয়ে ফেলেছিলেন।

পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরায় তাঁদের দু'জনের আবার দেখা হয়েছে।

মার্কোপোলো সুশান মনরোর মনের ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করেছেন। "আপনি কোনোদিন কোনো ইস্কুলে গান শেখেননি? বলেন কী? র' নেচার। নিজের খেয়ালে নেচার এমন সঙ্গীতের কণ্ঠ সৃষ্টি করেছে?" মার্কোপোলো অবাক হয়ে গিয়েছেন।

"শিখবো কোথা থেকে? গানের ইস্কুলে যেতে গেলে তো পয়স্যর দরকার হয়" সুশান বলেছিল।

মার্কোপোলো ক্রমশ সব শুনেছিলেন। প্রথমে পার্ক' স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয়, পরে সুশানের ঘরে বসে মার্কোপোলো শুনেছেন, সুশানের ভাগ্য অনেকখানি মার্কোপোলোর মতো। বাবা-মা কেউ ছিল না। এস্-পি-সি-আই মানুষ করেছিল। অনাথা মেয়েকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্যে ওঁরা কোনোরকম কার্পণ্য করেননি। সাবালিকা হয়ে সুশান নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। প্রথমে নিউ মার্কেটের কাছে এক সুইশ কনফেকশনারীর দোকানে কেক বিক্রি করতো। কিন্তু গানের নেশা। প্রচারের লোভ। বিনা পয়সায় রাতে রেস্তোরাঁয় গান গাইতেও সে প্রস্তুত। অনেক কষ্টে সুশান এইখানে ঢুকেছে। প্রথমে বেশ কষ্ট হতো। সারাদিন দোকনে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেক বিক্রি করে সোজা এখানে চলে আসতে হয়। এখানেই জামা কাপড় বদ্'লিয়ে সে তৈরি হয়ে নেয়; বাড়িতে ফিরে যাবার সময় থাকে না। অথচ এমন প্রমোদ নিকেতন যে 'লেডিজ টয়লেট'-এর কোনো

ব্যবস্থা নেই। একজন চাপরাশীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বারোয়ারি ল্যাভেটরি ব্যবহার করতে হয়। দু'র্গন্ধে মাঝে মাঝে বমি হয়ে যাবার অবস্থা হয়।

"এরা তোমায় কিছুই দেয় না?" মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করেছেন। 'রাত্রের খাওয়াটা পাওয়া যায়। আর মাসে দশ টাকা।" সুশান বলেছে। 'মাত্র দশ টাকা! ডিসগ্রেসফল। ছারপোকার জাত এরা!" মার্কোপোলো উত্তেজিত হয়ে বলেছেন।

'তা-ও বা ক'দিন?" সুশান বিষণ্নভাবে বলেছে।

'মানে?" মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করেছেন।

"এখানে যে গান গাইতো, তার নাম লিজা। পা ভেঙে সে বিছানায় পড়ে রয়েছে, তাই আমাকে গান গাইতে দিয়েছে। ডাক্তার লিজার পায়ের প্লাস্টারটা খুলে দিলেই আমার দিন শেষ হয়ে যাবে।"

সুশানের জন্য মার্কোপোলো দুঃখ অনুভব করেছেন। ওরও যে বাবা-মা ছিল না, ভাবতেই সুশানের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছেন। রূপ তার তেমন ছিল না। যৌবন হয়তো ছিল; কিন্তু কেবল যৌবনের সেই পাতলা দড়ি দিয়ে মার্কোর মতো সমুদ্রগামী জাহাজকে বেঁধে রাখা সুশানের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

কিন্তু মার্কোপোলো নিজেই ধরা দিলেন। বাঁধা পড়লেন। স্বেচ্ছায় একদিন সুশানকে বধুরূপে হোটেলে এনে তুললেন।

এই সুশানের জন্যই মার্কোপোলোকে শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়তে হলো। এখানে ওকে সবাই জেনে গিয়েছে। এখানে থেকে ওর পক্ষে বড়ো হওয়া সম্ভব নয়। পার্ক—স্ট্রীটের রাস্তায় যে একবার নিজের গান বিক্রি করেছে, তার পক্ষে চৌরঙ্গীর জাতে ওঠা আর সম্ভব নয়।

চেষ্টা করে রেঙ্গুনে চাকরি যোগাড় করলেন মার্কোপোলো। ম্যানেজারের চাকরি। এবার ওঁদের আর কোনো দু'শ্চিন্তার কারণ থাকবে না। সেখানের কেউ আর সুশানের পুরনো ইতিহাস খুঁজে পাবে না।

কলকাতার হোটেলওয়ালারা মার্কোপোলোকে বলেছিল, "এতো ব্যস্ত কেন, এখানেই একদিন তুমি ম্যানেজার হবে।"

মার্কোপোলো হেসে ফেলেছিলেন। "কলকাতা আমার শ্বশুরবাড়ি বটে, কিন্তু বাপের বাড়ি নয়। আমার কাছে রেঙ্গুনও যা কলকাতাও তাই।"

কিছুদিন ওখানে মন্দ কাটেনি। সুশান তার স্বপ্ন আর মার্কো তাঁর চাকরি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হোটেলটাকে ছবির মতো করে সাজিয়ে তুলবেন। বিদেশী আগন্তুকরা এসে অবাক হয়ে যাবেন। বার্মাতে যে এমন হোটেল থাকা সম্ভব, ভেবে পাবেন না।

কিন্তু রেঙ্গুনের আকাশে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান দেখা গেলো। জাপানীরা আসছে।

বার্মা ইভাক্যুয়েশন। এমন যে হতে পারে, কেউ জানতো না। এমন অবস্থার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না—মার্কোপোলোও না।

শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত রাস্তায় হারিয়ে ওঁরা দু'জন কলকাতায় ফিরে এলেন। এর আগেও, শৈশবে মার্কোপোলো একবার রিফিউজি হয়েছিলেন। কিন্তু তখন অন্যজনের করুণায় জীবন রক্ষা হয়েছিল। এখন নিজের ছাড়াও আর একটা জীবন—সুশানের জীবন — তাঁর উপর নির্ভর করছে।

যাঁরা একদিন তাঁকে রাখবার জন্য পেড়াপীড়ি করেছিলেন, তারাই আজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তার উপর ইতালীয় গন্ধ আছে বলে অনেকে নাক সিঁটকাল। ইতালীয় বলে মার্কোকে কলকাতার লোকেরা হয়তো জেলখানায় পাঠাতো, যদি না তাঁর পকেটে গ্রীক পাসপোর্ট থাকতো। ফাদাররা ঐ একটি দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন—নাম পাল্টালেও, তাঁরা মার্কোর জাত পাল্টাননি।

কলকাতার বাজারে মার্কোপোলোর দাম নেই; কিন্তু সুশানের চাহিদা বেড়েছে। হাজার হাজার ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যে দেশটা ভরে গিয়েছে। তারা রেস্তোরাঁয় খেতে চায়; এবং খেতে খেতে গান শুনতে চায়।

মার্কোপোলো আপত্তি করেছিলেন। "এইভাবে গান গাইলে, তুমি কোনোদিন আর জাতে উঠতে পারবে না। তোমাকে যে অনেক বড়ো হতে হবে। একদিন বিশ্বসুদ্ধ লোক তোমার গান শুনতে চাইবে; তোমার রেকর্ড ঘরে ঘরে বাজবে।"

সুশান বললে, “কিন্তু ততদিন? ততদিন কি না খেয়ে থাকবো? যারা একদিন দশ টাকা দিতে চায়নি তারাই পাঁচশ টাকা নিয়ে সাধাসাধি করছে। লিজা পালিয়েছে ওখান থেকে। গান না থাকলে, মিলিটারীরা ক্ষেপে যাবে।” বাধ্য হয়েই রাজী হয়েছিলেন মার্কোপোলো। যে-স্বামীর খাওয়াবার মুরোদ নেই, তার তো ফোঁস দেখিয়ে লাভ নেই।

মার্কোপোলো নিজের চাকরি খুঁজছেন। আর সুশান গান গাইছে। একদিন সুশান বললে, “একটা ঘড়ি কিনেছি জানো?” “টাকা পেলে কোথায়?”

সুশান বলে, “টাকার অভাব নেই। আমার গান শুনে খুশী হয়ে একদল আমেরিকান অফিসার সেদিন চাঁদা তুলে ঘড়ির দাম যোগাড় করে দিয়েছে।" মার্কোপোলো বলেছেন, “হু”

“এতো রাত করে বাড়ি ফেরো তুমি, আমার ভয় লাগে। মার্কোপোলো বলেছেন।

“আগে লাইসেন্স ছিল দশটা পর্যন্ত। এখন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। রাত একটা পর্যন্ত গান গাইতে হয়।"

“তোমার কষ্ট হয় না’ সুশান, এমন গান গাইতে তোমার ভাল লাগে?” মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করেন।

“কিন্তু ওরা যে টাকা দেয়। অনেক টাকা দেয়, জানো?” ক্লান্ত সুশান উত্তর দিয়েছে।

সুশান বলেছে, “তোমার জন্য একটা চাকরি যোগাড় করছি। করবে? লিলুয়া মিলিটারী ক্যানটিনের ম্যানেজার। আমার স্বামী শুনে ওরা খুব আগ্রহ দেখিয়েছে। মেজর স্যানন আগামী কাল তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করতে আসবেন।”

মার্কোপোলোর বাধাবন্ধহীন আদিম গ্রীক রক্ত যেন গরম হয়ে উঠেছিল! "তোমার-গান-গাওয়া-পরিচয়ের চাকরি? করুণা?"

“করুণায় এতো ঘৃণা কেন? করুণায় তো ছোটবেলা থেকে এতো বড়ো হয়েছো।” সুশান সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল।

উত্তর দেননি মার্কোপোলো, মেজর স্যাননের আসবার সময় বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন। এক বোতল বীয়ার নিয়ে মার্কোর জন্য অপেক্ষা করে মেজর স্যানন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন।

কিছুদিন পরে সুশান বলেছে, "দুপুরেও একটা সুযোগ পাচ্ছি। লাঞ্চের সময় গাইবার জন্য ম্যানেজমেন্ট ধরাধরি করছে। আরও শ' তিনেক টাকা বেশী দেবে।

মার্কোপোলো উত্তর দেননি। পরে একদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, "এইজন্যই কী তুমি গানের সাধনা করেছিলে, সুশান?"

"যারা গান গায়, তাদের স্বপ্ন কী?" সুশান পাল্টা প্রশ্ন করেছে। এবং মার্কোর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই উত্তর দিয়েছে, "তারা চায় জনপ্রিয়তা। তা আমি পেয়েছি। আমি পপুলার।"

একটা চাকরির সন্ধানে মার্কোপোলো পাটনায় গেলেন। চাকরি পেলেন, কিন্তু সেখানে মন ভরলো না। পাটনা থেকে সোজা করাচী। ওখানকার একটা বড়ো হোটেলে অবশেষে চাকরি পাওয়া গিয়েছে।

চাকরি পেয়ে করাচী থেকে সুশানকে মার্কোপোলো চিঠি লিখেছেন। সুশান লিখেছে, 'দিন-রাত্তির যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে জানি না। সব সময় শুধু গান গাইছি। পৃথিবীর লোকেরা এতো গান ভালবাসে!'

মার্কোপোলো লিখেছেন, 'এখানকার পরিবেশটা সুন্দর। তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। তাছাড়া শহর কলকাতা থেকে অনেক সাজানো-গোছানো। জাপানী বোমা পড়বার ভয়ও নেই।'

সুশান লিখেছে, 'কলকাতার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। যারা একদিন দশ টাকা দিতো না, তারাই হাজার টাকা দিচ্ছে। আর একটা রেস্টুরেন্ট আরও বেশী লোভ দেখাচ্ছে।'

মার্কোপোলো লিখেছেন, 'তোমার জন্য মন কেমন করছে!' সুশান উত্তর দিয়েছে, 'ছুটি নিয়ে চলে এসো। বড়োজোর কয়েকদিনের মাইনে দেবে না।

করাচী থেকে চিঠি এসেছে, 'নতুন চাকরি; ছুটি নেবো বললেই নেওয়া যায় না। হোটেলে অতিথি বোঝাই। অথচ দায়িত্বসম্পন্ন লোকের অভাব। তার থেকে তুমি চলে এসো। গাইয়েদেরও তো বিশ্রাম দরকার!'

কলকাতা থেকে উত্তর গিয়েছে, 'তোমার চিঠি পেলাম। আমেরিকান বেস-এ গান গাইবার জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে ছ'সপ্তাহের জন্য ভ্রমণে বেরোচ্ছি। স্যরি।'

ছুটির চেষ্টা করেছেন মার্কোপোলো। কিন্তু পাননি। যখন ছুটি মিললো, তখন একটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে।

ছুটিতে কলকাতায় এসে মার্কোপোলো অবাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর বাড়িঘরদোর কিছুই চেনা যাচ্ছে না। যে-বাজারে গাড়ির একটা টায়ার পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না, সেই বাজারে গাড়ি কিনেছে সুশান!

"আমাকে জানাওনি তো।" মার্কোপোলো বলেছেন।

"ওহো স্যরি, তোমাকে জানানো হয়নি। খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছি। মেজর স্যানন যোগাড় করে দিয়েছেন।"

নিজের চোখে মার্কোপোলো যা দেখলেন, তা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। টাকা...সস্তা কেরিয়ার...সুশানের কাছে ঐগুলোই বড়ো হলো? নিজের শিল্পের কথা, নিজের সাধনার কথা একবার ভেবে দেখলে না।

কিন্তু উপদেশ বর্ষণ করে লাভ কী? বাঘিনী রক্তের আস্বাদ পেয়েছে। সুশানের বাড়ির সামনে মিলিটারী অফিস্যরদের গাড়িগুলো প্রায় সর্বদাই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একান্তে সুশানকে ডেকে মার্কোপোলো বলেছেন, "তুমি কি আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখেছো?"

"নিশ্চয় দেখেছি, রোজই দেখছি। একটু মোটা হয়েছি, এই যা।" সুশান উত্তর দিয়েছে।

"তোমার চোখ দু'টো?"

"একটু বসে গিয়েছে। এমন পরিশ্রম করলে ম্যাডোনারও চোখ বসে যেতো।"

"তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, আমাকে জানতে হবে সুশান।" মার্কোপোলো গম্ভীরভাবে বলেছেন।

"ভেরি ব্রাইট প্ল্যান," সুশান উত্তর দিয়েছে। "রেস্তোরাঁর চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। ওতে লস। তার থেকে থিয়েটার রোডের এই বাড়িটাতে বসে বসে গান গাইবো, সঙ্গে কিছু খাবার ব্যবস্থা থাকবে। মেজর স্যানন একটা বার লাইসেন্স যোগাড় করে দেবেন কথা দিয়েছেন। যাকে তাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দেবো না। শুধু সিলেক্টেড গেস্টদের আপ্যায়ন করবো।

আর তুমি যদি সব দেখাশোনার দায়িত্ব নাও, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে গান নিয়ে পড়ে থাকতে পারি।”

“হোয়াট? সুইস কলেজ অব্‌ কেটারারস থেকে পাস করে আমি কলগার্লের ম্যানেজার হবো! গড হেল্প মি!”

সেই রাত্রেই মার্কোপোলো বুঝেছিলেন, আর হবে না।

ঘৃণায় ধর্মভীরু মার্কোপোলোর সর্বাঙ্গ রী রী করে উঠেছিল। গভীর রাত্রে থিয়েটার রোডের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে পরমপিতাকে মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করেছেন, “কেন এমন হলো? এমন শাস্তি তাকে কেন পেতে হলো?”

ভোরবেলায়, ব্রেকফাস্ট টেবিলে মার্কোপোলো সুশানকে জানিয়ে দিলেন, “আর এক সঙ্গে নয়, এবার ছাড়াছাড়ি।"

“ডাইভোর্স’!” সুশান প্রথমে রাজী হয়নি। “আমার হাজব্যান্ড আছে বলে, আনডিজায়ারেবল এলিমেন্টরা ডিসটার্ব করতে সাহস পায় না। আমেরিকান মিলিটারী পুলিসও আমার ফ্ল্যাটে অফিসারদের যাতায়াতে বাধা দেয় না। আমার সম্মানজনক পেশাটা নষ্ট না করলে, তোমার বুঝি রাতে ঘুম হচ্ছে না?”

"বিচ্ছেদ তো হয়েই রয়েছে। এবার কেবল আইনের স্বীকৃতি।” মার্কোপোলো বলেছেন।

“তার মানে তুমি কোর্টে আমার নামে অ্যাডালটারীর অভিযোগ আনবে? তুমি বলবে, আমি পরপুরুষে আসক্ত?"

এ-দেশের চার্চে বিয়ে হলেও, এ-দেশের আইন জানবার সময় বা সুযোগ কোনোটাই মার্কোপোলোর ভাগ্যে জোটেনি। এদিকে ছুটি ফুরিয়ে আসছে। যা-হয় একটা কিছু করে, এই পাপের শহর থেকে চিরদিনের মতো পালিয়ে যাবেন বিদেশী মার্কোপোলো।

আইনের পরামর্শ নিলেন তিনি। ডাইভোর্স চাইলেই পাওয়া যায় না। এর জন্য কাঠ খড় ছাড়াও সময় এবং অর্থ পোড়াতে হবে। যিনি বিবাহ-বিচেছদ প্রার্থনা করবেন তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে, প্রয়োজনীয় সাক্ষীসাবুদ কোর্টে হাজির করতে হবে।

“কতদিন সময় লাগবে?” মার্কোপোলো খোঁজ নিয়েছিলেন। “তা কেউ বলতে পারে না। দেড় বছর দু’ বছরও লেগে যেতে পারে,” এটর্নি বলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, কাজের সুবিধার জন্যে সুশানই মামলাটা দায়ের করবে। স্বামীর বিরুদ্ধে সে চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনবে। তাতে সুশানের সম্মানও রক্ষা পাবে ; আর মার্কোও যা চাইছেন তা পাবেন। সুন্দর কর্মক্ষেত্র থেকে তিনি মামলায় কোনো অংশ গ্রহণ করবেন না, ফলে সহজেই একতরফা ডিক্রি হয়ে যাবে।

যাবার আগে সুশানের সঙ্গে মার্কো সব আলোচনা করেছিলেন। সুশানের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। বিবাহিত ছাপটা থাকলে এ-কাজের সুবিধে হয়। সুশানের হাত দু'টো নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে মর্কো বলেছেন, "যদি কোনোদিন তোমাকে ভালবেসে থাকি তবে তার প্রতিদানে তুমি আমাকে এইটকু অনগ্রহ কোরো।"

সুশান বলেছে, "কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার কী অভিযোগ আনবো? তোমার নামের সঙ্গে কার নাম জড়াবো?"

মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন মার্কো। এমন কোনো মহিলা আছেন, যিনি ডাইভোর্স—মামলায় কো-রেসপন্ডেন্ট হতে রাজী হবেন?

শেষ পর্যন্ত সুশানই বলেছে, "লিজাকে বলে দেখতে পারি। ওর তো সমাজে সম্মান হারানোর ভয় নেই! তাছাড়া, এক সময় ওর অনেক উপকারও করেছি।" কয়েকদিন পরে সুশান বলেছে, "লিজার সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, যাঁর সঙ্গে গোপন অভিসারের অভিযোগ আনবে তাঁকে একটু দেখে রাখতে চাই!"

ভোরবেলায় সুশানকে সঙ্গে করে মার্কো লিজার বাড়িতে হাজির হয়েছেন। সারারাত জেগে থেকে, লিজা তখন সবেমাত্র ঘুমোতে আরম্ভ করেছিল। ওদের ডাকে সে ঘুম থেকে উঠলো।

দু''জনকে এক সঙ্গে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছে, "ও-বাবা, পতিব্রতা স্ত্রী এবং চরিত্রহীন স্বামী জোড়ে হাজির!"

মার্কো তখন লিজাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন! লিজা বলেছে, "বোঝাতে হবে না। একটা পরীক্ষায় আগেই পাস করে এসেছি। আমার নিজের ডাইভোর্স কেস্টা তো এই কোর্টেই হয়েছিল।"

সুশান বলেছে, "আইনের অতো মারপ্যাঁচ বুঝি না। কী করতে হবে বলে দাও।"

মার্কো এবার লিজাকে বললেন, "সুশান আদালতে অভিযোগ আনবে যে সে-ই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।"

সরু গলায় লিজা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। "সেটা তো মিথ্যে নয়। ও-ই তো আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে।" মার্কোপোলো বললেন, "তারপর কয়েকটা বিশেষ দিনে – ধরুন চার কিংবা পাঁচদিন—সুশান দিনগুলো তোমার নোট বুকে লিখে নাও, আমাকে এইখানে.... পরের কথাগুলো বলতে মার্কোর সঙ্কোচ হচ্ছিল।

"রাত্রিবাস করতে দেখা গিয়েছিল? এই তো," লিজা এবার হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

"আর আপনাকে আমি কয়েকটা চিঠি লিখবো, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে। আপনি তার ভাষা সম্বন্ধে কিছু মনে করবেন না। শুধু চিঠিগুলো পেয়েই খামসমেত সুশানের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ঐগুলোই হবে প্রয়োজনীয় প্রমাণ। আর আপনি যদি আমাকে দু' একটা লেখেন তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আর কোনো চিন্তারই কারণ থাকে না।" মার্কো কোনোরকমে বললেন।

"আর কিছু?" লিজা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"আর, কোনো রেস্তোরাঁয় যদি আমাদের কিছুক্ষণ একসঙ্গে দেখা যায়, মন্দ হয় না।" মার্কোপোলো মুখ বিকৃত করে বললেন।

লিজার হাসি এবার বিভৎস রূপ ধারণ করলো। হাসতে হাসতে সে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। বালিসে মুখে গুঁজে সে হাসি চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর কাশতে কাশতে বললো, "পুরো অভিনয়। ভেরি ইন্টারেস্টিং!"

উত্তর না দিয়ে মার্কো গম্ভীরভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লিজা বললে, "বেশ, আজই সন্ধ্যেতে দু''জনে কিছুটা সময় কাটানো যাবে।"

মার্কো বললেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনেই আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।"

লিজা এবার সোজা হয়ে বসলো। কী যেন ভাবলো। তারপর থিয়েটারী কায়দায় বললে, "হে কৃতজ্ঞ পুরুষোত্তম, তুমি কি অনুগ্রহ করে এক মিনিটের জন্য এই অধমা

নারীর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করবে তোমার সর্বগুণান্বিতা সাধ্বী স্ত্রী মুহূর্তের মধ্যেই তোমার অনুগামিনী হবেন।”

দরজার বাইরে মার্কো কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এক মিনিটের জায়গায় প্রায় দশ মিনিট কেটে গেলো। তারপর সুশান ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাড়িতে এসে সুশান জিজ্ঞাসা করলো, “কত টাকা তুমি খরচ করতে পারবে?"

“আমার আর্থিক অবস্থার কথা তোমার তো কিছু জানতে বাকি নেই।” মার্কোপোলো বললেন।

“লিজা টাকা চাইছে। বলছে, শুধু শুধু এই সব গণ্ডগোলে সে কেন যাবে?” সুশান বললে।

মার্কো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার পক্ষে কোনোরকম সাহায্য করা—"

সুশান রেগে উঠলো। “তুমি আমার মত জানো। তুমি করাচীতে রইলে, আমি এখানে —বিচ্ছেদ তো এমনিই হলো। তা সত্ত্বেও তুমি যদি ডাইভোর্সের লাক্সারি উপভোগ করতে চাও, তাহলে তোমাকেই টাকা খরচ করতে হবে।”

“কত টাকা চাইছে?” মার্কো জিজ্ঞাসা করেছেন। “দু’ হাজার।”

এমন অবস্থায় কোনোদিন যে তাঁকে পড়তে হবে, মার্কো কখনও ভাবেননি। বিকেল বেলায় একটা রেস্তোরাঁয় বসে বসে মার্কো গোটা কয়েক কাল্পনিক গোপন চিঠি লিখেছেন লিজাকে। পৃথিবীতে আইনের নামে কী হয়, ভাবতে মার্কোর দেহটা রী রী করে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় লিজার বাড়িতে গিয়ে মার্কো কড়া নেড়েছেন। ভিতর থেকে লিজা বললে, “ও ডার্লিং, তুমি তা হলে এসেছো! আর এক মিনিট। আমি প্রায় রেডি।”

সেই এক মিনিট ওয়েলেসলীর ওই নোংরা গলিটার বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মার্কো নিজেকে অভিশাপ দিয়েছে।

দরজা খুলে লিজা এবার বেরিয়ে এলো। লিজাকে যেন চেনাই যায় না। সত্যিই বারোয়ারি অভিসারে চলেছে যেন সে। কী উগ্র প্রসাধন? সস্তা সেন্টের গন্ধে গা ঘুলিয়ে

ওঠার অবস্থা। পুরো এক টিন পাউডারই লিজা বোধহয় আজ মুখে মেখেছে। তার উপর আবার লাল রং।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলেন মার্কো। ট্যাক্সিতে চড়ে বললেন, "কোথায় যাবেন? চাঙ্গুয়া?"

"না। আজ বড়ো কোথাও যাবো," লিজা বলেছে।

"তাহলে গ্র্যাণ্ড কিংবা গ্রেট ইস্টার্নে?" মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করেছেন। লিজা আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লো। আজ লিজার মন নাচছে শাজাহান হোটেলের জন্য। সৈন্যবাহিনীর লোকরা ডাইনিং হল্‌টা হয়তো বোঝাই করে রেখে দিয়েছে, তবু চেষ্টা করে একটা জায়গা করে নেওয়া যাবে।

হোটেল শাজাহান। অনেকদিন আগে লিজা ওখানে এসেছিল। সত্য বলে মনে হয় না, যেন ড্রিম ল্যাণ্ড। সাত টাকা আট আনা একটা ডিনারে নেয় বটে, কিন্তু অদ্ভুত। একটা মেনকার্ড চুরি করে এনেছিল লিজা। কতদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিজা সেই কার্ডটা পড়েছে— Pamplemous au Sajahan: Consomm Ajoblanco Beckti Allemby, Baron d'vos Roti, Gateau Citron, Cafe Noir. আরও কত কি।

শাজাহান হোটেলের নীলাভ আলোয় রাত্রি তখন দিন হয়ে উঠেছিল। হোটেলের অতিথি হয়ে কেমন যেন লাগছিল। অভিনেতা যখন দর্শক হয়ে নাটক দেখেন তখন মনের অবস্থা বোধহয় এমনই হয়।

মদ খেতে চেয়েছিল লিজা। মদের অর্ডার দিয়েছিলেন মার্কোপোলো। ৎবঁ ককটেল— জিন, ফ্রেঞ্চ ভারমুথ, ইটালিয়ান ভারমুথ আর কমলালেবুর রস। সাড়ে পাঁচ টাকা পেগ।

ব্রঁ ককটেল শেষ করে কাঁচা হুইস্কি। মদ খেতে খেতে লিজা বলেছিল, "আই এম স্যরি। আপনাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারলাম না। টাকাটা আমার প্রয়োজন। আমার দিনকাল সুশানের মতো ভাল নয়। আর তা ছাড়া, সুশানের যখন অনেক টাকা রয়েছে, তখন কেন সে দেবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যেমন বলেছেন ঠিক তেমন কাজ করবো।"

লিজা এবার মার্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে হাসলো। হাসতে তবে যেন ওর বয়সটা বোঝা গেলো। ওর চোখের কোলে কালো দাগগুলো দেখলে, যত বয়স মনে হয়, আসলে তার থেকে অনেক বয়স কম।

লিজা নিজেই বললে, "সেই যে পিছলে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ছিলাম এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম না। মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। বেশীক্ষণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইতে পারি না। সেদিন একজন কাস্টমার চিৎকার করে কী বললেন, জানেন?"

"কী?" ইচ্ছে না থাকলেও মার্কোকে জিজ্ঞাসা করতে হলো।

"খুড়ী এবং বুড়ী। বেগলী কাস্টমারগুলো নরকের ডাস্টবিন।"

আর একটু হুইস্কি গলায় ঢেলে লিজা বললে, "ঠিক করেছি, এবার থেকে কর্পোরেশনের বার্থ সার্টিফিকেটটা সব সময় বডিসের মধ্যে রেখে দেবো। কেউ কিছু বললে, সার্টিফিকেটটা বার করে মুখের উপর ছুড়ে দেবো।" উত্তর না দিয়ে মার্কো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনি হয়তো জানেন না, এই কেসের জন্যে আমি একটা পয়সাও সুশানের কাছ থেকে নিচ্ছি না।"

"সিলি ওল্ড ফুল। তুমি এখনও বোকা রয়ে গেছ। তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।" মদের গেলাসটা চেপে ধরে লিজা বলেছিল।

মার্কো সেই রাত্রেই লিজাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আর সামান্য যা আছে, তা এটর্নিকে দিয়ে যেতে হবে। ওখানে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার কিছু পাঠাবো।"

মামলার খরচের টাকাও এটর্নির ঘরে জমা পড়েছিল। চরিত্রহীনতার অভিযোগে মার্কোপোলোর বিরুদ্ধে সুশানের বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন আদালতে পেশ করাও হয়েছিল।

আবেদন সই করবার দিনে এটর্নি বলেছিলেন, "একটা ব্যাপারে আপনাদের সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন। পিটিশনে বলতে হয়, ডাইভোর্স পাবার জন্য দু'পক্ষের মধ্যে কোনো যোগ-সাজশ নেই। আমরা বলি 'কলিউশন'। যদি কোর্ট একবার সন্দেহ করেন এর পিছনে সাজানো কোনো ব্যবস্থা আছে তা হলেই বিপদ। কেউ যেন না জানে, মামলা, করবার জন্য

সুশানের টাকা আপনি দিয়ে গিয়েছেন। আজ থেকে আমরা আমাদের মক্কেল হিসেবে সুশানকেই শুধু চিনি ; আপনাকে আমরা দেখিনি, জানি না। ভুলেও আমাদের কাছে কোনো চিঠি-পত্তর লিখবেন না।”

এই পর্যন্ত বলে বায়রন একটু থামলেন। এলিয়ট রোড থেকে বেরনো একটা নোংরা গলির অপরিচিত পরিবেশে যে বসে আছি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আধুনিক মার্কোপোলোর দুঃখের ইতিহাসের ছবি মেট্রো সিনেমাতে দেখছিলাম।

বায়রন সায়েব বললেন, “এর পরের ঘটনার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। মার্কোপোলো যদি তখন আপনার সায়েবের কাছে যেতেন।”

“লাভ হতো না।” আমি বললাম। “স্বামী-স্ত্রীর যোগ-সাজশের মামলা তিনি কিছুতেই নিতেন না।”

‘তা হয়তো নিতেন না। কিন্তু অন্য একটা পথ বাতলে দিতেন।” বায়রন সায়েব বললেন।

"তা হয়তো পারতেন।” আমি বললাম ।

“যা হোক, কাটা দু’ধের জন্য শোকাশ্রু, বিসর্জন করে লাভ কী? যা হয়েছিল তাই বলি—

কলকাতার ব্যবস্থা মোটামুটি পাকা করে মার্কোপোলো নিজের কর্মস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে পাঁচশ টাকা যোগাড় করে লিজাকে পাঠিয়েছিলেন; এবং অদুর ভবিষ্যতে বাকিটা পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চিঠি লিখে খোঁজ নেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এমন কোনো বন্ধুও ছিল না, যে সমস্ত খবরাখবর জানাবে।

সুশান অবশ্য একবার চিঠি দিয়েছিল। জানিয়েছিল, আর একটা ভাল গাড়ি কিনেছে সে। এবং যে কাজের জন্য মার্কো এতো উদ্বিগ্ন আছে, তাও এগুচ্ছে। তবে এটর্নি কিছু টাকা চেয়েছে।

ধার করে মার্কো সুশানের ঠিকানায় কিছু টাকাও পাঠিয়েছিলেন। তার পরেই বিপদটা ঘটলো।

তাঁকে হঠাৎ পুলিসে ধরলো। ওঁর ইটালিয়ান গন্ধ এতোদিন পরে হঠাৎ কর্তৃপক্ষকে আবার সচেতন করে তুললো। আর ইটালীর সঙ্গে মিত্রপক্ষের তখন কী রকম সম্পর্ক সে তো জানোই।

যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল মার্কোপোলোকে। জীবনে ধিক্কার জন্মে গিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে সোজা ফিরে গিয়েছেন ইটালীতে।

অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানসিক অবস্থা মার্কোর তখন ছিল না। রিভিয়েরায় ছোটোখাটো কাজ করে কোনোরকমে জীবনধারণ করছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়লো জীবনের হিসেব-নিকেশে কোথায় যেন একটা বড়ো ভুল জট পাকিয়ে রয়েছে। লেজারের একটা মোটা অঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যে এক অভিশপ্ত নগরীতে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে পড়ে রয়েছে। জীবন সম্বন্ধে প্রবল অভিযোগে মার্কোপোলোর নিঃসঙ্গ অন্তর যেন দপ করে জ্বলে উঠলো।

চাকরির চেষ্টা আরম্ভ করলেন, প্রথমে রেঙ্গুনের একটা হোটেলে। লোকের অভাব, ওরা অনেক টাকা মাইনেতে তাঁকে নিয়ে গেলো। কিন্তু রেঙ্গুনে থাকবার জন্য তিনি তো ইটালিয়ান রিভিয়েরা ছেড়ে আসেননি। ওখানে কিছুদিন চাকরি করে, আবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এবার কেন্দ্র কলকাতা। শাজাহান হোটেলের ম্যানেজারের চাকরি খালি ছিল। মালিকরা তাঁর মতো লোক পেয়ে আদর করে নিয়েছেন।

কিন্তু কোথায় সুশান? কোথায় সেই ডাইভোর্স— মামলা? কলকাতার বিশাল জনারণ্যে যুদ্ধের সময় হঠাৎ জ্বলে ওঠা একটা মেয়ে - কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এটর্নি আপিসে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। ওরা কিছু বলতে রাজী হয়নি। পুরনো এটর্নি নিজের শেয়ার পার্টনারকে বিক্রি করে দিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের বৃহত্তম পার্টনারের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য জীবনের ওপারে চলে গিয়েছেন।

কোর্টে খোঁজ নিয়েছিলেন। "এই নামে কোনো ডাইভোর্স অর্ডার হয়নি।" বায়রন এবার থামলেন।

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"তারপরই আমার ডাক পড়েছে। চেষ্টা করছি।" বায়রন বললেন। ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত্রি অনেক হয়েছে। এবার যাওয়া দরকার।

বায়রন বললেন, "মার্কোপোলোকে অধৈর্য হতে বারণ কোরো। শিগশিরই যা হয় একটা হয়ে যাবে।"

বিদায় নেবার আগে বায়রন বললেন, "সায়েবের সঙ্গে থেকে থেকে তোমার তো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে। তোমার সাহায্য নিতে হবে আমাকে।"

"আপনি চাকরি দিয়েছেন, আর সামান্য সাহায্য চাইতে দ্বিধা করছেন?" পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে, বায়রন বললেন, "ছি ভাই, ওসব কথা বলতে আছে?"

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছিলাম। চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে পারছিলাম না। সুশান বা লিজাকে আমি দেখিনি, কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই ওদের দু'টো কাল্পনিক মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

সুশান এখন কোথায় কে জানে? সে কি এই শহরের কোনো অখ্যাত পল্লীর অন্ধকার ঘরে কষ্টের দিনগুলো কোনোরকমে কাটিয়ে দিচ্ছে? কিংবা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, বাড়ি কিনে, রেস্তোরাঁ এবং সঙ্গীতকে জীবন থেকে চিরতরে বিদায় দিয়ে, অবসরের আনন্দ উপভোগ করছে?

থিয়েটার রোডের সেই বাড়িতে সুশান নিশ্চয়ই আজ নেই। থাকলে বায়রন সায়েব অনেকদিন আগেই তাকে খুঁজে বার করে, মার্কোপোলোর সমস্যা সমাধান করে দিতেন। নিজের দাম্পত্যজীবনের সমস্যা না মিটিয়ে, সে আজ কোথায় পড়ে রইলো? তার কি একবারও মনে পড়ে না, বিদেশী মার্কোপোলো একদিন তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এবং আরও অনেক কিছু বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন?

মার্কোপোলোর বেদনাময় দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রকৃত দুঃখ অনুভব করেছি। কিন্তু আবার অন্যদিকটাও বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি, কী আশ্চর্য এই পৃথিবী! বেঁচে থাকার সমস্যা সমাধান করতে করতেই কত নিষ্পাপ লোকের সমগ্র সামর্থ্য ব্যয়িত হচ্ছে; আর যাদের অন্নচিন্তা নেই, একঘেয়ে সুখে ক্লান্ত হয়ে তারা শখের সমস্যা তৈরি করছে।

আবার ভেবেছি, কাউকে দোষ দেবার অধিকারই আমার নেই। জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না-হলে বাঁচার আনন্দের অর্ধেকেই হয়তো নষ্ট হতো। দুঃখ আছে, দু'শ্চিন্তা আছে, দৈন্য আছে বলেই তো জীবন এখনও জোলো এবং একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। সংসারের সুখের ইতিহাসে আমরা কেউ-ই আগ্রহী নই। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরম পুজ্যগণ সকলেই তো দুঃখের অবতার, তাঁদের কেউই আরামে লালিত লক্ষীর ক্রীতদাস নন।

ভোরবেলায় যখন হোটেলে হাজির হয়েছি, গত রাত্রের চিন্তাগুলো তখনো মনের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেয়নি। পার্থক্যটা তাই আশ্চর্ষ লাগলো। এই তো কয়েক মুহূর্ত আগে আমি যেখানে ছিলাম তার চারিদিকে বস্তি; কাঁচা নর্দমা, ডাস্টবিন। আর এখানে? ময়লা তো এখানেও সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেগুলো যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় বুঝি না। যা কিছূ অশোভন, যা কিছ দৃষ্টিকটু তাকেই চোখের সামনে থেকে আড়ালে স্যরিয়ে রাখার শিল্পটি এরা আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করেছে। এই প্রতি মূহূর্তে সুন্দর হয়ে থাকার পিছনে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম আছে, তা শাজাহান হোটেলে ভোরবেলায় গেলে কিছুটা বোঝা যায়।

কলের ঝাঁটা দিয়ে (ভ্যাকুয়াম ক্লিনার) দিনের লাউঞ্জের কার্পেট পরিষ্কার করা হচ্ছে। অতো সকালেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্লান্ত জমাদারগুলো মেঝেতে বসে যখন এক মনে মেঝে ঘসে যাচ্ছে তখন আমাদের এই কলকাতা শহরে প্রায় কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি।

রাত একটা পর্যন্ত ওরা কিছু কাজ করতে পারে না। লাউঞ্জে তখনও লোক বসে থাকে। কাউন্টার থেকেই ক্যাবারে দর্শকদের হাততালি শোনা যায়। হোটেলের নাম শাজাহান; কিন্তু বার ও রেস্তোরাঁর নাম মমতাজ। ইতিহাসের সম্রাজ্ঞী মমতাজ তাঁর স্বামী অপেক্ষাও ঐশ্বর্যবিলাসিনী ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মমতাজ আরও অনেক সুন্দরী, আরও অনেক রোমাঞ্চময়ী। আমাদের মমতাজ রাজশয্যায় সারাদিন ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁর সব লীলাখেলা রাতে। কিন্তু কলকাতার পুলিস ও আবগারী বিভাগ মোটেই সরসিক নন। ছোটো ছেলের মতো কলকাত্তাওয়ালাদের আগলে রাখেন; ভাবেন রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে। সাধারণ ভাবে রাত দশটা। অনেক সাধ্যসাধনা করলে

মধ্যরাত্রি। হেড বারম্যান নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে ঘরের কোণে রাখা ছোট্ট নোটিশটা সামনে এনে টাঙিয়ে দেয়- Bar closes at twelve tonight.

রাতের অতিথিরা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে বসেন! সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিড়িতে হবে। যাঁরা চালাক তাঁরা কিন্তু চিন্তিত হন না, শুধু বারম্যানের দিকে তাকিয়ে কাছে আসতে ইঙ্গিত করেন।

বেয়ারা সে ইঙ্গিতের অর্থ বোঝে। বলে, “ক'পেগ হুজুর?”

সাহেব হিসেব করতে শুরু করেন। এক এক পেগে যদি আধঘণ্টা সময় গিলে ফেলা যায়, তা হলে আট পেগে রাত্রির অন্ধকারকে ভোরের আলোর খপ্পরে আনা যাবে। বারোটায় বার বন্ধ, কিন্তু বার-এ বসে আগে থেকে অর্ডার দেওয়া পানীয় পানে আপত্তি নেই। আর কয়েকটা ঘণ্টা টেবিলে জড়ো করে রাখা মদ সাবাড় করতে করতে কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার যা হয় একটা সুযোগ এসে যাবে। যে তোবারক আলী আট পেগ মদ টেবিলে দিয়ে বার বন্ধ' নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে, চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, সেই আবার ততোক্ষণে রাত্রির ঘুম শেষ করে ডান হাতে লাল ব্যাজটা জড়াতে জড়াতে আবার বার-এ এসে ঢুকবে। দেখবে সাহেব সবক'টা পেগ উড়িয়ে দিয়ে তীর্থকাকের মতো ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, কখন আবার বার খুলবে।

শাজাহান হোটেলের মেন গেট পেরিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলাম। সত্যসুন্দরবাবু কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছেন। বাঁ হাতে টেলিফোনটাকে কানে ধরে আছেন, আর ডান হাতে বোধহয় কোনো মেসেজ লিখে নিচ্ছেন। আমাকে দেখে সত্যসুন্দরদা মাথা নাড়লেন। ইঙ্গিতে বললেন, "সোজা কিচেনে চলে যাও। ওখানে তোমার কাজ আছে।” কী কাজ? কে কাজ দেবেন, কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সত্যসুন্দরবাবু, তখন কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। শাজাহান রিসেপশন থেকে আমি স্যাটা বোস কথা বলছি। করবী গুহকে এখন ফোনে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আপনার কিছু বলবার থাকে বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। উনি ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই আপনার মেসেজ পেয়ে যাবেন।

বোসদার মুখ দেখে বুঝলাম, টেলিফোনের অপর প্রান্তের ভদ্রলোক তাঁর উত্তরে খুশী হননি। বোসদা বলে উঠলেন, “আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন না

থাকাতে, কোনো বোর্ডারকে আমরা ঘুমের মধ্যে জ্বালাতন করি না।...আজ্ঞে, এ-বি-সি। এ কেমন নাম? বলছেন ওই বললেই শ্রীমতি গুহ বুঝতে পারবেন। তবে আমাদের কাস্টম হলো, পুরো নাম, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর টুকে নেওয়া...না, না, প্লিজ রাগ করবেন না; সব কিছু বলা না-বলা আপনার ইচ্ছে। আমি তাঁকে বলবো, মিস্টার এ-বি-সি ফোন করেছেন।”

ফোনের ওধার থেকে ভদ্রলোক তখনও কী সব বলছেন। টেলিফোন পর্ব শেষ হবার জন্য অপেক্ষা না করে আমি সোজা কিচেনের দিকে পা বাড়ালাম। "হটাও, হটাও,"—দু'র থেকেই মার্কোপোলো সাহেবের বাজখাঁই গলার স্বর শুনতে পেলাম। কাছে এসে দেখলাম ঝাড়ুদাররা সব মাথা নিচু করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে ওরা ঠক ঠক করে কাঁপছে। মুখের অবস্থা দেখে মনে হব মিলিটারী ক্যাম্পে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ওদের কেউ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার সাহেবের দিকে ওরা এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন উনিই সেনাবাহিনীর মেজর—এখনই গুলী করবার হুকুম দেবেন।

"দু'নিয়ার আর কোথাও এর থেকে নোংরা হোটেল আছে?" মার্কোপোলো তারস্বরে প্রশ্ন করলেন।

সবাই মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদের নীরবতায় বিরক্ত হয়ে মার্কোপোলো এবার গর্জন করে উঠলেন, "ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ইস্কুলের এক্স স্টুডেন্টরা কি সবাই দলবেধে এই হোটেলে চাকরি নিয়েছে? তোমরা

কথা বলো না কেন?"

মার্কোপোলোর সন্ধানী চোখ এবার সার্চলাইটের মতো ঘুরতে আরম্ভ করলো। ঘুরতে ঘুরতে চোখটা যেখানে এসে থামলো, সেখানে স্টুয়ার্ড জিমি দাঁড়িয়েছিলেন। ম্যানেজার আবার তোপ দাগলেন, "জিমি, তুমি কি গ্যাণ্ডি পার্টিতে জয়েন করেছো? সায়লেন্স-এর ভাও নিয়েছো?"

স্টুয়ার্ড, যাঁর প্রতাপের খানিকটা অভিজ্ঞতা আমার আছে, যেন কেঁচো হয়ে গিয়েছেন। কোনোরকমে বললেন, "সত্যি খুব নোংরা, আপনি যা বলছেন..."

"এবং তুমি সেই হোটেলের স্টুয়ার্ড—যার রান্নাঘর দিয়ে দিনের বেলায় কুমীরের মতো বড়ো বড়ো ইঁদু'র ছোটাছুটি করে।"

ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম। সায়েবের সামনে দিয়ে দু'টো ইঁদুর কিচেনের ফ্লোরে ছোটাছুটি করেছে। তারপরই এই দৃশ্য। সায়েব আর কাউকে ছাড়তে রাজী নন।

মুখের পাইপ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে, মার্কো এবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "মাইডিয়ার ফেলোজ, তোমরা যেভাবে চলছো, যেভাবে স্টোরস এবং কিচেন

নোংরা করে রাখছো, তাতে যদি সামনের সপ্তাহে দেখি, ইঁদুর কেন এখানে হাতী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলেও আমি আশ্চর্য হবো না।”

জমাদাররা ততক্ষণে ঘরের মেঝে সাবধানে মুছতে আরম্ভ করেছে। স্টুয়ার্ড হেড কুককে ডেকে বললেন, “আমি ঠিক লাঞ্চের পরই আসছি—সমস্ত কিছু আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে চাই। কেউ যেন আজ বাইরে না পালায়। প্রত্যেককে আমি এখানে হাজির দেখতে চাই।”

পাইপটা হাতে নিয়ে আর একবার ঘুরতে গিয়ে, মার্কোপোলো আমাকে দেখতে পেলেন। যিনি এতোক্ষণ ৪৪০ ভোল্টের মেজাজে ছিলেন, তিনিই এবার স্নিগ্ধ হাসিতে মুখে ভরিয়ে বললেন, “হ্যালো, গুড্ মর্নিং”

আমার এই অভাবনীয় সৌভাগ্য স্টুয়ার্ডের বোধহয় মনঃপূত হলো না। বাঁকা চাহনি এবং মুখের ভাব দেখে তাঁর মনের কথাটা আমার বুঝতে বাকি রইলো না। কিন্তু ও-নিয়ে সময় খরচ করবার উপায় ছিল না। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে মার্কোপোলো বললেন, “এসো।"

এবার তাঁকে আমি অন্যরূপে দেখতে আরম্ভ করলাম। তিনি আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার নন। একে কাল রাতে এলিয়ট রোডের এক অন্ধকার ঘরে আমি মাটি খুড়ে আবিষ্কার করেছি। আঘাতে আঘাতে শক্ত হয়ে যাওয়া ওই দেহটার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি সেই শিশুকে, অনেক দিন আগে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকম্পে যে সব হারিয়েছিল; এথেন্সের ফাদাররা তাকে আবার সব দিয়েছিল; আবার আমাদের এই কলকাতা যার সর্বস্ব হরণ করে নিয়েছিল।

শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার আজ আমার খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরিপূর্ণ রূপটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর তিনিও ম্যাজিসিয়ানের মতো মূহূর্তে নিজের রূপ পালটিয়ে ফেললেন। কে বলবে, এই লোকটাই দু’ মিনিট আগে ইঁদুর দেখে হোটেলের সব কর্মচারীকে এক সঙ্গে রসাতলে পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন।

আমার মুখের দিকে মার্কো অমনভাবে কেন তাকিয়ে রয়েছেন? হয়তো ভাবছেন, আমি সব জেনে ফেলেছি। আবার ঠিক নিঃসন্দেহও হতে পারছেন না। ডিটেকটিভ বায়রন

এই অজানা ছোকরাকে কতখানি বলেছেন আর কতখানি বলেননি, কে জানে। আমারও কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। সেই অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যই বললাম, "স্যর, গতকাল মিস্টার বায়রনের কাছে আমি গিয়েছিলাম।"

"বাড়ি চিনতে তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

বললাম, "না। অপরিচিত জায়গা বটে, কিন্তু নম্বর তো জানা ছিল।"

"আই হোপ, সমস্ত জীবনই কলকাতার ঐ অঞ্চল তোমার কাছে অপরিচিত থাকবে। মাইডিয়ার ইয়ংম্যান, জীবনে সব রকম অন্যায়ের প্রলোভন থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না: বাট বিলিভ মি, আমরা প্রায়ই নিজেদের দুঃখ নিজেরাই সৃষ্টি করি।"

আমি চুপ করে রইলাম। আর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি কোনোরকমে ঢোঁক গিলে বললাম, "গতকাল রাতে মিস্টার বায়রনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, আপনি যেন ধৈর্য হারাবেন না।"

"ধৈর্য! পৃথিবী কোনোদিন এর থেকেও ধৈর্যশীল মানবশিশুকে লালন করেছে?" মার্কোপোলো যে কাকে প্রশ্ন করলেন বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এই প্রথম মনে হলো, যাকে আমি পাথর বলে মনে করেছিলাম আসলে সে একটা বরফের চাঙড়। আমারই চোখের সামনে বরফের বিশাল টুকরোটা গলতে শুরু করেছে।

যাঁর সঙ্গে আমার প্রভু, ভৃত্য সম্পর্ক, তিনি মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন আমি কে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে বলতে গেলে আমার কোনো পরিচয়ই নেই। আই হার্ডলি নো ইউ। কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হয় পৃথিবীকে তুমি চেনো না। তুমি জানো না, কোন পৃথিবী-হোটেলে বাস করবার জন্য ঈশ্বর আমাদের অ্যাকোমোডেশন বুক করেছেন। খুব সাবধান।"

আমার কথা বলবার মতো সামর্থ্য ছিল না। শুধু নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছি। সংসারের দুঃখময় যাত্রাপথে অকারণে কতোবারই তো মানুষের অযাচিত ভালবাসা পেয়েছি। না চাইতে পেয়ে পেয়ে আমার লোভ যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে। আজও ভালবাসার অভাব হলো না।

“আমাকে স্বীকার করতেই হবে; তুমি খুব খারাপ টাইপিস্ট নও।” গলার হারটা ডান হাতে নাড়তে নাড়তে মার্কোপোলো বললেন।

মাথা নীচু করে তাঁর প্রশংসা গ্রহণ করলাম। এই সামান্য সময়ে যদি তাঁকে খুশী করে থাকতে পারি, তবে তার থেকে আনন্দের কী হতে পারে? বিনা চাকরির জীবনটা যে কী রকমের, তার কিছু, নমুনা আমি আস্বাদ করে দেখছি। বিশেষ করে একবার চাকরি করে যে আবার পথে বেরিয়ে এসেছে। সত্যসুন্দরবাবু হাসতে হাসতে একবার বলেছিলেন, "মেয়েদের স্বামী, আর ছেলেদের চাকরি। অরিজিন্যাল বেকার আর চাকরি খোয়ানো বেকার —যেন কুমারী মেয়ে আর বিধবা মেয়ে। দু’জনেরই স্বামী নেই। কিন্তু তফাৎটা যে কী, সে একমাত্র বিধবাই বোঝে।”

সত্যসুন্দরবাবুর ভাষায় স্বামী হারিয়ে আবার স্বামী পেয়েছি, সুতরাং চাকরি যে কী দ্রব্য বুঝতে বাকী নেই। কোনো চেষ্টা না-করতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'নাইস অফ ইউ, টু সে সো স্যর।”

মার্কোপোলোর গোলগোল চোখ দু’টো মধুর দুষ্টুমিতে ছটফট করতে লাগলো। বললেন, “এতোদিন হাইকোর্টে চাকরি করেও তুমি মানুষ চেনোনি। ‘নাইস' আমি মোটেই নই।”

আমার অস্বস্তিকর মুখের অবস্থা দেখে, মার্কোপোলো এবার আলোচনার মোড় ফেরালেন। বললেন, “আই অ্যাম স্যরি। তোমাদের ও-পাড়াকে বেশ ভয় করি; কয়েকবার ওখানে গিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো ষাঁড় যদি আমাকে তাড়া করে, তবে লাইফ সেভ করবার জন্য আমি নদীতে ঝাঁপ দেবো, তবু কিছুতেই ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের কোনো বাড়িতে উঠবো না।”

উত্তর না দিয়ে কেবল হাসলাম। মার্কোপোলো জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় থাকো?”

বললাম, “হাওড়ায়।"

"সে আবার কোথায়?" মার্কোপোলো যেন অমন জায়গার নামই শোনেননি। বুঝিয়ে বললাম, "গঙ্গার পশ্চিম দিকে হাওড়া স্টেশনের পরে।”

ওঁর মুখ দেখে মনে হলো, হাওড়া স্টেশনের পরে যে কোনো ভূখণ্ড আছে, তা যেন ওঁর জানাই ছিল না। যেন ওইখানেই স্থলভাগ শেষ হয়ে, সমুদ্র আরম্ভ হয়ে গেলো!

মার্কোপোলো এবার যা প্রস্তাব করলেন তার ইঙ্গিত সত্যসুন্দরবারে কাছে আগেই পেয়েছিলাম। সত্যসুন্দরবাবু বলেছিলেন, "এ আপনার সাধারণ আপিস নয় যে, দশটা পাঁচটায় বাঁধা জীবন- শনিবার অর্ধেক, রবিবারে পুরো ছুটি। যদি এখানে চাকরি পাকা হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কর্তা একদিন আপনাকে দু'নিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে, শাজাহান হোটেলে এসে আশ্রয় নিতে হুকুম করবেন।"

চাকরিটা রক্ষে করবার জন্য, দুনিয়ার যে কোনো বাড়িতে এসে থাকতে প্রস্তত আছি আমি।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, সত্যসুন্দরবাবু, বলেছিলেন, "যা বুঝছি, শাজাহান হোটেলের অন্ন আপনার জন্য অনেকদিন বাঁধা রয়েছে। স্টুয়ার্ড জিমির হাবভাব দেখে আন্দাজ করতে পারছি আমি। আপনার সম্বন্ধে জিমি এখন খুব নরম হয়ে গিয়েছে। জিমি উপরওয়ালার মন বুঝে চলে।"

সত্যসুন্দরবাবুর ভবিষ্যবাণী সফল হলো। মার্কোপোলো একটা বার্মা সিগার ধরিয়ে বললেন, "তোমাকে একটা ইনপর্টাণ্ট ডিসিশন নিতে হবে। তোমার আগে যে এখানে কাজ করতো তার নাম রোজী। তাকে এখানে থাকতে হতো। তাতে ম্যানেজমেন্টের সুবিধে। পাঁচটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবার জন্যে আমাকে হাঁকপাক করতে হতো না; জরুরী কাজগুলো আসা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেলা যেতো। আমাকে বলতেই হবে, রোজীর মতো ওয়াণ্ডারফুল সেক্রেটারী আমি কখনও দেখিনি। তার আঙুলগুলো টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের উপর দিল্লী মেলের স্পীডে ছোটাছুটি করতো, অথচ মুখে হাসি লেগেই আছে। আনগ্রাজিং, কখনও কাজ করতে অসন্তুষ্ট হতো না।

"একদিন তো বেচারাকে রাত বারোটা থেকে ডিক্টেশন নিতে হলো। আমার কাজ নয়। এক গেস্টের কাজ। সে ভদ্রলোক ভোরবেলাতেই দমদম থেকে লণ্ডন চলে যাচ্ছেন। পথে করাচীতে একটা চিঠি ডেলিভারী দিতেই হবে। বেচারার টাইপরাইটার নেই, নিজেও টাইপ জানেন না। আমাকে এসে রাত এগারোটায় ধরলেন। আমি বললাম, 'এতো রাত্রে, কোথায়

স্টেনো পাবো?' সে ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। 'এতো বড়ো কলকাতা শহর, এখানে তোমরা চেষ্টা করলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।'

"আমার রোজীর কথা মনে পড়ে গেলো। বিলিভ মি, সেই রাত্রে রোজী প্রায় তিনটে পর্যন্ত টাইপ করেছিল। আমি জানতাম না। রোজীকে কাজে বসিয়ে দিয়ে আমি ঘুমোতে চলে গিয়েছিলাম। পরের দিন ভোরে রোজীও আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু পরে বিলেত থেকে ভদ্রলোকের চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন—'সেদিন আপনার সেক্রেটারী আকাশের পরীর মতো উপর থেকে নেমে এসে আমাকে রক্ষে করেছিলেন। তাঁকে এবং আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিনি রাত তিনটে পর্যন্ত টাইপ করলেন, অথচ একটুও বিরক্ত না-হয়ে কাজ শেষ করে, আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন!" মার্কোপোলো সগর্বে তাঁর সেক্রেটারীর কাহিনী আমাকে বললেন। "তুমিও এখানে থেকে যাও।" মার্কোপোলো বললেন।

মিস্টার মার্কোপোলো আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আমি জিমিকে বলে দিয়েছি। সে নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। যদি কোনো অসুবিধে হয় সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

মার্কোপোলো এবার বিল রেজিস্টারটা পরীক্ষা করবার জন্যে কাউন্টারের দিকে চললেন। আমি প্রথমটা বুঝতে না পেরে এবং শেষে বুঝতে পেরে ধপাস করে বসে পড়লাম। আকাশের নক্ষত্রদের কোন ষড়যন্ত্রে গৃহ থেকেও গৃহহারা হতে চলছি কে জানে!

আমার নিজস্ব একটা নাম ছিল। হাইকোর্টে সেটা হারিয়ে এসেছিলাম। একটা ঠিকানা অবশিষ্ট ছিল। বহু কষ্টের মধ্যেও এতোদিন ধরে কোনোরকমে সেটা রক্ষে করে আসছিলাম। পয়সা জমিয়ে একটা চিঠির কাগজ পর্যন্ত ছাপিয়েছিলাম। ইউরোপীয় কায়দায় তার ডানদিকে শুধু ঠিকানাটাই লেখা ছিল। নাম এবং ধাম সমেত একটা রবার স্ট্যাম্পও আত্মপ্রসাদের নেশায় নগদ বারো আনা পয়সা খরচ করে তৈরি করিয়েছিলাম। স্থানে-অস্থানে সেই স্ট্যাম্প অকৃপণভাবে ব্যবহার করে, সগর্বে আমার কৌলীন্য প্রচার করেছি! সে দু'টো এক সঙ্গে একই দিনে নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে গেলো। শাজাহান হোটেলের

বিশাল গহ্বরে যে মানুষটা এবার হারিয়ে যাবে তার নামও থাকবে না, ঠিকানাও থাকবে না। সে যেন সত্যিই সরাইখানার নামহীন গোত্রহীন অজানা মুসাফির।

রেজিস্টারে নাম লিখতে লিখতে সত্যসুন্দরবাবু মুখে তুলে তাকালেন। বললেন, "আগাম খবর পেয়ে গেছি।"

সামনে একজন বিদেশী অতিথি দাঁড়িয়েছিলেন। বেয়ারা দুর থেকে ছুটে এসে কাছে দাঁড়াতেই, সতাসুন্দরবাবু বললেন, "এক নম্বর সুইট"

বেয়ারা দেওয়ালের বোর্ডে যে অসংখ্য চাবি ঝুলছে, তার একটা সায়েবের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেলাম করলে। সায়েব বাঁহাতে মাথার সোনালী চুলগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে, ডান হাতে চাবির রিঙটা ঘোরাতে ঘোরাতে উপরে উঠে গেলেন।

সত্যসুন্দরদা ফিস ফিস করে বললেন, "একলা এসেছেন, কিন্তু ডবল বেডের রূম নিলেন। আমাদের সবচেয়ে সেরা সুইট, যার প্রতিদিনের রেট দু'শো পঞ্চাশ টাকা। তাও বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট।"

বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট কথাটার অর্থ তখনও আমার জানা ছিল না। শুনলাম, তার মানে থাকার ব্যবস্থা ছাড়া শুধু ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে। বাকি খাওয়ার জন্যে আলাদা বিল। যেসব টুরিস্টরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করেন, তাঁরা বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট রেট পছন্দ করেন। হোটেলও কম খুশী হন না। হাঙ্গামাও কম।

বলেছিলাম, "সায়েবের বয়স তো বেশী নয়। নিশ্চয়ই খুব বড়লোক।" "মুন্ডু!" বোসদা হেসে ফেললেন। "চাকরি একটা করেন বটে, কিন্তু সেই মাইনেতে শাজাহানের এক নম্বর সুইটে থাকা যায় না।"

"হয়তো আপিসের কাজে এসেছেন।" আমি বললাম।

"আপিস তো ওঁর এই কলকাতাতেই। থাকেন বালিগঞ্জের এক সায়েবের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে। কিন্তু মাঝে মাঝে একলা চলে আসেন। অথচ ডবল-বিছানা ঘর ভাড়া নেন। মাসে অন্তত চার পাঁচবার আসেন। ভদ্রলোক কমনওয়েলথের লোক, তাই। না

হলে প্রতিবার সিকিউরিটি পুলিসকে রিপোর্ট করতে হতো; এবং তারাও অবাক হয়ে যেতো বালিগঞ্জ থেকে একটা লোক বার বার শাজাহান হোটেলে এসে ওঠে কেন?"

আমি এই জীবনের সঙ্গে তেমন পরিচিত হয়ে উঠিনি। বোসদা বললেন, "এখানে যদি সন্ধ্যের পর কেউ বেশ কয়েক ঘণ্টা বসে থাকে, তবে সেও বুঝতে পারবে। রাত্রে কালো চশমা পরে তিনি আসবেন। তাঁর স্বামীর সাত আটখানা গাড়ি আছে, তবু তিনি ট্যাক্সি চড়েই আসবেন। একটা কথা আমি জোর করে বলতে পারি, মিস্টার অমুক আজ কলকাতায় নেই। হয় বোম্বাই গিয়েছেন, না হয় দিল্লী গিয়েছেন ; কিংবা খোদ বিলেতেই বিজনেসের কাজে তাঁকে যেতে হয়েছে।"

"কে এই ভদ্রলোক? কে এই ভদ্রমহিলা?" আমি নিজের কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। বোসদা বললেন, "এই হতভাগা দেশে দেওয়ালেরও কান আছে।"

বোসদার হাত চেপে ধরে বললাম, "আমার কান আছে বটে, কিন্তু আমি বোবা! যা কান দিয়ে ঢোকে, তা পেটেই বন্দী হয়ে থাকে। মুখ দিয়ে আর বের হয় না।"

বোসদা বললেন, "মিসেস পাকড়াশী। মাধব পাকড়াশীর হিসেবের খাতায় তিনি খরচ হয়ে গিয়েছেন। মিস্টার পাকড়াশীর জীবনে সব জিনিসই অনেক ছিল—অনেক গাড়ি, অনেক কোম্পানি, অনেক বাড়ি, অনেক টাকা। কিন্তু যে জিনিস মাত্র একটা ছিল, সেটাই নষ্ট হয়ে গেলো। মিসেস পাকড়াশী আজ থেকেও নেই। দিনের বেলায় সমাজসেবা করেন, বক্তৃতা করেন, দেশের চিন্তা করেন। আর রাতে শাজাহানে চলে আসেন। সারাদিন তিনি প্রচণ্ড বাঙালী, কিন্তু এখানে তিনি প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক! কখনও দেশের কাউকে ওঁর সঙ্গে দেখিনি। এক নম্বর সুইটে আগে যিনি আসতেন, তিনি তেইশ বছরের একজন ফরাসী ছোকরা। কিন্তু কমনওয়েলথের বাইরে হলেই আমাদের রিপোর্ট করতে হয়, সেইজন্যেই বোধহয় এই ইংরেজ ছোকরাকে পছন্দ করেছেন। বেচারা মিস্টার পাকড়াশী!"

"কারুর সম্বন্ধেই আপনার বেশী সহানুভূতি থাকবার প্রয়োজন নেই।" আমি বললাম।

"মিসেস পাকড়াশীর নিজেরও তাই ধারণা। বোম্বাই-এর তাজ হোটেলে, দিল্লীর মেডেন্সে মিস্টার পাকড়াশী সিঙ্গল না ডবল বেডের রুম ভাড়া নেন, কে জানে! তবে আজও তিনি কর্তাকে বেকায়দায় ধরতে পারেননি। আমার মনে হয়, ভদ্রলোক ভালো।

দু'পুরে মাঝে মাঝে লাঞ্চে আসতে দেখেছি। বিয়ার পর্যন্ত নেন না। মিসেস পাকড়াশী তো আপনার বায়রন সায়েবকে লাগিয়েছিলেন: ভদ্রলোক তো দু'বার বোম্বাই ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু যতদুর জানি, কিছুই পাওয়া যায়নি।"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, "এসব আপনি কী করে জানলেন?" "জানতে হয় না, এমনিই জানা হয়ে যায়। আপনারও হবে। দু''দিন পরে আপনিও জেনে যাবেন মিসেস পাকড়াশীকে। তাঁর বয়-ফ্রেণ্ড সম্বন্ধেও বহু কিছু শুনবেন। তখন অবাক হয়ে যাবেন। হয়তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"এখন নয়। সে সময়মতো একদিন বলা যাবে, যদি তখনও আগ্রহ থাকে। এখন একটু অপেক্ষা করুন, হাতের কাজগুলো সেরে নিই। এখনই একশো বাহান্ন, একশো পঞ্চান্ন আর একশো আটান্ন খালি হয়ে যাবে। বিলটা ঠিকই আছে। তবে লাস্ট মিনিটে কোনো মেমো সই করেছেন কিনা দেখে নিই। কোনো মেমো ফাঁক গেলে সেটা আমারই মাইনে থেকে কাটা যাবে।"

বিলগুলো চেক করে, সত্যসুন্দরবাবু পোর্টারকে ডাক দিলেন। বেচারা টুলের উপর বসেছিল। ডাক শুনেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো।

এখানে কথা বলার একটা অদ্ভুত কায়দা আছে। স্বর এতো চাপা যে, যাকে বলা হচ্ছে সে ছাড়া কেউ শুনতে পাবে না। অথচ তার মানেই যে ফিস্ ফিস্ করে কথা, তা নয়। সত্যসুন্দরবাবু, সেই ভাবে পোর্টারকে বললেন, "সায়েবরা ঘরে রয়েছেন। ওঁদের প্যাকিংও প্রায় রেডি। সুতরাং আর দেরি কোরো না।"

আমি বললাম, "এমন কণ্ঠস্বর কেমন করে রপ্ত করলেন?"

"আপনারা যেমন বলেন বি-বি-সি উচ্চারণ, তেমনি এর নাম হোটেল ভয়েস। বাংলায় বলতে পারেন সরাইকণ্ঠ! অনেক কষ্টে রপ্ত করেছি। আপনাকেও করতে হবে।"——বোসদা বললেন।

বললাম, "আপনি-পর্বটা এবার চুকিয়ে ফেললে হয় না? আমার অন্তত সান্ত্বনা থাকবে, শাজাহান হোটেলে এমন একজন আছেন, যাঁর কাছে আমি 'আপনি' নই, যাঁর

কাছে আমি তুমি।”

বোসদা বললেন, “তার বদলে, তুমি আমাকে কী বলে ডাকবে?” .

“সে তো আমি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছি—বোসদা।”

বোসদা বললেন, “মোটেই আপত্তি নেই, তবে মাঝে মাঝে 'স্যাটাদা' বোলো। সায়েবগঞ্জ কলোনির অমন পেয়ারের নামটা যেন ব্যবহারের অভাবে অকেজো না হয়ে যায়।"

“কেন? এখানকার সবাই তো আপনাকে ওই নামে ডাকছে।" আমি একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

“ওদের ডাকা, আর আপনজনদের ডাকা কী এক হলো, ভাই?”

সত্যসুন্দরবাবু এবার আমার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন, “জিমির মুখেই শুনলাম, তুমি পাকাপাকিভাবে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করছো। ভালোই হলো।”

আমার মনের মধ্যে তখন দু’শ্চিন্তা এবং অস্বস্তি দু’ই'ই ছিল। বললাম, “আপনি বলছেন, ভাল হলো? আমার তো কেমন ‘ভয় ভয় করছে।”

সত্যদার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, “হাসালে তুমি। ভয় অবশ্য হয়। শাজাহান হোটেলকে দূর থেকে দেখলে, কার না ভয় হয়? আমি সায়েবগঞ্জ কলোনির সিজিনড্ সেগুন কাঠ, আমারই বুকে ফাট ধরার দাখিল হয়েছিল।”

রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ কথা বলবার কোনো উপায় নেই। আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। বোসদা ফোনটা তুলে নিলেন। “শাজাহান রিসেপশন।...বেগ্‌ইওর পার্ডন। মিস্টার মিস ইবিসি... হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি টোকিও থেকে ঠিক সময়েই পৌঁছেছেন। রুম নাম্বার টু হানড্রেড টেন।” ওদিক থেকে বোধহয় কেউ জিজ্ঞাসা করলে, মিস্টার মিস ইবিসি এখন আছেন কিনা।

“জাস্ট এ মিনিট” বলে বোসদা চাবির বোর্ডটার দিকে নজর দিলেন। দু’শ দশ নম্বর চাবিটা বোর্ডেই ঝুলছে। টেলিফোনটা তুলে আবার বললেন, “নো, আই অ্যাম স্যরি। উনি বেরিয়ে গিয়েছেন।”

টেলিফোন নামিয়ে বোসদা বললেন, "তা হলে আর দেরি করছ কেন, কাসুন্দের সম্পর্কটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে এসো।"

এবার আমার দু'শ্চিন্তার কারণটা প্রকাশ করতে হলো। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। তবু কোনোরকমে বললাম, "এতো বড়ো হোটেলে থাকতে হলে যে-সব জিনিসপত্তর আনা দরকার, সেরকম কিছুই তো নেই। আমার তোশকটার যা অবস্থা। একটা হোল্ড-অলও এতো তাড়াতাড়ি কারুর কাছে ধার পাবো না যে ঢেকে আনবো। এই দরজা ছাড়া অন্য কোনো দরজা দিয়ে ঢোকা যায় না?"

বোসদা সে-যাত্রায় আমায় রক্ষে করলেন। আমার বিদ্যেবদ্ধি সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হয়েই যেন বললেন, "তুমি নেহাতই বোকা। এই সামান্য জিনিস নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? যদি ভাল তোশকই থাকবে তবে আমরা এখানে আশ্রয় নেবো কেন? যতো বড়ো হোটেলে উঠবে, ততো কম জিনিস সঙ্গে নিয়ে এলেই চলে যায়। ফ্রান্সের এক হোটেল তো বিজ্ঞাপনই দেয়, 'আপনার ক্ষিদেটি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসবার প্রয়োজন নেই।' আর এ-ক্ষিদে বলতে শুধু পেটের ক্ষিদে নয়, আরও অনেক কিছু বোঝায়।"

বোসদা ডান কানে পেন্সিলটা গুঁজে রেখেছিলেন। সেটা নামিয়ে নিয়ে একটা স্লিপ লিখতে আরম্ভ করলেন। লেখা বন্ধ করে বললেন, "লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই এখানে আনবার দরকার নেই। আর সব ব্যবস্থা আপনা-আপনি হয়ে যাবে।"

তারপর একটু ভেবে বললেন, "স্যরি, আর একটা জিনিস আনতে হবে। খুব প্রয়োজনীয় আইটেম। সেটা তোমার ভাল অবস্থায় আছে তো?" "কোনটা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"টুথ ব্রাশ। নিজের ব্রাশ ছাড়া, এখানে আর কিছুই আনবার প্রয়োজন নেই। যাও, আর দেরি কোবো না। কাসুন্দের মা হাজার-হাত-কালীকে পেন্নাম ঠুকে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে কানেকশন কাট অফ করে, সোজা এই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে চলে এসো। আমরা ততোক্ষণ তোমাকে সিভিক রিসেপশন দেবার জন্যে প্রস্তুত হই।"

মালপত্র সঙ্গে করে শাজাহান হোটেলের সামনের রাস্তায় যখন ফিরে এলাম, তখন এক বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা ভরে উঠছিল। শাজাহান হোটেলের নিওন বাতিটা তখন

জ্বলে উঠেছে। সেই নিওন আলোর স্বপ্নাভায় হোটেল বাড়িটাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।

হোটেল বাড়ি নয়তো—যেন ফ্রেমে আঁকা ছবি। তার যুবতী অঙ্গে আধুনিক স্কাইস্ক্র্যাপারের ঔদ্ধত্য নেই; কিন্তু প্রাচীন আভিজাত্যের কৌলীন্য আছে। রাত্রের অন্ধকারে, সুন্দরী বন্ধুর কাঁকনের মতো নিওন আলোর রেখাটা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে। সেই আলোর তিন ভাগ দু''দিকে সবুজ, মধ্যিখানে লাল। জ্জ্বলা-নেভার যা কিছু, চটুলতা, 'তা কেবল সবুজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর লাল আলো দু'টো যেন কোনো ক্ষুব্ধ দৈত্যের পাতাবিহীন রক্তচক্ষু।

যেন ইন্দ্রপুরী। বিরাট গাড়ি-বারান্দা শুধু হোটেলের দরজাকে নয়, অনেক ঝলমলে দোকানকেও আশ্রয় দিয়েছে। হোটেলেরই যেন অংশ ওগুলো। বই-এর দোকান আছে, সাময়িকপত্রের আড়ত আছে, ডাক্তারখানা আছে, ভারতীয় তাঁতশিল্পের সেরা নিদর্শন বোঝাই সরকারী দোকান আছে; নটরাজের মূর্তি, হাতির দাঁত, কাঠের কাজ-করা কিউরিও শপ আছে; শাজাহান ব্র্যান্ড কেক এবং রুটি বিক্রির কাউন্টার আছে। তা ছাড়া মোটরের শো রুম আছে, টাকা পাঠাবার পোস্টাপিস আছে, টাকা ভাঙাবার ব্যাঙ্ক আছে; কোট-প্যান্ট তৈরির টেলরিং শপ আছে, সেই কোট কাচবার আর্ট-ড্রায়ারস এবং ক্লীনার্স আছে। মানুষের খিদমত খাটিয়েদের এই বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে মরা জানোয়ারদের জামাকাপড় পরাবার জন্য জনৈক ট্যাক্সিডার্মিষ্ট কীভাবে টিকে রয়েছে কে জানে। বাঘ, সিংহ এখন শিকার করে কে? আর করলেও, অত যত্নে এবং পয়সা খরচ করে কে সেই মরা বাঘের পেটে খড় এবং ঘাড়ে কাঠ পুরে তাকে প্রায় জ্যান্ত করে তোলবার চেষ্টা করে?

কিন্তু এই ট্যাক্সিডার্মিস্ট এখানে থাকবার পিছনে ইতিহাস আছে। এই হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা শিকার করতে ভালবাসতেন; তাঁর এক বন্ধুও শিকারের নেশায় পাগল ছিলেন। দোকানে ঢুকলে ওঁদের দু'জনের একটা অয়েল-:পন্টিং দেখতে পাবেন—একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহের উপর পা দিয়ে বিজয়গর্বে শাজাহান হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর বন্ধু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সে পা কিন্তু সায়েব ভদ্রলোক চিরকাল রাখতে পারেননি। রয়েল বেঙ্গল কুলের কোনো সাহসী যুবক পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে স্কিনার সায়েবের পদাঘাতের

প্রতিশোধ নিয়েছিল। শাজাহান হোটেলের মালিক সিম্পসন সায়েব এবং তাঁর বন্ধু স্কিনার চারখানা পা নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন—ফিরে এলেন তিনখানা নিয়ে। স্কিনার সায়েবের ঘোরাঘুরির চাকরি ছিল। সে চাকরি গেলো। বন্ধুর জন্য সিম্পসনের চিন্তার অন্ত নেই। স্কিনার সাহেব একসময় শখ করে ট্যাক্সিডার্মি'র কাজ শিখেছিলেন। বন্ধু বললেন, তুমি দোকান খোলো, আমার হোটেলের তলায়—ঘরভাড়া লাগবে না। আর হোটেলের শিকারী অতিথিদের তোমার ওখানে পাঠাবার চেষ্টা করবো।"

তারপর এই একশ' পচিশ বছর ধরে কত লক্ষ ভারতীয় বাঘ, সিংহ, হরিণ এবং হাতী যে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে, তা তো আমরা সবাই জানি। সেই সব অকালে-মরা অরণ্য-সন্তানদের কত মৃতদেহ আজও অক্ষত অবস্থায় সমুদ্রের ওপারে ইংলণ্ডের ড্রয়িং রুমে শোভা পাচ্ছে, তাও হয়তো আন্দাজ করা যায়। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না, কেমন করে খোঁড়া স্কিনার সায়েব স্কটল্যান্ডে একটা প্রাসাদ কিনেছিলেন; কেমন করে সেই যুগে কয়েক লক্ষ টাকাকে পাউণ্ডে পরিবর্তিত করে, তিনি লন্ডনের জাহাজে চেপে বসেছিলেন।

স্কিনার সায়েবের সাফল্যের এই গল্প আমার জানবার কথা নয়। শুধু আমি কেন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানির বর্তমান মালিক মুক্তারাম সাহাও জানতে পারতেন কিনা সন্দেহ, যদি না ঐ দোকানে ক্যাশকাউন্টারের পিছনে পুরোনো ইংলিশম্যান কাগজের একটা অংশ সযত্নে ফ্রেমে-বাঁধা অবস্থায় ঝোলানো থাকতো। স্পিনার সায়েবের বিদায় দিনে ইংলিশম্যানের সম্পাদক বিশেষ প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন।

বাঁধানো প্রবন্ধে একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে ইংলিশম্যানের নিজস্ব শিল্পীর আঁকা শাজাহান হোটেলের স্কেচ। সেই স্কেচ আমি যত্নের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে দেখেছি। শাজাহান হোটেলের লাউঞ্জেও সেকালের কোনো নামহীন শিল্পীর খানকয়েক ছবি আছে। এই ছবিগুলোই নতুন আগন্তুককে প্রথম অভ্যর্থনা করে। তাঁকে জানিয়ে দেয়, এ পান্থনিবাস হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা 'আমরিকী' হোটেল নয়, এর পিছনে ইতিহাস আছে, ট্র্যাডিশন আছে—সুয়েজ খালের পূর্বপ্রান্তের প্রাচীন পান্থশালা আপনাকে রাত্রিযাপনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

নিজের ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকলাম, তখন সেখানে বাইরের কেউ ছিল না। সত্যসুন্দরদা রিসেপশন কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে নাটকীয় কায়দায় আমাকে অভ্যর্থনা করলেন।

আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। সত্যসুন্দরদা হাসতে হাসতে বললেন, "জানোই তো, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে হোটেলের চাকরি নয়।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো। আমার ডিউটি শেষ হবে, উইলিয়ম ঘোষ এসে পড়বে। ওকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে, দু'জনে একসঙ্গে ব্যূহভেদ করে ভিতরে ঢুকবো।"

"উইলিয়ম কী ওপরেই থাকে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, ও বাইরে থেকে আসে। বৌবাজারের মদন দত্ত লেনে থাকে। ওর সঙ্গে তোমার বুঝি আলাপই হয়নি? ভেরি ইন্টারেস্টিং বয়।" সত্যসুন্দরবাবু বললেন।

আমার নজর এতোক্ষণে লাউঞ্জের পুরোনো ছবিগুলোর উপর এসে পড়েছিল। সত্যসুন্দরদাও কাজ শেষ করে বসেছিলেন। আমার সঙ্গে ছবি দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে বললেন, "সত্যি আশ্চর্য। কবেকার কথা। কিন্তু কালের পরিবর্তন স্রোতকে উপেক্ষা করে সিম্পসন সায়েবের শাজাহান হোটেল সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"অথচ আজও বাড়িটাকে দেখে কে বলবে, তার এতো বয়েস হয়েছে?" আমি বললাম।

বোসদা বললেন, "আমাদের উইলিয়ম খুব ভাল ছড়া জানে। খুঁজে খুঁজে অনেক বাংলা প্রবাদও ছোকরা স্টক করে রেখেছে। উইলিয়ম বলে, বাড়ির বয়স বাড়ে না। বয়স বাড়াবাড়ি সম্পূর্ণ নির্ভর করে মালিকের উপর। উইলিয়মের ডাইরিতে লেখা আছে:

ইমারতির মেরামতি
জমিদারির মালগুজারি
চাকরির হাজরি।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সত্যসুন্দরদা বললেন, “উইলিয়ম ঘোষ এখানে থাকলে তোমাকে হয়তো অনেক মানে বোঝাতো। আমার সোজাসুজি মনে হয়— ঠিক সময়ে বাড়ির মেরামত করা, জমিদারির সরকারী খাজনা আর চাকরির হাজরি দেওয়া প্রয়োজন।”

“তা এ-বাড়ির মালিকরা মেরামতিতে কোনোদিন কার্পণ্য করেছেন বলে মনে হয় না।” আমি বললাম।

“ঠিক সময়ে চুন-সুরকির স্নো-পাউডার মাখে বলেই তো বুড়ী চেহারাটা অতো আঁট-সাঁট রাখতে পেরেছে”, সত্যসুন্দরদা হাসতে হাসতে বললেন, “তবে এ শুধু বাইরের রূপ, ভিতরটা ভালভাবে না দেখে কোনো মন্তব্য করলে পরে আপসোসের কারণ হতে পারে!” সত্যসুন্দরদা সকৌতুকে চোখ টিপলেন।

একটা পুকুরের ছবি দেখলাম। দূরে লাটসায়েবের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এই পুকুরটা কলকাতার বুক থেকে কীভাবে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো বুঝতে পারছিলাম না।

সত্যসুন্দরদা বললেন, “এইটাই তোমার সেই বিখ্যাত এসপ্ল্যানেডের পুকুর। ওই এসপ্ল্যানেডে এখন ট্রাম ঘোরাঘুরি করে। ওই পুকুর নিয়ে কত গল্পই যে আছে, সে-সব যদি জানতে চাও, তা হলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। ভারি মজার মানুষ— পুরনো গল্পের যেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। এতো ঘটনাও যে ঘটেছিল, আর এতো ঘটনাও যে মনে রাখা একটা লোকের পক্ষে সম্ভব, তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বুড়ো সায়েব, বহুকাল ধরে কলকাতায় রয়েছেন।”

সত্যসুন্দরবাবু বললেন, ওঁর কাছেই শুনেছি, সে-যুগের লোকের বিশ্বাস ছিল, এই এসপ্ল্যানেড ট্যাঙ্কের কোনো তল নেই। যতোদুর নেমে যাবে শুধুই জল। পুকুরটাতে অনেক মাছ ছিল। তারপর যখন ওই পুকুরের জল পাম্প করে তুলে ফেলবার সিদ্ধান্ত হলো, তখন হোটেল-ডি-ইউরোপের মালিক ফিনবার্গ— সায়েব সাড়ে ছ'শ টাকায় সমস্ত মাছ কিনে নিতে রাজী হলেন। জল ছেচা আরম্ভ হলো। চৌরঙ্গী তখন লোকে নাকারণ্য। অতল দিঘির সত্যই তল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখবার জন্য প্রতিদিন দুরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভিড় করে দাঁড়াতো। এদিকে হোটেল-ডি-ইউরোপের মালিক রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না ; অতগুলো টাকা শেষ পর্যন্ত জলে না যায় কত মাছ উঠবে কে জানে।

জল ছেঁচে নর্দমায় ফেলা হতে লাগলো: আর কুলির মাথায় ঝুড়ি করে পাঁক চালান দেওয়া আরম্ভ হলো ময়দানে। ঐ পাঁকেই তৈরি হলো ডালহৌসি ক্লাবের মাঠ।

শুনেছি, সাড়ে ছ'শ টাকা লাগিয়ে হোটেল-ডি-ইউরোপের মালিক বহু টাকা লাভ করেছিলেন। কতরকমের মাছই যে পাওয়া গিয়েছিল। আর দৈত্যের মতো এক একটা রুই মাছ-মণখানেকের মতো ওজন। দু' একটা অবার পাঁকের মধ্যে লুকিরেছিল। ফিনবার্গ সায়েবের লোকেরা হৈ হৈ করে কাদা থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে এসেছিল।”

মাছের গল্প হয়তো অনেকক্ষণ ধরে চলতো। কিন্তু হঠাৎ কে যেন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের চমকে দিয়েই প্রশ্ন করলে, “চৌরঙ্গীর মাছগুলো যখন জলের দরে নিলামে বিকিয়ে যাচ্ছিল, তখন শাজাহান হোটেলের মালিক কী করেছিলেন?"

বোসদা মুখ ফিরিয়ে বললেন, “আরে উইলিয়ম। দেরি করলে যে?”

"একুট, দেরি হয়ে গেলো স্যাটা। কলকাতার ব্যাপার তো, ট্রামের মেজাজ সব সময় সমান থাকে না। আজ একটু বিগড়িয়ে গিয়েছিল।" উইলিয়ম হেসে উত্তর দিলে।

উইলিয়ম ঘোষের দিকে এতোক্ষণ আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। কালোর মধ্যে এমন সুন্দর চেহারা সহজে নজরে পড়ে না। পরনে যদি ধুতি থাকতো, এবং রংটা যদি একটু ফর্সা হতো তা হলে বলতাম কার্তিক। এমন কুচকুচে কাজল চোখ, একমাত্র ছোটবেলায় আমার পুটুদির ছিল। কিন্তু পুটুদি তাঁর কালো হরিণ চোখে সযত্নে প্রচুর কাজল লাগাতেন। দুর থেকে উইলিয়মকে দেখলে ওই একই সন্দেহ হয়। কিন্তু কাছে এলে তবে বোঝা যাবে, ও-কাজল তার জন্ম থেকেই পাওয়া।

সাদা শার্টের উপর কালো রংয়ের প্রজাপতি টাই পরেছে উইলিয়ম ঘোষ। ছুচলো গোঁফটা যেন গলার প্রজাপতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কাটা হয়েছে। হাল্কা নীল রংয়ের প্যান্ট পরেছে উইলিয়ম। সঙ্গে একই রংয়ের কোট। বোতামখোলা কোটের মধ্য থেকে সাদা শার্টের বুকপকেটটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে সিল্কের রঙীন সুতো দিয়ে লেখা—S। এই 'এস' যে শাজাহানের 'এস', তা না বললেও বোঝা যায়।

খাতাপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে বোসদা বললেন, "উইলিয়ম, তোমার কপাল ভাল। শুভদিনে তোমার নাইট ডিউটি পড়েছে।"

উইলিয়মকে আর কিছুই বলতে হলো না, সে যেন সব বুঝে নিয়েছে। "এক নম্বর সুইট কী বুক হয়েছে? মিসেস...কী এসে গিয়েছেন?"

"মিসেস পাকড়াশী এখনও আসেননি। আজ হঠাৎ নিজে ফোন করে ঘরটা ঠিক করলেন। বোধহয় আগে থেকে জানতেন না। নিশ্চয়ই জরুরী কাজে ভদ্রলোককে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে।"

"টমসন এসেছে?" উইলিয়ম ঘোষ প্রশ্ন করলে।

"হ্যাঁ, টমসন এসে গিয়েছে। দু''খানা দশ টাকার নোট তোমার বাঁধা!" "ব্যাডলাক ব্রাদার! চামড়াটা সাদা হলে, দ,'খানা কেন, আরও অনেক দশ টাকার নোট রোজগার করতে পারতাম।

"নেমকহারামি কোরো না, উইলিয়ম। মিসেস পাকড়াশী ছাড়া আর কাউকে কখনও রিসেপশনিস্টকে টাকা দিতে দেখিনি আমি। ভদ্রমহিলার মনটা খুবই ভাল।"

উত্তরে উইলিয়ম কিছু বলতে যাচ্ছিন, কিন্তু তার আগেই বোসদা বললেন, "এবার মন চলো নিজ নিকেতনে।" চামড়ার ব্যাগটা নিজের হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলাম। বোসদা ডাকলেন, "পোর্টার।"

পোর্টার দূরে টুলের উপর বসে ছিল। উঠে এসে আমাদের দু'জনকে সে সেলাম করলে। কিন্তু বোসদা তার উপর চটে উঠলেন। "টুপিটা বে'কে রয়েছে কেন? ম্যানেজার সায়েব দেখলে, এখনি হাতে একটি চিঠি ভিড়িয়ে দিয়ে বিদায় করে দেবেন।"

ঠিক সার্কাস দলের ক্লাউন। ক্লাউনদের ড্রেস দেখেই যেন শাজাহান হোটেলের পোর্টারদের ইউনিফর্ম তৈরি করা হয়েছিল। বেগুনী রংয়ের গলাবন্ধ কোট—অথচ হাতের অর্ধেকটা কাটা। হাতার মধ্যিখানে আবার সবুজ রংয়ের লম্বা লাইন। সেই লাইনটা প্যান্টের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। মাথায় ভেলভেটের গোল টুপি——সেখানেও ওই সবুজ রংয়ের দাগ। টুপি, কোট এবং প্যান্ট পরার পর একটা তুলি এবং বড়ো রুল-কাঠ নিয়ে কেউ যেন একটা সবুজ রংয়ের সরল রেখা টেনে দিয়েছে। টপির রেখাটা মাঝে মাঝে

বে'কে যেতে বাধ্য—কারণ মাল তোলবার জন্য টুপিটা খুলে প্রায়ই কাঁধের স্প্ল্যাপে আটকে রাখতে হয়।

পোর্টার তাড়াতাড়ি টুপিটা সোজা করে নিয়ে বললে, “কসুর মাফ কিজিয়ে, হুজুর।” বোসদা বললেন, "লাউঞ্জে অতগুলো আয়না রাখা হয়েছে কেন? দেখে নিতে পারিস না?”

পোর্টার আমার হাতের ব্যাগটা তুলে নিলো। আমরা দু’জনে বোসদার পিছন পিছন চলতে শুরু করলাম। “লিফটে যাবে, না হে'টে?” বোসদা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর কী ভেবে বললেন, “না, লিফটেই চলো।।” লিফট্ চলতে আরম্ভ করলো।

দোতলায় একবার থেমে লিফট আবার উঠতে আরম্ভ করলো।

দোতলায় সব ঘর গেস্টদের জন্যে। শুধু মার্কোপোলো কোনোরকমে টিকে রয়েছেন। তিনতলাতে একবার লিফট থামলো। এয়ারকন্ডিশনের এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মুখের উপর নেচে গেলো। তিনতলায় শুধু গেষ্ট।

তিনতলা থেকে লিফট যেমনি আরও উপরে উঠতে আরম্ভ করলো, সঙ্গে সঙ্গে যেন আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হলো। যে লিফটম্যান এতোক্ষণ মিলিটারী কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও যেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এক হাতে পা চুলকোতে লাগলো ; ঠাণ্ডা হাওয়াটাও সুযোগ বুঝে যেন কাজে ফাঁকি দিয়ে গরম হতে আরম্ভ করলো। বোসদা বললেন, “এয়ারকণ্ডিশন এলাকা শেষ হয়ে গেলো। এবার আমাদের এলাকা।”

দরজা খুলে লিফট যেখানে আমাদের নামিয়ে দিলে সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোলাপসেবল গেট বন্ধ করে যেমনি লিফট আবার পাতালে নেমে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কেউ জোর করে আমাদের অন্ধকার কারাগারে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে, গেট বন্ধ করে পালিয়ে গেলো।

বেশীক্ষণ ওই অবস্থায় থাকলে হয়তো ভয় পেতাম। কিন্তু পোর্টার বাঁহাত দিয়ে সামনের দিকে টেনে একটা দরজা খুলে ফেললে। একঝলক ইলেকঠিক আলো দরজা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে হড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো। সেই আলোতে দেখলাম, দরজায় লাল অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা—PULL; দরজাটা পেরিয়ে যেতে সেটা আপনা আপনিই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলো। দরজার এদিকে একইভাবে লেখা — PUSH

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বোসদা হেসে বললেন, “বুঝতে পারলে না! দু’নিয়ার পুরোনো নিয়ম। এদিক থেকে ঠেলো, ওদিক থেকে টানো। দু’নিয়ায় যাদের কপাল চওড়া, তাদের সৌভাগ্যের দরজা এইভাবেই খুলে যায়। আর অভাগাদের বেলায় ঠিক উল্টো—যেদিকে টানবার কথা, সেই দিকে ঠেলে, আর ঠ্যালার দিক থেকে টানা হয়। তাদের ভাগ্যের দরজা তাই কিছুতেই নড়তে চায় না। আমাদের মধ্যে পাছে সেই ভুল কেউ করে, সেইজন্যই লিখে সাবধান করে দিয়েছি!”

সমস্ত ছাদ জুড়ে ছোটো ছোটো অসংখ্য কুঠুরি রয়েছে, যার মাথায় টালি, টিন, না-হয় এসবেস্টস।

“ওইগুলোই আমাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। আমাদের বিনিপয়স্যর পান্থশালা; আর শাজাহান হোটেলের অন্তরাল।" বোসদা বললেন।

জানলার পর্দা চু'ইয়ে ঘরের ভিতর থেকে সামান্য আলো বাইরে এসে পড়েছে। আকাশ অন্ধকার।

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রায়-উলঙ্গ কোনো মহিলা যেন একটা ইজি-চেয়ারে বসেছিলেন। আমাদের দেখে দ্রুতবেগে সেই নারীমূর্তি কোথায় ঢুকে পড়লেন।

আমি যে সঙ্গে রয়েছি তা যেন ভুলে গিয়ে বোসদা আপন মনে শিস দিতে দিতে নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বোসদার ঘরও অন্ধকার। সাদা পোশাকপরা একজন বেয়ারা ছুটে এলো। তাকে দেখে বোসদা মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বললেন— "হে রাত্রিরূপিণী, আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি!”

সত্যসুন্দরবাবুর ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। ঘরটার তেমন কোনো আব্রু নেই। দেওয়ালগুলোও ইটের নয়। আসলে কাঠের কেবিন। পশ্চিমে আর উত্তরদিকে দু’টো ছোটো ছোটো জানলা আছে। দক্ষিণে এক পাল্লা দরজা, ঠিক রাস্তার উপরেই। দরজা খোলা রাখলে ভিতরের সবকিছু দেখা যায়।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই সত্যসুন্দরদা প্রথমে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দু''এক মিনিট মড়ার মতো চিৎ হয়ে

পড়ে থাকবার পর, সত্যসুন্দরদার দেহটা একটু নড়ে উঠলো। শোয়া অবস্থায় তিনি বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা মহলে সত্যসুন্দরদার প্রভাপের নমুনা পেলাম। সে ঘরের মধ্যে ঢুকেই, কোনো কথা না বলে সত্যসন্দবদার পা থেকে জুতোটা টেনে বার করে নেবার জন্যে ফিতে খুলতে লাগলো।

বেয়ারা সাবধানে জুতো জোড়া খাটের তলায় স্যরিয়ে দিয়ে, অভ্যস্ত কায়দায় পায়ের মোজা দু'টোও খুলে নিলো। পাশে একটা সস্তা কাঠের রং-ওঠা আলমারি ছিল। সেইটা খুলে বেয়ারা একজোড়া রবারের স্লিপার খাটের কাছে রেখে দিলো।

সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমাদের দু'জনের আলাপ হওয়া প্রয়োজন।" বেয়ারার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "ইনি আমার গার্জেন, গুড়বেড়িয়া।" আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "বৎস গুড়বেড়িয়া, এই বঙ্গসন্তান নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন। শাজাহান হোটেলের ছোটোলাট সায়েব বলে একে জানবে। রোজী মেমসায়েবের ঘরে আপাতত ইনি থাকবেন।"

গুড়বেড়িয়া বেচারা বিনয়ে গলে গিয়ে, মাথার পাগড়ি সমেত ঘাড় নামিয়ে আমাকে নমস্কার করলে।

সত্যদা বললেন, "গুড়বেড়িয়া, ৩৬২-এ ঘরের চাবিটা নিয়ে এসো। সায়েব ওঁর নিজের ঘরে চলে গিয়ে এখন বিশ্রাম নেবেন।"

গুড়বেড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট-টার্ন করে প্রায় ছুটতে ছুটতে চাবির সন্ধানে চলে গেলো। সত্যদাকে বললাম, "বাঃ, বেয়ারাটি বেশ তো।" সত্যদা হেসে ফেললেন, "এখন বেশ না হয়ে ওর উপায় নেই । শ্রীমান গুড়বেড়িয়া বর্তমানে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আগে তিনতলায় ডিউটি পড়তো ওর। সেদিন আধ ডজন কাপ ভেঙে ফেলায়, কর্তারা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হোটেলের অতিথিদের কাছ থেকে বদলি হয়ে শাজাহানের স্টাফের সেবায় আত্মনিয়োগ করাটা অনেকটা বার্মাশেলের চাকরি ছেড়ে মাখনলাল হাজরার গোলদারী মসলার দোকানে খাতা লেখার কাজ নেওয়ার মতো। বেচারাকে হাতে না নেরে ভাতে মেরেছেন ম্যানেজার সায়েব। বকশিশের ফোয়ারা থেকে

ছাদের এই মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিকে হেড বেয়ারা পরবাসীয়া নিজের মেয়ের সঙ্গে ওর একটা সম্বন্ধ করছিল। শ্রীমানের এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সেও পেছিয়ে যাবার মনস্থ করেছে। বেচারা এখন তাই আমার সেবা করে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করছে। ওর ধারণা, পরবাসীয়া এবং মার্কোপোলো দু'জনের উপরই আমার বেজায় প্রভাব। আমার কোনো অনুরোধই ওঁরা নাকি ঠেলতে পারবেন না।"

সত্যদা আরও কিছু হয়তো বলতেন। কিন্তু চাবি হাতে গুড়বেড়িয়া এসে পড়াতে তিনি চুপ করে গেলেন। গুড়বেড়িয়া আমাকে বললে, "চলুন স্যর।" সত্যদা বললেন, "আমার কি আর তোমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন আছে?"

"মোটেই না। গুড়বেড়িয়া আমাকে সব দেখিয়ে দেবে।"—বলে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

৩৬২-এ ঘরটা যে কয়েকদিন খোলা হয়নি, তা দরজার উপরে জমে ওঠা ধুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে। চাবি খুলে ভিতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েই গুড়বেড়িয়া বোধহয় অন্য কোনো কাজে সরে পড়লো।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমি কিন্তু বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। এই ঘরেই যে রোজী থাকতো, তা ঢোকামাত্রই ড্রেসিং টেবিলের উপর যত্ন করে রাখা প্রসাধন সরঞ্জাম দেখেই বুঝতে পারলাম। যাবার সময় রোজী বোধহয় কিছুই নিয়ে যায়নি। ওর জিনিসপত্তর সবই পড়ে রয়েছে, মনে হলো। যেন একটু আগে ছুটি নিয়ে মেয়েটা সিনেমা দেখতে গিয়েছে, এখন আবার ফিরে আসবে। এবং এসেই দেখবে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটা অচেনা পুরুষ গোপনে তার শোবার ঘরে ঢুকে বসে রয়েছে।

এ-ঘরটা ছাদের পূর্বপ্রান্তে। ভিতর এবং বাইরের দেওয়াল ও দরজা ঘন সবুজ রংয়ের। মাথার উপর চটের সিলিঙটা কিন্তু সাদা। ছোট্ট ঘর। একটা খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল এবং একটা ওয়াড্রোব প্রায় সবখানি জায়গা দখল করে বসে আছে। চেয়ার আছে--কিন্তু মাত্র একটা। কৌতূহলী আগন্তুকদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার জন্যই যেন চেয়ারের এই ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম অনটন।

রোজীর বিছানার উপর একটা রঙিন চাদর ঢাকা ছিল। তার উপরে বসেই জুতোটা খুলে ফেললাম। জামা ও প্যান্ট পাল্টিয়ে, বাঙালী কায়দায় একটা কাপড় পরতে পরতেই যেন সোঁ সোঁ করে আওয়াজ আরম্ভ হলো। আকাশ যে কখন কালো মেঘে ভরে গিয়েছিল খেয়াল করিনি। প্রকৃতির প্রতি আমাদের ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞাতে বিরক্ত হয়েই যেন, কালবৈশাখ তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

হাওয়ার দৌরাত্ম্যে ৩৬২-এ ঘরের দরজাটা দেওয়ালের উপর আছড়ে পড়তে আরম্ভ করলো। বাইরে থেকে চবিটা খুলে নিয়ে, ভিতর থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলাম। জানলাগুলোও তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হলো—কিন্তু তার আগেই বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানার কিছু অংশ ভিজিয়ে দিয়ে গেলো। মাঝেমাঝে বিদ্যুতের চকমকি জানলার সামান্য ফাটলের মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে আমাকে যেন শাসিয়ে গেলো। ওরা যেন বুঝতে পেরেছে, এ-ঘরে আমি অনধিকার-প্রবেশকারী।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। টিনের ছাদের উপর পাড়ার একদল বিশ্ববকাটে ছোঁড়া যেন অবিশ্রান্তভাবে তবলার চাঁটি মেরে চলেছে। আমি যে ছাদের মাথায় একটা ছোট্ট ঘরে বসে আছি, মনেই রইলো না। যেন লোকবসতি থেকে বহুদু'রে কোনো নির্জন দ্বীপে, আমি নির্বাসিত জীবন যাপন করছি। অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল সুযোগ যেন চিরকালের মতো ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

জামাকাপড়গুলো রাখবার জন্য আলমারিটা খুলেই চমকে উঠলাম। রোজীর অনেকগুলো গাউন সেখানে হ্যাঙারে ঝুলছে। পাল্লা খোলামাত্র বাইরের হাওয়া এসে গাউনের ফুলবনে যেন বিপর্যয় বাধিয়ে বসলো। সিল্ক, রেয়ন আর নাইলনের অঙ্গবাসগুলো নারীসুলভ চপলতায় খিল খিল করে হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওরা যেভাবে ঝুলছে, তার মধ্যেও যেন ভয়ানক কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে—প্রথমে ঘন কালো, তারপর ঘন সবুজ, এবার সাদা, তারপর টকটকে লাল। মাইনের সব টাকাই ভদ্রমহিলা বোধহয় জামা কিনতে খরচ করতেন। আলমারির বাঁদিকের পাল্লাতে ব্রাইট স্টীলের ফ্রেমে বন্দী একটা ছবি যেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

ফ্রেমের মধ্যে বসে-থাকা মহিলাটিই যে রোজী, তা কেউ বলে না-দিলেও আমার বুঝতে দেরী হলো না। এমন সর্বনাশা ভঙ্গীতে কোনো মেয়ে যে নিজের ছবি তুলতে দিতে রাজী হতে পারে, এবং তুললেও নিজের কাছে সযত্নে রাখতে পারে তা এ-ছবিটা না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। রোজীর সম্পূর্ণ দেহটা ওখানে নেই। অর্ধেকও নেই। কিন্তু যতটুক; আছে, তার সবটুকুই এক পৈশাচিক প্রভাবে হাসছে। রোজীর পুরু ঠোঁট দু'টো সামান্য উল্টে রয়েছে। চোখ দু'টো যেন নিজেরই দেহের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে।

ওর চুলগুলো কোঁকড়া—আফ্রিকার কোনো গহন অরণ্যের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে যেন ওই সাপের ফণাওয়ালা চুলগুলোর মধ্যে। এই মেয়ে টাইপ করে! ওর দাঁতগুলো ছবিতে ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে সামান্য উকি দিচ্ছে। আলো আধারে ছায়াতে তোলা ছবি। কিন্তু কে যেন ওর দাঁতগুলোর উপর আলো ফেলে সেগুলোকে স্পষ্ট করে তুলেছে। সেই আলোরই খানিকটা আইন অমান্য করে ওর বুকের উপরে এসে পড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রোজী বুঝতে পেরে তা হতে দেয়নি, শিথিল অঙ্গবাস দ্রুতবেগে ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছিল।

ওকে ইউরেশীয় ভেবেছিলাম। কিন্তু ছবিতে যেন আর এক মহাদেশের ইঙ্গিত পেলাম। ওর চোখে, ম,খে, দেহে সর্বর যে মহাদেশটি ছড়িয়ে রয়েছে, তার একসময় নাম ছিল 'অন্ধকার মহাদেশ'— এখন অন্ধকার তুলে দিয়ে শুধু বলে আফ্রিকা।

আর কোথাও রাখবার জায়গা নেই বলেই আমার জামা-কাপড়গুলো আলমারির মধ্যেই ঢোকাতে হলো।

এই ঘরে রোজী নেই বটে, কিন্তু সারাক্ষণই অশরীরিণী রোজী উপস্থিত রয়েছে। এই প্রাচীন হোটেলবাড়ির বিদেহী আত্মারাও বোধ হয় রাত্রের অর্ধকারে, ক্যাবারে কনসার্টের কোলাহল থেকে দূরে, এই খালি ঘরখানাতে আশ্রয় নিয়েছিল। গঙ্গার ওপার থেকে কাসুন্দের এক ছোঁড়া তাদের শান্তির আশ্রয়ে অহেতুক যেন বিঘ্ন ঘটাতে এসেছে। বাইরে বিরক্ত বৈশাখের বৃষ্টি তাই তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করছে, "কে গা? কে তুমি?"

সে-রাত্রের কথা মনে পড়লে, এতোদিন পরেও আমার হাসি লাগে। নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই অবাক হয়ে যাই। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে বিরক্ত বৃষ্টি ঝড়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাপাদাপি শুরু করেছে। শাজাহান হোটেলের শতাব্দী প্রাচীন আত্মা আরও জোরে জিজ্ঞাসা করছে, "কে তুমি? কেন তুমি এখানে?"

ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। এই ক'দিন ওটার দিকেও কেউ যেন নজর দেয়নি। বাথটাবের ভিতর খানিকটা সাবানগোলা জল জমা হয়ে রয়েছে। টাবের ফুটোটা বাঁ-হাত দিয়ে খুলে দিলাম। জলটা বেরিয়ে যেতে, কলের মুখটা পরোপরি ঘুরিয়ে দিলাম। তোড়ে জল বেরিয়ে, টাবটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু বাথরুমের মধ্যেও যেন রোজী রয়েছে। তার সাবানদানি, টয়লেটের সরঞ্জাম, টুথপেস্ট, ব্রাস অনাদৃত রয়েছে।

অনভ্যস্ত আমি বৃষ্টিটা থামলে যেন একটু ভরসা পেতাম। বোসদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, "এ কোথায় এলাম?"

বোসদা নিশ্চয়ই, তাঁর স্বভাবসমূলভ রসিকতায় উত্তর দিতেন, কলকাতার প্রাচীনতম শাজাহান হোটেলে।

হ্যাঁ, প্রাচীনতম। বোসদার কাছেই শুনেছিলাম—

সে কিছু আজকের কথা নয়। কোন দুর শতাব্দীর এক অখ্যাত বর্ষামুখর অপরাহ্নে জব চার্নক নামে এক ভদ্রলোক হুগলী নদীর তীরে এই কলকাতায় তাঁর তরী ভিড়িয়েছিলেন। সেদিন তাঁর কষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু সেই ক্লান্ত অতিথিকে আশ্রয় দেবার জন্য কোনো সরাইখানার দরজা খোলা ছিল না। সুতানুটি হুগলীর লোকেরা তখন হোটেল বা সরাইখানার নামও শোনেননি। জীবন তখন ছিল অনেক কঠিন। সে-রাত্রে চার্নক সায়েব নিজেই নিশ্চয় সব ব্যবস্থা করেছিলেন, যেমন অনাদিকাল থেকে বিদেশী পথিকরা করে এসেছেন।

তারপর কতদিন কাটলো। নীল সমুদ্রের ওপার থেকে আরও কত আগন্তুক কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করলেন। কিন্তু তখনও তাঁদের আশ্রয়ের জন্য কলকাতার নোনামাটিতে কোনো হোটেল গজিয়ে ওঠেনি।

হাসতে হাসতে বোসদা বলেছিলেন, "ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মুখস্থ করেছিলাম, কিন্তু তখন তার মানে বুঝতে পারিনি—দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। এখন বুঝি, কবি যা 'মিন' করেছিলেন, তা হলো—পৃথিবীর সব দেশেই হোটেলের ঘর রয়েছে। অনেক ঘরই দেখছি, কিন্তু কোনোটাই তেমন পছন্দ হচ্ছে না। এখনও মনের মতো ঘর খুঁজে মরছি। কবি যদি আরও একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে অমন সুন্দর কবিতাটা লেখা হতো না। কারণ তখন ভো ক্যালকাটাতে কোনো হোটেলই ছিল না।

কলকাতার বুকে তখন যা গজিয়ে উঠছে তার নাম ট্যাভার্ন। আমাদের উইলিয়ম ঘোষের ভাষায়, 'মদ বোঝাই করবার পেট্রোল পাম্প'। হুগলী নদীর তীরে জাহাজ বেধে রেখে আনন্দপিয়াসী ঘর ছাড়া নাবিকের দল ছুটে আসতো কলকাতার সরাইখানায়। জীবনের কত বিচিত্র অধ্যায়ই না সেদিন অভিনীত হতো এই রঙ্গমঞ্চে!—বোসদা বলেছিলেন।

এতোদিন পরে, অন্য এক শতাব্দীর উন্মাদ কোলাহল সত্যিই যেন আমার কানে এসে বাজতে লাগলো। সেদিনের তপ্ত কামার্ত নিঃশ্বাস যেন আজ রাত্রে আমার অসতর্ক' দেহের উপর এসে পড়েছে। প্রথমে দেহটা কেমন যেন শিরশির করে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে গিয়েছিল, যে বিশাল পুরীর সবচেয়ে উপরতলার নির্জন ঘরে এই বিজন রাত্রে আমি জেগে রয়েছি এবং সেখানে আমি আরও অনেক রাত্রি যাপন করবো, সেখানেও ইতিহাসের কত অনধীত অধ্যায় ধূলোয় মলিন হয়ে পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে।

যে বাড়িতে আমি প্রভাতের মিলন প্রতীক্ষা করছি, সোনার আলোর রথে চড়িয়ে রূপসী রাত্রিকে যে বাড়ি থেকে বিদায় দিতে চাই, সেটি আজকের নয়। এই শতাব্দীরও নয়।

"কোনো কিছুই স্থায়ী হয় না, এই আজব নগরে"—বোসদা বলেছিলেন। "জীবন? সেও স্থায়ী নয়। অমন যে জবরদস্ত চার্নক সায়েব, তিনিও দু' বছরের মধ্যে কলকাতার এই

নোনা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে তাড়াতাড়ি কবরের গর্ভে পুরে, তবে যেন শান্তি পেয়েছিল কলকাতা।”

গতকাল সত্যসুন্দরদা বলেছিলেন, “খ্যাতি? সেও এখানে পদ্মপত্রে জলের মতোই দীর্ঘস্থায়ী। গতকাল যিনি রাজা ছিলেন, শাজাহান হোটেলের সবচেয়ে দামী ঘরে রাত্রিযাপন করেছিলেন, আজ তিনি ফকির হয়ে কলকাতার পথে আশ্রয় নিয়েছেন। এই শহরের জীবন, যৌবন এবং অন্য সবই যেন ক্ষণস্থায়ী। মহাকালকে চোখ রাঙিয়ে, কলকাতার মাটিতে কোনো কিছুই দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করে না।"

“এরই মধ্যে অবিশ্বাস্য দম্ভে শাজাহান হোটেল দাঁড়িয়ে রয়েছে।” বোসদা বলেছিলেন, “বহু রাত্রির বহু দুঃখ, শোক, আনন্দ, উৎসব, কামনা, লোভ, গ্রহণ ও ত্যাগের ইতিহাস বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে আজও সে বেঁচে রয়েছে। কিন্তু সময়কে এমনভাবে অবজ্ঞা করে সে যে এতোদিন টিকে থাকবে, তা সিম্পসন সায়েবও ভাবতে পারেননি।”

সেণ্ট জন্স চার্চের কবরখানা থেকে উঠে পড়ে, আজ রাতে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে সিম্পসন সায়েব যদি তাঁর প্রিয় শাজাহান হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ান, তবে তিনি অবাক হয়ে যাবেন। তাঁর কীর্তির রথ তাঁকে বহু পিছনে ফেলে রেখে কলকাতার রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হবেন সিম্পসন সায়েব। অনেক দিন আগে লোকে তাঁকে পাগল বলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আজকাল সারাক্ষণ কী তুমি মদের নেশায় রয়েছো?”

সিম্পসন রাগ করে বলেছিলেন, 'আমি টি-টোটালার--আমি মদ স্পর্শ করি না।'

‘তা হলে কী লাস্যময়ী প্রাচ্যের অহিফেনের আশীর্বাদে রঙিন স্বপ্ন দেখছো?” তারা প্রশ্ন করেছিল।

স্বপ্ন নয়, প্ল্যান করছি। ব্যবস্যার বুদ্ধি।'

‘আকাশে ফোর্ট উইলিয়ম তৈরি করার প্ল্যান!’

‘তা কেন? এই ফোর্ট উইলিয়ামের পাশেই, মাটির বুকে একটা হোটেলের প্ল্যান করছি। কলকাতা ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে অনেককে এখানে আসতে হবে। মাথা গুজবার ঠাঁই-এর জন্যে তারা ট্যাঁকের কড়ি খসাতে দ্বিধা করবে না। তাদের জন্যে আমি

এমন এক হোটেল তৈরি করবো, যা দেখে শুধু তোমরা নও, তোমাদের সন এবং গ্রাণ্ডসনরাও এই সিম্পসনকে ধন্যবাদ দেবে। আমার কোনো স্ট্যাচু থাকবে না, কিন্তু শাজাহান হোটেলের প্রতিটি ব্রেকফাস্ট, প্রতিটি লাঞ্চ এবং প্রতিটি ডিনারের মধ্যে আমি বেচে থাকবো।'"

সিম্পসন সায়েব সেদিন সন এবং গ্র্যাণ্ডসনকে ডিঙিয়ে ভবিষ্যতের আরও গভীরে উকি মারতে সাহস করেননি। আজ রাতে সেন্ট জন্স চার্চের ফাদারদের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে সিম্পসন সায়েব যদি পালিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর হোটেলে যাদের দেখতে পাবেন, তারা তাঁর পরিচিত বন্ধুদের গ্র্যাণ্ডসন নয়, গ্র্যাণ্ডসনের গ্র্যাণ্ডসনও নয়। গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট—যতগুলো ইচ্ছে গ্রেট বসিয়ে দিয়ে, আমাদের এই ছাদে এসে তিনি দাঁড়াতে পারেন।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শুনতে পেলাম। কে যেন বার বার নক্, করছে। ধড়মড় করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি গুড়বেড়িয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি কখন থেমে গিয়েছে।

গুড়বেড়িয়া বললে, "হুজুর, আপনি আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?" সত্যি। বৃষ্টির ঘুমপাড়ানি ছন্দে, কখন যে চোখে ঘুম নেমে এসেছিল বুঝতে পারিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত্রি অনেক হয়েছে।

গুড়বেড়িয়ার উপর রাগ হলো। এতো রাত্রে এমনভাবে ডেকে তোলবার কী প্রয়োজন ছিল?

মনে হলো গুড়বেড়িয়া ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে, "হুজুর, রাত্রে আলো জ্বালিয়ে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন না। আপনারও মুশকিল, আমারও মুশকিল।"

চোখের পাতা দু'টো রগড়াতে রগড়াতে বললাম, "কেন?"

গুড়বেড়িয়া ফিসফিস করে বললে, "সিমপসন সায়েব পছন্দ করেন না। কোনো কিছুর অপচয় তিনি দেখতে পারেন না।"

"সিম্পসন সায়েব?"

"হ্যাঁ, হুজুর," গুড়বেড়িয়া বললে। "যারা রাত্রে ডিউটি দেয়, তারা সবাই ওঁকে ভয় করে। রাতে তিনি যে ইন্সপেকশনে আসেন। বড্ড কড়া সায়েব, হুজুর। একটুও মায়া দয়া

নেই। সারারাত একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা ঘুরে ঘুরে বেড়ান।"

"সিম্পসন সায়েবকে তোমরা চেনো?"

"হ্যাঁ হুজুর। এই হোটেলের এক নম্বর মালিক। ডান পা-টা একটু টেনে টেনে চলেন। ওঁকে আমরা সবাই চিনি।"

গুড়বেড়িয়ার গলা যেন শুকিয়ে আসছে। ঢোঁক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে সে বললে, "ওই সায়েবের জন্য রাত-ডিউটিতে একটু বিশ্রাম করবার উপায় নেই।"

গভীর দুঃখের সঙ্গে গুড়বেড়িয়া বললে, "হুজুর, মানুষ-সায়েবকে বুঝি। কিন্তু ভূত-সায়েব বড়ো নিষ্ঠুর : একটুও মায়া দয়া করে না।"

গুড়বেড়িয়া বললে, "তখন আমি নতুন চাকরিতে ঢুকেছি হুজুর। রাত দু'টো বাজে। সমস্ত গেস্ট ঘুমিয়ে পড়েছে। সব ঘর ভিতর থেকে চাবিবন্ধ। একটুও শব্দ নেই কোথাও। করিডরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। একটু ঝিমনির মতো আসছিল। টুলের উপর বসে, পা দু'টো তুলে সবে একটু চোখ বুজেছি। এমন সময় মনে হলো, কে যেন আমার কোমরের বেল্ট খুলে নিচ্ছে।

"চমকে উঠে বেল্টটা চেপে ধরতেই বুঝলাম সিম্পসন সায়েব এসেছেন। তখন হুজুর ওঁর পা জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু হুজুর ভুতের পা কিছুতেই ধরা যায় না। অথচ কোমরের বেল্টটা এবার খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। বললাম, আমি নতুন লোক, সায়েব। আর কখনও ভুল হবে না।

"উনি কোনো কথায় কান না দিয়ে, বেল্ট নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কী ভেবে, তিনতলার শেষ কোণে বেল্ট ফেলে রেখে চলে গেলেন।"

গুড়বেড়িয়ার কথা শুনে আমি আধা ঘুমন্ত অবস্থাতেও হেসে ফেলতে যাচ্ছিলাম।

গুড়বেড়িয়া বললে, "হাসবেন না, হুজুর। হাবসি সায়েবকে জিজ্ঞাসা করবেন। এখানে সবাই জানে, সিম্পসন সায়েব বেচে থাকতে, সারারাত ধরে বেড়াতেন। দেখতেন, সবাই কাজ করছে কিনা। কাউকে ঘুমোতে দেখলেই, তার বেল্ট খুলে নিতেন। পরের দিন সকালে জরিমানা দিয়ে বেল্ট খালাস করতে হতো। বেল্ট না পরে ডিউটিতে আসা একদম বারণ ছিল।"

আলো না-নেভাবার জন্য গুড়বেড়িয়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় সিড়ির কাছে চার-পাঁচজনের খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। সেই মিলিত হাস্যে নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বর ছিল।

গুড়বেড়িয়া চাপা গলায় বললে, "আমি চললাম। আপনিও আর কথা বলবেন না।"

কিছু বুঝতে না পেরে, একটু, রেগে বললাম, "কেন?"

ফিসফিস করে গুড়বেড়িয়া বললে, "অনেক রাত হয়েছে। ল্যাংটা মেমসায়েবরা ঘরে ফিরে আসছেন। আপনি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন।" আমাকে এক ভয়াবহ রহস্যের মধ্যে ফেলে রেখে গুড়বেড়িয়া দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আলো নেভালাম, শুয়েও পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসে না। আমার পরিচিত কাসুন্দের দরিদ্র ঘুম যেন শাজাহান হোটেলে ঢুকতে সাহস করছে না।

ওদিকে ছাদের উপর কারা খিলখিল করে হেসে উঠছে। সিড়ি বেয়ে হৈহৈ করে যে মেমসায়েবরা উপরে উঠে এলেন, গুড়বেড়িয়া যাঁদের এক অদ্ভুত নামে ডাকল, তাঁদেরই গলা। ঠিক আমারই পাশের ঘরে ওঁদের দু" একজন এসে ঢুকলেন। পাতলা কাঠের পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের গলার আওয়াজ পুরোপুরি ভেসে আসছে। তাঁরাও কিছু চাপা গলায় কথা বলবার চেষ্টা করছেন না।

আমার ঘর অন্ধকার হলেও ওঁদের ঘরে আলো জলছে। এবং সেই আলোরই কিছুটা কাঠের পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করছে।

"বাটলার, বাটলার!" ও-ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কে যেন ডেকে উঠলেন।

বেচারা গুড়বেড়িয়া যে ও-ঘরে ছুটে গেলো, তা বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি বুঝতে পারলাম।

"ইউ বাটলার হ্যায়?" মেমসায়েব বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলেন।

"না 'মেমসাব। আই গুড়বেড়িয়া ওয়েটার।"

শুধু ওয়েটার বললেই ভাল করতো। কিন্তু মধ্যিখানে নিজের নামটা ঢুকিয়ে দিয়েই গুড়বেড়িয়া মেমসায়েবকে আরও বিপদে ফেলে দিলে। কয়েকটা অশ্লীল শপথ করে মেমসায়েব বললেন, "তুমি কী ধরনের ওয়েটার?" সঙ্গে বোধহয় আরও কোনো ভদ্রমহিলা

বসে ছিলেন। কারণ, শুনতে পেলাম মেমসায়েব বলছেন, "আই টেল ইউ মামি, দিস ইজ মাই লাস্ট ভিজিট টু ইণ্ডিয়া। এই শেষ, আর কখনো এই পোড়া দেশে আসবো না।"

ইণ্ডিয়াতে এসে মহিলা যে প্রচণ্ড ভুল করছেন, সে-কথা মেমসায়েব তাঁর মাকে বার বার বোঝাতে লাগলেন। "মামি, এতো জায়গা থাকতে ইন্ডিয়াতে আসতে কেন তুমি রাজী হলে?" মেমসায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

এ'রা কারা? বুঝতে পারছি না। কিন্তু সারা রাতই যে তাঁরা কথা বলে কাটিয়ে দিতে পারেন তা বুঝলাম।

মেমসায়েব এবার গুড়বেড়িয়াকে শুদ্ধ ইংরিজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুইস্কির হিন্দী কি?"

হুইস্কির হিন্দী যে হুইস্কিই, তা শুনে বললেন, "চাই। এখনই চাই।"

"বার আণ্ডার লক অ্যান্ড কি"—গুড়বেড়িয়া খানিকটা ইংরিজীতে, খানিকটা মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিলে, বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন ঠাণ্ডা পানি ছাড়া আর কিছুই সে দিতে পারবে না।

"ও মামি, তুমি আমাকে কোন ফরেস্টে নিয়ে এসেছো?" বলে মেয়েটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মা বোধহয় তখন সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, "কেমন করে জানবো, ক্যালকাটায় রাত একটার পর কোনো বার খোলা থাকে না? সোনা আমার, বাছা আমার, ঘমিয়ে পড়বার চেষ্টা করো, এখনই ভোর হয়ে যাবে।"

মেয়ে তখন গালাগালি শুরু করেছেন। "গেট আউট, গেট আউট। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা। তুই শুধু আমার টাকা ভালবাসিস। ওনলি মানি। টাকার বদলে মেয়েকে তুই শার্কদের কাছেও ছেড়ে দিতে রাজী আছিস।"

"প্যামেলা, প্যামেলা"— ভদ্রমহিলা কাতরভাবে মেয়েকে সংযত করার চেষ্টা করলেন।

"বেরিয়ে যা' বেরিয়ে তুই নিজের ধরে যা, আমি এখন আনড্রেস করবো। আমার সামনে কেউ থাকবে না।" মেয়ে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠলেন।

“মাই ডিয়ার গার্ল, আমি তোমার মা। মায়ের কাছে তোমার সঙ্কোচ থাকতে পারে না। আমারও মা ছিল। আমি তো কখনও অবাধ্য হতাম না।” ভদ্রমহিলা বোঝানার চেষ্টা করলেন।

"ও, সেইজন্যে বুঝি তুই আঠারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলি? বাটলারের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলি?” মেয়ে ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন।

মা এবার রেগে উঠলেন “প্যামেলা আমি যাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম তিনি তোমার বাবা।”

“ইয়েস! বাট হি ওয়াজ এ বাটলার।" মেয়ে এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

আর আমার সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠলো। এ আমি কোথায় এলাম? এ জগতের কিছুই যে বুঝতে পারছি না। সত্যসুন্দরদার উপর আমার রাগ হলো। আমাকে এই ভাবে ফেলে তিনি কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন।

আমার অনেক পরিচিত মুখ যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। রামজী হাজরা লেনের ছোকাদা, উমেশ ব্যানার্জি লেনের হেজোদা, নবকুমার নন্দী লেনের পানুদা, কাসুন্দের কেষ্টদা—সবাই এখন ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছেন। শুধু, আমি জেগে রয়েছি। আমার জাগবার ইচ্ছে নেই, তবু জেগে রয়েছি চোখের পাতা বন্ধ করতে সাহস হচ্ছে না।

ওদিকে পাশের ঘরে তখন পুরোদমে কথা-কাটাকাটি চলেছে। ভদ্রমহিলার বাটলার বাবার অর্ধেক গোপন কাহিনী ইতিমধ্যে আমি জেনে ফেলেছি। বুড়ী মা শেষ পর্যন্ত বললেন, “তা হলে আমি কি অন্য ঘরে গিয়ে শোবো?”

"ইয়েস, ইয়েস। কতবার তোকে বলবো? আর এখনও যদি না যাস, তা হলে আমি বয়কে ডাকবো, বার করে দেবার জন্যে।"

ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “একলা শুয়ে থাকতে পারবি তো? ভয় করবে না তো!”

খিলখিল করে হেসে মহিলা বললেন, “আমার মরার দিন পর্যন্ত তুই আমার পাশে শুয়ে থাকবি, তা আমি জানি।”

ভদ্রমহিলার মা এবার বিদায় নিলেন বোধহয়। শুভরাত্রি জানালেন তিনি। "গুড্ নাইট, মাই গার্ল'। মে গড ব্লেস ইউ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

ও-ঘরের আলো এবার নিবে গেলো। শাজাহান হোটেলের রাত্রি এবার যেন সত্যিকারের রাত্রে রূপান্তরিত হলো। আর গোবেচারা কাসুন্দের ভয়-পাওয়া ঘুম এবার সাহস পেয়ে পা টিপে টিপে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

সেইভাবে কতক্ষণ যে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। দরজায় খুব আলতোভাবে যেন টোকা পড়ছে। জর্জ টেলিগ্রাফ ইস্কুলে একবার টেলিগ্রাফ শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। একটা টেলিগ্রাফ কলও কিনেছিলাম। ঠিক তেমনি শব্দ—টরে টক্কা, টরে টক্কা।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, অন্ধকারে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতেই চাপা পুরুষালি আওয়াজ পেলাম—"প্যামেলা, তুমি দরজা খুললে তা হলে। আমি ভাবছিলাম তুমি খুলবে না।"

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে আমি চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, "হোয়াট? কে? কে আপনি?"

রাত্রের আগন্তুক এবার বোধহয় সংবিৎ ফিরে পেলেন। মাথা নিচু করে পালাতে পালাতে বললেন, "স্যরি, রং নাম্বার।"

আমার দেহটা তখন সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছে। স্লিপিং গাউন পরা দেহটা সেই সুযোগে যে কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো বুঝতে পারলাম না। আলো জ্বালিয়ে বাইরে এসে দেখলাম—টুলের উপর গুড়বেড়িয়া অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার পায়ের গোড়ায় একটা বেড়ালও মনের সুখে রাত্রির বিশ্রাম গ্রহণ করছে। ওদিকে টুলের পাশে একটা টেবিলে আর একটা বেড়াল পরম সুখে শেষ রাত্রের নিদ্রা উপভোগ করছে। গুড়বেড়িয়ার মাথার উপর একটা আলো শুধু জেগে রয়েছে—সব কিছু দেখে শুনে আলোটাও যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে।

রাত্রির প্রতীক্ষা কাকে বলে জানতাম না। আজ বুঝলাম আমি সত্যিই প্রভাতের অপেক্ষায় জেগে রয়েছি। শাজাহান হোটেলের ছাদের উপরে ময়লা আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, আপিসের হেড ক্লার্ক নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে থেকেই জুনিয়র বাবুদের আবির্ভাবের অপেক্ষায় যেমনভাবে ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকেন, সূর্যের আশায় আমিও সেইভাবে পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তখনও অন্ধকার কাটেনি। ঘোমটার আড়ালে রাঙাবৌ-এর মান-অভিমানের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই প্রায়ান্ধকারে ছাদের কোণে এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। আণ্ডারপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে তিনি খালি হাতের ব্যায়াম করছেন। ছোটার ভঙ্গিতে সামান্য লাফালাফি করছেন—স্লো মোশন পিকচার্সে যেমন দেখা যায়।

কালো মতো ভদ্রলোক। একেবারে তরুণ নন। সরু পাকানো চেহারা, জুলপির চুলগুলো যে পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে, তা দু'র থেকেই বুঝতে পারলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক এক মনে ব্যায়াম করছেন, আর তাঁর সামনে একটা স্টোভে জল ফুটছে। ব্যায়াম করতে করতেই ভদ্রলোক এক একবার জলের দিকে তাকাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক মৃদ, হাসলেন। তারপর চমৎকার বাংলায় বললেন, "নমোস্কার। আপনারও কী ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস?"

বললাম, "না। আমার মা গালাগালি করেও আমাকে সকালে ঘুম থেকে তুলতে পারেন না। কিন্তু কেন জানি না, আজ ভোরবেলায় উঠে পড়েছি।"

ভদ্রলোক যে আমার খবরাখবর রাখেন তা বুঝলাম। তিনি নিজেই বললেন, "রোজীর জায়গায় আপনি এসেছেন তো?"

এবার ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন-"আমার নাম পি সি গোমেজ-প্র'ভাতচন্দ্র গোমেজ। এখানে বাজনা বাজাই—ব্যাণ্ডমাস্টার।"

"আপনি এখানেই থাকেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না থেকে উপায় নেই—রাতে যখন ক্যাবারে শেষ হয়, তখন কলকাতায় বাস ট্রাম থাকে না।"

ভদ্রলোক এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এক গ্লাস জল এনে স্টোভের পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিলেন। "আপনার জন্যেও এক কাপের ব্যবস্থা করছি।”

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি শুনলেন না। বললেন, “প্রথম আলাপ। আমি সামান্য মানুষ, একটু কফি দিয়েই উৎসব করা যাক।” “কফি? এই সাত সকালে?”

গোমেজ হেসে ফেললেন। “হ্যাঁ, ঠিক চারটের সময়, বিনা দু’ধ এবং বিনা চিনিতে এক পাত্র প্রচণ্ড কড়া কফি আমি খেয়ে থাকি। আপনি অত কড়া খেতে পারবেন না। আপনাকে চিনি মিশিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু স্যরি দু’ধের কোনো ব্যবস্থা নেই আমার।”

লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম। এই ভোরবেলায় ভদ্রলোককে কষ্ট দিচ্ছি।

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে গোমেজ বললেন, “ব্রাহ্ম—দি গ্রেট কম্পোজার —তিনি ভোরবেলায় এমনি কফি খেতেন।”

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতেই শূনলাম, ব্রাহ্ম নিজের কফি নিজেই তৈরি করে খেতেন। আর এই তেতো, কড়া এবং কালো কফির কাপে চুমুক দিতে দিতেই তিনি চারটে সিমফনি, দু’টো পিয়ানো কনসার্টো, একটা ভায়োলিন কনসার্টো, আর একটা ডবল কনসার্টো ফর ভায়োলিন অ্যাড চেলো সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

কথাগুলোর অর্থ আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু গোমেজ যে দরদ দিয়েই বলছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল। আমার কাপটা ধুয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গোমেজ কিছুতেই রাজী হলেন না। হেসে বললেন, “তা হয় না। ব্রাহ্মের বাড়িতে যখন সুম্যান আসতেন, তখন কি তিনি কফির কাপ ধুতেন?”

সুম্যান ভদ্রলোক কে আমার জানা ছিল না। আমার মুখের অবস্থা দেখে গোমেজ বোধহয় সঙ্গীতবিদ্যায় আমার গভীরতার আন্দাজ পেলেন। বললেন, “দি গ্রেট সুম্যান। যার একটা প্রবন্ধের জোরে অখ্যাত ব্রাহ্ম রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।”

সঙ্গীতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনো দিনই বিশেষ মুধর নয়। কিন্তু সেই অজ্ঞতা চাপা দিয়ে গোমেজকে প্রশ্ন করলাম, “তার মানে, এখানে আমি কি সেই সঙ্গীত-রস-চুড়ামণি সুম্যান?”

"না, তা হয়তো নন, কিন্তু আপনি আমার অতিথি," গোমেজ বললেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন না করেই বললেন, "ব্রাহ্মের কাছে আমি এই শিখেছি যে, পৃথিবীতে কোনো কষ্টই কষ্ট নয়—কোনো অভাবই অভাব নয়, কোনো বেদনাই বেদনা নয়। আমাদের সকল কাঁটা ধন্য করে সঙ্গীতের ফুল ফুটে ওঠে।"

এদিকে সূর্য আকাশে উঠতে আরম্ভ করেছেন। মিষ্টি হেসে গোমেজ এবার নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বললেন, "ছেলেগুলো এখনও ঘুমোচ্ছে। ওদের জাগিয়ে দেওয়া দরকার।"

আর আমিও নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরেও রাত্রির সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারছিলাম না। উকি মেরে দেখলাম, আমার পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। চায়ের ট্রে হাতে করে গুড়বড়িয়া সেই ঘরের মধ্যে কিন্তু বেমালুম ঢুকে পড়লো। চায়ের ট্রে ভিতরে রেখে দু' সেকেণ্ডের মধ্যে সে ছিটকে বেরিয়ে এলো। মুখটা কুঁচকে গজগজ করে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, "এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেলো। ক্যাবারে মেমসাব ভিতর থেকে চাবিও লাগাবে না, অথচ কাপড়ও পরবে না।"

ঘরের মধ্যে আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখলাম সত্যসুদরদা। ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে করতে সত্যসুন্দরদা বললেন, "নিজে উঠে দরজা খোলার দরকার নেই। শুধু বলবে, কাম ইন। আর যদি দরজা খোলবার অবস্থায় না থাকে। তবে বলবে, জাস্ট-এ-মিনিট। এই মিনিট বলে তুমি হোটেলে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় নিতে পারো।"

সত্যসুন্দরদা জিজ্ঞেস করলেন, "বিছানা-চা পেয়েছো তো?" "বিছানা-চা?"

"হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দাঁত মুখ না পরিষ্কার করে শাজাহান হোটেলের শাজাহানরা যে বেড-টি পান করেন, তারই বাংলা নাম বিছানা-চা।"

বললাম, "এই মাত্র কফি..."

কথা শেষ করতে হলো না। বোসদা যেন হাঁ করতেই সব বুঝে নিলেন। "প্রথম দিনেই ছাত-কফি খেয়েছো তুমি—তুমি তো খুবই লাকি চ্যাপ। দু'নিয়াতে দু'টি মাত্র লোকের ওই

সময়ে কফি পানের অভ্যাস—আমাদের গোমেজ সায়েব, আর জার্মানির ব্রহম সায়েব।”

“ব্রহম না, ব্রাহম”—আমি হেসে বললাম।

"ওই হলো—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। তাছাড়া শেক্সপিয়ার সায়েবই বলে গিয়েছেন—নামে কী আসে যায়? ব্রাহমকে ব্রহাম বললে কি সুরকার হিসেবে তাঁর দাম কমে যাবে, না ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে?” আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যসুন্দরদা এবার কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, “কাল রাত্রে তুমি কি ঘুমোওনি?”

“না, ঘুমিয়েছি তো”। —কোনোরকমে বললাম।

বোসদা সব বুঝলেন। আস্তে আস্তে বললেন, “প্রথম প্রথম অমন হয়। আমারও হয়েছিল। তারপর দেখে দেখে তোমার চোখ পচে যাবে। মনে হবে এইটাই তো স্বাভাবিক।”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোসদা এবার গুড়বেড়িয়াকে ডাকলেন। বললেন, "আমাদের দু''জনের খাবার শংকরবাবুর ঘরে দিয়ে যেও।”

তারপর আমার বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললেন, “তাড়াতাড়ি স্নান করে রেডি হয়ে নাও। একসঙ্গে নিচে নেমে যাবো। শ্রীমান উইলিয়ম ঘোষ এতোক্ষণে আমার ফোর্টিনথ জেনারেশনকে নরকে পাঠাচ্ছে।”

মাখন মাখানো রুটি ও ওমলেট সহযোগে ব্রেকফাস্ট আরম্ভ হলো। চায়ের কাপের আকার দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। তা লক্ষ্য করেই বোধহয় বোসদা বললেন, “ব্রেকফাস্টে ওরা একটু বেশী চা খায়। এই কাপগুলোতর নাম ব্রেকফাস্ট কাপ।”

আমাদের কথাবার্তা হয়তো আরও চলতো। কিন্তু বেয়ারা এসে খবর দিলো, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

“আমার সঙ্গে!” আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই
যিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, তিনি বায়রন সায়েব ছাড়া আর কেউ নন। “গুড মর্নিং। স্যরি, বিনা নোটিশেই তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়লাম।” বায়রন সায়েব বললেন।

ওদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বললাম, “বোসদা, ইনিই বায়রন সায়েব, আমার চাকরি করে দিয়েছেন।”

বোসদা নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বায়রন সায়েব বললো, “আর আপনি হলেন শংকরের বন্ধু, শাজাহান হোটেলের ম্যানেজারের দক্ষিণ হস্ত মিস্টার সত্যসুন্দর বোস। এখানে এগারো বছর কাজ করছেন, তার আগে একবার আপনার মামার মারফৎ গ্র্যাণ্ডে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলেন।”

আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। বোসদা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বায়রন বললেন, “আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আমাদের জেনে রাখতে হয়—জেনে রাখাটাই আমাদের ক্যাপিটাল। আর জানানোটা আমাদের বিজনেস।"

বায়রন এবার আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বোসদা বললেন, “আমি কি উঠে যাবো?”

“না, না, উঠবেন কেন? আপনাকে আমার দরকার। আজ সকালেই একটা খারাপ খবর পেলাম। তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি।”

“কী খবর?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। রোজী বোধহয় ফিরে আসছে।”

“অ্যাঁ!”—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

বায়রন বললেন, “মিসেস ব্যানার্জি মিস্টার ব্যানার্জির খবর পেয়েছেন। বোম্বাইতে মিসেস ব্যানার্জির ভাই খোকা চ্যাটার্জি আমার পাঠানো ঠিকানা থেকে ভগ্নীপতির পাত্তা করেছেন। বকাবকিতে মিস্টার ব্যানার্জির মন সংসারের দিকে আবার ফিরে গিয়েছে। রোজীকেও কীভাবে খোকা চ্যাটার্জি শান্ত করেছেন। মিস্টার ব্যানার্জি যখন ফিরছেন, রোজীও তখন আর কোথায় পড়ে থাকবে? বিশেষ করে বোম্বাই-এর মতো জায়গায় !”

ভোরবেলায় এমন সংবাদ শোনবার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বায়রন বললেন, “এখনই ভেঙে পোড়ো না। আমি মার্কোপোলোর সঙ্গে দেখা করে তবে যাবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি অন্য পোস্ট খালি না থাকে?” বোসদা একটু চিন্তা করলেন, তারপর উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, “কিচ্ছু, ভয় নেই।”

আর সময় নষ্ট না-করে ওঁরা দু'জন মার্কোপোলোর সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। আমি ওঁদের সঙ্গে যেতে সাহস করলাম না। মার্কোপোলোর ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম।

মথুরা সিং আমাকে দেখে বললে, "বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ভিতরে "

মথুরা সিংক আমি বলতে পারলাম না, কেন বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিন প্রধান এতোক্ষণে বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন। মনে মনে-ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়েছি। অযাচিতভাবে তিনি আমাকে বন্ধু দিয়েছেন বিপদের দিনে, প্রতিদানের কোনো আশা না-নিয়েই বায়রন সায়েব এবং বোসদার মতো লোকেরা আমার হয়ে অন্যের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে তাঁরা যখন বেরিয়ে এলেন, তখন দু'জনের মুখেই হাসি। বায়রন বললেন, "যদি তোমার কোনো থ্যাঙ্কস থাকে, মিস্টার বোসকেই দাও। রিসেপশনে দু''জন লোকে যে কাজ চলে না, ক্যাবারেতে টিকিট বিক্রির লোক যে প্রায়ই পাওয়া যায় না, মমতাজ রেস্তোরাঁয় ড্রিংকস এবং ফুডের অর্ডার যে বাধ্য হয়েই বোসকে দশ ঘণ্টা ডিউটির পরেও নিতে হয়, তা মার্কোপোলোকে উনি জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন।"

আমি বোসদার মুখের দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। বোসদ। পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, "এতোদিন শুধু বসে বসে বাক্স বাজাতে: এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে। রোজী অর নো রোজী, তুমি কাউন্টারে ডিউটি দেবে। আমারই লাভ হলো, মিস্টার বায়রন। ওবিডিয়েন্ট ওয়াইফ আর একটা বশংবদ অ্যাসিস্ট্যান্ট না পেলে লাইফে বেঁচে সুখ কী?"

"কাউন্টারের কাজ?" আমি প্রশ্ন করলাম।।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতি ঘোড়া কিছু নেই। তুমিও পারবে।" বোসদা বললেন। "শুধু দু'টো স্যুট তৈরি করে ফেলতে হবে। সে খরচ তোমার নয়, হোটেল দেবে"

"কিন্তু আপনারা যে কতরকমের ভাষা কেমন অনর্গলভাবে বলে যান। আমি তো কোনো ভাষাই ভাল করে বলতে পারি না।" আমি ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলাম।

বোসদা এবার হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, “কাউন্টারে চলো, তোমাকে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলবো।"

কাউন্টারে উইলিয়ম ঘোষ তখন খাতাপত্তর বন্ধ করে বোসদার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাকে বিদায় দিয়ে বোসদা বললেন, “সায়েব তো এখন তোমাকে ডিক্টেশন দিচ্ছেন না; আমার ফাইফরমাস খাটো। সব ট্রেড সিক্রেট 'আাস্তে আস্তে শিখিয়ে দেবো।”

"হ্যা, যা বলছিলাম।”—বোসদা আবার শুরু করলেন। “আমি যেবার চাকরীতে ঢুকেছিলাম, সেবার এঁরা কাগজে যা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তার মানে দাঁড়ায় -- শেক্সপিয়ারের মতো ইংরিজী, রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলা, আর তুলসীদাসের মতো হিন্দী জানা একটি লোক চাই। মাইনে প'চাত্তর টাকা। তার উত্তরে ওঁরা আমার মতো লোক পেলেন। সব কোয়ালিফিকেশনই আছে, কেবল একটু এদিক ওদিক– তুলসীদাসের মতো ইংরিজী, শেক্সপিয়ারের মতো বাংলা এবং রবীন্দ্রনাথের মতো হিন্দী জানা লোক আমি! কিন্তু কাজ কি চলছে না?

এবার রিসেপশনিস্টের গল্প। রোজী বলে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা হোটেলমাতানো টাইপ-ললনার পুনরাবির্ভাবের গল্প। কেমন করে সত্যসুন্দরদার অনুগ্রহে আমি হোটেলের সব রকম কাজ শিখলাম, সবাইকে খুশী করলাম, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলকাতার কালো যাদু' দেখলাম, তার গল্প।

কিন্তু সে-সবের আগে সাদারল্যাণ্ড সায়েবের কাহিনী। আজ এতোদিন পরে কেন জানি না, সাদারল্যান্ড সায়েবের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

সাদারল্যান্ড সায়েবের টানা-টানা পটল-চেরা চোখ দেখে আমার যাঁর কথা মনে হয়েছিল তাঁর নাম কৃষ্ণ। বোসদা বলেছিলেন, "তুমি বড়ো সঙ্কীর্ণ মনের। সব কিছুকে দেশী উপমা দিয়ে বুঝতে চাও। সে-উপমা তেমন ভালো না হলেও, তুমি ছাড়বে না। সেই আদ্যিকালের ঈশ্বর গুপ্তকে আঁকড়ে বসে আছো —দেখো দেশবাসিগণে, কত রূপে স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

আমি বলেছিলাম, "আক্রমণ তো ঠিক হলো না! আমি বিদেশীকে ধরে দেশের ঠাকুর বানাচ্ছি।"

বোসদা বলেছিলেন, "যতোই পাবলিসিটি করো, আমাদের কিষেণচাঁদ কি সাদারল্যান্ডের মতো লম্বা ছিলেন?"

আমি বলেছিলাম, "দরজির ফিতে দিয়ে আমরা দেবতাদের মহত্ত্ব মাপি না।"

"তা মাপো না, কিন্তু রাধিকার দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কোনো অংশই তো বাদ দাও না।" বোসদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন।

তারপর বলেছিলেন, "আমাদের ঠাকুর দেবতারা আমাদের মতোই ছোটোখাটো ছিলেন। সাদারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে যদি কারার তুলনা করতে হয় সে হলো গ্রীক ভাস্কর্যের। এই গ্রীক ভাস্কর্য দেখবার জন্য তোমার গ্রীসে খাবার দরকার নেই। কলকাতার পুরনো জমিদার বাড়িতে এখনও দু'-চারটে ধ্বংসাবশেষ যা পড়ে আছে, তাই দেখলেই বুঝতে পারবে। ওইসব মূর্তির একটা হারিয়ে গেলে, তার জায়গায় সাদারল্যাণ্ডকে বসিয়ে রাখা যেতে পারে।"

আজও যখন সাদারল্যাণ্ডের দেহটা আমার স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে,

তখন বোসদার উপদেশ উল্টোভাবে কাজে লাগাই। চিৎপুর রোডে আমার এক পরিচিত পুরনো বাড়িতে গ্রীক ভাস্কর্যের তৈরি একটা উলঙ্গ পুরুষমূর্তি দেখতে যাই। অবহেলায় অযত্নে এবং আঘাতে সেই অপরূপ পুরুষমমূর্তি আজ ক্ষতবিক্ষত। একটা হাত ভেঙে গিয়েছে, সমুখের কিছু অংশ যেন কোনো দূর্ঘটনায় উড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয় না। বরং সুবিধেই হয়-লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে ওঁর মুখে যে যন্ত্রণাময় বেদনা ফুটে উঠেছিল, তা আবার দেখতে পাই।

সেই যে প্রথম ওঁকে দেখেছিলাম, তখন শাজাহান হোটেলে আমার জীবন সবে শুরু হয়েছে। তখন শুনেছিলাম, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসংস্থার কাজে ভারতবর্ষে এসেছেন তিনি। তারপর তাঁকে অনেকদিন আর দেখিনি। আমিও খোঁজ করিনি। প্রতিদিন কত জনই তো হোটেলে আসছেন, আবার কতজনই তো শাজাহান হোটেলের ঘর খালি করে দিয়ে, ব্যাগ এবং বাক্স সমেত হাওয়াই কোম্পানির জাহাজে চড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়ার মধ্যে কাকে দেখবো, আর কাকেই বা মনে রাখবো?

শুনেছিলাম, কি একটা জরুরী 'ভ্যাকসিন' সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য তিনি এসেছিলেন; এবং কয়েকটি সর্বনাশা রোগের জীবাণু, আইস-বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে তিনি আবার ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

গতরাত্রে লন্ডনের এরোপ্লেন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে দমদমে এসে পৌছেছিল। সেই প্লেনে ডাক্তার সাদারল্যান্ড যখন আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন তখন ঘরের মধ্যে আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়েছিলাম।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, বাইরে বেরিয়ে যে ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডকে ইজিচেয়ারে বসে থাকতে দেখবো, আমি কল্পনাও করিনি। একটা গেঞ্জি এবং ফুলপ্যান্ট পরে তিনি পূর্ব দিগন্তের দিকে স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রয়েছেন। দূ'রে রাস্তায় ভোরের বাস এবং লরীর ঘরঘর শব্দ ভেসে আসছে, তিনি যেন সে শব্দও মন দিয়ে শুনছেন।

ওকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমার গায়ে কোনো গেঞ্জিও ছিল না। একটা লুঙি পরেই বেরিয়ে এসেছিলাম।

গুড়বেড়িয়া বেড-টি দিতে ঘরে আসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ওই সায়েব ছাতে এলেন কী করে?"

গুড়বেড়িয়া বললে, "তা জানি না হুজুর। বোস সায়েব রাতে এঁকে নিয়েই উপরে উঠে এলেন। তিনশো সত্তর খালি ছিল, ওইখানেই ওঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো"

"উপরের এই সব ঘর গেস্টদের দেওয়া হয়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

গুড়বেড়িয়া বললে, "বোস সায়েবের কী যে মতলব জানি না।" গুড়বেড়িয়া যে বোস সায়েবের উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, তা জানতাম। অসন্তুষ্ট হবার কারণও ছিল, পরবাসীয়া কফি হাউসের এক ছোকরার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করছে।

গুড়বেড়িয়া বললে, "বোস সায়েব আমার জন্যে কিছুই করছেন না। অথচ অতো রাত্রে এই ছাদের উপর সায়েবকে নিয়ে এসে তুললেন। প্রথমে, আমার তো ভয় হয়ে গিয়েছিল। উধারের তিনটে ঘরে ল্যাংটা মেমসায়েবরা তখন ঘুমোচ্ছেন। বোস সায়ের সঙ্গে না থাকলে, উ সায়েবকে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিতাম—মার্কোপোলো সায়েবের স্ট্রীকট্ অর্ডার আছে।"

গুড়বেড়িয়ার কাছে আমি অনেক নতুন কথা শিখেছি। সায়েবকে ও মার্কাপালা সায়েব বলে। ক্যাবারে পার্টির বিদেশিনীদের কে ষে ল্যাংটা মেমসায়েব নামকরণ করেছে, তা জানি না। মার্কোপোলো গুড়বেড়িয়ার নিজের নামটির উৎপত্তিও গভীর রহস্যে আবৃত। বোসদা বলেন, ওদের কোনো পিতৃপুরুষ নিশ্চয়ই উলুবেড়িয়াতে গিয়ে গুড খেয়ে এই নামটি সৃষ্টি করেছিলেন। গুড়বেড়িয়ার সামনেই তিনি নিজের এই ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। গুড়বেড়িয়া তাঁর আপত্তি জানিয়েছিল। প্রথমত, সে বা তার বাবা তেলেভাজা খেতে ভালবাসে; তাদের কেউই গুড়ের ভক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, তাদের বংশধর কেউ কখনও উলুবেড়িয়ার ধারে কাছে যায়নি। তাদের যা কিছু কাজকারবার সব এই কলকাতার সঙ্গে। বিশেষ করে কলকাতার পানীয় জল সরবরাহ সমস্যার সঙ্গে তারা বহুদিন জড়িত। জ্যাঠামশায় কর্পোরেশনের জলের পাইপ সারাতেন। বাবাও শাজাহান হোটেলের 'হোল-টাইম' জল-মিস্ত্রি ছিলেন। কিন্তু টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড হয়েও ওয়েটারদের থেকে কম রোজগার করবার জন্য তিনি সারাজীবন আফসোস করে গিয়েছেন। ওরা যা মাইনে পায়,

তার ঢের বেশী পায় বকশিশ। দূরদর্শী গুড়বেড়িয়ার-পিতা তাই ছেলেকে কলের কাজে না ঢুকিয়ে, সোজা হোটেলের চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন।

“কিন্তু কপাল। নইলে, হুজুর, আমার ছাদে ডিউটি পড়বে কেন?" গুড়বেড়িয়া বললো। আমি বললাম, “ছাদেও তো গেস্ট আসতে আরম্ভ করেছে, তোমার কপাল তো খুলে গেলো।”

গুড়বেড়িয়ার মুখে আশার আলোকে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বোস সায়েব তা হলে ওর মঙ্গলের জন্যই, ওই সায়েবকে তিনশো সত্তর নম্বর ঘরে নিয়ে এসে তুলেছেন!

গুড়বেড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বোস সারেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?" "হ্যাঁ, হজুর। তবে আজ আর বারোটা পর্যন্ত ঘুমোবেন না। কোথায় বোধহয় যাবেন। আমাকে একটু পরেই চা দিয়ে তুলে দিতে বলেছেন।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে, ভালোই হলো। ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।” গুড়বেড়িয়া এবার তার পাথর-চাপা ভাগ্যের কথা নিবেদন করতে শুরু করলো। “বোস সায়েব নিশ্চয় তেমন করে বলেননি। না হলে পরবাসীয়ার সাহস কি মেয়েটাকে কফি হাউসের কালিন্দীর হাতে দেবার কথা ভাবে?” আমি চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চা খাচ্ছিলাম। কোনোরকম 'হ্যাঁ, না' বলিনি।

গুড়বেড়িয়া কিন্তু আমার নীরবতায় নিরুৎসাহ না হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “হুজুর, শাজাহান হোটেলের থেকে ভাল হোটেল আর দু’নিয়ায় আছে?”

আমি বললাম, “দু’নিয়াটা যে মস্ত বড়ো।"

গুড়বেড়িয়া আমার উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, "হুজুর, কোথায় কফি হাউস আর কোথায় শাজাহান হোটেল।”

বললাম, “তা বটে। কিন্তু শাজাহান কে জানিস?”

গুড়বেড়িয়া বললে, “পড়া লিখি করিনি বলে কি কিছুই জানি না। উনি মস্ত বড়ো লোক ছিলেন, দু’টো হোটেল বানিয়ে লাখো লাখো টাকা করেছেন। একটা' বোম্বেতে আপন পরিবারের নামে—তাজমহল, আর এই কলকাতায় নিজের নামে শাজাহান।”

হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যাবার অবস্থা। বললাম, “যা আমাকে বললি বললি, আর কাউকে বলিস না। তাজ হোটেল যিনি তৈরি করেছিলেন, তাঁর নাম জামসেদজী টাটা–ও তো সেদিনের ব্যাপার; আর আমরা হলাম বনেদী ঘর—আমাদের এই হোটেলের মালিক ছিলেন সিম্পসন সায়েব।”

ও ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ না করে, গুড়বেড়িয়া জিজ্ঞেস করলে, "তাজ হোটেলের বকশিশ হিজ-হিজ-হুজ-হুজ, না, যা ওঠে তা সবাই সমান ভাগ করে নেয়?”

আমি বললাম, “বাবা, তা তো আমার জানা নেই।”

গুড়বেড়িয়া কোথা থেকে খবর পেয়েছে, অনেক বড়ো বড়ো হোটেলে নাকি বকশিশ বিলের সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়। তারপর প্রতি সপ্তাহে তা সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তেমন ব্যবস্থা যে একদিন শাজাহান হোটেলেও চালু হবে, সে সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই। “তখন?” গুড়বেড়িয়া প্রশ্ন করলে।

কফি হাউসের কালিন্দী আজ না-হয় চার পয়সা, ছ'পয়সা করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওর থেকে বেশী রোজগার করছে। কিন্তু শাজাহান হোটেলে সবাই যখন বকশিশের সমান ভাগ পাবে, তখন পরবাসীয়াকে আঙুল কামড়াতে হবে। মেয়েটাকে সে যে আরও ভালো পাত্রের হাতে দিতে পারতো, তখন বুঝতে পারবে।

গুড়বেড়িয়ার লেকচারের তোড়ে এই সকালেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আরও কতক্ষণ ওর দুঃখের পাঁচালি শুনতে হবে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই পাশের ঘরের এলার্ম ঘড়িটা বাজতে আরম্ভ করলো। গুড়বেড়িয়া বললে, “এখনই বোস সায়েবকে জাগিয়ে দিতে হবে।”

আমার চায়ের কাপটা তুলে নিতে নিতে সে শেষবারের মতো আবেদন করলে এখনও সময় আছে। আমরা এখনও যদি পরবাসীয়াকে বোঝাতে পারি, কড় বড় ভুল সে করতে চলেছে।

বোসদার ঘরে ঢুকতে, কাল রাত্রের ব্যাপারটা জানতে পারলাম। “সজ্জন মানুষ এই ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড”, বোসদা বললেন।

"কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমাদের একটা ঘরও খালি ছিল না। এমনকি তিন তলাতে যে অন্ধকূপ দু'টো আছে, তাও অয়েল অ্যাসোসিয়েশন ওদের বোম্বাই ডেলিগেটদের জন্য নিয়ে নিয়েছে। ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড আমাদের এয়ারমেলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু 'রিগ্রেট' করে আমরা টেলিগ্রাম করেছিলাম। "অত রাত্রে এসে কালকে বললেন, 'তোমাদের তার পাইনি।'

"ভদ্রলোককে চিনি। আমাদের অবস্থার কথা খুলে বললাম। এমনকি টেলিফোনে অন্য হোটেলকে জানালাম। আমার স্পেশাল রিকোয়েস্টে ওরা একটা ঘর দিতে রাজী হলো।

"কিন্তু ওঁর শাজাহান হোটেল কী যে ভাল লেগেছে। বললেন, 'কলকাতায় এই আমার শেষ আসা। শাজাহান হোটেলে থাকবো বলে কতদিন থেকে স্বপ্ন দেখছি।'

"বললাম, 'যে হোটেলে আপনার ব্যবস্থা করলাম, ভারতবর্ষের সেরা হোটেলের মধ্যে সেটি একটি।'

"কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বোধহয় এয়ারপোর্ট থেকে ড্রিঙ্ক করে এসেছিলেন। না হলে কেউ কি বলে, "দরকার হলে শাজাহান হোটেলের মেঝেতে শুয়ে থাকবো। তুমি দয়া করে যা-হয়-কিছু একটা করো।'

তখন বললাম, ছাদে একটা ঘর পড়ে আছে। মোটেই ভাল নয়। টিনের ছাদ, বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়তে পারে।

উনি 'তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমার সঙ্গে উপরে চলে এলেন। অথচ অন্য সব কথাবার্তা শুনে মনে হলো না যে, উনি মদ খেয়ে টাইট হয়ে আছেন।

"ওঁকে তিনশো সত্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে, আমিও এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত্রি শেষ হতে বেশী দেরী ছিল না। ব্যাটা উইলিয়ম বাড়ি যায়নি। ওই প্লেনে অন্য কারও আসবার কথা আছে বলে লাউঞ্জে বসে ঢুলছিল। ওকে কাউন্টারে বসিয়ে আমি চলে এলাম।"

বোসদার কথায় মনে হলো, হয় মার্কোপোলো সাদারল্যান্ডকে বশীকরণ করেছেন, না হয় ভদ্রলোক গুপ্তচরের কাজ করছেন। শাজাহান হোটেলের কোনো অতিথির উপর নজর রাখবার জন্য এখানে থাকা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। বোসদার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে

ঢোকার পথে সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওঁর মুখের সরল হাসিটা যেন ছোঁয়াচে। যে দেখবে, সেই হাসিতে উত্তর না দিয়ে পারবে না। ও হাসি যে কোনো স্পাই-এর হাসি, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড আমাকে কাছে ডাকলেন।

সুপ্রভাত জানালাম। বিনিময়ে সুপ্রভাত জানিয়ে তিনি বললেন, "ভারী সুন্দর সকাল। তাই না?"

"সত্যি সুন্দর সকাল।"

সাদারল্যাণ্ড বললেন, "আমি ডাক্তার মানুষ। রোগ আমাকে আকর্ষণ করে, নেচার আমাকে কখনও বিপথে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আজ আমারও কবিত্ব করতে ইচ্ছে করছে—মনে হচ্ছে, বুকের কাপড় ছিড়ে ফেলে সুন্দরী প্রভাত যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাদার ইণ্ডিয়া তাঁর শাড়ির আঁচলের তলায় যা এতোদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন, বিদেশী সন্তানের সামনে তা এবার পরমস্নেহে তুলে ধরলেন।"

আমি বললাম, "আমাদের মা অকৃপণা। ভারতবর্ষের যেখানে যাবে, সেখানেই তুমি তাঁর এই স্নেহময়ী রূপ দেখতে পাবে।"

"হয়তো তাই।" সাদারল্যাণ্ড বললেন। "কিন্তু আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরেছি যেখানে যেখানে এপিডেমিক হয়, সেখানে থেকেওছি। অথচ কোথাও তাঁকে আবিষ্কার করতে পারিনি। এতোদিন পরে ছুটি নিয়ে এই কলকাতায় এসে আজ যেন তাঁকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করলাম।"

বাইরের রোদ এবার প্রখর হতে আরম্ভ করেছে। নিজের চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাদারল্যাণ্ড আমাকেও তাঁর ঘরে আসতে অনুরোধ করলেন।

বিছানায় নিজে বসে সাদারল্যাণ্ড আমাকে চেয়ারটা ছেড়ে দিলেন। বললেন, "আপনার কাজের ক্ষতি করছি না তো? হয়তো আপনার ডিউটিতে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে।"

বললাম, "এখন আমার ছুটি। ডিউটি আরম্ভ হবে আরও পরে। রাতেও বোধহয় করতে হবে।"

"তা হলে সারারাত আপনাকে আজ জেগে থাকতে হবে?" সাদারল্যান্ড প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আপনারা ডাক্তারী পড়বার সময় নাইট ডিউটি দিতেন না?" আমি উত্তর দিলাম।

হাসতে হাসতে সাদারল্যাণ্ড বললেন, "দু'টোর মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। আমরা কতকগুলো অসুস্থ মানুষের চিকিৎস্যর জন্য রাত্রে জেগে থাকতাম। আর হোটেল-বোঝাই একদল সুস্থ সবল লোক নরম বিছানায়, ততোধিক নরম বালিশে মাথা রেখে যখন ঘুমোবেন, তখনও তাঁদের পরিচর্যার জন্য কাউকে জেগে থাকতে হবে, এ আমি ভাবতে পারি না। অহেতুক ওরিয়েন্টাল লাক্সারি।" মিস্টার সাদারল্যাণ্ড বেশ রেগে উঠলেন। একটু থেমে বললেন, "আমাকে যদি সত্যি কথা বলতে বলা হয়, আমি বলবো, It is a shanmeful system. সত্যি লজ্জাজনক।"

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড টেবিলের ঘণ্টাটা বাজালেন। "তুমি যদি আপত্তি না করো, এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করা যাক।"

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডের ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতার সুর ছিল যে না বলবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

গুড়বেড়িয়া ডিউটি শেষ করে চলে গিয়েছে। তার জায়গায় ঘণ্টার ডাকে যে এলো, তার নাম জানি না। তাকে নম্বর ধরে ডাকি আমরা। সে এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই ডাক্তার বললেন, "দু' গ্লাস পাইন-আপেল জুস প্লিজ "

আবার সেলাম করে সে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সাদারল্যাণ্ড তার মুখের দিকে পাকিয়ে, দাঁড়াতে বললেন। এতোক্ষণে আমারও নজর পড়লো। তার সারা মুখে বসন্তের দাগ। কিন্তু ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড যেন হাঁ করে কোনো আশ্চর্য জিনিস দেখছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে হয়েছিল?"

বেয়ারা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে বললে, "অনেকদিন আগে সায়েব।"

"ছোটবেলায়?"

"আজ্ঞে, হাঁ সায়েব"

“টিকে নিয়েছিলে?” সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন। “না সায়েব, টিকে নেবার আগেই হয়েছিল।”

“আই সি।” সাদারল্যান্ড সায়েব বললেন।

বেয়ারা অর্ডার তামিল করতে বেরিয়ে গেলো। সাদারল্যাণ্ড আমাকে বললেন, "ভগবান ওকে শেষ মুহূর্তে দয়া করেছেন। আর একটু হলেই চোখ দু'টো যেতো।"

একটা সাধারণ হোটেল-বেয়ারার জন্য একজন অপরিচিত বিদেশী যে এতোখানি অনুভব করতে পারেন, তা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

মনের ভাব আমার পক্ষে চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। বলে ফেললাম, 'লোকটি আপনার কথা হয়তো চিরদিন মনে রাখবে। কোনোদিন হয়তো এই হোটেলের কোনো অতিথি এমন আন্তরিকভাবে তাকে প্রশ্ন করেননি।”

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মনের ভাব চেপে রাখার জন্যই যেন বললেন, “মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, সব না জেনেশনে ওই রকম মন্তব্য করে বসাটা উচিত নয়। এই হোটেলের অতীতের কতটুকু আর আমাদের জানা আছে? তাছাড়া আমি একজন ডাক্তার। এপিডেমিয়োলজিস্ট। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা আমাকে যে মাইনে দিয়ে পুষছেন, গাড়িভাড়া এবং পথের খরচ দিয়ে দেশ-বিদেশে পাঠাচ্ছেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁরা আশা করেন, মানুষের রোগ সম্বন্ধে আমি খবর নেবো। সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে পৃথিবীর মানুষদের চিরকালের জন্য মুক্ত করবার চেষ্টা করবো, তাই না?” ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড চুপ করলেন। কিন্তু তিনি যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে পারলাম।

কোল্ড ড্রিঙ্ক হাজির হওয়ার পর, সাদারল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করলেন, “এই হোটেলে তুমি কতদিন কাজ করছো?”

“বেশী দিন নয়।” আমাকে বলতে হলো।

“তুমি হোটেলের বার-এ গিয়েছ?” সাদারল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করেছেন। "বার-এ আমার এখনও ডিউটি পড়েনি। তবে এমনি গিয়েছি অনেকবার।” সদারল্যাণ্ড এবারে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বললেন, “আমার একটা

বিষয়ে জানবার আগ্রহ আছে। বলতে পারো, তোমাদের বার কি হোটেলের গোড়াপত্তন থেকে ঐ:একই জায়গায় আছে, না মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন হয়েছে?”

বললাম, “আমাদের বার-এর জায়গাটা তো খারাপ নয়। কেন, আপনার কি কোনো সাজেসন আছে? তা হলে মিস্টার মার্কোপোলোকে জানাতে পারি।” সাদারল্যাণ্ড মাথা নাড়লেন। “আমার কোনো সাজেসন নেই। আমি শুধু জানতে চাই, বারটা ঠিক ঐভাবে কতদিন আছে?”

সে-কথা বলা শক্ত। হোটেল বাড়িটা সিম্পসন সায়েবের হাতছাড়া হয়ে বহু জনের হাতে হাতে ঘুরেছে। প্রত্যেক নতুন মালিকই নিজের খেয়াল অনুযায়ী পরিবর্তন করেছেন। বাইরের খোলসটা ছাড়া, শাজাহান হোটেলের ভিতরের কিছুই আজ অক্ষত নেই।

সাদারল্যাণ্ড বললেন, “আমি খুব পিছিয়ে যেতে চাই না। ধরো, গত শতাব্দীর শেষের দিকে। অর্থাৎ কলকাতায় যখন বারমেডরা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে পানীয় বিক্রী করতো।”

ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে বললে, বোসদা আমাকে খু'জছেন।

আমি বোসদাকে এখানে আসতে বললাম। তিনি এখানে আমার থেকে অনেক বেশী দিন রয়েছেন। হয়তো সাদারল্যাণ্ডের কৌতূহল মেটাতে সমর্থ হবেন। ঘরে ঢুকেই বোসদা বললেন, “রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছিল তো? যদি সম্ভব হয়, আজ তিনতলার একটা ঘর আপনাকে দেবার চেষ্টা করবো। সাদারল্যান্ড কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। তিনি শাজাহান হোটেলের পুরোনো দিনে ফিরে যেতে চাইছেন। সব শুনে বোসদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হবস সায়েবের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?”

তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় আগে থেকেই ছিল। সেদিন এক ডিনার পার্টিতে এসেছিলেন। কাউন্টারে এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন।

বোসদা. বললেন, “হোটেল সম্বন্ধে সত্যিই যদি কিছু জানতে চাও তা হলে ওঁর কাছে না গিয়ে উপায় নেই।”

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড বললেন, “তুমি কি জানো, কখনও এই হোটেলে বারমেড রাখা হতো কিনা?”

বোসদা বললেন, "ইংরিজী সিনেমাতে অনেক দেখেছি। যুবতী মহিলা বার এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিংকস সরবরাহ করছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এখানকার কোনো হোটেলে তেমন তো দেখিনি।”

আমি বললাম, “সত্যি তো, বাইরে থেকে ক্যাবারের জন্য সুবেশা তরুণীরা আসছেন: সঙ্গীত ও নৃত্যনিপুণাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছি আমরা, অথচ বার এ তো একজনও মহিলা রাখা হয়নি।”

বোসদা বললেন, "বুদ্ধিটা মন্দ নয়তো। মার্কোপোলোর মাথায় একবার লাগিয়ে দিলে হয়।”

বিষণ্ণ ডাক্তার সাদারল্যান্ড এবার একটু হাসলেন। “আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, তোমাদের ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধিটা ঢুকলেও কিছু লাভ হবে না। কারণ দেশে কোনো বার-এ মহিলা নিয়োগ করা বে-আইনী। তোমাদের এক্সাইজ আইনে লেখা আছে, যে বাড়িতে মদ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হবে, সেখানে কোনো মহিলার চাকরি করা সরকারের বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ।"

আমাদের দেশের আবগারি আইনে তাঁর দখল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, ভারতবর্ষের কোথাও প্রহিবিশন আইনের কৃপায় সায়েব বোধহয় পুলিসের খপ্পরে পড়েছিলেন। তখনই বোধহয় বিভিন্ন রাজ্যের বার-লাইসেন্সএর নিয়মগুলো মুখস্থ করেছিলেন।

সাদারল্যান্ড জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের বার লাইসেন্সটা কখনও পড়ে দেখেছো?”

হলদে রংয়ের সরকারী কাগজটা সযত্নে বার-এ রেখে দিতে দেখেছি। কিন্তু তার পিছনে কী যে লেখা আছে, তা জানবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমাদের কোনোদিন হয়নি।

সাদারল্যাণ্ড বললেন, “দেখবে, ওখানে সরকার নির্দেশ দিচ্ছেন, পাঁচ আনার কমে কোনো ড্রিঙ্কস বিক্রি করা চলবে না!”

“পাঁচ আনা! এ-আইন কবেকার তৈরি?” বোসদা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন।

“সেই যুগে যখন এক বোতল স্কচ হুইস্কির দাম ছিল এক টাকা বারো আনা। তখন সবচেয়ে প্রিয় ব্র্যান্ড ছিল ডানিয়েল ক্লফোর্ড। মদ খেয়ে লিভার নষ্ট করে কেউ মারা গেলে

লোকে বলতো, শ্রীযুক্ত অমুক ডানিয়েল ব্লকফোর্ড রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।”

আমার সন্দেহ এবার ঘনীভূত হলো। বললাম, “আপনি কি বিভিন্ন দেশের বার নিয়ে কোনো বই লিখছেন?”

“মোটেই না,” ডাক্তার সাদারল্যান্ড উত্তর দিলেন। "যদি একান্তই লিখি স্মলপক্স সম্বন্ধে লিখবো। মদ সম্বন্ধে লিখে অপচয় করবার মতো সময় আমার নেই।”

টেলিফোনে হবস সায়েবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক হলো; ভদ্রলোক গল্প করতে এবং শুনতে ভালবাসেন। বোসদা বললেন, “সময় থাকলে আমিও যেতাম। তুমি ডাক্তারকে নিয়ে যেও। বেলা আড়াইটা নাগাদ তিনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।"

সদারল্যান্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে বোসদাকে বললাম, “এই যে এঁকে নিয়ে যাবো, তাতে কোনো কথা উঠবে না তো?”

বোসদা রেগে উঠলেন। “কে কথা তুলবে? হোটেলের জন্য রক্তপাত করে তারপর আমার খুশিমতো যদি কিছু করি, তাতে কারুর নাক গলাবার অধিকার নেই। কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?”

“না, বলেনি। কিন্তু হয়তো কোনো আইন অমান্য করবার জন্য হঠাৎ চাকরি গেলো।"

“চাকরি নষ্ট হওয়াটা এখানে কিছু নয়। কত লোক তো আমারই চোখের সামনে এলো আর গেলো। অক্ষয় বটের মতো আমিই শুধু গাঁট হয়ে বসে আছি। আমাকে কেউ নড়াতে সাহস করে না। হাটে হাঁড়ি ভাঙবার ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তা এই স্যাটা বোসেরই আছে। আর এও বলে রাখলাম, ব্যাটা জিমি যদি তোমার কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করে, তবে সেও বিপদে পড়বে।” বোসদা যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তা বুঝতে পারলাম।

একটু থেমে বোসদা নিজের মনেই বললেন, “আমরা কী আর মানুষ! আমাদের মধ্যে যাদের পয়সা আছে তাদের টাকায় ছাতা ধরছে। কয়েক পারসেন্ট সুদ নিয়েই আমাদের বড়লোকরা সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। বেলা ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠছেন, তারপর চা পান করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিশ্রাম শেষ করে মধ্যাহ্ন ভোজন করছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর উঠে জলখাবার খেয়ে গুডগড়া টানছেন। তারপর একটু গড়ের

মাঠে হাওয়া খাওয়া। ফিরে এসে আবার বিশ্রাম। বিশ্রাম শেষ করে ভোজন পর্ব। তারপর আবার বিশ্রাম। নিজের বংশ ছাড়া ওরা কিছুই বাড়ালেন না। তা যদি করতেন, তা হলে স্যাটা বোস দেখিয়ে দিতো মেড-ইন-ক্যালকাটা ছোঁড়ারা হোটেল চালাতে পারে কিনা। যাদের বুদ্ধি আছে, পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে, মাসিক কয়েকখানা নোটের বদলে তারা সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে বসে আছে। অথচ অন্যের কাছ থেকে ধার করা টাকা, আর আমাদের গতর নিয়ে দু'নিয়ার লোকরা শুধু নিজেদের নয়, নিজেদের ভাগ্নে, ভাইপো, জামাই সবার ভাগ্য ফিরিয়ে নিলে।”—বোসদা এবার দুঃখে হেসে ফেললেন।

“এ-সব কথা এখানে বলে যে কোনো লাভ নেই, বুঝি। চৌরঙ্গীর মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারতাম, তা হলেও হয়তো কিছু কাজ হতো, কিন্তু সে সুযোগ আর আমাদের কী করে জুটবে বলো।”

“বুড়ো হবস সায়েবের ওখানে যাচ্ছ তাহলে?” লাঞ্চের সময় বোসদা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সরকারীভাবে লাঞ্চ আরম্ভ হয় সাড়ে বারোটা থেকে। কিন্তু কর্মচারীদের খাওয়া তার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে, তবে তারা লাঞ্চ রুমের দরজা খুলে দেয়। বাইরের ব্যস্ত অতিথিরা তখন আসতে শুরু করেন। ক্লাইভ স্ট্রীটের সায়েবদের অপচয় করবার মতো সময় দু'পুরবেলায় থাকে না!

হোটেলের বাসিদারা অনেকে একটু দেরিতে আসেন। লাঞ্চরুমে ঢোকবার আগে, অনেকে বার-এর কাউন্টারেও খানিকটা সময় কাটিয়ে যান। কেউ আবার সোজা লাঞ্চরুমে গিয়ে লাল পট্টি জড়ানো তোবারককে ডেকে পাঠান। শাজাহান হোটেল ডিক্সনারিতে তার নাম 'ওয়েট বয়'। বোসদা কিন্তু বলেন, ভিজে খোকা! ভিজে খোকা সায়েবের সেলাম পেলেই ছুটে আসে। সায়েব সাধারণত ঠাণ্ডা বিয়ার অর্ডার দেন। বিয়ারের মগে চুমুক দিতে দিতে গরম সুপ এসে যায়। দূরে গোমেজ সায়েবের ইঙ্গিতে শাজাহান ‘ব্যাণ্ড' বেজে ওঠে। পাঁচটা ছোকরা এক সঙ্গে তাদের সামনের 'কোরের' উপর ঝুকে পড়ে যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ করে দেয়।

গোমেজ কন্ডাক্টর। বোসদা বলেন, 'ব্যাণ্ডপতি'—কখনও আবার আদর করে ব্যাণ্ডোস্বামী বলেন। গোমেজ তার পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে সবার আগে প্রাইভেট রুমে লাঞ্চের জন্য হাজির হন।

সেফকে বলেন, "তাড়াতাড়ি যা হয় ব্যবস্থা করুন।" সেফ আমাদের খাওয়ানোটাকে 'ভুতভোজন বলে মনে করেন। গোমেজ ব্যস্ত হয়ে পড়লে বলেন, "অতো ব্যস্ত হলে আমি পারবো না।"

গোমেজ বলেন, "শাজাহান ব্যান্ড আজ লাঞ্চ আওয়ারে তাহলে বন্ধ থাকবে।"

সেফ কপট উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "আহা তাহলে সর্বনাশ হবে! কেবল বাজনা শোনবার জন্যেই তো কলকাতার নাগরিকরা বেলা একটার সময় নিজেদের কাজ ছেড়ে শাজাহান হোটেলে চলে আসেন!"

গোমেজও ছাড়বার পাত্র নন। সেফ মিস্টার জুনোকে বলেন, "গানই যদি বুঝবে, তা হলে হাঁড়ি ঠেলবে কেন?"

সেফ তখন সবচেয়ে খারাপ কাঁচের বাসনপত্তরগুলো ওয়েটারদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, "গানের কিছু বুঝি না, কিন্তু এইটুটুক, জানি, পাখিরাও খাবার পর গাইতে পারে না। ভরাপেটে সঙ্গীতচর্চা একমাৎৰ শাজাহানেই সম্ভব।"

গোমেজ তখন দলের ছেলেদের বলেন, "বয়েজ, তোমরা আরম্ভ করে দাও।" অনুগত ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে মুখে সুপ তুলতে আরম্ভ করে। গোমেজ তখন ন্যাপকিনটা কোমরে লাগাতে লাগাতে বলেন, "পাখিদের সঙ্গে ওখানেই আমাদের তফাৎ। ওরা পেটের জন্যে গান করে না, আমরা শুধু পেটের জন্যেই এই ভর দুপুরে সঙ্গীতচর্চা করি।"

কথা-কাটাকাটি হয়তো আরও এগোতো, কিন্তু বোসদা এসে টেবিলের একটা চেয়ার দখল করে বলেন, "জুনো সায়েব, আমি গোঁড়া হিন্দু। আমার রিলিজিয়াস ফিলিঙে তোমরা হাত দিচ্ছো। খাওয়ার সময় আমাদের কথা বলা শাস্ত্রমতে নিষেধ। এখনই হয়তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবে!"

সকলেই হাসতে হাসতে কথা বন্ধ করে দেন। জুনো গদগদ হয়ে বলেন, "স্যাটা মজার কথার স্টক তোমার কি কখনও শেষ হবে না?"

"ডিয়ার জুনো সায়েব, আমার স্টক তোমার ওই ফ্রিজের মতো। তলার দিকে গোটা দশেক আইসক্রিম সব সময় লুকানো আছে”— বোসদা বলেন। জুনো সায়েব হা হা করে হেসে ফেলেন। বলেন, “গ্রীদি। গ্রীদি বয়েজ আর নত্ নাইস ফর হোতেল।”

বোসদার পিঠে স্নেহভরে থাবড়া মেরে জুনো কিচেনের দিকে চলে যান। যাবার আগে বলেন, “বোস, একটা মেরেজ কোরো। হামরা পারবে না। দ্যাত্ ভাইফ তোমাকে বয়েল করে ম্যানেজ করতে পারবে!”

বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, "সায়েব, তোমার সেই পুডিং-এ স্যাণ্ড।”

“হোয়াত্?” জুনো না বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার সেই গুড়ে বালি। আমার বিয়েও হবে না, তোমার পাপের ভোগও শেষ হবে না।” মুখের মধ্যে খাবার পুরতে পুরতে বোসদা বললেন।

আমি অবাক হয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম। ওয়েটাররা খাবার আনতে একটু দেরি করছিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোমেজ যেন আঁতকে উঠলেন, লাঞ্চরুমের দরজা খুলতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গোমেজ বললেন, “গেট আপ বয়েজ। আর সময় নেই।”

পাঁচটা ছেলে যেন বোবা। মুখে তাদের কথা নেই। এক সঙ্গে সেই অবস্থায় উঠে পড়লো।

ঘরের কোণে একটা ছোট্ট আয়না রয়েছে। তার উপর ইংরিজীতে লেখা— "Am I correctly dressed?” তার নীচে খড়ি দিয়ে দু’ষ্টুমি করে কে বাংলায় লিখে দিয়েছে— আমি কি ঠিকভাবে জামা কাপড় পরিয়াছি?

ওরা সবাই একে একে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের টাইগুলো ঠিক করে নিতে লাগলো। গোমেজ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। লাইন বে'ধে মার্চ করে ওরা বেরিয়ে যেতে, দু'টো হাত দোলাতে দোলাতে তিনিও ওদের শেষে লাইনে যোগ দিলেন।

বোসদা আর আমি তখনও বসে রইলাম। তিনি হেসে জুনোকে বললেন, 'মাই হেভেন-গন, মাদার মরবার সময় বলেছিলেন, ফাদার সতু, থ্রি ওয়ার্লড রসাতলে গেলেও মুখের রাইস ফেলে উঠবে না।”

জুনো ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলেন না। “হোয়াত্? ফাদার সতু, তোমার ফাদার সেই সময় হাজির ছিলেন?”

“না, সায়েব, না। তোমাকে এতোদিন ধরে বেঙ্গলী শেখাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সব বৃথা। ফাদার সতু মানে হলো বাবা সতু, অর্থাৎ কি না আদর করছে।” বোসদা বললেন।

জুনো এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইংরিজীতে বললেন, “সত্যি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ছেলে কি করে বাবা হয়?”

“কেন হবে না?” সত্যদা প্রশ্ন করলেন। “তোমাদের মায়ের কাছে ছেলে যদি ডার্লিং হতে পারে তবে আর এক পা এগিয়ে বাবা হতে কী আপত্তি আছে?”

জুনো এবার ঘোঁত ঘোঁত করে হেসে ফেললেন। “তোমার সঙ্গে তর্কে কেউ পারবে না। ওনলি কোনোদিন তোমার ভাইফ, আই মিন ইওর জেনানা, যদি পারে।"

"পারবে পারবে, আর একজন পারবে। দিস বয়।" বোসদা আমাকে দেখিয়ে জুনোকে বললেন। “খুব ভালো ছেলে। এতো ভালো ছেলে যে, ওকে তোমার একটা স্পেশাল আইসক্রিম দেওয়া উচিত; যাতে ভবিষাতে ও তোমার বিরুদ্ধে কখনো মুখ খুলতে না পারে।”

জুনো এতোই খুশী হলেন যে, ওয়েটারকে হুকুম না দিয়ে নিজেই ফ্রিজিডেয়ার থেকে দু'টো আইসক্রিম বার করে এনে দিলেন।

আইসক্রিমের পর কফি এলো। বোসদা কফির কাপে চুমুক দিয়ে নিজের মনেই, বললেন, “বারমেড! 'তৃষ্ণার্ত অতিথির সুরাপাত্র সুন্দরী মধুর হাসিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। চমৎকার। একদিন এখানেও ছিল। আজ থাকলে ক্লাইভ স্ট্রীটের সায়েবরা, শুধু সায়েবরা কেন, বাঙালী, মাড়ওয়ারী, গুজরাটী, চীনে, জাপানী, রাশিয়ান, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কে না খুশি হতো? শাজাহান হোটেলের বার-এর আরও শ্রীবৃদ্ধি হতো। আরও অনেক টুল দিতে

হতো। আরও অনেক বোতল সোডা রোজ নিতে হতো, আরও অনেক বেশী রসিদ কাটতে হতো, আরও অনেক বেশী টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে পাঠাতে হতো। গভরমেন্ট ট্যাক্স বাড়িয়েছে; গোদের উপর বিষফোড়ার মতো আমরা আরও মদের দাম বাড়াতে পারতাম। কী সুন্দর হতো!”

“বারমেড! বড্ড ইংরেজী কথা।” বোসদা নিজের মনেই আবার বললেন। তারপর আমাকে বললেন, “একটা আইসক্রিম খাইয়েছি, ব্রেন নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে আছে। কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ একটা বলো দিকিনি।"

আমার মাথায় কিছু আসছিল না। বললাম, “রবাইয়াতে পড়েছি সাকী।” “দুর, ও তো আর বাংলা হলো না”——বোসদা বললেন। “ওরা যা ছিল, তার একটি মাত্র বাংলা হয়। অর্থাৎ কি না বারবনিতা।"

বারবনিতার নেশায় আমরা যখন বন্দি হয়ে আছি, ঠিক সেই সময় জুনো বললেন, “একজন জোয়ান মদ্দ তোমাদের দু’জনকেই একসঙ্গে খুঁজছেন।' বিরক্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বোসদা বললেন, “দেখ তো আমাদের তপোবনের এই নিষাদটি কে।"

তপোবনের এ নিষাদটি স্বয়ং সাদারল্যান্ড ছাড়া আর কেউ নন। আমাকে দেখেই বললেন, “আমি বাইরে লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলাম।”

আমি বললাম, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মনে করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। মিস্টার হবসের সঙ্গে দেখা আমাদের হবেই।”

আমার এ কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে দেখলে, যিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, আজ তিনি ইহলোকে নেই। চৌরঙ্গীর অন্তরের কথা পাঠকের কাছে নিবেদন করবার পরিকল্পনা তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। উৎসাহ দিয়েছিলেন, উদ্দীপনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "খোঁজ করো, অনেক কিছু পাবে।” কিন্তু তাঁর জীবিতকালের মধ্যে সে কাজ আমার পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কলকাতার বুকের উপর তাঁর দীর্ঘ দিনের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণও আজ নেই। তাঁর নামাঙ্কিত একটা দোকান চৌরঙ্গীর ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় অংশ

হয়ে কিছুদিন টিকে ছিল। সে দোকানটাও সকলের অলক্ষ্যে কলকাতার বুক থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

পুরনো অনেকেই হয়তো আজও হবসকে মনে রেখেছেন, আমাদের যুগের কয়েকজনও তাঁকে হয়তো মনে রাখবে, তারপর একদিন তাঁর স্মৃতি চিরদিনের মতো ব্যস্ত কলকাতার ব্যস্ত নাগরিকদের মন থেকে মুছে যাবে।

শাজাহান হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা এসপ্ল্যানেডে এসে পড়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে সাদারল্যান্ড বলেছিলেন, "তোমাদের এই পথ দিয়ে হাঁটতে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে। প্রতি পদক্ষেপে যেন ইতিহাসের কোনো আশ্চর্য অধ্যায়কে মাড়িয়ে চলেছি। সেসব দিনের ইতিহাসের কোনো সাক্ষীই আজ নেই। পুরনো কলকাতার অনেক নিদর্শন ছিল এই রাস্তার উপর! সেসব তো কবে তোমরা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছো।"

হাঁটতে হাঁটতে সাদারল্যাণ্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "এখনও একটা সাক্ষী রয়েছে। ঘনগাছের বোরখার মধ্য দিয়ে সুন্দরী রাজভবন, অনেকদিন থেকে অনেক কিছুই দেখছে।"

সাদারল্যাণ্ড বললেন, "এমন একদিন আসবে, যখন টেপ রেকর্ডারের মতো Past recorder কিনতে পাওয়া যাবে। সেই যন্ত্র নিয়ে যে-কোনো পুরনো বাড়ির সামনে বসে আমরা তার আত্মজীবনী শুনতে পাবো।"

"সত্যি, তা যদি সম্ভব হয় কোনোদিন।"

"একেবারে নিরাশ হয়ো না"—সাদারল্যাণ্ড বললেন। "ঐ যন্ত্র দেখে যাবার মতো দীর্ঘদিন আমরা নিশ্চয়ই বেচে থাকবো। অতীতকে উদ্ধার করাটা খুব শক্ত কাজ হবে না। কারণ, আমরা যা করছি, যা বলছি, এমন কি যা ভাবছি তার কিছুই তো নষ্ট হচ্ছে না। শুধু এক জায়গা থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যের অন্য এক কোণে জমা হচ্ছে।"

আমি বললাম, "সেই জন্যেই বুঝি আমাদের কবি বলে গিয়েছেন, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।"

সাদারল্যাণ্ড হাসতে হাসতে বললেন, "মুক অতীতকে যেদিন আমরা কথা বলাতে পারবো, সেদিন সমস্ত পৃথিবী নতুন রূপ গ্রহণ করবে। বিপদে পড়বেন শুধু ঐতিহাসিকরা।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়তো চাকরিও যাবে। অধ্যাপক গবেষকদের বদলে একজন অপারেটর রেখে দিলেই কাজ চলে যাবে!"

সাদারল্যাণ্ড তাঁর কথাবার্তা শুনে কে বলবে, ওঁর বিষয় ডাক্তারী! ইতিহাসের সঙ্গে 'তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই?

ছোট ছেলের মতো নিজের মনেই হেসে ফেললেন।

ফুটপাথের উপর একটা খাঁচা এবং গোটাকয়েক চড়াইপাখি নিয়ে একটা ছোকরা বসে ছিল। সাদারল্যান্ড একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি ?"

আমি হেসে বললাম, "ফিউচার রেকর্ডার। ভবিষ্যতের যত কিছু দলিল সব এর কাছে আছে। সব কিছুই এখানে জানতে পারা যাবে।"

সাদারল্যান্ড বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাতটা ঘষতে ঘষতে বললেন, "ভবিষ্যৎকে আমি বড্ড ভয় করি। একটু ভাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে যাই।"

মিস্টার হবস আমাদের জন্যই বোধহয় অপেক্ষা করছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর দু'টি হাত বাড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

"বারমেড?" বৃদ্ধ হবস আমাদের প্রশ্নে যেন কোন সুদুর অতীতে ফিরে গেলেন। "সেসব দিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, নেভার টু রিটার্ন।"

"একজন শুধু যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। তাঁর নাম মিসেস ব্রকওয়ে। ইউনিয়ন চ্যাপেলের পাদ্রী ফাদার ব্রকওয়ের সহধর্মিণী," তিনি নিজের মনেই বললেন।

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড মাথা নাড়লেন। "আমি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার ভারতবন্ধু ফ্রেনার ব্রকওয়ের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম। ওঁর মায়ের কথা জানবার খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোনো খবর পাওয়া সম্ভব হলো না। শুধু শুনলাম, ইউনিয়ন চ্যাপেলের পাদ্রীর সন্তান ফ্রেনার ব্রকওয়ে কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর মমতার কারণ তখন আমার বোধগম্য হলো।"

হবস বললেন, "মিসেস ব্রকওয়ে কলকাতার বারমেডদের জন্যে চিন্তা করতেন। ওদের জন্য চোখের জল পর্যন্ত ফেলেছেন শুনেছি। তাঁর নজরে না পড়লে, আজও আমরা

এতোক্ষণ শাজাহান, কিংবা যে কোনো হোটেলের বার-এ বসে নারী পরিবেশিত বীয়ারের মগ বা হুইস্কির পেগ উপভোগ করতে পারতাম।”

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড গম্ভীরভাবে অথচ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "আমি অবশ্য ড্রিঙ্ক করি না।”

“তুমি ড্রিঙ্ক করো না!” হবস অবাক হয়ে গেলেন। “খুব সাবধান, মিস্টার গ্যান্ডির শিষ্যরা জানতে পারলে তোমাকে আর দেশে ফিরতে দেবে না। সবরমতী বা অন্য কোনো নদীর ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে তোমাকে ডিসপেন্সারি করে দেবে, এবং সেইখানেই তোমাকে চিরদিনের জন্যে থেকে যেতে হবে।”

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড মৃদু' হাসলেন। “চমৎকার হয় তাহলে। ডাক্তারি কতটুকুই বা জানি আমি। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে এইটুকু, বুঝেছি, ইন্ডিয়ার এখন অনেক ডাক্তার চাই। অসংখ্য কাজ জানা লোকের দরকার।”

হবস আবার বারমেডদের কথায় ফিরে এলেন। “দোজ্, গুড ওল্ড ডেজ।” আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার জেনারেল নলেজ্ একটু পরীক্ষা করা যাক। বলো দেখি, সুয়েজ খাল দিয়ে কোন সালে জাহাজ চলতে আরম্ভ করলো?”

ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস, নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক সুয়েজখাল কেটেছিলেন, এইটুকু শুধু ইস্কুলে ভূগোল বইতে পড়েছিলাম। কিন্তু কবে তিনি কী করেছিলেন, কোন সালে লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের জল মিলে মিশে ইউরোপ ও এশিয়াকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিল, তা আমার জানা ছিল না। সুয়েজখালের সঙ্গে আমাদের গল্পের কী যে সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছিলাম না।

মিস্টার হবস বললেন, “আমাদের গল্পের সঙ্গে সুয়েজখালের নিবিড় সুযোগ আছে। সুয়েজখাল যখন ছিল না, তখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার-লোভী ছোকরারা কলকাতায় আসতো, হোটেলের অভাবে চাঁদপালঘাটের কাছে বজরায় রাত্রি যাপন করতো। কিন্তু তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো নীলনয়না সমূদ্রের ওপার থেকে ছুটে আসতো না। নিতান্ত প্রয়োজন হলে এ দেশের দিশী জিনিস দিয়েই তৃষ্ণা নিবারণ করতে হতো।

তারপর ১৭৬২ সালে উইলিয়াম পার্কার কলকাতার ভদ্দরলোকদের চিত্তবিনোদনের জন্য পানশালা খুলতে চাইলেন। তখন কেবল মদের কথাই উঠেছিল, কিন্তু বার-বনিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। বোর্ডও লাইসেন্স দিয়ে ছিলেন এই শর্তে যে, বাগানবাড়িটা সকালবেলায় খুলে রাখা চলবে না, সকালে খোলা থাকলে, ছোকরা সায়েবসুবোরা কাজে ফাঁকি দেবে।

তারপর একে একে কত মদের দোকানই তো খোলা হলো। কিন্তু সব জায়গাতেই বারম্যান, দেশী ভাষায় খিদমতগার।

সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের বিচারের সময় ব্যারিস্টার এবং তাঁদের সাকরেদদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন যিনি, সেই লে গ্যালের ট্যাভার্নেও বারমেড ছিল না। সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও লে গ্যালে প্রতিটি লাঞ্চ এবং প্রতিটি ডিনারের জন্যে দু'টাকা চার আনা দাম নিতেন। সুপ্রীম কোর্টে খাবার পাঠাবার অর্ডার দিয়েছিলেন মোহনপ্রসাদ। প্রতিদিন ষোলোটি লোকের লাঞ্চ আর ষোলোটি লোকের ডিনার।

নন্দকমারের ফাঁসির খবর আমরা রাখি, কিন্তু লে গ্যালের খবর আমরা রাখি না। ইম্পের রায় বেরলো, নন্দকুমার সিম্পসন কোম্পানির ফাঁসিতে চড়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন, কিন্তু মোহনপ্রসাদ-এর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত লাঞ্চ ও ডিনারের টাকা আদায়ের জন্য লে গ্যালে কোর্টে গিয়েছিলেন। মামলা করে ছশো ঊনত্রিশ টাকা আদায় করতে হয়েছিল তাঁকে।”—মিস্টার হবস আমাদের এবার কফি-পাত্র এগিয়ে দিলেন।

আমরা আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, তিনি শুনলেন না। হেসে বললেন, “আমি ভারতবিদ্বেষী নই। কিন্তু যাঁদের ধারণা ইণ্ডিয়া কফিহাউস ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও কফি তৈরি হয় না, তাঁরা এখানে এসে একৰার দেখতে পারেন!”

আমাদের বিদগ্ধ মুখের দিকে না তাকিয়েই, মিস্টার হবস বললেন, “বক্ষে সুধ্;;া এবং হস্তে সুরাপাত্র নিয়ে ইংলণ্ডের অষ্টাদশীরা সুয়েজখাল কাটার পর থেকেই কলকাতায় আসতে লাগলেন। ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল কাটার পর থেকেই চার্নক নগরের রেস্তোরাঁ এবং হোটেলগুলো যেন জমজমাট হয়ে উঠলো।"

আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হবস ধীরে ধীরে সেই অতীতে ফিরে গেলেন, যেখানে বার-বনিতারা বার-এ দাঁড়িয়ে মদ পরিবেশন করতো। এখানকার মেয়ে নয়। খাস বিলেতের মেয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরতো—লণ্ডন থেকে অমুক জাহাজ যোগে আমাদের নতুন বারমেড এসে পৌঁছেছেন।

কেউ আসতেন ছ'মাসের কন্ট্রাক্টে—কেউ বা দু''বছরের। শাজাহান, হোটেল ডি ইউরোপ এবং এলেনবি'র বিলিতী প্রতিনিধিরা লিখে পাঠাতেন—'একটি সুন্দরী মেয়ে সন্ধান করেছি, প্রয়োজন কিনা জানাও।' দ্রুত উত্তর যেতো— তোমার রুচির উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আশা করি তোমাকে বিশ্বাস করে কলকাতার খদ্দেরদের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাবো না!'

ওদিক থেকে উত্তর আসতো—'শুধু তোমাদের কলকাতা নয়, দুনিয়ার বাঘা বাঘা পোর্টে এতোদিন ধরে বারমেড পাঠাচ্ছি, কখনও সমালোচনা শুনিনি। আমার হাতের নির্বাচিত মেয়েরা কত হোটেলের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে—মদের বিক্রি ডবল করে দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার একমাত্র দু'শ্চিতা কলকাতার হোটেলগুলো মেয়েদের রাখতে পারে না। কন্ট্রাক্ট শেষ হতে না হতে চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও জেঁকে বসে। তাতে আমার ক্ষতি হয়। ওদের মাইনের কিছু অংশ আমাকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, কিন্তু চাকরি পাল্টালে সেটা আর পাই না।'

"আপনি দেখেছেন কোনো বারমেডকে?" প্রশ্ন করবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

হবস হেসে ফেলেছেন। "আমি কি আর আজকের লোক? আর এই কলকাতাতে কি আমি আজকে এসেছি? আর কিছুদিন আগে এলে হয়তো দু' একটা ক্রীতদাসও দেখতে পেতাম।"

"ক্রীতদাস!" আমি চমকে উঠেছি।

"আজকালকার ছেলেরা তোমরা কোনো খবরই রাখো না। গত শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত কলকাতায় মানুষ কেনা-বেচা হতো। মূরগাঁহাটা থেকে ছেলে-মেয়ে কিনে এনে সায়েব মেম, বাবু বিবিরা বাড়িতে রাখতেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন;

পুরস্কার ঘোষণা করতেন।" সাদারল্যাণ্ড গম্ভীরভাবে বললেন, "আই ওনলি হোপ, হোটেলে যাঁরা মদ ঢেলে দিতেন তাঁরাও ক্রীতদাসী ছিলেন না।"

বৃদ্ধের মুখে এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, "না, আইনের চোখে তাঁরা ক্রীতদাসী নিশ্চয়ই ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের দুঃখের যে দৃশ্য আমি দেখেছি, যা শুনেছি, তাতে ডিকসনারিতে একটা নতুন শব্দ তৈরি করে ঢুকিয়ে দিতে পারো।"

"এই শাজাহান হোটেলেরই একটি পুরোনো বিজ্ঞাপন তোমাকে দেখাতে পারি।" মিস্টার হবস চেয়ার থেকে উঠে পড়ে আলমারি থেকে একটা খাতা বার করে নিয়ে এলেন। সেই খাতার পাতায় পাতায় পুরোনো দিনের ইংরেজী কাগজের কাটিং আঁটা রয়েছে। উল্টোতে উল্টোতে এক জায়গায় থেমে গেলেন। "হয়তো তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে।"

বিজ্ঞাপন পড়ে দেখলাম। শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার সগর্বে ঘোষণা করছেন —'আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর এস এস 'হাওয়াই' জাহাজ যোগে কুমারী মেরিয়ন বুথ ও কুমারী জেন গ্রে খিদিরপুরে এসে হাজির হচ্ছেন। শাজাহান হোটেলের অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা কোনোরকম ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না!' বিজ্ঞাপনের তলায় মোটা মোটা হরফে পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে "শাজাহানের কষ্টার্জিত সুনাম অক্ষয় রাখবার জন্যই এই সুন্দরী দু'টিকেও দিনের বেলায় এবং রাত্রের ডিউটি-শেষে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হবে!"

মিষ্টার হবসের কাজে বাধা সৃষ্টি করছি আমরা। হারিয়ে যাওয়া দিনের গল্প শোনবার উপযুক্ত সময় নয় এখন। মনে মনে লজ্জাবোধ করছিলাম। কিন্তু সাদারল্যান্ডের সেদিকে খেয়াল নেই। হবসও ও বিষয়ে মোটেই চিন্তা করছেন না। খাতাটা মুড়তে মুড়তে তিনি বললেন, "ভাগ্যে এই কাটিংটা রেখেছিলাম। এই সামান্য সূচনা থেকে যে একদিন এমন একটা ব্যাপার হবে তা কল্পনাও করিনি।

"শাজাহানের ম্যানেজার সিলভারটনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। সিলভারটন শেষ পর্যন্ত হোটেলটা কিনেও নিয়েছিলেন। আর্মেনিয়ান খ্রীষ্টান গ্রেগরি আপকার একবার শাজাহান হোটেলে এসে উঠেছিলেন। হোটেলের তখন দুর্দিন চলেছে। মালিক কোনো

কাজে নজর দেন না, বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, জিনিসপত্তরের অভাব। গ্রেগরি আপকার চাকর-বাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। ম্যানেজারকে শাজাহানের চিঠির কাগজেই লিখে পাঠিয়েছিলেন—দুনিয়াতে এর থেকেও ওঁচা কোনো হোটেলের নাম যদি কেউ বলতে পারে, তবে তাকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেবো।

সিলভারটন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু টাকাকড়ির অভাব। টাকা থাকলে ভালো হোটেল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।'

ইতিহাসে সেই প্রথম বোধহয় কোনো হোটেলের গেস্ট হোটেলের উপর রেগে গিয়ে হোটেলটাই কিনে ফেলেছিলেন। গ্রেগরি আপকারের পয়সার অভাব ছিল না। চেক কেটে পুরো দাম দিয়ে মালিকানা কিনেছিলেন— সিলভারটনকে করেছিলেন ওয়ার্কিং পার্টনার।

সিলভারটনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বিজ্ঞাপনের ফল কি হলো?"

সঙ্গে সঙ্গে ফল। অনেকেই ২২শে সেপ্টেম্বরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। খোঁজ করছে, ঐদিন সন্ধ্যেতেই ওঁরা বার-এ কাজ করতে আরম্ভ করবেন তো? রসিকজনরা একটুও দেরি সহ্য করতে পারছেন না।'

বাইশে সেপ্টেম্বর রাত্রে সিলভারটন আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। হোটেলের লোকরা সহজে কাউকে নেমতন্ন করে না। কিন্তু সিলভারটনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্যরকম ছিল—মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। সে-রাত্রে শাজাহান হোটেলের বার এবং ডাইনিং রুমে তিলধারণের জায়গা ছিল না। ইয়ংমেন উইথ বেস্ট অফ ম্যানারস্ অ্যান্ড ওয়ার্স্ট অফ ইনটেনসনস্ সেখানে হাজির হয়েছিল। কিন্তু নতুন বালিকারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হলেন না।

'কী ব্যাপার, জাহাজ কি এসে পৌঁছয়নি?" অনেক ছোকরা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো।

'জাহাজ এসেছে। তাঁরাও এসেছেন। কিন্তু আজ তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত'— সিলভারটন হাতজোড় করে ঘোষণা করলেন।

'আমরাও কিছু, তাজা গোলাপ ফুলের অবস্থায় নেই। সারাদিন কাজ করে, পচা বৃষ্টিকে কলা দেখিয়ে ভিজতে ভিজতে এখানে হাজির হয়েছি।' ছোকরাদের একজন

ফোড়ন দিয়েছিল।

সিলভারটন বিনয়ে গলে গিয়ে বলেছিলেন, 'শাজাহান হোটেলের পরম সৌভাগ্য, এতো অসুবিধার মধ্যেও তাকে আপনারা ভোলেননি। আপনাদের দেহের এবং মনের অবস্থার কথা ভেবেই মিস ডিকশন সেলার থেকে কয়েকটি সেরা বোতল বার করে এনেছেন।'

ছোকরারা খিলখিল করে হেসে ফেললে। 'উই ডিমাণ্ড ওল্ড ওয়াইন ফ্রম নিউ হ্যাণ্ড। নতুন কচি কচি হাত থেকে পুরনো মদ চাই আমরা।'

একটু দূরে মুখ শুকনো করে প্রৌঢ়া মিস ডিকশন দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে অনেকগুলো মদের বোতল সাজানো রয়েছে। পাশে পিতলের ছোট্ট বালতি হাতে পাথরের মতো একজন জোয়ান খিদমতগার দাঁড়িয়ে রয়েছে। গেলাসে বরফের গুড়ো দেওয়াই তার কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু ওটা ছুতো, আসলে সে বডিগার্ড।

কেউ আজ মিস ডিকশনের কাছে ড্রিংকস কিনছে না—আজ যেন ওই দড়ির মতো পাকানো শীর্ণ দেহটাকে এখানে কেউ প্রত্যাশা করেনি। ছোকরারা বললে, ‘আমরা কি একটু অপেক্ষা করবো? নতুন মহিলারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আসতে পারেন।'

সিলভারটন আপত্তি জানালেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ওরা এতোই ক্লান্ত যে এতোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

সিলভারটনের পা-দু'টো উত্তেজনায় কাঁপছিল। ছোকরারা চিৎকার করে বললে, ‘প্রয়োজন হয় আমরা গিয়ে ওঁদের অনুরোধ করতে পারি; আর তাতে যদি অসুবিধা থাকে তবে আমরা চললাম। অ্যাডেলফি বার-এর লোলা আমাদের জন্যে বসে আছে। আমাদের দেখলেই লোলা ফিক করে হেসে উঠবে, আর মনে হবে যেন মেঝেতে মুক্তো ঝরে পড়ছে।'

ওরা দল বেধে শাজাহান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সিলভারটন মুখে শুকনো করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিস ডিকশনও সেই যে কাউন্টারের কাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর মুখে তুললেন না।

সিলভারটনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার?”

সিলভারটন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'নিজের ঘরে বসে বসে আমরা আলাদা ডিনার করবো। বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছি।'

ওঁর ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা শুনলাম। বিপদই ঘটে! মেরিয়ন বুথ নামে যে মহিলাটি জাহাজ থেকে নেমেছেন, তাঁর বয়স পয়তাল্লিশের কম নয়। জাহাজঘাটেই সিলভারটন ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। কিন্তু তখন কিছু বলতে পারেননি। জেন গ্রে অবশ্য ফাঁকি দেয়নি। সিলভাবটন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এতো পয়সা খরচ করে সিলভারটন একটা বুড়ী এনেছেন, এ-খবর একবার বেরিয়ে পড়লে শাজাহানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা পরে প্রকাশিত হয়েছিল। শাজাহান হোটেল ঠকে গিয়েছে। যে মেয়েকে শাজাহান হোটেলের এজেন্ট পছন্দ করেছিলেন, কথাবার্তা বলেছিলেন, এমনকি জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন সে কোনো এক সময় জাহাজের খোলে বুড়ীকে রেখে, নিজে নেমে গিয়েছে। কলকাতায় এসে কনেবদল যখন ধরা পড়লো, তখন আর কিছুই করবার নেই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিলডারটন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারই নাম মেরিয়ন বুথ? আপনি সত্যি কথা বলছেন?"

ভদ্রমহিলা কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। 'হোয়াট? তুমি আমার ফাদারের দেওয়া নামে সন্দেহ করছ?"

এবং আপনার বয়স প'চিশ!' দাঁতে দাঁত চেপে সিলভারটন বলেছিলেন। 'মোর অর লেস'— ভদ্রমহিলা উত্তর দিয়েছিলেন।

'নিশ্চয়ই লেস'—সিলভারটন নিজের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন। 'আমার যে কি ক্ষতি আপনি করলেন! আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে যে অন্য কাউকে আনবো সে-টাকাও আমার নেই। টাকা যদিও যোগাড় হয়, সময় নেই। মিস ডিকশনকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছি। একা মিস গ্রের পক্ষে এতো বড়ো বার চালানো অসম্ভব।'

আমি বলেছিলাম, 'এসে যখন পড়েছে, তখন কী করবেন? লণ্ডনে কি বয়স্কা মহিলারা বার-এ কাজ করেন না?"

প্রত্যুত্তরে সিলভারটন যা বলেছিলেন তা আজও আমার বেশ মনে আছে। দীর্ঘদিন ধরে বহুবার ব্যবহার করেও কথাটা পুরনো হয়নি। এই শহর সম্বন্ধে ওইটাই বোধহয় শেষ

কথা—ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা।

সিলভারটন বলেছিলেন, 'লণ্ডনে চলতে পারে—এখানে চলবে না। দু'টো বুড়ী এইভাবে চৌরঙ্গীর দু'টো হোটেলকে ঠকিয়েছে। ওদের টাকা ছিল অনেক, ফিরতি জাহাজের ভাড়া দিয়ে দিলে, কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিত। বুড়ীরা অবশ্য ফিরে যায়নি, তারা খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজী পাড়ায় নিজেদের দোকান করে বসলো।'

বুড়ী, মিস বুথ অনুনয় বিনয় করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাকে একবার সুযোগ দাও—আমি বলছি তোমার বিক্রি কমবে না।'

সিলভারটন রাজী হননি। জোচ্চুরিটা ধরবার জন্যে, চাবি খুলে মিস গ্রেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পথের শ্রমে ক্লান্ত হয়ে বেচারা মিস গ্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চোখ মুছতে মুছতে লাজনম্রা জেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে যে ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত ছড়ানো রয়েছে, সেদিনই যেন বুঝেছিলাম।

সিলভারটন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মিস বুথ কিভাবে সকলকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলেন, জানেন?'

মিস গ্রে কোনো উত্তর দেননি। মাথা নিচু করে বলেছিলেন, 'আমি তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। দেশ ছেড়ে আসছি, কোনোদিন আর ফিরতে পারবো কিনা জানি না।'

এই লাজুক ও নম্র স্বভাবের অষ্টাদশী শাজাহান হোটেলের বার-এ কী করে যে কাজ করবে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জেন বললেন, 'মিস বুথের মতো দয়ালু স্বভাবের মহিলা আমি দেখিনি। জাহাজে সহস্ত পথ আমাকে যত্ন করে এসেছেন।'

সেই রাত্রে শাজাহান থেকে ফিরে এসেছিলাম। কয়েকদিন পরে শুনেছিলাম মিস বুথ লিপস্টিক এবং রুজমাখা 'কিডারপুর' গার্লদের দলে যোগ দিয়েছেন। আর যুবতী মিস গ্রের লাজনম্র হাত থেকে হুইস্কি গ্রহণ করবার জন্য শাজাহান হোটেলে অনেক মেড-ইন-ইংল্যাণ্ড ভদ্রলোক এবং মেড-ইন-ইণ্ডিয়া বেঙ্গলী বাবু ভিড় করছেন। এই বেঙ্গলী বাবুদের নিয়েই ডেভি কারসন, গান বেধেছিলেন—

I very good Bengali Babu

In Calcutta I long time e'stop.

জেন সম্বন্ধে আমি যে ভুল করিনি, তা আবার একজনের কথা শুনে বুঝলাম—আমার বন্ধু রবি। রবি অ্যাডাম। শাজাহান-এ 'সাপার' করতে গিয়ে জেনকে সে প্রথম দেখেছিল। কলকাতার বার-এ তার নিজের দেশের এক মেয়ের দু'র্দশা সে নিজের চোখে দেখেছিল। না দেখলেই হয়তো ভালো করতো। অনেক কষ্টের হাত থেকে বে'চে যেতো—বিধাতার এমন কঠিন পরীক্ষায় বেচারাকে বসতে হতো না।

রবি বলেছিল, 'শাজাহানের নতুন মেয়েটিকে দেখেছো? চোখঝলসানো সুন্দরী হয়তো নয়—কিন্তু প্লিজিং। বেচারার কি ইংলণ্ডে চাকরি জুটলো না? না জেনে শুনে কেউ এখানে আসে? গত রাত্রে ক্লাইভ স্ট্রীটের এক বড়া সাব ওর হাত চেপে ধরেছিল। অনেক কষ্টে খিদমতগার হাত ছাড়িয়ে দেয়। আর একজন আব্দার ধরেছিল, 'আমাকে কম্পানি দাও। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আমার টেবিলে এসে বোসো, একটু ড্রিঙ্ক করো।' আমি বাধা না দিলে ভদ্রলোক জোর করেই ওকে কাউন্টার থেকে বের করে নিয়ে আসতেন। তখন একটা কেলেঙ্কারি হতো। বার-এর অন্য খদ্দেররা রেগে উঠতো, সবাই বলতো, আমার পাশে এসে বোসো, আমিও 'লোনলি ফীল' করছি।

আমাদের রবি, অর্থাৎ রবার্ট জে অ্যাডাম, তখনও পুরো ক্যালকাটাওয়ালা হয়ে ওঠেনি। বছর খানেক ক্লাইভ স্ট্রীটের এক বাঘা আপিসে কাজ করছিল। এখানকার ভাষা, সভ্যতা, চালচলন কোনো কিছুতেই সে তখনও অভ্যস্ত হয়ে খ্রঠেনি।

এমন যে হবে তা আমি জানতাম না। কোনো অদৃশ্য আকর্ষণে রবি প্রতিদিন শাজাহান হোটেলে যেতে আরম্ভ করেছে। দিনের আলোয় ওদের দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। জেনকে ঘরে তালাবদ্ধ করে, সিলভারটন ঘুমোতে যেতেন। জেনও সেই সময় অঘোরে ঘুমিয়ে থাকতো। সন্ধ্যার পর থেকে তার যে ডিউটি আরম্ভ। আর তখনকার বার তো আর এখনকার মতো দশটা কি এগারোটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যেতো না। সকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকতো। মদ্যপদের অট্টহাসি, হৈ হৈ হট্টগোল, গেলাস ভাঙার শব্দের মধ্যেও দু''টি মন নীরবে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল।"

হবস একটু হাসলেন। বললেন, "আমি ব্যবসাদার লোক, কাব্যিক ন্যাকামো আমার আসে না। তবুও আই মাস্ট সে, ওদের দু'জনের পরিচয়ের মধ্যে কাব্যের সৌরভ ছিল। শূনেছি ওরা কোডে কথা বলতো। হুইস্কির 'গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে জেন কড়া কড়া ভাষা ব্যবহার করতো। মিষ্টি কথা বলা মিষ্টি হাসবার কোনো উপায় ছিল না— অন্য খদ্দেররা তাহলে হৈ হৈ বাধিয়ে দেবে।

খিদমতগারই বোধ হয় সব জানতো। কোনো গোপন কথা থাকলে সে-ই রবিকে চুপি চুপি বলে যেত। খিদমতগার বেচারার এক মুহূর্তের শান্তি ছিল না। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বারমেডকে কিছু বলতে অতিথিরা তবু ও সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু খিদমতগারের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাব পেশ করতে লজ্জা নেই। শাজাহান হোটেলের মদ্যরসিকরা খিদমতগারকে একটা টাকা এবং একখানা চিঠি মেমসায়েবকে পৌঁছে দেবার জন্যে দিতেন।

জেন-এর কাছে পরে শুনেছি, একরাত্রে সে তিরিশখানা চিঠি পেয়েছিল। তার মধ্যে দশজন তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জেন বলেছিল, মাই পুওর খিদমতগার, সে যদি তিরিশ টাকা রোজ আয় করতে পারে, আই ডোন্ট মাইন্ড।"

হবস একবার ঢোঁক গিললেন। সুন্দরের স্মৃতিকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আমি কিন্তু রবিকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ডোন্ট ফরগেট, ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা।"

সাদারল্যাণ্ডও যেন মিস্টার হবসের কথায় চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "ঠিক। কলকাতা কলকাতাই।"

"জেন ও রবি যখন বিয়ে করবার মতলব ভাঁজছে তখনও রবিকে বলেছিলাম, মনে রেখো ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা। হোটেলে যাও, ড্রিঙ্ক করো, ফুর্তি করো, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তাই বলে বারমেডকে বিয়ে করে বোসো না।"

মিস্টার হবস এবার একটু থামলেন।

তাঁর কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। বিয়ে করে একঘরে হবার সম্ভাবনা ইংরেজ সমাজেও তাহলে আছে? এতোদিন ধরে সমস্ত গালাগালিটা শুধু শুধু আমরাই হজম করে এসেছি।

মিস্টার হবস আবার বলতে আরম্ভ করলেন। আমার মধ্যে তবু সামান্য চঞ্চলতা ছিল, কিন্তু সাদারল্যাণ্ড পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

মিস্টার হবস বললেন, "আমাদের কোনো আপত্তিই রবি শোনেনি। সে বলেছে, 'আমি কথা দিয়েছি। শাজাহান হোটেলের নরককুণ্ড থেকে জেনকে আমার উদ্ধার করতেই হবে।

জেনও আপত্তি করেনি। শাজাহান হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে সে ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। বার-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সে যে আপনজনকে খু'জে পেয়েছে, তা হয়তো গল্পের মতো শোনায়; কিন্তু সত্যি তা সম্ভব হয়েছে। ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে জেন।

সিলভারটন গুজব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। জেনকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'যে-সব গুজব শুনছি, আই হোপ, সেগুলো মিথ্যে। তোমার কাজে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার পপুলারিটি কলকাতার সমস্ত বারমেডদের হিংসের কারণ। পরের কনট্রাক্টে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো।' জেন বলছে, 'বিবাহিত মেয়েদের চাকরিতে রাখতে আপনার কোনো অসুবিধে আছে?"

'বিবাহিত মেয়ে। জেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ম্যারেড গার্ল' দিয়ে কখনও বারমেড-এর কাজ চলে?"

'কেন? আপত্তি কী?' জেন প্রশ্ন করেছে।

'আপত্তি আমার নয়। শাজাহান হোটেলের পেট্রনদের। তাঁরা অপমানিত বোধ করবেন। হয়তো শাজাহান বারকে বয়কট করে বসবেন।' সিলভারটন বলেছেন।

জেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, 'আমি তা হলে কনট্রাক্ট সই করবো না। আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে।'

সিলভারটন তখন লোভ দেখিয়েছেন। জেনকে সব ভেবে দেখতে বলেছেন। এমনকি বিক্রির উপর একটা কমিশন দিতেও রাজী হয়েছেন। জেন তবুও রাজী হয়নি। বড়লোক হবার জন্যে সে কলকাতায় আসেনি। অভাবে বিরক্ত হয়ে, বাঁচবার জন্যে, ভুল করে চলে এসেছিল বিলেত থেকে। এখন নিজের চোখে সব দেখছে।

সিলভারটন বলেছেন, 'তোমার প্রাইভেট লাইফে আমি কোনোরকম বাধা দেবো না। দু'পুরবেলা তালা দিয়ে রাখার ব্যাপারটা প্রচারের জন্য করেছিলাম। তুমি যদি চাও সে তালার চাবিও তোমাকে দিয়ে দেবো। তোমার যা খুশী তাই কোরো।'

জেন বলেছে, চাবির মধ্যে থাকবার আর প্রয়োজনই নেই। নতুন যে বারমেড আসবে, তাকে বরং ওই সুযোগটা দেবেন।"

সিলভারটন তখন ভয় দেখিয়েছেন। 'নিজের সর্বনাশ এইভাবে ডেকে এনো না, জেন। এই ডেনজারাস শহরকে তুমি এখনও চেনো না। শাজাহান হোটেলেব বারে তোমার একটু মিষ্টি হাসি দেখবার জন্যে যাঁরা সাধ্যসাধনা করেন, রাস্তায় বেরিয়ে তাঁরাই অন্য মানুষ হয়ে যান। তাঁদের সমাজ আছে, হিন্দুদের থেকেও কড়া সামাজিক আইন আছে, সেখানে রাত-জেগে-মদ বিক্রি করা মেয়েদের কোনো স্থান নেই।'

জেন হেসে বলেছে, তাঁদের চরণে তো আমি স্থান ভিক্ষে করছি না। আমি যাঁর কথা ভাবছি, কেবল তিনি আমার কথা ভাবলেই আমার চলে যাবে।'

সিলভারটন রবির সঙ্গেও দেখা করেছেন। বলেছেন, 'একবার যে বার-বনিতা সে চিরকালই বার-বনিতা – ওয়ান্স এ বারমেড অলওয়েজ এ বারমেড। আমরা খরচ দিয়ে বিদেশ থেকে মেয়ে আনি। অ্যাডেলফি, হোটেল-ডি ইউরোপ বেশী পয়স্যর লোভ দেখিয়ে তাদের ভাঙিয়ে নেয়। তারপর ওদের যৌবন যখন স্তিমিত হয়ে আসে, দৃষ্টির ছোবলে যখন আর তেমন বিষ থাকে না, তখন তাড়িয়ে দেয়। ওরা তখন দর্জিকে দিয়ে জামাগুলো আরো টাইট করে নিয়ে, খিদিরপরে গিয়ে লাইন দেয়। ডকের ধারে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ সব একাকার হয়ে যায়; ফিরিঙ্গি, কিন্তুলী, বিলিতী পাশাপাশি গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে।'

রবি বলেছে, 'ওই বিষয়ে আমার কোনো বই লেখবার ইচ্ছে নেই, সুতরাং আমি কিছু জানতে চাই না।'

সিলভারটন শেষ চেষ্টায় রবির বড়সায়েবের কাছে দরবার করেছেন। বড়সায়েব বলেছেন, 'আই সি। দ্যাট গার্ল' উইথ এ নটি স্মাইল। দু'পুর বেলায় ওর দরজায় তোমরা যে

তালা লাগিয়ে রাখো, তার ক'টা ডুপ্লিকেট চাবি আছে?”

রবিকে তিনি বলেছেন, 'হিন্দুরা রাস্তার জুতোকে শোবার ঘরে ঢুকতে দেয় না। যদি তেমন প্রয়োজন হয় ঘরের জন্যে একটা আলাদা বাথরুম স্লিপার ব্যবহার করো।'

রবি বলেছে, 'যখন আমি লণ্ডন থেকে জাহাজে চড়েছিলাম, তখন শুনেছিলাম ইংরেজ যেখানেই যাক না কেন, তারা সব সময় অন্য লোকের প্রাইভেসিকে সম্মান করে।'

বড়সায়েব আর কিছু বলেননি। শুধু মনে করিয়ে দিয়েছেন, যা কিছু আমরা করি, তার ফলও আমাদের ভোগ করতে হয়।

রবি সে-উপদেশের জন্য সায়েবকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারপর এক শুভদিনে জেন শাজাহান হোটেলের কন্ট্রাক্ট শেষ করে রবার্ট অ্যাডামের সঙ্গে জীবনের গাটছড়া বাঁধবার জন্য চার্চে গিয়েছে।

ধর্মতলা চার্চে সেদিন কিন্তু মোটেই ভিড় হয়নি। জেন-এর কোনো বন্ধু নেই, একমাত্র মিস ডিকশন ছাড়া। তিনি তখন শাজাহান হোটেলের ছাদের ঘরে ভালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। আর রবার্টের বিয়ে নিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীট মহলে যে সামাজিক কেলেঙ্কারীর অবতারণা হয়েছে, তাতে ক্লাইভ স্ট্রীটওয়ালাদের কারোর পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। আমার সঙ্গে ও-সমাজের তখনও তেমন জানাশোনা হয়নি। সেই জন্যেই বোধহয় বিয়েতে গিয়েছিলাম; এবং যাবার সময় জোর করেই ম্যানেজার সিলভারটনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'হাজার হোক তোমার একজন কর্মচারিণীর বিয়ে তো।”

বিয়ের পর ওরা বাসা করেছিল। সে বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম, জেন বসে রয়েছে। আমাকে দেখে ওরা দু’জনে হৈ হৈ করে উঠলো। রবি আলমারি খুলে আমাদের জন্য ব্র্যান্ডির বোতল বার করে নিয়ে এলো। স্বামীকে মদ ঢালতে দেখে জেন হেসে ফেললো। আমিও সে হাসিতে যোগ দিয়েছি। রবি তখন হাসছে. ‘শাজাহানের কাউন্টারে তুমি অনেকবার দিয়েছো, এবার আস্তে আস্তে শোধ করবার চেষ্টা করি।'

জেন যেন এতোদিন জেলখানায় বন্দী হয়ে ছিল। বহু কষ্টে মুক্তি পেয়েছে তাই তার আনন্দের সীমা নেই। আর রবিও যেন হঠাৎ তাকে খুজে পেয়েছে, যাকে সে এতোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ব্রান্ডির গ্লাসে আমরা চুমক দিয়েছি। নববিবাহিত দম্পতির মঙ্গল কামনা করেছি! জেন বসে বসে সোয়েটার বুনছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'এতোদুর যখন এসেছেন তখন দুপুরের লাঞ্চটাও সেরে যান। আমার অবশ্য নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।'

রবার্ট বলেছে, 'ওইটাই তোমার স্বভাব। সিনভারটনকেও তুমি অত্যন্ত শর্ট নোটিশ দিয়ে ছিলে!'

জেন কপট রাগ করেছে। বলেছে, 'বাজে লোকদের অল্প নোটিশে ছাড়া পেতে অসুবিধে হয় না। আমাদের মতো অপদার্থকে বিদায় করবার সুযোগ পেলে মালিকরা একমুহূর্ত দেরি করতে চান না!'

রবার্ট বলেছে, 'সবাই যদি জহুরী হতো, তাহলে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের হ্যামিলটন কোম্পানির অতো কদর থাকতো না।'

জেন তখন বলেছে, 'হ্যামিলটন কোম্পানির উপর তোমার এতো দূর্বলতা কেন জানি না।' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলেছে, 'আপনার বন্ধুটিকে একটু সাবধান করে দিন না। এ-মাসের পুরো মাইনেটি তো এঁদের হাতে দিয়ে আমার জন্যে হীরে-বসানো ব্রোচ কিনে এনেছেন। এর কোনো মানে হয় বলুন তো?'

'দোষটা বুঝি শুধু, আমার হলো?" রবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে। যদি হ্যামিলটনের উপর তোমার এতোই রাগ, তবে আমার জন্যে ওখান থেকে রূপোর টি-পট কিনে আনলে কেন?"

জেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তার কারণ অন্য। বিষে বিষক্ষয় করবার চেষ্টা করছি। চা দিয়ে যদি এলকোহলকে তাড়াতে পারি।'

সেদিন যে যত্ন করে ওরা আমার আদর-আপ্যায়ন করেছিল, তা আজও ভুলতে পারিনি। বাজনার কথা উঠছে। রবি বলেছে, 'জানেন, ও পিয়ানো বাজাতে পারতো। সম্ভব হলে জেনকে একটা কিনে দেবার ইচ্ছে আছে।'

কয়েকদিন পরে একটা ভালো পিয়ানোর খোঁজ পেয়েছিলাম। রবি ও জেনকে খবর দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু খবর দিতে হলো না। আজ আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে

আছেন, ঠিক ওইখানেই তারা হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলো। দেখেই বললাম, 'একটা চমৎকার পিয়ানোর খবর পেয়েছি।'

জেন-এর মুখে কালো হয়ে উঠলো। আর রবি যেন রাত্রে একটুও ঘুমোয়নি। রবি বললে, 'এখন বোধহয় পিয়ানো কেনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।' 'কী ব্যাপার?”

‘আমার চাকরি গিয়েছে।'

‘কেন? বড়সায়েবের সঙ্গে কোনো গডগোল হয়েছে?”

‘না। বার-এ অপরিচিত পুরুষদের সারারাত ধরে মদ বিক্রি করে এমন এক মেয়ে বিয়ে করে আমি নাকি কোম্পানিকে লোকচক্ষুতে হেয় করেছি। এমন লোক কোম্পানিতে রাখলে, কোম্পানির বিক্রি কমে যাবে, বিজনেসের ভয়ানক ক্ষতি হবে।'

কলকাতা শহরে এমনভাবে কোনো ইংরেজের চাকরি যাওয়া যে সম্ভব তা আমাব কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু বড়সায়েবের নিজের হাতে লেখা চিঠিটা রবি আমার সামনে মেলে ধরলো।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জেন বললে, 'এখন উপায়?'

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'উপায় আবার কী? অন্য আপিসে চাকরির চেষ্টা করতে হবে। কলকাতায় তো আর ফার্মের অভাব নেই।'

কিন্তু এতো ফার্ম থাকলেও সে চাকরি পাওয়া সোজা নয়, তা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমরা। অনেক আপিসে ঘুরেছিল রবি। কিন্তু ওকে দেখেই কর্তারা আঁতকে উঠছেন। যেন সে খুন করে জেলে গিয়েছিল, এখন খালাস পেয়ে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে। কর্তারা বসতে দিয়েছেন। বলেছেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার কথা শুনেছি বটে। আপনিই শাজাহান হোটেলের বারমেড জেনকে নিয়ে পালিয়েছেন?'

'আজ্ঞে, তাঁকে নিয়ে আমি পালাইনি, তাঁকে আমি বিয়ে করেছি।' রবার্ট আতর্কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে।

সায়েব বলেছেন, 'ও আই সি। কিন্যাপিং নয়, ইলোপমেণ্ট নয়, প্লেন এন্ড সিম্পল ম্যারেজ।'

চাকরি কিন্তু পাওয়া যায়নি। প্রথমে সন্দেহ হয়নি। কিন্তু ক্রমশঃ যেন রবি বুঝতে পারছে ওর চাকরি হবে না। কলকাতার কোনো আপিস তাকে আর চাকরি দেবে না। যা সঞ্চয় ছিল, তাও ফুরিয়ে আসছে। সাজানো বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, ওদের অন্য একটা ছোট বাড়িতে উঠে যেতে হলো।

জেন বললে, 'আমি চাকরির চেষ্টা করবো।”

মেয়েদের কাজ করবার সুযোগ তখন সামান্যই ছিল। টাইপ কিংবা টেলিফোনের চাকরি তখন ছিল না। হয় লেডিঙ্গ ড্রেস মেকার, না-হয় হেয়ার ড্রেস্যর। পার্ক স্ট্রীটে দোকান করে, বড়সায়েবদের বুড়ী বৌদের সাদা চুল কালো করবার চেষ্টা করো। কিন্তু সে-সব কাজও তো শিখতে হবে। না শিখলে, কে আর জামা তৈরি করতে পারে, বা চুল ছাঁটতে সাহস করে?

কাজের খোঁজে তবু জেনকে দু''এক জায়গায় পাঠিয়েছি। কিন্তু রবি কিছুতেই রাজী নয়। সে যুগের লোকরা তোমাদের মতো আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। স্ত্রী কাজ করবে ভাবতেই তাদের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করতো। রবি বলছে, ‘এখন থেকেই উতলা হয়ো না। ব্যাঙ্কে এখনও আমার কিছু টাকা রয়েছে।'

এদিকে জেনও একদিন আবিষ্কার করলো; চাকরি পেলেও তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। সে মা হতে চলেছে। অভাব, অনটন, দু’শ্চিন্তার মধ্যেই দুঃখদিনের রাজা তাদের ঘরে আসছেন।

রবি আমার কাছে প্রায়ই আসতো। ওদের খবরাখবর পেতাম। বলতো, 'কলকাতার প্রভুরা যে আমাদের জন্যে এতো শাস্তি তুলে রেখেছিলেন জানতাম না। কিন্তু আমরা দু''জনে এর শেষ পর্যন্ত দেখবো। জেন আর আমি ওদের •নাকের ডগায় সুখে স্বচ্ছন্দে বে'চে থাকবো। বারমেডকে বিয়ে করা যে সমাজের চোখে এতোবড়ো অন্যায় তা তো জানতাম না। এর আগে কলকাতায় কেউ কি কখনও কোনো হোটেলের মেয়েকে বিয়ে করেনি?'

‘করেছে,' আমি বলেছি। 'ওই তো হোটেল-সার্জেন্ট ওকলে কিছুদিন আগে বিয়ে করলো পেগিকে। রাত্রে পূলিসের লোক কলকাতার বারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতো। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে এক রাত্রে পেগিকে সার্জেন্ট ওকলে অ্যারেস্ট করেছিল। তারপর

পেগির হাতেই সার্জেন্ট নিজে গ্রেপ্তার হলেন! গবরমেণ্টের আইনে বিয়ের কোনো বাধা নেই। ওরা দু''জনে তো বেশ সুখে শান্তিতে সংস্যর করছে। ওদের দু'টো ছেলেকে ইস্কলে পাঠিয়েছে। চাকরি যাওয়া তো দূরের কথা, কপালগণে সার্জেণ্টের পদোন্নতি হয়েছে।'

রবিকে শেষ পর্যন্ত একটা কাপড়ের এজেন্সি যোগাড় করে দিয়েছি। ম্যাঞ্চেস্টারের মিস্টার স্ট্রীট সেবার ব্যবস্যর কাজে কলকাতায় এসে শাজাহান হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল আমার ; সেই সুযোগেই এঁকে বলেছিলাম, 'রবিকে রাখুন। মাইনে দিতে হবে না, কমিশনে কাজ করবে।' রবির কাছে তখন সে-ই আশীর্বাদ। কাপড়ের নমূনা নিয়ে সে সারাদিন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতো। বড়বাজার যেতো সকালের দিকে; আর দু'পুরে জেন সামান্য যা বেঁধে রাখতো তাই খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়তো অন্য পাড়ায়। ওদের কোম্পানির ছাতার কাপড় খুব বিখ্যাত ছিল। রবি আমাকে একটা ছাতা উপহারও দিয়েছিল। কিন্তু সারা বছরে ক'টা ছাতাই আর তখন বিক্রি হতো বলো।

এমন কিছু বিক্রি হতো না। ফলে কমিশনও সামান্য। এতো সামান্য যে তাতে বেয়ারা এবং কুক রাখা যায় না। জেন নিজেই সব করে নিতো। চরম দুঃখের মধ্যেই দুঃখের রাজার আবির্ভাবের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওদের অবস্থা তখন আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। উইলিয়ামস্, লেন-এ একটা ভাঙা ঘরে ওদের বাসা। পাশের বাড়িতে একজন চার্চের পাদ্রি থাকতেন। তাঁর সঙ্গে মিসেস্, ব্রকওয়েরও যথেষ্ট আলাপ ছিল। ওদের দুঃসময়ে ফদার রোজ আসতেন। ফাদারের স্ত্রীও। জেন-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। শাজাহানের প্রাসাদে যে একদিন রাত্রি যাপন করতো, নরম কার্পেটের উপর দিয়ে চলা যার অভ্যাস ছিল, সে আজ যোগিনী সেজেছে। দু'টো ঘর। দেওয়ালে চুন-বালি খসে ইট দেখা যাচ্ছে। ওয়েটাররা যাকে খাতির করে ডাইনিং হল-এ নিয়ে যেতো, পাছে অসুবিধা হয় বলে সযত্নে টেবিলটাকে চেয়ার থেকে সামান্য বেকিয়ে ধরতো, সে আজ নিজেই রান্না করছে। অসুস্থ শরীরটা টানতে টানতে ঘরের জিনিসপত্তর গোছাচ্ছে।

শাজাহান হোটেল আজ যেন অনেক দূরে সরে গিয়েছে। বার-এ দাঁড়িয়ে হাসির মুক্তো ছড়িয়ে যে হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, ড্রাইজিন, রাম, ভারমুথ বিতরণ করতো সে যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। জেন বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। সে বললে, 'শাজাহানকে

আমি কোনোদিন বোধহয় ক্ষমা করতে পারবো না। ঐখানেই আমি আমার স্বামীকে পেয়েছি; তবুও।

বললাম, 'কেন?”

জেন এবার কেঁদে ফেললো। চাকরির খোঁজে, আপনাদের না বলে ওখানেও একদিন গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বার-এ কাজ করতে আমি আবার রাজী আছি। শুধু দু'পুরে আমাকে তালা দিয়ে রাখা চলবে না। হোটেলে আমি খাবোও না। কাজ শেষ হলেই নিজের বাড়িতে ফিরে যাবো। অন্তত বিলেত থেকে নতুন মেয়ে না আসা পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে দাও। লোকের অভাবে তোমাদেরও তো অসুবিধে হচ্ছে।'

সিলভারটন তখন মুখ বেকিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তালা খোলা অবস্থায় থাকতে হলে খিদিরপুরে যাও। আর বিবাহিত মেয়েকে বারমেড রাখার মতো দুর্মতি শুধু আমার কেন কলকাতার কোনো হোটেলেরই হবে না, শাজাহান থেকে যখন বেরিয়েছ, তখন খিদিরপুরেই তোমাকে শেষ করতে হবে|

জেন-এর চোখ দিয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। রবির পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলেছে। সারাদিন বড়বাজার, শ্যামবাজার আর ধর্মতলায় ঘুরে ঘুরে রবির দেহটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘামে জামাকাপড়গুলো ভিজে গিয়েছে। সারাদিন রবি কিছুই বিক্রি করতে পারেনি। আগে যা বিক্রি করেছে, তার দামও আদায় করতে পারেনি। অথচ মাস শেষ হয়ে আসছে, বিলেতে হিসেব পাঠাতে হবে।

রবিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছি, 'তোমরা পালাও। মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাই চলে যাও। চাকরি পেয়ে যাবে।

রবি রাজী হয়নি। জেন বোধহয় আমার কথা বুঝতে পেরেছিল। কিছুতেই নয়', সে বলেছিল 'এই কলকাতায় আমাদের থাকতে হবে। ওদের অপমানের যোগ্য উত্তর এখানে বসে বসেই আমাদের দিতে হবে। চিরকাল কিছু আমাদের এমন অবস্থা থাকবে না। আমরা আবার রাসেল স্ট্রীটে ফ্ল্যাট নেবো। তারপর একদিন শাজাহানেই আমরা ব্যানকোয়েট দেবো। ওদের সবাইকে সেখানে হাজির করবো। আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব শাজাহান হোটেলে না করে আমরা কলকাতা ছাড়ছি না।'

রবি আনন্দে জেনকে আমার সামনেই জড়িয়ে ধরেছে। বলেছে, 'ঠিক বলেছ, জেন'।

চরম দুঃখের মধ্যেও ওদের আনন্দ দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, তাই যেন হয়। কিন্তু তখন কি জানতাম, চোখের জলের সবে মাত্র শুরু; আসল বর্ষা এখনও নামেনি।

সে অবস্থা আমি চোখে দেখিনি। ফাদারের মুখেই খবর পেয়েছিলাম।

ফাদর বলেছিলেন, 'সর্বনাশা অবস্থা।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'আপনার বন্ধু রবি অ্যাডাম-এর বসন্ত হয়েছে। আসল স্মলপক্স।'ওরা কোথায় আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

'কোথায় আর থাকবে। এখনও উইলিয়ামস লেনের বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতে বোধহয় আর রাখা চলবে না। সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কে দেখবে? কে সেবা করবে? এবং সবচেয়ে বড়কথা, টাকা পাবে কোথায়? জেন কিছুই শুনতে চাইছে না। দেহের ওই অবস্থা নিয়ে সর্বদা স্বামীর পাশে বসে রয়েছে। গতরাত্রে বেচারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

বন্ধুরা আমাকে বারণ করেছিলেন। 'বসন্ত! ওর আধ মাইলের মধ্যে যেও না। যদি কিছু সাহায্য করতে চাও, ফাদারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিও।'

কিন্তু কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। বৌবাজার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ির কাছে এসেছি। দুর থেকে ফিনাইল ও ওষুধের গন্ধ ভেসে এসেছে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে সাহস হয়নি। ফাদার তখনও বোধহয় ঘরে বসে বসে ওর সেবা করছিলেন—বসন্তের গুটিতে তুলি দিয়ে অলিভ তেল লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। রবির সর্বদেহে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেহটাকে ভুট্টার মতো করে পোড়ানো হচ্ছে।

আর জেন! মেটারনিটি কোট পরে, থলে হাতে বোধহয় বাজার করতে বেরোচ্ছিল। আমাকে দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। জেনকে আমি চিনতে পারছিলাম না। এই জেনকে দেখবার জন্যেই কলকাতার রসিকজনরা একদিন শাজাহান হোটেলের বার-এ

ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল? হাততালি পড়েছিল ; ছোকরা মাতালরা গুন গুন করে গান ধরেছিল ; শাজাহান হোটেলে মদের বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল।

'আপনি! আপনি এখানে? জেন আমাকে দেখে কোনোরকমে প্রশ্ন করেছিল।

'রবি কেমন আছে খবর নিতে এসেছি।' আমি মাথা নিচু করে উত্তর দিয়েছিলাম।

'রবি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। ফাদার কাল চার্চে ওর জন্য প্রার্থনা করেছেন। লোকাল হিন্দু বয়েজরা খুব ভালো। ওরা শাজাহান হোটেলে, উইলসন সায়েবের হোটেলে, বড়াপোচখানায় যায় না বটে; কিন্তু জেণ্টেলমেন। ওরা দল বেধে আজ ফিরিঙ্গী কালীর কাছে পুজো দিতে গিয়েছে। আমি পয়সা দিতে গিয়েছিলাম, ওরা নিলো না। ওরা নিজেরা চাঁদা করে পয়সা তুলেছে। বলেছে, সায়েব ভাল হয়ে গেলে, চাকরিতে ঢুকলে আমাদের একদিন কেক তৈরি করে খাইও। ঠিক বিলিতী কেক যেমন হয়। যেমন কেক কলকাতার বড় বড় হোটেলে বড় বড় সায়েবরা চায়ের সঙ্গে খায়। যে কেকে কামড় দিতে দিতে মেমসায়েবরা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

আমি বলেছি, 'জেন, যদি তুমি কিছু না মনে করো, কিছু, টাকা...'

জেন মাথা নেড়েছে। 'হ্যামিলটনের হীরের ব্রোচ এখনও আমার কাছে আছে। শাজাহান হোটেলে এক বছর কাজ করেও আমি কিছু জমিয়েছিলাম। রবি কোনোদিন তা স্পর্শ করেনি। সেগুলো অমার কাছে আজও আছে।' লোকাল বয়েজরা ঠিক সেই সময় কোথা থেকে হাজির হলো। 'মেমবৌদি, মেমবৌদি, আপনি কেন বাজারে যাবেন?আমরা রয়েছি।'মেমবৌদির হাত থেকে ওরা বাজারের থলেটা কেড়ে নিয়েছে। 'বাজার করে নিয়ে আসছি। কিন্তু নো মাছ। স্ট্রিক্টলি ভেজিটারিয়ান।

মাদার 'সেটুলা' না হলে অসন্তুষ্ট হবেন।'—ছেলেরা বলেছে। ছেলেরা বলেছে—'আজ রাত্রে বৌদি আপনি ডিপ ডিপ স্লিপ। নো দুশ্চিন্তা। সায়েবদাদাকে হোল নাইট আমরা গার্ড দেবো। নো ফিয়ার বৌদি। ''স্লাইট সন্দেহ, দেন এণ্ড দেয়ার কলিং বৌদি।'

জেন বলেছেন, 'তা হয় না, মাই বয়েজ। তোমরা মানুষ নও, তোমরা 'অ্যাঞ্জেল। কিন্তু এই সর্বনাশা রোগে তোমরা কাছে এসো না। তোমাদের বাবা মা আছেন, ভাইবোন আছেন। রোগটা মোটেই ভালো নয়।'

ছেলেদের মধ্যে একজন হেসে উঠেছে। আমরা কী অতো বোকা ছেলে, বৌদি। মাদার সেটুলাকে একেবারে কন্ট্রোল করে ফেলেছি। আমাদের কিছু হবে না। হত্তুকি–ইণ্ডিয়ান মেডিসিন।' শার্টের হাতাটা গুটিয়ে ওরা সুতোয় বাঁধা একটুকরো হত্তুকি দেখিয়েছে। কিচ্ছু হবে না। আপনার জন্যেও আমরা এনেছি। তাড়াতাড়ি স্নান করে, ওটা আজই হাতে বেধে ফেলুন।'

জেন-এর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। হত্তুকি পরাবার জন্যে ছেলেরা ওদের মেমবৌদিকে প্রায় টানতে টানতেই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

খবর পেয়েছি, রবির অবস্থা ভাল নয়। লোকাল বয়েজদের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু হাসপাতালে দিতে হয়েছে। হাসপাতালের বেড-এ প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সে পড়ে আছে। লোকাল বয়েজরা যমের সঙ্গে টাগ অফ-ওয়ারে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি। হাসপাতালের ওয়ার্ডে' বাইরের লোকদের ঢোকা মানা। ওরা তবু ফিরিঙ্গী কালীর ফুল প্রতিদিন ওয়ার্ড বয়ের হাতে দিয়ে এসেছে। এই দড়ি টানাটানিতে কে জিতবে জানা নেই, কিন্তু লোকাল বয়েজরা অন্তত ফলাফল ঘোষণা দেরি করিয়ে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে ওরা প্রতিদিন মেমবৌদির কাছে গিয়েছে, মেমবৌদিকে সায়েবদাদার সব বিবরণ—অর্থাৎ যতখানি তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে—দিয়েছে। মেমবৌদির যে আর রাস্তায় বেরোবার সামর্থ্য নেই। শুয়ে শুয়েই ওদের কথা তিনি শোনেন। ছেলেরা বলেছে, ‘বুঝতে পারছি বৌদি, আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি। ভয়ের কিছু নেই।' বৌদি অঝোরে কেঁদেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমরা কারা? তোমরা কেন করছ?”

ছেলেরা বুঝতে না পেরে, প্রথমে ভড়কে গিয়েছে। মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বলেছে, কী করছি আমরা?...ও...সায়েবদাদার অসুখ তাই। অসুখ না করলে কিছুই করতাম না। ফাদারের পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেতাম'

ছেলেদের কাছেই আবার একদিন খবর পেলাম। খবর নিতে একদিন জেনের কাছে যাচ্ছিলাম। গলির মোড়ে ছেলেরা মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ওরা সরে গেলো। নিজেদের মধ্যে সভয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললে, আমাকে সোজাসুজি কিছুই বলতে চাইলো না। অথচ বাড়িতে জেনকে দেখতে পেলাম না। সেখানে কেউ নেই।

ওরা বললে, ‘আপনি ফাদারের সঙ্গে দেখা করুন।'

"ওদেরই একজন আমাকে ফাদারের কাছে নিয়ে গেলো। ফাদার তখন বোধহয় ভিতরে ছিলেন। একটু অপেক্ষা করবার পর, ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ও আপনি এসে গিয়েছেন? শুনেছেন?”

বললাম, 'না, এখনও কিছু শুনিনি।'

ফাদার বললেন, ‘সেই নবজাত শিশুকে আমার স্ত্রী দু’ধ খাওয়াবার চেষ্টা করছেন। বহু কষ্ট করে একটা ওয়েট নার্স যোগাড় করে এনেছি।' 'মানে?' আমি চমকে উঠেছি।

‘ওদের কী দোষ? ওদের সত্যি দোষ নেই। ওরা লজ্জা পেয়েছে, ভয়ে আমার কাছে আসছে না, কিন্তু আমি জানি, অলমাইটী গড়ের চরণতলে তারা কিছু অপরাধ করেনি। তবে, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতো। আমি তো ডাক্তারদের সঙ্গে রোজ কথা বলি। প্রয়োজন হলে আমিই বলতে পারতাম।' ফাদারের কাছে ঘটনাটা শুনলাম—

সেদিনও পাড়ার ছেলেরা ফিরিঙ্গি কালীর ফুল নিয়ে রবিকে দেখতে গিয়েছিল। অর্থাৎ ওয়ার্ডের সামনে পর্যন্ত গিয়েছিল, যেখানে লেখা— NO ADMISSION. সেখানে অন্যদিনের মতো ওয়ার্ড-বয়ের হাতে তারা টিফিন থেকে বাঁচানো কয়েকটা পয়সা দিয়েছে। ফুলগুলো সায়েবের বিছানার তলাতে দেবার জন্যে বলেছে। ফুলগুলো সায়েবের বিছানার তলায় দিয়ে ওয়ার্ড-বয় আবার ফিরে এসেছে। ছেলেরা জিজ্ঞেস করেছে, 'সায়েবদাদা কেমন আছেন?"

ওয়ার্ড বয় বলেছে, 'সায়েব তোমাদের কে হয়?”

‘কেউ নয়। আমাদের পাড়ায় থাকেন। সায়েবদাদা যে আমাদের মতো গরীব হয়ে গিয়েছেন। মেমবৌদি আমাদের মতো ডাল ভাত খেয়ে থাকেন। কী করবে, পয়সা নেই।'

ওয়ার্ড-বয় মাথা দু’লিয়ে বলেছে, তা হলে আপনাদের বলি, পেসেন্ট আপনাদের আত্মীয় নন যখন। বত্রিশ নম্বরের আখঁ খতম। ডাগদার সাব আজ ভোরে দেখেছেন।'

'অন্ধ! সায়েবদাদা জীবনে আর দেখতে পাবেন না?' ছেলেদের চোখ ছলছল করে উঠেছে। যদি আমরা চাঁদা করে আট টাকা ভিজিটের ডাক্তার নিয়ে আসি, দারোয়ানজী?”

ওয়ার্ড-বয় ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ওদের কথা আ'র কানেও নেয়নি।

মেমবৌদিকে ওরা প্রথমে বলতে চায়নি। মেমবৌদি জিজ্ঞেস করেছেন, ‘আজ তোমরা রবিকে কেমন দেখলে? রবি কেমন আছে?'

তারা মিথ্যে বলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মিথ্যে কথা বলবার অভ্যেস নেই যে ওদের। কিছু না বলে তারা চোখের জল মুছতে আরম্ভ করেছিল। একজন এরই মধ্যে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো।

মেমবৌদি তখন ওদের হাত চেপে ধরেছেন। 'বলো বলছি। আমি তোমাদের গার্জেন। আমাকে মিথ্যে বললে তোমাদের অকল্যাণ হবে।'

ওরা বলে ফেলেছে। সায়েবদাদা যে পৃথিবীর আলো কোনোদিন চোখ দিয়ে দেখতে পাবেন না, তা আর চেপে রাখতে পারেনি।

জেন-এর জ্ঞানহীন দেহটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই যে মেঝেতে লাটিয়ে পড়বে, ভারা তা ভাবতে পারেনি। মেমবৌদির মুখে তারা জলের ঝাপটা দিতে আরম্ভ করেছে, আর একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটেছে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেছেন, এখনি ওষুধ কিনে নিয়ে এসো। ওষুধ কেনার পয়সা ছেলেদের কাছে ছিল না—যা দরকার তার থেকে আট আনা কম হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা তখন ফাদারের কাছে ছুটে এসেছে। ফাদারও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন।

জেনের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে ফাদারের বাড়িতে আনা হয়েছে। এবং সেই রাত্রে সে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে—প্রিম্যাচিওর বেবি। দুঃখদিনের রাজা নির্ধারিত সময়ের আগেই ঘরে এসেছেন।

শেষ রাত্রেই ফাদার মৃত্যুপথযাত্রী জেনের জন্য নতজানু হয়ে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। রাত শেষ হবার আগেই উইলিয়ামস লেনের লোকাল বয়েজদের কাঁদিয়ে জেন যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, শাজাহান হোটেলের বার তখনও বন্ধ হয়নি। সায়েবরা তখনও নিশ্চয় চিৎকার করছেন, 'হে মিস, হুইস্কি সরাব, ব্রাতি পানি লে আও।'

ফাদার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দুঃখের সঙ্গে ছেলেদের বলেছেন, 'কে তোমাদের বলেছে, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে? বাজে কথা। একটা চোখ—ওনলি ওয়ান আই—নষ্ট হয়েছে। আর একটা ঠিক আছে। মিরাকুলাসলি বেঁচে গিয়েছে।'

কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। জেন-এর প্রাণহীন দেহ তখন সাদা চাদরে ঢাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। লোকাল বয়েজরা সেই রাত্রে হাঁটতে হাঁটতে লোয়েলিন কোম্পানিকে খবর দিতে চৌরঙ্গীতে চলে গিয়েছে। লোয়েলিন কোম্পানি—আণ্ডারটেকার। ছেলেরা বলেছিল, 'যদি আপত্তি না থাকে, আমরাই কাধেঁ করে নিয়ে যাবো। আমরাই সব করবো।'

ফাদার বলেছিলেন, 'তোমরা থেকো, কিন্তু ক্রিশ্চান ফিউনারাল-এ আরও অনেক গোলমাল আছে। লোয়েলিন কোম্পানিকে না-ডাকলে অসুবিধে হবে। ওরা দিনরাত ওই কাজ করছে।'

রবি ওদিকে সুস্থ হয়ে উঠছে। জ্বর কমে গিয়েছে। শরীরের অসহ্য জ্বালাটাও যেন ক্রমশ কমছে। ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে। এতোদিন সব যেন ভুলেই ছিল। আবার সব মনে পড়ছে। উইলিয়ামস লেনের একটা ভাঙা বাড়িতে জেনকে যে রেখে এসেছে তাও মনে পড়লো।

'মেমসায়েব কোথায়?” রবি জিজ্ঞাসা করে।

'কৌন?' ওয়ার্ড-বয় প্রশ্ন করে।

মেম সাব। মেরি জেনানা।' রবি উত্তর দেয়।

'এখানে কারুর আসা বারণ।' ডাক্তাররা রবিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তবু প্রবোধ মানতে চায় না। রবির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে আরম্ভ করে। 'মেমসাব। আমার জেনানা।'

আবার কখনও সে পাগলের মতো হয়ে ওঠে। বলে, বুঝেছি। সে আসতে চায়না, শাজাহানের সুন্দরী বারমেড আমাকে বিয়ে করে মস্ত ভুল করেছিল। নিশ্চয়ই সে অন্য কোথাও গিয়েছে। সিলভারটন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

ডাক্তাররা বলেছেন, 'আপনার স্ত্রীর উপর অবিচার করছেন। হাসপাতালের দরজা পর্যন্ত তিনি রোজ আসেন।'

দু’পুরবেলায় রবি ওয়ার্ড-বয়কে জিজ্ঞাসা করেছে, 'একজন মেমসায়েবকে রোজ তোমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো?’

না সাব, কোনো মেমসাব তো এদিকে আসেন না।' ওয়ার্ড বয় উত্তর দিয়েছে। অভিমানে রবির চোখ দিয়ে জল বেরোতে আরম্ভ করেছে। খবর পেয়ে ডাক্তাররা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'একেবারে বাজে কথা। তিনি প্রায়ই আমাদের কাছে আসেন।'

রবি মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। জেনকে না-হয় আপনারা আসতে দেন না। কিন্তু চিঠি দেয় না কেন সে? তাকে চিঠি লিখতে বলবেন?”

জানলার বাইরে থেকে লোকাল বয়েজরা দেখে, সায়েব কাঁদছে। একটা চিঠির জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে। যে আসে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে, ‘আমার কোনো চিঠি আছে? আমার ওয়াইফ জেন অ্যাডমি, উইলিয়ামস লেন থেকে কোনো চিঠি পাঠিয়েছেন?'

ছেলেদের মুখে ফাদার সবই শোনেন। হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডাক্তার বলেন, 'আপনিই পারেন, ফাদার। একমাত্র আপনিই ওকে বুঝিয়ে বলতে পারেন। ওয়ার্ডে আপনার ঢোকবার কোনো বাধা নেই।'

ফাদার এমন কাজে অভ্যস্ত। জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুভীত জীবনকে কল্যাণের স্পর্শ দেবার সাধনা তিনি অনেকদিন থেকেই করছেন। কিন্তু তিনিও পারেননি। অতি সাবধানে, জেনের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও, রবি বেড থেকে আছড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। গায়ের ঘাগুলো মেঝের ঘষটানিতে সঙ্গে সঙ্গে যেন দগদগে হয়ে উঠেছিল।

সেই রাতেই আবার জ্বর বেড়েছিল। রবি দু'ধের গেলাস ছ'ড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিছুই খেতে রাজী হয়নি সে। ডাক্তাররা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু সফল হননি।

রাতের অন্ধকারে উইলিয়ামস লেনের ছেলেরা আবার লোয়েলিন কোম্পানিতে খবর দিতে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে লোয়েলিন কোম্পানির কর্টেজ সোজা সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল। ছেলেদের পয়সা ছিল না। মেমবৌদিকে ওরা বড়ো একটা মালা কিনে দিয়েছিল। ধার করে বৈঠকখানা বাজার থেকে একটা কমদামী মালা ওরা সায়েবদাদার গাড়িতে দিয়েছিল।

তারপর আর আমি খবর রাখি না। ফাদার তার কিছুদিন পরেই হোমে ফিরে গিয়েছিলেন। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই নবজাত শিশুকে।”

হবস এবার চুপ করলেন। আমি চোখের জলকে সংবরণ করতে পারিনি। লোকাল বয়েজদের দলে মিশে গিয়ে কখন যে কাঁদতে আরম্ভ করেছি বুঝিনি। ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড কিন্তু কাঁদলেন না। বিচলিত হওয়ার কোনো লক্ষণই ওঁর মধ্যে দেখতে পেলাম না। ডাক্তার মানুষদের বোধহয় ওই রকমই হয়। মৃত্যুর সঙ্গে ঘর করে এঁরা মৃত্যুকে আশ্চর্য বলে মনে করেন না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। “থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার হবস।” তারপর থতমত খেয়ে আর একবার বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ ইনডিড স্যর।”

বাইরে বেরিয়ে সাদারল্যাণ্ড কোনো কথা বললেন না। কথা বলার মতো অবস্থা আমারও ছিল না। আপিস পাড়ায় ছুটি হয়ে গিয়েছে। ট্রাম বাস বোঝাই। রাস্তায় ঘরমুখো লোকদের শোভাযাত্রা।

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, “আই হোপ, তোমার কোনো কাজ নেই।"

ডাক্তারের বলার ভঙ্গিতে সামান্য দুঃখিত হয়েছিলাম। যেন ওঁর সঙ্গে ঘোরাটাও আমার চাকরির অংশ।

বললাম, “এখনই আমার কাউন্টার ডিউটি আরম্ভ হবে। মিস্টার স্যাটা বোস অনেকক্ষণ কাজ করছেন।”

সে-কথায় ডাক্তার সাদারল্যান্ড কোনো কান দিলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি উইলিয়ামস লেন চেনো?” বললাম, “চিনি।”

"লোয়ার সার্কুলার রোড কবরখানা?” “চিনি।”

ডাক্তার •সাদারল্যাণ্ড আমাকে নিয়েই হোটেলে ঢুকলেন। কিন্তু গেটের কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, কাউন্টারের কাছে সত্যসুদরদাকে পাকড়াও করলেন। সত্যসুন্দরদাকে তিনি কী যেন বললেন।

আমি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড আবার মোড় ফিরলেন। সত্যসুন্দরদা আমার দিকে পেন্সিলসমেত হাতটা তুলে ইঙ্গিতে বললেন, ওঁর সঙ্গে চলে যাও, তোমার ডিউটি আমি ম্যানেজ করে নেবো।

ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডকে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন, অথচ সে-কথা তিনি যেন ভুলেই গিয়েছেন। যেন টুরিষ্ট আপিস থেকে ষোলো টাকা দিয়ে তিনি এক প্রফেশন্যাল গাইড ভাড়া করেছেন। ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড যেন নেশার ঘোরে নিজের মধ্যেই বিভোর হয়ে আছেন। রহস্যময় প্রাচ্যের রহস্য যেন ওঁর সমস্ত চেতনা অবশ করে দিয়েছে।

উইলিয়ামস লেনের সামনে ট্যাক্সি থেকে আমবা দু'জনে নেমে পড়েছিলাম। বৌবাজার স্ট্রীট থেকে ঢুকতে গলির মুখে কয়েকটা কাচ্চাবাচ্চা খেলছিল। সাদারল্যাণ্ড আমাকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা কারা?"

বললাম, "লোকাল বয়েজ।"

বহু বর্ষ আগের সেই লোকাল বয়েজ যারা লোয়েলিন কোম্পানিতে খবর দিয়ে এসেছিল, তাদের যেন আজও উইলিয়ামস লেনে দেখতে পেলাম। তাদের যেন বয়েস বাড়েনি। আজও যেন গলির মোড়ে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কোথায় গেলো সেই পুরনো দিনের চিহ্ন? এই লেনের কোন বাড়িটাতে যে সেদিন জীবনের বিচিত্র নাটক অভিনীত হয়েছিল, তাও বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার সাদারল্যান্ড বলেন, "হয়তো সে বাড়িটা উইলিয়ামস লেনের বুক থেকে কবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে; সেই পুরনো জায়গায় আবার নতুন বাড়ি উঠেছে।"

উইলিয়ামস লেনের পথচারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তারা জানে না। বহু বর্ষ আগে চোখের জলে এক দুঃখ দিনের রাজা যে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল, তা তাদের মনেও নেই।

রাস্তার উপর একটা ভিখিরীর ছেলে হাইড্রান্ট থেকে একটা ভাঙা টিনের কৌটোয় জল নিচ্ছিল। হঠাৎ পা পিছলে সে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠলো। তারপর যে এমন হবে

বুঝিনি। ডাক্তার সাদারল্যান্ড ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। তুলেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি; আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

"কী করছেন? কী করছেন? আপনার জামাকাপড় সব কাদায় বোঝাই হয়ে যাবে। তাছাড়া ওর পায়ে ঘা রয়েছে।"—ভিখিরীর ছেলেকে সায়েবকে কোলে তুলে নিতে দেখে, কয়েকজন ভদ্রলোক ছুটে এলেন।

ডাক্তার সাদারল্যান্ডের সেদিকে খেয়াল নেই। ছেলেটার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছিল। নিজের রুমাল বার করে মুছে দিলেন। আদর করতে করতে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললেন, "তুমরা মা কীধার? তুমকো ড্যাডি—পিতাজি?"

আঙ্গুল দিয়ে ছেলেটা শিয়ালদা স্টেশনের দিকটা দেখিয়ে দিলো। তারপর ভয় পেয়ে, বাচ্চাটা হঠাৎ জোর করে কোল থেকে নেমে ছুটে পালিয়ে গেলো। ভেবেছে, কেউ বোধহয় ওকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

ডাক্তার সাদারল্যান্ড পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উইলিয়ামস লেন-এর মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ডাক্তার সাদারল্যান্ড ছেলেটার সর্দিমোছা রুমালের একটা অংশ দিয়ে নিজের চোখ দু'টো মুছছেন ।

উইলিয়ামস লেন থেকে আমরা সোজা লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে চলে এসেছি। তখন অন্ধকার একটু বল পেয়েছে—একেবারে টেম্পোরারি পোস্ট থেকে যেন কোয়াসি পার্মানেন্ট হয়েছে।

সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার মুখে কয়েকজন মালী ফুল বিক্রি করছিল। মালীরা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো - সায়েব, ফুল।

আমার কাছে টাকা ছিল না, কিন্তু সায়েব ফুল কিনলেন।

রাত্রের অন্ধকারে ফুল হাতে করে মৃত মানুষদের সেই নিস্তব্ধ শহরে আমরা ঢুকে পড়লাম। কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে বিছে বা সাপ থাকাও আশ্চর্য নয়। সাদারল্যান্ডের পকেটে টর্চ— ছিল—কিন্তু সামান্য টর্চে আযর কতটুকু আলো হবে? মনে হলো যেন মধ্যরাত্রে কোনো ভদ্র-হোটেলে ঢুকে পড়েছি আমরা। রাতের সব অতিথি কর্মমুখর দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছেন। আইন না মেনে আমরা

দু'জনে যেন গোপনে বাইরে পালিয়েছিলাম। এখন দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে পা টিপে টিপে দুরু দুরু বক্ষে নিজের ঘরে ফিরে আসছি।

বহুজনের এই বিচিত্র মেলা থেকে আজ আর শাজাহান হোটেলের সেই বার-বালিকাকে খুজে পাওয়া সম্ভব নয়। কে জানে, এই বিশাল প্রান্তরের কোন অংশে একদিন উইলিয়ামস লেনের ছেলেরা চিরদিনের জন্যে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। তাদের কেউই হয়তো আজ নেই। তবু শাজাহান হোটেল আজও তার অনন্ত যৌবন নিয়ে বে'চে রয়েছে। মোহিনী মায়ায় ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও কামার্ত মানুষদের আজও নিজের কাছে আহ্বান করছে। সামনে একটা গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় ফুলগুলো নামিয়ে দিয়ে, ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আর আমার মনে হলো, হবস যেন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন— আমাদের কানের কাছে আপনমনে আবৃত্তি করছেন—

Gone away are the Kidderpore girls,
With their powdered faces & ticked up curls, Gone away are those sirens dark, Fertile kisses, but barren of heart Bowing alternatively cold and hot Stead fastly sticking to all they got— Filling a bevy of sailors boys
With maddening hopes of synthetic joys.

সুযোগ পেলে ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড বোধহয় সারারাত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু আমার তো হোটেলে ফেরা দরকার। আমাকে না পেয়ে মার্কোপোলো এতোক্ষণ হয়তো চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন।

বললাম, "ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড, এবার বোধহয় আমরা ফিরতে পারি।" উত্তরে তিনি যে আমার সঙ্গে অমন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করবেন তা প্রত্যাশা করিনি। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন; "ফর হেভেনস্ সেক, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

আমার চোখে তখন জল এসে গিয়েছিল। তোমার খামখেয়ালির জন্যে শেষে আমার এতোকষ্টে যোগাড় করা চাকরিটা যাক। অথচ প্রতিবাদও করতে সাহস হয়নি। হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে লাগিয়ে দিলেই হলো—বা চিঠিতে কমপ্লেন করলেই, আমাকে আবার

পথে বসতে হবে। "খদ্দের সব সময়ই ঠিক, যদি কোনো দোষ হয়ে থাকে সে তোমার", একথা সত্যসুন্দরদা আমাকে অনেকবার মনে রাখতে বলে দিয়েছেন।

ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে আমি একটা কথাও বলিনি। ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডও কথা বলবার চেষ্টা করেননি। গাড়ি থেকে নেমে, তাঁর ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা না করেই আমি কাউন্টারে বোসদার কাছে চলে গিয়েছি।

পরের দিন ভোরেই ডাক্তার সাদারল্যান্ড কলকাতা ছেড়ে লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তারপর আর কোনোদিন ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডের দেখা পাইনি। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হলে কোনোদিন হয়তো তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁকে ক্ষমা করতে পারতাম না। কয়েকদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম

প্রিয় শংকর,

তোমাকে চিঠি না লেখা পর্যন্ত মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। শাজাহান হোটেল থেকে চলে আসবার আগে তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছিলাম, তা ভাবতে আজ আমার অনুতাপের শেষ নেই। তাছাড়া তোমার এবং মিস্টার হবসের কাছে সত্যকে গোপন রেখেও আমি ভগবানের চরণে অপরাধ করেছি। ভেবেছিলাম, পরের বার তোমাদের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে—এবার WHO-র কাজে যেখানে চললাম, তার নাম তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ। জীবনের বাকী ক'টা দিন ওখানেই কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে আছে।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কলকাতার অনেক দু'র্নাম আমি কাগজে পড়েছি, কানে শুনেছি। কিন্তু আমি তো তোমাদের জানি। সেদিনই আমার বলা উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি। শোনো, আমার জন্ম উইলিয়ামস লেন-এ। আমার বাবার নাম রবার্ট অ্যাডাম

মা জেন গ্রে। উইলিয়ামস লেনের লোকাল বয়েজদের দয়ায় যার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, ফাদার সাদারল্যাণ্ড তাকেই বুকে করে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন, আমাকে তাঁর নামেরও অধিকারও দিয়েছিলেন। এ-খবর আমার ছোটবেলায় অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগে ফাদার সাদারল্যাণ্ড নিজেই আমাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার শেষ রাত্রি আমি তাই শাজাহান হোটেলে কাটিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—তোমাদের দয়ায় তা সম্ভব হয়েছে।

তোমাদের বার-এ আজ বারমেড নেই, ভাবতে সত্যি আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। মনে মনে ইউনিয়ন চ্যাপেলের ফাদার ব্রকওয়ের স্ত্রীকে প্রণাম জানিয়েছি। জীবনজোড়া যন্ত্রণা থেকে তিনি অনেক বারমেডকে মুক্তি দিয়েছেন। আজ তিনি বেঁচে নেই। বেচে থাকলে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতাম। কিছু না পেরে, তাঁর সুযোগ্য সন্তান মিস্টার ফ্রেনার ব্রকওয়েকে একটা চিঠি লিখলাম। অনেক অজ্ঞাত নারীর আশীর্বাদ তাঁর মাথায় ঝরে পড়ছে।

সেদিন কেন যে আমার মাথার ঠিক ছিল না, তা হয়তো তুমি বুঝতে পারছো। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

ইতি—

জে. পি. সাদারল্যান্ড

সাদারল্যান্ড সায়েবের অনুগ্রহে অতীতের যে সিংহদ্বার সেদিন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে খুলে গিয়েছিল, তা আজও মাঝে মাঝে আমাকে বিহ্বল করে তোলে। মনে মনে আপন ভাগ্যকে ধনাবাদ দিই। মানুষের এই সংসারে দীর্ঘদিন ধরে জীবন-যন্ত্রণায় কাতর হয়েছি আমি; জীবন-দেবতার নির্মম পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে বার বার নীরবে অভিযোগও জানিয়েছি; কিন্তু আজ মনে হয়, আমার সৌভাগ্যেরও অন্ত নেই। জীবনের কালবৈশাখী ঝড়ে বার বার সঙ্কীর্ণতার কারাগার ধ্বংস করে আমাকে বার বার মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে। পরম যন্ত্রণার মধ্যেই শাজাহান হোটেলের ছোট

ঘরে পৃথিবীর গোপনতম বৈভব আবিষ্কার করেছি। সেই ঐশ্বর্যের কতটুকুই আর আপনাদের উপহার দিতে পারবো? তার অনেক কিছুই যে প্রকাশের যোগ্য নয়। অনেক লাজুক প্রাণের গোপন কথা শাজাহান হোটেলের নিভৃতে আমি শুনেছি। লেখক-আমি সে-সব প্রকাশ করতে চাইলেও মানুষ-আমি কিছুতেই রাজী হয় না। বিশ্বাসের অংশটুটুকু বাদ দিয়ে যা থাকে তা কেবল দর্শকের গ্যালারি থেকে দেখা। এবং সেটুকু নিয়েই আমাদের **চৌরঙ্গী**।

মানুষের ভিতর এবং বাইরের ভাল এবং মন্দ এক অপরূপ আভায় রঙীন হয়ে আমার চোখের সামনে বার বার এসে হাজির হয়েছে। সেই রঙীন ভালবাসার ধনই আমার **চৌরঙ্গী**। সে এমন এক জগৎ যেখানে অন্তরের কোনো অনুভূতিরই, কোনো মূল্য নেই—অন্তত যে অনুভূতি কাঞ্চনমমূল্যে কেনা সম্ভব হয় না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। বায়রন, মার্কোপোলো এবং স্যাটাদার অনুগ্রহে আমি যে রাজ্যে বিচরণ করছি সেখানকার মানুষেরা কেবল দু'টি জিনিসই চেনে—একটির নাম মানিব্যাগ, আর একটি চেক।

যেদিন সকালে একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে রোজী আবার শাজাহান হোটেলে ফিরে এসেছিল, সেদিনটা আজও আমার বেশ মনে আছে। হোটেলে ব্রেকফাস্টের পাট চুকে গিয়েছে। লাঞ্চের তদ্বির তদারক শেষ হয়ে গিয়েছে। মেন,কার্ড', ওয়াইন-কার্ড কখন টাইপ করে, সাইক্লোস্টাইল হয়ে টেবিলে সাজানো হয়ে গিয়েছে। অন্য সব জায়গায় লাঞ্চের কার্ডটাই রোজ ছাপানো হয়; ওয়াইনকার্ড' অনেকদিন থাকে। শাজাহান হোটেলের আভিজাত্য এই যে, লাল রংয়ের ওয়াইন-কার্ডটাও রোজ ছাপানো হয়—এক কোণে তারিখটা লেখা থাকে। তাছাড়া, ডাইনিং হল-এর পাশে আমাদের একটা ব্যাংকোয়েট হল আছে। সেখানে আজ রায়বাহাদর সদাসুখলাল গোয়েঙ্কার পার্টি। রায়বাহাদুর সদাসুখলাল এই সভাতেই রাজধানীর দেশপ্রেমিক এক হোমরা-চোমরাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।

এই লাঞ্চ পার্টিতে টেবিলের কে কোথায় বসবেন, সে এক বিরাট অঙ্ক। সরকারী মহলে অতিথিদের এক নম্বরী তালিকা সযত্নে রক্ষা করা হয়। তার নাম লিস্ট অফ প্রিসিডেন্স। তাছাড়াও কলকাতার নাগরিকদের এক আলখিত লিস্ট অফ প্রিসিডেন্স

হোটেল-কর্তাদের এবং অনেক গৃহকর্ত্রীর মুখস্থ আছে। সেই তালিকার সামান্য উনিশ-বিশের জন্য কোন বিখ্যাত হোটেলের আকাশ-চুম্বী খ্যাতি যে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল তা স্মরণ করে আমরা বেশ ভীত হয়ে পড়ি। টেবিল সাজাবার এই দায়িত্ব তাই সহজে আমরা নিজেদের কাঁধে নিতে চাই না। যিনি পার্টি দিচ্ছেন, তিনি যাকে যেখানে বসাতে চান বসান। বোসদার ভাষায়, "তোমার হি-গোট, তুমি যেদিক থেকে খুশি কেটে নাও। আমার পৈতৃক প্রাণটা শুধু শুধু কেন নষ্ট হয়!"

রায়বাহাদু'রের সেক্রেটারি তাই নিজেই এসেছেন অনেকগুলো কার্ড নিয়ে। সঙ্গে আর-এস-ভি-পি'র ফাইল। এই ফাইলেই নেমন্তন্নের উত্তরগুলো রয়েছে। আর-এস-ভি-পি রহস্যটা কাসুন্দেতে থাকার সময় একদম বুঝতাম না। বোসদা বললেন, "শধু, তুমি কেন, আমিও বুঝতাম না। ইস্কলে আমরা বলতাম, কথাটার মানে রসগোল্লা-সন্দেশ-ভর-পেট। নেমন্তন্নর চিঠির তলায় ওই চারটি অক্ষর থাকলেই বুঝতে হবে, প্রচুর আয়োজন হয়েছে।"

এই লাঞ্চ পার্টির জন্য রায়বাহাদু'রের অর্থাৎ কিনা তাঁর কোম্পানি লিভিংস্টোন, বটমলে অ্যান্ড গোয়েঙ্কা লিমিটেডের নির্দেশে, বিশেষ ধরনের মেনু কার্ডের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সুদৃশ্য কার্ড কলকাতার সেরা ছাপাখানা থেকে সাতরংয়ে ছাপানো হয়েছিল। সেই কার্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক প্রচার প্রতিষ্ঠান। শেষ পৃষ্ঠায় রায়বাহাদু'রের নিজের এবং মাননীয় অতিথির একটি ছবি ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রায়বাহাদরের অতো শখের কার্ড— শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হলো না। কার্ডের গোড়াতেই গতকালের তারিখ দেওয়া রয়েছে। গতকালই পার্টির কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মাননীয় অতিথি পাটনা থেকে এসে পৌঁছাতে পারবেন না জানালেন। ওখানেও তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বৈঠক ছিল। বৈঠক শেষ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারিখটা তাঁর একান্ত সচিব ট্রাংককলে একদিন পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

টেলিফোন পেয়ে লিভিংস্টোন, বটমলে অ্যান্ড গোয়েঙ্কা কোম্পানির অফিসাররা সারারাত ঘুমোতে পারেননি। প্রত্যেকটি অতিথিকে ফোনে ডেকে মাননীয় অতিথির অনিবার্য কারণে না-আসার সংবাদটা জানাতে হয়েছে। অতো তাড়াতাড়ি অবার

সাতরংয়ের কার্ড ছাপানো সম্ভব হয়নি। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, শুধু, তারিখটা কালো কালিতে বুজিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু রায়বাহাদু'র সদাসুখলালের তা পছন্দ না হওয়ায়, আমাদের স্পেশাল কার্ডেই আজকের মেনু ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই মেনুই আমি কার্ডে ছাপাবার ব্যবস্থা করছিলাম। জব্বর মেনু।

প্রথমে — Les Hors toeuvre Sajahan

তারপর সুপ– Creme de Champignors,

এবার Filets de Beckti Sicilience :
Jambon Grille Kualalampur
Chicken Curry & Pilao :
Pudding de Vermicelle et Creme :
Tutti Frutti Ice cream :

Cream Cheese, এবং

সর্বশেষে Cafe et The, অর্থাৎ কফি এবং চা। যাঁরা নিরামিষাশী তাঁদের জন্যে Papya Cocktail:
Potato & Cheese soup :

Green Banana Tikia (কাঁচকলার চপ!)

Mixed Vegetable Grill :
Dal Mong Piazi :

Pilao ইত্যাদি।

এই মেনুই নিজের মনে কাউন্টারে বসে টাইপ করে যাচ্ছিলাম। এখনই সত্যসুন্দরদা কার্ড গুলো নিয়ে ব্যাংকোয়েট হল-এ ঢুকে যাবেন। ঠিক সেই সময় এক ভদ্রমহিলা হাতে একটা ঝোলানো এয়ার-ব্যাগ নিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্টুয়ার্ড জিমিও কাউন্টারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। সুদীর্ঘ বিরহের পর কাকে যেন তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন।

মুখ ফিরে তাকিয়েই, এক মুহূর্তে বুঝলাম ঐ যুবতী মহিলাটি কে। আমি যে এতো কাছাকাছি বসে আছি, তা অবজ্ঞা করেই স্টুয়ার্ড বলে ফেললেন, "রোজী, ডার্লিং, তোমার

আঙুরের মতো মুখ শুকিয়ে কিসমিস হয়ে গিয়েছে। তোমার সোনার মতো রং পুড়ে তামা হয়ে গিয়েছে।”

রোজী এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, “আমার দাঁত?” জিমি ঘাড় নেড়ে বললেন, “তোমার দাঁতগুলো কিন্তু ঠিক মুক্তোর মতোই রয়েছে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বিশৃঙ্খল চুলগুলো সামলাতে সামলাতে রোজী বললে, "হোটেলে কাজ করে জিমি, তুমি কিছুতেই সত্যি কথা বলতে পারো না। সোনার মতো রং আমার আবার কবে ছিল? তুমিই তো বলেছিলে কালো গ্রনাইট পাথর থেকে কুঁদে কে যেন আমাকে বার করেছে!”

জিমি যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, “এতোদিন। কোথায় ছিলে? বলা নেই, কওয়া নেই।”

রোজী জিমিকে কোনো পাত্তা দিলে না। তার নজর হঠাৎ আমার দিকে পড়ে গিয়েছে। তার মেসিনে বসে, বাইরের কেউ ষে টাইপ করতে পারে, তা সে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছিল না। স্বভাবসিদ্ধ ওয়েলেসলি স্ট্রীটীয় কায়দায় সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, “হ্যালো ম্যান, হু আর ইউ?” রাগে অপমানে আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল। কোনো উত্তর না দিয়ে, আমি একমনে টাইপ করে যেতে লাগলাম।

জিমি এবার সুযোগ বুঝে আমাকে আক্রমণ করলেন। “হ্যালো ম্যান, তোমাদের সোসাইটিতে তোমরা কি লেডিদের সম্মান করো না? একজন ইয়ং লেডি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছেন, আর তুমি তার উত্তর দিতে পারছো না?”

রোজীও এবার কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই জিমি বললেন, “রোজী, তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। বাইরে কী খুবই গরম?তোমার বগলের জামাটা ভিজে উঠেছে।”

সেদিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে রোজী বললে, “হ্যাঁ।” তারপর বেশ রাগতস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, “কিন্তু জিমি, কোনো লেডির শরীরের পার্টিকুলার অংশের দিকে ঐভাবে খুটিয়ে তাকানো কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।”

জিমি জিভ কেটে বললেন, "ছিঃ ছিঃ, তোমাকে এমব্যারাস করবার জন্যে আমি কিছু বলিনি, বিশ্বাস করো। কিন্তু ওইভাবে জামা ভিজে থাকলে মেয়েদের স্মার্টনেস যে নষ্ট হয়ে যায় তা নিশ্চয়ই মানবে।"

রোজী এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যালো ম্যান, তুমি কিন্তু আমার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দাওনি। হু আর ইউ?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "তাতে তোমার দরকার কী? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।"

কিন্তু তার আগেই আমার পিছন থেকে কে বলে উঠলো, "হি ইজ মিস্টার ব্যানার্জিস ব্রাদার-ইন-ল। এর আর এক মাসতুতো ভাই—খোকা চ্যাটার্জি – বোম্বাইতে থাকেন!"

এতোক্ষণে পালে যেন বাঘ পড়লো। জিমি থতমত খেয়ে বললে, "ডিয়ার স্যাটা, তুমি তাহলে এসে গিয়েছো। আমি রোজীর সঙ্গে তোমার ফ্রেন্ডের আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম।"

রোজীর মুখে ততক্ষণে কে যেন এক দোয়াত কালি ছুড়ে দিয়েছে। এয়ারকন্ডিশনের মধ্যেও তার নাকের ডগা ঘামতে আরম্ভ করেছে। বোসদা এবার কাউন্টারের মধ্যে ঢুকে এসে বললেন, "তা রোজী, হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমরা তো ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।"

রোজী এবার ভয় পেয়ে একটুকরো কাগজের মতো হাওয়ায় কাঁপতে লাগলো। জিমি ওকে ইশারায় একটু দূরে স্যরিয়ে নিয়ে গেলেন।

স্যাটাদা বললেন, "তোমার কার্ডগুলো হয়ে গিয়ে থাকলে আমাকে দিয়ে দাও। গোয়েঙ্কা সায়েবের মাননীয় অতিথিরা কোনোরকম অসুবিধেয় না পড়ে যান ।"

জিমি ও রোজী দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী সব কথাবার্তা বললে। কথা বলতে বলতে ওরা আমার দিকে তাকালো। তারপর ফিরে এসে দু''জনে আবার কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালো। জিমি বোসদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "পুওর গার্ল! আহা রে! তা রোজী, তোমার আন্টি এখন কেমন আছেন? ভাল তো? বৃদ্ধা মহিলা ক'দিন তাহলে খুব ভুগলেন।"

রোজী বললে, "আমার কপাল। কিন্তু আমার চিঠি পাওনি, সে কেমন কথা। ম্যানেজর ছিলেন না বলে, আমি তোমার ঘরে খামটা রেখে গিয়েছিলাম।" বোসদা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়তো ইঁদুর টেনে নিয়ে কোথায় ফেলে দিয়েছে।"

জিমি বললেন, "ইয়েস, খুবই সম্ভব। আমার ঘরের ইঁদুর-সমস্যাটা কিছুতেই গেলো না। এক একটা ইঁদু'র দেখলে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায়। এই ইঁদুরগুলোই আমাকে শেষ পর্যন্ত মারবে। উইপোকা মারবার জন্যে যেমন কোম্পানি আছে, তেমনি বাড়িতে বাড়িতে ইঁদু'র মারবার জন্যে কেন কোম্পানি হচ্ছে না? এমন জরুরি একটা চিঠি আমার হাতে এলো না!"

বোসদা বললেন, "আর সময় নষ্ট করবেন না, এখনই গিয়ে মার্কোপোলোকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আসুন!"

জিমি যেতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়ালেন। "কিন্তু তোমার ফ্রেন্ড। পুওর ফেলো।"

বোসদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমার কোনো ফ্রেণ্ড নেই। দিস বয় ইজ নট মাই ফ্রেণ্ড। সিমপ্লি, আমার কোলিগ, আমার সহকর্মী। যাই হোক, ওর জন্যে চিন্তা কোরো না। তুমি রোজীর জন্যে চেষ্টা করো।"

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে জিমি বললেন, "ধন্যবাদ।" রোজীকে বললেন, "চলো। কিন্তু ঘামে ভেজা এই জামাটা পরেই যাবে? একটু পাখার তলায় দাঁড়িয়ে নাও।"

রোজী চোরা কটাক্ষ হেনে বললে, "বরফের মধ্যে চুবিয়ে রাখলেও আমার বগলের ঘাম বন্ধ হবে না। আর চাকরিই যদি না থাকে, তবে আমার সব স্কার্টই সমান।"

ওরা দু'জনে এবার দ্রুতবেগে ম্যানেজারের খোঁজে চলে গেলেন। বোসদা হেসে আমাকে একটা আলতো চাঁটি মেরে বললেন, "শাজাহান হোটেল না বলে, এটাকে শাজাহান থিয়েটার বললে বোধহয় ভাল হয়। চাকরি অবশ্য রোজীর কিছুতেই যাবে না। রোজীর গুণগ্রাহীর সংখ্যা এ-হোটেলে কম নেই। তাছাড়া মার্কোপোলোর কী যে হয়েছে, সারাদিন মনমরা হয়ে পড়ে থাকেন। কারুর চাকরি তিনি নিশ্চয়ই খেতে চাইবেন না। যতো

দোষই করুক, একটা মোটাদু'টি যুক্তিসঙ্গত কারণ খাড়া করে নিবেদন করতে পারলেই তিনি ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবেন।"

মার্কোপোলো তখন একতলায় কিচেনে ঘোরাঘুরি করছিলেন। রোজীকে নিয়ে জিমি সেই দিকেই চলে গেলেন। একটু পরেই মুখ কাঁচুমাচু করে রোজী একলা ফিরে এলো। ফিরে এসে সে সোজা কাউন্টারের কাছে দাঁড়ালো। বোসদা বললেন, "কী হলো?"

নখগুলো আবার দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে রোজী বললে, "জিমি বেচারার কপালটাই মন্দ। আমার জন্যে সে শুধু শুধু, বকুনি খেলো। মার্কোপোলো দাঁত খিচিয়ে ওর দিকে তেড়ে গেলেন। অসভ্য ভাবে বললেন, মেয়ে মানুষের ওকালতি করবার জন্যে তাকে হোটেলে রাখা হয়নি। আর লেডি টাইপিস্টের ঘ্যান ঘ্যানানি শোনবার মতো অঢেল সময় তাঁর নেই। আগে লাঞ্চএর সময় শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় হবে।"

বোসদা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই সময় রোজী হঠাৎ এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো। ভাগ্যে তখন কাউন্টারে কেউ ছিল না। বাইরে সারি সারি গাড়ি এসে পড়বার সময়ও তখন হয়নি। রোজী হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি জানি স্যাটা, তুমি আমাকে দেখতে পারো না। কিন্তু বলো তো আমি তোমার কী করেছি? তুমি আমাকে দেখতে পারো না। কোনোদিন তুমি আমাকে দেখতে পারো না। আমার সর্বনাশ করবার জন্যে তুমি নিজের কাজিনকে এনে আমার চাকরিতে বসিয়ে দিয়েছো।"

বোসদা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "রোজী, এটা হোটেলের কাউন্টার। এখানে সিন ক্রিয়েট কোরো না । কী বললে তুমি? তোমাকে তাড়াবার জন্যে আমি লোক নিয়ে এসেছি!"

রোজী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "এর আগেও তো একবার আমি চারদিনের জন্যে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তো কেউ আমার চেয়ারে এসে বসে যায়নি।"

বোসদা বললেন, "রোজী, তুমি কী সব বলছো?"

রোজী রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "জানি আমি কালো কুচকুচে; জানি আমি সুন্দরী নই। লোকে আমাকে আড়ালে নিগ্রো বলে। তোমরা আমাকে দেখতে পারো

না। ইচ্ছে করে তুমি ম্যানেজারকে আমার বোম্বাই পালানোর কথা বলে দিয়েছো। আবার অতগুলো লোকের সামনে বললে, ওই ছোকরা মিস্টার ব্যানার্জির ব্রাদার-ইন-ল।”

বোসদা পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, “রোজী, জীবনে কার অন্নে হাত বসাবার চেষ্টা আমি করিনি। কখনও করবোও না। তবে মিস্টার ব্যানার্জীর প্রসঙ্গটা তোলার জন্যে আমি লজ্জিত। প্লিজ, কিছু, মানে কোরো না।"

লাঞ্চের মেনু কার্ডগুলো গুছিয়ে নিয়ে বোসদা কাউন্টার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর রোজীও সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এসে ঢুকলো। আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে সে দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বললে, "স্যাটার ডানদিকের ড্রয়ারটা খোলো তো।”

আমি বললাম, “মিস্টার বোস তো এখনই আসছেন। আমি ড্রয়ার খুলতে পারবো না।”

রোজী ঝুকে পড়ে পায়ের গোছটা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ড্রয়ারে গোপন কিছু থাকে না। উইলিয়ম ঘোষ ওর মধ্যে অনেক সময় আমার জন্যে চকোলেট রেখে যায়। দেখো না, প্লিজ।”

ড্রয়ারটা খুলতেই দেখলাম গোটাকয়েক চকোলেট রয়েছে।

রোজীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললে, "উইলিয়মটা এখনও নেমকহারাম হয়নি। হি ইজ সাচ্ এ সুইট বয়। ওর সঙ্গে আমার কথা ছিল, আমার জন্যে সব সময়ে চকোলেট-বার রেখে দেবে। ড্রয়ার খুললেই পাবো।”

চকোলেট থেকে ভেঙে খানিকটা আমার হাতে দিয়ে রোজী বললে, “বাবু একটু নাও। হাজার হোক তুমি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। তুমি স্যাটাকে পর্যন্ত হাত করেছো। আমরা তো জানতাম স্যাটার হার্ট বলে কিছু নেই। থাকলেও সেটা ‘প্লাস্টিকের তৈরি। অথচ তুমি সেখানে জেঁকে বসেছো।”

না বলতে পারলাম না। চকোলেটটা নিয়ে চুষতে আরম্ভ করলাম। রোজী বললে, তুমি ভাবছো, উইলিয়ম পয়সা দিয়ে কিনে আমাকে চকোলেট খাওয়ায়? মোটেই তা নয়। উইলিয়মের বয়ে গিয়েছে। ওরা কাউন্টারে অনেক চকোলেট পায়। আমেরিকান ট্যুরিস্টরা

রিসেপশনের লোকদের টিপস দেয় না —ভাবে, তাতে ওদের অসম্মান করা হবে। টিপসের বদলে ওরা হয় পকেটের পেন অথবা চকোলেট দিয়ে যায়।”

বোসদা কাউন্টারে আবার ফিরে এলেন। বললেন, “রোজী, বড়সায়েব এখনও খুব ব্যস্ত রয়েছেন। তা তারই মধ্যে তোমার সম্বন্ধে কথা হয়ে গেলো।”

“কী কথা?"

রোজী সভয়ে প্রশ্ন করলো।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বোসদা আমাকে বললেন, “তুমি ওপরে চলে যাও। নিজের মালপত্তরগুলো রোজীর ঘর থেকে বার করে প্যামেলার ঘরে ঢুকিয়ে দাওগে যাও।”

“সে কি?” আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু তার আগেই বোসদা বললেন, “প্যামেলার শো কলকাতায় চলবে না। পুলিসে নোটিস দিয়েছে। প্যামেলা ঘর খালি করে দিয়েছে। সে আজই চলে যাচ্ছে।"

এবার বোসদা গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, “আজকের লাঞ্চ পার্টিতে তোমাকে কাজ শেখাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু স্টুয়ার্ড রাজী নন। বলছেন, নতুন লোক, হয়তো গণ্ডগোল করে ফেলবে। যা হোক, পরে অনেক সুযোগ আসবে। এখন উপরে চলে যাও। আমি ফোনে গুড়বেড়িয়াকে বলে দিচ্ছি।”

রোজী এবার সত্যদার মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে বললে, “স্যাটা, ডিয়ার, আমার সম্বন্ধে ম্যানেজার কী বললেন?”

বোসদা হেসে বললেন, “আর চিন্তা করতে হবে না। এখন গিয়ে নিজের পুরনো ঘরটা দখল করোগে যাও। তোমার কামাই করবার কারণটা সায়েবকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি।”

রোজীর মুখ আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ছাদের উপরে আমাকে দেখে রোজী আহত কেউটে সাপের মতো ফোঁস ফাঁস করতে লাগলো। আমি আস্তে আস্তে গুড়বেড়িয়াকে দিয়ে আমার জিনিসগুলো তার ঘর থেকে বার করে অন্য ঘরে স্যরিয়ে নিলাম। রোজী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, “ঠিক হ্যায়, আমারও দিন আসবে। তখন স্যাটাকেও দেখবো। শাজাহান হোটেলে কত মহাজনকেই দেখলাম! সব পুরুষমানুষই তা হয় যীশু না হয় সেন্ট পিটার!”

আমার পূর্ববঙ্গীয় রক্ত তখন গরম হয়ে উঠেছে। এই পরিষ্কার হোটেলের নোংরা অন্তরের কিছুটা পরিচয় আমি এর মধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। তাও সহ্য করেছি। চাকরি করতে এসেছি—ভিখিরীদের বাছ-বিচার করা চলে না। কিন্তু বোসদার সম্বন্ধে কোনো গালাগালিই এই নোংরা লোকগুলোর মুখে আমি শুনতে রাজী নই।

রাগে অন্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনি বোধহয় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।"

"হোয়াট? কী বললে তুমি?" রোজী এবার যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠলো।

দু'রে গুড়বেড়িয়া দাঁড়িয়েছিল। সে তার রোজী মেমসায়েবকে চেনে। এই ক'দিনে আমাকেও কিছুটা চিনে ফেলেছে। বুঝলে এবার বোধহয় গুরুতর গোলমল শুরু হয়ে যাবে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে যেন কাজের আছলায় কয়েক গজ দূরে সরে গেলো।

ইতিমধ্যে রোজী খপাং করে সজোরে আমার হাতের কব্জিটা ধরে ফেলেছে। এই কলকাতা শহরে কোনো অনাত্মীয়া মহিলা যে এইভাবে এক অপরিচিত পুরুষের হাত চেপে ধরতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমার মধ্যেও তখন কী রকম ভয় এসে গিয়েছে! জোর করে হাতট ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসবো? এখনই হয়তো চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে এই সর্বনাশা মেয়েটা লোকজন জড়ো করে বসবে।

দুর থেকে গুড়বেড়িয়া আড়চোখে আমার এই সঙ্গীন অবস্থা দেখেও কিছু করলো না। আর ঠিক সেই মূহূর্তেই রোজী হঠাৎ হিড়হিড় করে আমাকে টানতে টানতে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

আমি কিছু বোঝবার আগেই যেন চোখের নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো। শুধু ঢোকবার আগের মুহূর্তে মনে হলো গুড়বেড়িয়ার মুখে একটা রহস্যময় অশ্লীল হাসি ফুটে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কোনো জানলা পর্যন্ত খোলা হয়নি। তারই মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে রোজী ভিতর থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলো।

এক ঝটকায় ওর হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আমি দরজার দিকে এগিয়ে এলাম। কিন্তু রোজী হঠাৎ পাগলের মতো এসে দরজার সামনে

দাঁড়িয়ে পড়লো। উত্তেজনায় ওর বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। তারই মধ্যে চাপা গলায় সে বললে, "কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না। তোমাকে এখানে বসতে হবে।"

আমি জোর করে ওকে ডান দিকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা খোলবার চেষ্টা করতে, রোজী সাপিণীর মতো আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর অভ্যস্ত কাটা কাটা ইংরেজীতে বললে, "ছোকরা, এখন যদি তুমি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করো, আমি চিৎকার করে উঠবো। বলবো, তুমি আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছো। দরকার হয় আমি আরও এগিয়ে যাবো বলবো, ঘরের দরজা বন্ধ করে তুমি একটা অবলা মেয়ের উপর অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছো।"

এমন অবস্থায় পড়বার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। অভিজ্ঞ পাঠক হয়তো আমার উপস্থিতবুদ্ধি ও মনোবলের অভাবের জন্যে আমার প্রতি করুণা পোষণ করবেন। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই মুহূর্তে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এখনই রোজী চীৎকার করে উঠবে, "সেভ মি, সেভ মি——কে আছো কোথায়, আমাকে বাঁচাও।"

আইনের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় ছিল, তাতে তার পরবর্তী অধ্যায় গুলোর কথা চিন্তা করে, আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। রোজীকে জোর করে স্যরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে ফেলবার শক্তি এবং সাহস তখন আমার ভিতর থেকে একেবারে উবে গিয়েছে।

আমি দরজা খোলবার চেষ্টা পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণের জুনো দাঁড়িয়ে রইলাম। নিরীহ টাইপিস্টের চাকরি করতে এসে কোথায় জড়িয়ে পড়লাম ভাবতে যাচ্ছিলাম। রোজী তখন ওর উদ্ধত বুকটাকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

তারপরেই দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, "ইন ফ্যাক্ট, তুমি আমার মডেস্টি আউটরেজ করেছো। তুমি বলেছো আমি সভ্য নই। আমি সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছি।"

আমি বললাম, "প্লিজ। আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন।"

রোজী বললে, "তুমি আমাকে ইনসাল্ট করেছো।"

"আপনার সঙ্গে আমার আধঘণ্টা হলো দেখা হয়েছে। এর মধ্যে আপনার সঙ্গে আমি কোনো কথাই বলিনি।"

রোজী বললে, “তুমি মিসেস ব্যানার্জির ভাই। তুমি নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনেছো।”

এ আর-এক বিপদ হলো। রসিকতা করে বোসদা আমাকে কী বিপদে ফেলে গেলেন।

রোজী সেই অন্ধকারেই বললে, “তোমরা নিশ্চয়ই বলে বেড়াচ্ছো, আমি ব্যানার্জির কাছ থেকে অনেক পয়সা হাতিয়েছি। পয়স্যর লোভেই ওর সঙ্গে বোম্বে পালিয়েছিলাম?"

আমি কী বলবো? চুপ করে রইলাম।

রোজী রেগে গিয়ে বলল, “এমন ন্যাকা সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছো, যেন তুমি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না। মিস্টার ব্যানার্জি, মিসেস ব্যানার্জিকে যেন জীবনে কোনোদিন তুমি দেখোনি।

রোজী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, “তোমার দিদিকে বোলো, বেচারা একটা জানোয়ারকে বিয়ে করেছেন। আমাকে সে মিথ্যে কথা বলেছিল। ব্যানার্জি বলেছিল, সে বিয়ে করেনি।

"আর ওই শয়তান বায়রনটা। নিশ্চয়ই বলেছে, আমরা যাবার আগে অন্য হোটেলে দু’জনে ছিলাম। ছিলাম, কিন্তু টাকা নিইনি। এখানে তো আর তাকে আামি আনতে পারি না। এই ঘরে এনে কারও সঙ্গে তো কথাবার্তা বলবার হুকুম নেই।"

রোজীর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়ছে মনে হলো। স্কার্টের কোণ দিয়ে সে চোখটা একবার মুছে নিলো। তারপর চুলগুলো বাঁ হাতে স্যরিয়ে নিতে নিতে সে বললে, “তুমি, তোমার ব্রাদার-ইন-ল, তোমার সিস্টার—তোমরা সবাই মিলে আমার মডেস্টি আউটরেজ করলে।"

কাঁদতে কাঁদতে রোজী বললে, “জানো, আমার মা আছে, প্যারালিসিসে পড়ে-থাকা বাবা আছেন। দু’টো আইবুড়ো বেকার বোন আছে। আমরা কিন্তলী। কিন্তু কলকাতার লোক তোমরা আমাদের নিগ্রো বলে চালাও। দেশের বাইরে গিয়ে তোমরা বড়ো বড়ো কথা বলো। কিন্তু আসলে তোমরা আমাদের ঘেন্না করো। আমি ভেবেছিলাম, ব্যানার্জির সঙ্গে আমি বিয়ে করে চলে যাবো। জিমিকে বলে যাবো, আমার কাজটা যেন আমার বোনকে দেয়। জানো, আমার বোনের শাজাহান হোটেলে ডিনার খাবার কী ইচ্ছে? ওরা পাউরুটি,

পেয়াজ আর পটাটো খেয়ে বে'চে থাকে। আর জিমির অনুগ্রহে এখানে আমি ফুল কোর্স ডিনার খেয়ে থাকি।"

একটু থেমে রোজী বললে, "তোমার ভগ্নিপতিকে নিয়ে আমি কেটে পড়তে পারতাম। কিন্তু হঠাৎ শুনলাম তোমার বোন রয়েছে। এখন আবার দেখছি, বোনের ভাই রয়েছে। আমার গা ঘিনঘিন করছে!"

আমি বললাম, "এবার আমাকে যেতে দিন।"

রোজী বললে, "হ্যাঁ, যেতে দেবো। কিন্তু যাবার আগে যার জন্যে ডেকেছি, তাই বলা হয়নি।"

আমি যে ব্যানার্জিদের কেউ নই, তা বোঝাবার বৃথা চেষ্টা না করে বললাম, "কী বলুন?"

রোজীর মুখটা যে বীভৎস রূপ ধারণ করেছে তা সেই অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম। সে বললে, "তোমার বোন বলে বেড়িয়েছে ব্যানার্জি একজন ডার্টি হোটেল গার্ল-এর সঙ্গে পালিয়েছে। সেটা মিথ্যে -আটার লাই। অ্যান্ড টেল ইওর সিস্টার, তোমার বোনকে বোলো —আই স্পিট অ্যাট হার হাজবেণ্ডস ফেস —আমি তার স্বামীর মুখে থুতু দিই।" এই বলে রোজী সত্যিই মেঝের মধ্যে এক মুখ থুতু ফেলে দিলে।

সেই থুতুটাই জুতো দিয়ে ঘষতে ঘষতে রোজীর আবার চৈতন্যোদোয় হলো। মুখটা বেকিয়ে বললে, "আই অ্যাম সারি। তোমাকে বলে কী হবে? তোমাকে বলে কিছুই লাভ নেই। থুতুটা নষ্ট করলাম। ওটা ব্যানার্জির জন্যেই রেখে দেওয়া উচিত ছিল।"

রোজী নিজেই এবার দরজাটা একটু ফাঁক করে আমাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দিলো। তারপর দড়াম করে ভেতর থেকে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

আমার মুখের উপর রোজীর দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও, আমার চোখের সামনে পৃথিবীর জানলা সেই দিনই খুলে গিয়েছিল। ওইদিনই বোসদা আমাকে কাউন্টারের কাজে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “দু'পুরের লাঞ্চ পার্টিটা তোমার দেখা হলো না, অনেক কিছু শিখতে পারতে। যা হোক, অমন সুযোগ আরও অনেক আসবে। খাওয়ার ব্যাপারে কলকাতার নামডাক আছে। খেয়ে এবং খাইয়েই তো এখানকার লোকরা ফতুর হয়ে গেলো।”

কাউন্টারের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বোসদা একদিন বলেছিলেন, “ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে, আর হাজার রকম লোকের দেড় হাজার রকম অভিযোগ শুনতে সবসময় হয়তো ভাল লাগবে না। কিন্তু আমার যখনই ঐরকম মানসিক অবস্থা হয়, তখনই মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, পৃথিবীর জানলার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। শাজাহানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে দেখবার এমন আশ্চর্য সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে?”

“পৃথিবী?” আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

“পৃথিবী নয়তো কি?” বোসদা বলেছিলেন। “এই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমিই এক'শ দেশের পাশপোর্ট দেখেছি। জঙ্গলের উলঙ্গ আদিমরা ছাড়া এমন কোনো জাতের মানুষ এই পৃথিবীতে নেই যাদের সঙ্গে না এই শাজাধান হোটেলের স্যাটা বোসের সুযোগ হয়েছে।”

কিন্তু এই কি পৃথিবী?” আমি প্রশ্ন করে বসেছিলাম।

বোসদা আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, “সাবধান! এখানে শুধু দেখে যাবে, কখনও প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করলেই অশান্তি। পৃথিবীতে যারা চুপচাপ শুনে যায় তারা অনেক সুখে থাকে। কিন্তু যাদেরই মনে হয়েছে এটা কেন হয়? কেন মানুষ ওটা সহ্য করে? তারাই বিপদে পড়েছে। তাদের অনেকের হাড়ে দু'ব্বো গজিয়ে গিয়েছে।"

আমি কাউন্টারের রেজিস্টারগুলো উল্টাতে উল্টাতে হাসলাম। বোসদা এললেন, “তা বলে তোমার কোশ্চেনের উত্তর দেবো না এমন নয়। আমি তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আসল পৃথিবী যেন অন্য রকম হয়। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যাঁদের দেখি তাঁরা যেন নিয়মের ব্যাতিক্রম হন। করবী গুহ বেচারী একবার আমাকে বলেছিলেন, ঘর দিয়ে বাইরের বিচার করা যায় না। ঘরের ছাগলই হোটেলে এলে বাঘ হয়ে যায়।' তা করবী গুহ বলতে পারেন। ভদ্রমহিলার তো আর বই-পড়া বিদ্যে নয়। হোটেল সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেকটা কথারই দাম লাখ টাকা।”

করবী গুহ ভদ্রমহিলাটি কে তা আমার জানা ছিল না। বোসদা আমার
মুখের ভাব দেখে বললেন, "করবী গুহকে তুমি এখনও চেনোনি? এটা খারাপ খবরও বটে, আবার ভালও বটে। অবশ্য করবী দেবী আজকাল একদম বেরোন না। বেরোলেও পিছনের সিঁড়ি দিয়ে লুকিয়ে চলে যান। ওঁর লাউঞ্জে এসে বসে থাকাও বারণ—মিস্টার আগরওয়ালা জিনিসটা মোটেই পছন্দ করেন না।"

আমি বোসদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বোসদা বললেন, “দু’ নম্বর সুইট। অর্থাৎ মিস্টার আগরওয়ালার অতিথিশালা—ইংরিজীতে গেস্ট হাউস। পার্মানেন্ট খদ্দের আমাদের। ও সুইট কস্মিনকালে বাইরের কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না। তারই চার্জে আছেন শ্রীমতী করবী গুহ। আমাদের সহকর্মীদেরই একজন বলতে পারো।”

করবী সম্বন্ধে বোসদা আর কিছুই প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বললেন, “সময়মতো সব জানতে পারবে। দু’ নম্বর সুইট যা-তা জায়গা নয়। আমাদের অনেকেরই উন্নতি অবনতি দু’ নম্বর সুইটের মেজাজের উপর নির্ভর করে।”

শুনলাম, করবী গুহ একদিন বোসদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘর-সংস্যর ছেড়ে মানুষ কবে হোটেলে থাকতে শিখলো বলতে পারেন? বাড়ির বাইরে এমন বাড়ি বানাবার বুদ্ধি কবে তার মাথায় এলো?”

সে-প্রশ্নের উত্তর বোসদা দিতে পারেননি। কিন্তু সংসারের অনেক সেরা নাটকই যে তার পর থেকে দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে পান্থশালায় অভিনীত হতে আরম্ভ করেছে, বোসদা করবী দেবীকে তা জানাতে ভোলেননি।

বোসদা পুলিসের রিপোর্টটা তৈরি করতে করতে আমাকে বললেন, "হোটেল নিয়ে এদেশে প্রতিবছর ডজনখানেক উপন্যাস লেখা হয়। তার কিছু কিছু আমি পড়েছি। কিন্তু পড়তে পড়তে আমার প্রায়ই হাসি এসে যায়। দু' দিন হোটেলে থেকে, তিনদিন বারে বসে এবং চারদিন পুলিস রিপোর্ট ঘাঁটাঘাঁটি করেই যদি হোটেলের অন্তরের কথা জানা যেতো, তাহলে আর ভাবনার কি ছিল? হয়তো বললে বিশ্বাস করবে না, এমন একটা বই পড়েই আমার হোটেলের রিসেপশনিস্ট হবার লোভ হয়েছিল।

সায়েবগঞ্জ থেকে সবে কলকাতায় এসে হোস্টেলে রয়েছি। কলেজের খাতায় নাম লেখানো আছে, বাবার কাছ থেকে মনি-অর্ডারও আসে : কিন্তু পড়াশোনা কিছুই করি না। সবসময় নাটক-নভেল পড়ি; সিনেমা দেখি, আর বিলিতী রেকর্ডের গান শুনি। সেই সময়েই একটা হোটেল-উপন্যাস একবার হাতে এসে গিয়েছিল। সে উপন্যাসের নায়ক একজন লক্ষপতি আমেরিকান। মধ্যপ্রাচ্যের এক শেখের রাজত্বের তলায় কোটি কোটি গ্যালন ভেল জমা হয়ে রয়েছে, এ-খবর তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ সায়েব লোকটি তেমন সুবিধের নন। বিদেশীদের তিনি তেমন সুনজরে দেখেন না। এদিকে আর একজন তৈল চুম্বক তোমরা যাকে বলো অয়েল-ম্যাগনেট—শেখকে আরও বেশী পয়স্যর লোভ দেখিয়ে তেল সন্ধানের লাইসেন্স চাইছেন। আলোচনা চালাবার জন্যে শেখ তাঁর দু'জন সহকারী নিয়ে আমেরিকার এক বিশাল শহরের বৃহত্তম হোটেলে উঠেছেন। সেই হোটেলের আরও দু'টি সুইট দখল করেছেন দু'ই দলের দু'ই আমেরিকান। এদের একজন শেখের ঘরে ঢুকলে, আর একজনের মন খারাপ হয়ে যায়। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে ওঠে। আবার ইনি যখন তাঁর ঘরে ঢোকেন, তখন অন্য ভদ্রলোকের রক্তচাপ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। শক্তির এই টাগ-অফ-ওয়ারে কারুর যদি লাভ হয়ে থাকে, তিনি হোটেলের রিসেপশনিস্ট, আর তার অনুগত হল-পোর্টার। সমস্ত হোটেলটাতে শেখ এবং এই দু'ই কোম্পানির প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ নেই। এদেরই ছোটাছুটি, কাঁদাকাঁদি, হাসাহাসিতে হোটেলটা বোঝাই হয়ে রয়েছে।"

বোসদা বলেছিলেন, "একজন কোম্পানির মালিকের একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। বাবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়াতে, জোর করে বাবাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, সে বাবার ঘরে

রাত্রিদিন ডিউটি দিতে আরম্ভ করলো। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে তার ভাব হতে দেরি হলো না। তারপর দু'জনের যুক্ত বুদ্ধিতে শেখ শেষ পর্যন্ত কীভাবে এদের দিকে চলে গেলেন, কীভাবে তাঁর মন গলে গেলো তারই গল্প।"

একটু থেমে বোসদা বললেন, "ভেবো না, গল্পের এইটুক্, পড়েই আমার হোটেলে ঢোকবার লোভ হলো। এর পরেও একটা চ্যাপটার ছিল। সেই চ্যাপটারে ওদের দু'জনের বিয়ে হয়ে গেলো, বিয়ের দিন রাতে লম্বা আলখাল্লা পরে শেখসায়েব নিজে ডিনার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারপর জোর করে তাঁর নিজের রাজ্যে নববিবাহিত দম্পতিকে হনি-মুন যাপন করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হনি-মুনের পরও রিসেপশনিস্ট ছোকরা এবং সেই ধনীকন্যা আর হোটেলে ফিরে আসেননি। কারণ শেখ সোজাসাজি জানিয়েছিলেন যে, নবগঠিত তৈল কোম্পানির রেসিডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে এই ছোকরাটি ছাড়া আর কাউকে নিয়োগ করা চলবে না।"

বোসদা এবার হেসে ফেলে বললেন, "ভাবলাম, সহজে রাজত্ব আর রাজকন্যা পেতে হলে, হোটেলে চাকরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হয়তো কোনো শেখের নজরে পড়ে যেতে পারি। কতদিন, কতবার তখন কলকাতার বড়ো বড়ো হোটেলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। পয়সা জমিয়ে এক আধদিন ভিতরেও ঢুকেছি। পোর্টার সোজা রেস্তোরাঁর পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রেস্তোরাঁয় খাবার জন্যে তো আর আমি হোটেলে ঢুকিনি। যাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ঢুকেছি, তিনি দেখেছি একমনে মাথা গুজে কাজ করে যাচ্ছেন। বাইরের কোনো দিকেই যেন তাঁর আগ্রহ নেই। একদিন এক বুড়ো ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। রিসেপশনে কাজ করছেন। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে ভদ্রলোক আজও কাউণ্টারে পড়ে রয়েছেন। কোনো তৈলচুম্বকের কন্যার নজর কী তাঁর দিকে এই এতোদিনেও পড়েনি? কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়েছি। ভেবেছি, ভদ্রলোকের হয়তো তেমন বুদ্ধি নেই; কিংবা হয়তো ভদ্রলোক বিয়ে করেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন—ফলে জলের মধ্যে বাস করেও তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরছেন। আমার জানাশোনা এক মামাকে ধরে হোটেলে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলম। কিন্তু মামা শুনেই আমাকে মারতে এসেছিলেন। বাবাকে তখনি টেলিগ্রাম করে দেবেন ভয় দেখিয়েছিলেন।" মামাকে বোঝাবার

জন্যে বোসদা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। মামা বলেছিলেন, ‘জেনেশুনে কোনো ভাল ছেলে কখনও হোটেল লাইনে আসে? এখানে ছুটি নেই, ভবিষ্যৎ নেই এবং সত্যি কথা বলতে কি আত্মসম্মানও নেই।' মামাকে ভেজাবার জন্যে বোসদা বলেছিলেন, 'মানুষকে দেখতে চাই আমি ; মানুষের সেবা করতে চাই।'

‘তাহলে এই হোঁতকা সুস্থ সবল লোকদের সেবা করে মরতে যাবি কেন? আই-এস-সিটা পাস করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে পড়। রোগীর সেবা কর, পুণ্য হবে এবং মানুষের উপকারও হবে।'

বোসদা মামাকে সব বোঝাতে পারেননি। সুযোগ বুঝে একদিন সোজা শাজাহান হোটেলে চলে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল হবস সায়েবের একখানা চিঠি। হবস সায়েবের সঙ্গে একদিন হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। বোসের আগ্রহ দেখে চিঠি লিখে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, “মাই ডিয়ার বয়, তুমি দেখতে সুন্দর, তোমার সুপারিশের দরকার হবে না। এরিস্টটল বলেছেন—a beautiful face is better than all the letters of recommendation in the world— দু’নিয়ার সমস্ত সুপারিশপত্রের চেয়ে সুন্দর মুখের কদর অনেক বেশী।”

আমাদের কথার মধ্যেই হঠাৎ হল-পোর্টার কাউন্টারের কাছে ছুটে এলো। চোখ তুলে দেখলাম, কালো চশমা পরে নিজের ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব ঢাকা দিয়ে এক মধ্যবয়সী বাঙালী ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর হাতেও একটা কালো রংয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ। ভদ্রমহিলার বয়স নিশ্চয়ই অর্ধশতাব্দীতে ছুই ছুই করছে। কিন্তু মেজেণ্টা রংয়ের ঢলঢলে সিল্কের শাড়ি, বগলকাটা ব্লাউজ এবং দেহের চলচপলার-চকিত-চমক যেন এই অর্ধ-শতাব্দীর অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হচ্ছে না। বোসদা ফিস ফিস্ করে বললেন, “মিসেস পাকড়াশী।”

চটুল-জঙ্ঘিনী মিসেস পাকড়াশী কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালেন। হাজার জনের আনাগোনার এই কেন্দ্রে আসতে তিনি যে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে না দাঁড়িয়ে তিনি যদি সোজা কোনো ঘরে চলে যেতে পারতেন, তা হলে বোধহয় খুবই খুশী হতেন। আরও খুশী হতেন যদি সামনের দরজা দিয়ে তাঁকে

যেতে না হতো। যদি পিছনে অন্য কোনো স্বল্পালোকিত পথে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তা হলে তো কথাই ছিল না।

কোনোরকম ভণিতা না করে মিসেস পাকড়াশী ফিসফিস করে বোসদাকে প্রশ্ন করলেন, "আজ রাত্রে একটা ঘর পাওয়া যাবে?"

বোসদা অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "দয়া করে একবার ফোন করে দিলেন না কেন? আমি সব ব্যবস্থা করে রেখে দিতাম।"

মিসেস পাকড়াশী বললেন, "আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। ভেবেছিলাম আসাই হবে না। খুকু আর সব্যসাচীর আসবার কথা ছিল। তা মেয়ে আমার এই দেড়ঘণ্টা আগে ফোন করে জানালেন, জামাইয়ের সর্দি হয়েছে, আসবেন না।"

মিসেস পাকড়াশী এবার নখটা দাঁতে খুঁটতে খুঁটতে বললেন, "রবার্ট তা হলে এখনও আসেনি। আমি ভেবেছিলাম, এতোক্ষণে ও চলে আসবে।"

বোসদা বললেন, "না, আসেননি তো। কোনো খবরও পাঠাননি।" মিসেস পাকড়াশী যেন একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "রবার্ট কমনওয়েলথ সিটিজেন। আপনার পুলিসের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না।"

"আরে, মিসেস পাকড়াশী যে!" হোটেলের ভিতর থেকে সুটপরা এক ভদ্রলোক বেরোতে গিয়ে এঁকে দেখেই কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস পাকড়াশীর মুখ যেন মূহুর্তের মধ্যে নীল হয়ে উঠলো। কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না। কোনোরকমে তিনি বললেন, "আপনি এখানে!"

ভদ্রলোক বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, "আর বলবেন না। আজ যে ড্রাই-ডে আমার খেয়ালই ছিল না। আপিসে একমনে কাজ করে গিয়েছি। তারপর ওখান থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। এসে বার-এর দরজা বন্ধ দেখে খেয়াল হলো, হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে: গবরমেণ্টের এই সিলি নিয়মের কোনো মানে হয়? শুধু শুধু কতকগুলো শুচিবাইগ্রস্ত লোকের পাল্লায় পড়ে গবরমেন্ট নিজেদের আয় কমাচ্ছে। অথচ ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টের জন্যে এখন টাকা চাই। এক্সাইজ রেভিনিউ বাড়ানো চাই। বাড়িতে যে একটু ব্যবস্থা করবো, তারও উপায় নেই। গৃহিণী বলেন, ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে উঠছে।"

ভাবা গিয়েছিল ভদ্রলোক এবার নিজের কথাতেই মেতে থাকবেন। মিসেস পাকড়াশীকে আর প্রশ্ন করতে পারবেন না। কিন্তু ভদ্রলোক এবার বললেন, "আমাদের কথা ছেড়ে দিন। রাত্রে এখানে আপনি?"

মিসেস্ পাকড়াশী আমতা আমতা করে বললেন, “একটা এনকোয়ারি।”

বোসদা যেন ইঙ্গিতটা লুফে নিলেন। বললেন, “আপনাকে তো বললাম, ব্যাংকোয়েট রুম ওই দিন পাওয়া শক্ত হবে। আপনাদের মহিলা সমিতির মিটিংএর দিনটা পিছিয়ে দিন।”

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আবার মিসেস পাকড়াশীর ব্রীফ গ্রহণ করলেন। “বলছেন কী? আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন জানেন? মাধব পাকড়াশীর ওয়াইফ ব্যাংকোয়েট হল, পাবেন না?”

বোসদা বললেন, “দেখছি, স্যরি। আমি চেষ্টা করে দেখছি।”

ভদ্রলোক বললেন, 'চলুন, মিসেস পাকড়াশী, একসঙ্গে ফেরা যেতে পারে।"

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, “ম্যাডাম, এতোই যখন দেরি করলেন, তখন আর একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের ম্যানেজার মিস্টার মার্কোপোলো এখনই এসে পড়বেন।”

মিসেস পাকড়াশী বললেন, “অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার চ্যাটার্জি। আমি আর একটু অপেক্ষা করে যাই। আপনিও তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান—একদিন না হয় ড্রিঙ্ক না-ই করলেন।”

“ওই আপনাদের স্বভাব, সব মেয়ের এক রা— ড্রিঙ্ক কোরো না, ড্রিঙ্ক কোরো না।” ভদ্রলোক শুভরাত্রি জানিয়ে গটগট করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস পাকড়াশী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কৃতজ্ঞ নয়নে বোসদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না। খাতাপত্তর পরীক্ষা করে বোসদা বললেন, "ম্যাডাম, আপনি এক নম্বর সুইটে চলে যান। রবার্টসন নিশ্চয়ই একটু পরেই চলে আসবেন।"

মিসেস পাকড়াশী ইতস্তত করতে লাগলেন। “খাতায় সই :”

বোসদা বললেন, “আপনি ও-নিয়ে চিন্তা করবেন না। রবার্টসনকে দিয়ে আমি সই করিয়ে নেবো।”

মিসেস পাকড়াশী এবারও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর কালো চশমার মধ্যে দিয়ে আর একবার বোসদার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করলেন। বোসদা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনাদের সাপার?”

“হলে মন্দ হতো না।” মিসেস পাকড়শী বললেন।

“আপনারা কী 'ডাইনিং রুমে আসবেন?"

“না, ঘরেই সার্ভ করুক। আমি একটু সলিটিউড্ চাই, একস্ট্রা সর্ভিস চার্জ'টা বিলে ঢুকিয়ে দেবেন।”

বোসদা বললেন, “একটু অপেক্ষা করুন, মেনু কার্ডটা আনিয়ে দিচ্ছি।” মিসেস পাকড়াশী বললেন, “কিছু নয়, শুধু একটু হট চিকেন সুপ।”

“সে কি! সামান্য একটু ফিশ্ প্রিপারেশন?”

“পাগল! এতেই যেভাবে ওজন বেড়ে যাচ্ছে।” বলে মিসেস পাকড়াশী কাউন্টার থেকে এগিয়ে গেলেন।

বোসদা কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে পূর্ববঙ্গীয় কায়দায় বললেন, “হায় রে, স্লিম-হওন-প্রয়াসী!" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোসদা বললেন, “হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু জানো, মিসেস পাকড়াশী অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। খুব গরীব ঘরের মেয়ে কিনা উনি।"

রবার্টসন নামের ইংরেজ ছোকরা পনেরো মিনিট পরেই আসরে অবতীর্ণ হলেন। খাতায় সই করে দিয়ে রবার্টসন যখন উপরে চলে যাচ্ছিলেন, তখন বোসদা জিজ্ঞাসা করলেন, “সাপার পাঠিয়ে দিতে হবে নাকি? মিসেস পাকড়াশী হট চিকেন সুপের অর্ডার দিয়েছেন।”

রবার্টসন বললেন, “আমার সাপার চাই না। কোনো অ্যালকহলিক ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা সম্ভব কিনা তাই বলুন। যদি সামান্য একটু বেশী খরচ লাগে তা বলতে যেন দ্বিধা করবেন না।”

বোসদা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, “কোনো উপায় নেই। এক্সাইজের নিয়ম ভঙ্গ করা শাজাহানের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোটেলের পক্ষে সম্ভব নয়।"

ভদ্রলোক হতাশ মনে লিফটে উপরে উঠে গেলেন। আমি বোসদাকে প্রশ্ন করলাম, "ড্রাই-ডেতে মিসেস পাকড়াশী এমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-করলেই পারতেন।"

"তুমিও যেমন। উনি তো দেখে দেখে ড্রাই-ডে পছন্দ করেন। ড্রাই-ডেতে হোটেলগুলো ঝিমিয়ে পড়ে। লোকজনের যাতায়াত একরকম থাকে না বললেই চলে। ওই দিনই তো ওঁর পক্ষে নিরাপদ। ড্রাই-ডে এখন সপ্তাহে একদিন। শুনছি ওটা ক্রমশঃ বাচ্চা পাড়তে আরম্ভ করবে। এক দু'ই হবে; দু'ই চার হবে। এমনি করে একদিন সপ্তাহের সাতটা দিনই শুকনো হয়ে যাবে। তখন কী যে হবে!"

শুকনো দিনের পরেই ভিজে দিন। সেই ভিজে দিনের ভোরেই অর্থাৎ রাত চারটে থেকে আমার স্পেশাল ডিউটি ছিল। কাউন্টারে চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাজের মধ্যে কেবল জাপান থেকে আসা কয়েকজন আকাশযাত্রীকে স্বাগত জানানো। তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা কলকতার এক খ্যাতনামা ট্রাভেল এজেন্সি আগে থেকেই করে রেখেছিল। ট্রাভেল এজেন্সির এক ছোকরাও সঙ্গে ছিল।

ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের বহু অতিথি পাঠান। কিন্তু ম্যানেজার মনে মনে তাঁদের খুব পছন্দ করেন না। কারণ খুবই সহজ। আমাদের হোটেলে যে তাঁরা খদ্দের পাঠালেন, তার পরিবর্তে বিলের শতকরা দশভাগ তাঁদের পাওনা। তাছাড়া চেকটা প্রায়ই খদেরদের কাছে পাওয়া যায় না। অতিথিরা খাওয়াদাওয়া, হৈ হৈ হট্টগোল আর স্ফুর্তি করে বিদায় নেন। আমরা হিসেব রেখে ট্রাভেল এজেন্টের কাছে বিল পাঠাই। তাঁরা তখন নিজেদের অংশটি কেটে রেখে চেক দেন।

ট্রাভেল এজেন্সির ছোকরা যখন বিদায় নিলো, তখন চারটে বেজে কয়েক মিনিট। তার ঠিক পরেই সিড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যিনি নেমে এলেন তিনি মিসেস পাকড়াশী। ঘুম থেকে উঠে মিসেস পাকড়াশী বোধহয় চুলগুলো ঠিক করে নেননি। অথচ কালো চশমাটা পরে ফেলেছেন।

ধীর পদক্ষেপে এগোতে এগোতে মিসেস পাকড়াশী একবার কাউন্টারের দিকে তাকালেন। বোধহয় বোসদার খোঁজ করলেন। আমি বললাম, "গুড, মর্নিং, ম্যাডাম।" মিসেস পাকড়াশী যেন শুনতেই পেলেন না। আপন মনে হাতের ব্যাগটা জড়িয়ে ধরে

বাইরে চলে গেলেন। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শাজাহান হোটেলের দারোয়ানজীর হুইসলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এই হুইসলের শব্দেই দারোয়ানজী ট্যাক্সি ডেকে পাঠান।

মিসেস পাকড়াশীর পরই যার সঙ্গে আমার দেখা হলো সে নিউ মার্কেটের এক ফলের দোকানের কর্মচারী। হাতে একগোছা বিভিন্ন রকমের ফুল। তখনও বুঝিনি, পরে জেনেছিলাম ওগুলো ফুলের নমুনা। সে দু'' নম্বর সুইটের মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। লোকটাকে করবী দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি ফুল পছন্দ করে দিয়েছেন।

ও ঘরের ঐ প্রাত্যহিক সূচী পরে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে সুইটের অন্য খাতির। যে ঘরে শধু, বিছানা আছে, তার নাম রুম। আর রুমের সঙ্গে একটা বসবার ঘর থাকলেই সেটা হয়ে গেলো সুইট। হাসপাতালে জেনারেল বেডের সঙ্গে কেবিনের মর্যাদার যা তফাৎ, হোটেলের রুম এবং সুইটেরও সেই পার্থক্য। কেবিনেরও যেমন জাতিভেদ আছে, সুইটেরও তেমনি। দু' নম্বর সুইটেরও জাত আলাদা। দু' নম্বরের আলাদা ফোন আছে, এবং ঘরের মধ্যে একাধিক ঘর আছে। ঘর সাজাতে প্রতিদিন অনেক ফুল লাগে। করবী দেবী নিজে ফুল পছন্দ করেন। ফুল পছন্দের পরই লিনেন ক্লার্ক 'নিত্যহরি ভট্টাচার্য পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে করবী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শাজাহান হোটেলে যত চাদর লাগে, পর্দা লাগে, টেবিলক্লথ লাগে, তার রাজাধিরাজ হলেন নিত্যহরিবাবু। সবাই বলে, 'নিত্যহরিদা ভাগ্যবান লোক।'

নিত্যহরিদা বলেন, “তা নয়! বাউনের ছেলে হয়ে ধোপার কাজ করছি, এর থেকে ভাগ্য আর কী হবে! বাবা তখন কতবার বলেছিলেন, 'নেত্য, মন দিয়ে পড়াশোনা কর।' তা নেত্যর সে-কথা কানে গেলো না। নেত্য তখন ফুটবল, যাত্রা, গান, পান, বিড়ি নিয়ে পড়ে রইলো। এখন নেত্য বুঝছে। দু'নিয়ার লোকের পরা কাপড় বয়ে বেড়াচ্ছে। হিসেব করছে। ময়লা কাপড় ফরসা করে আবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে।”

নিত্যহরিদা আরও বলেন, “গুরুবাক্যি অমান্য করলে এই হয়। একেবারে হাতেহাতে ফল। কে জানে গত জন্মে বোধহয় ধোপার কাপড় চুরি করেছিলাম। নইলে এমন শাস্তি ভগবান কেন দেবেন?”

বেয়ারারা এঁকে দেখতে পারে না। তারা বলে, "পরের জন্মে তাহলে তোমার কী যে হবে জানিনে। চুরি করে তো ফাঁক করে দিলে। বাপের দুরদৃষ্টি ছিল। নামটা ঠিকই দিয়েছিল —নিত্য হরণ করে যে সে নিত্যহরি।"

সায়েবরা বলেন ন্যাটা। স্যাটা এবং ন্যাটা দু'জনেই কর্তাদের প্রিয়! মার্কোপোলো মাঝে মাঝে আদর করে বলেন, স্যাটাহারি ও ন্যাটাহারি। গুপ্ত সংবাদ পরিবেশনে ন্যাটাহারির প্রতিপত্তি মাতাহারির থেকেও বেশী। ন্যাটাহারিবাবু কানে পেন্সিলটা গুজে করবী দেবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। করবী দেবী সভয়ে পিছিয়ে যান! "কী করেন, কাঁ করেন!"

ন্যাটাহারিবাবু দমবার পাত্র নন। বলেন, "না মা। তুমি সাক্ষাৎ জগজ্জননী। হাঁপের টানে কতদিন ভুগলাম। তারপর, ভাগ্যে বাবা তারকেশ্বর স্বপ্নে বললেন, তোর হোটেলেই চিকিচ্ছে রয়েছে। আর মা, তোমাকে সেই প্রণাম করার পর থেকেই বেশ ভাল আছি। হাঁপানি নেই বললেই চলে।"

করবী গুহ বিষণ্ণ মুখটা হাসিতে ভরিয়ে বলেন, "আজ যে ফুল আনতে দিয়েছি, তার সঙ্গে ম্যাচ করবে হাল্কা বাসন্তী রং। পর্দা, টেবিলক্লথ, বেড়শিট, টাওয়েল সব ঐ রংয়ের চাই। আপনার স্টকে আছে তো?"

কান থেকে পেন্সিলটা বার করতে করতে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "কী যে বলেন মা লক্ষ্মী। নিত্যহারি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব পাবেন। প্রতিমুহূর্তে খিটখিট করি বটে। কিন্তু না করলে এই আড়াইশো ঘর কী সাজিয়ে রাখতে
পারতাম? তবে মা, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তখন সায়েবসুবোরা আসতো, এ-সবের কদর বুঝতো। প্রতিদিন বেডশিট চেঞ্জ হতো। এখন একদিন ছাড়া ছাড়া।"

করবী দেবীর এ-সব শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু সকৌতুক প্রশ্রয় দিয়ে ন্যাটাহারিবাবু র দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মৃদু' হেসে বলেন, "জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।"

"এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার তো সব মুখস্ত, কোথায় রেখেছি। এখন এরা বুঝবে না। যদি কোনোদিন পালাই, কিংবা কামাই করি তখন এরা আমার কদর বুঝবে।"

নিত্যহরিবাবু, তাঁর প্রাত্যহিক ইন্টারভিউ সেরে আমার চোখের সামনে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। হোটেলের কাজকর্ম ইতিমধ্যে জমে উঠেছে। রোজী নিচেয় নেমে এসে জিমির ব্রেকফাস্টের মেনুকার্ডগুলো টাইপ করতে আরম্ভ করেছে।

এক নম্বর সুইটের রবার্টসন তখনও বোধহয় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি আন্দাজ করেছিলাম, ভদ্রলোকও মিসেস পাকড়াশীর সঙ্গেই হোটেল থেকে সরে পড়বেন।

ভদ্রলোক যে বহুকাল বাঁচবেন তা পরমুহূর্তেই বুঝলাম। বেয়ারা এসে বললো, "এক নম্বর সুইটের সায়েব আপনাকে ডাকছেন।"

কাউন্টার ছেড়ে রেখে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রোজী আজ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে। আমি যে সত্যিই মিস্টার ব্যানার্জির ব্রাদার-ইন-ল নই তা যেন সে ক্রমশ বিশ্বাস করছে।

রোজী বললে, "ম্যান, এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। এক নম্বর সুইটের গেস্ট কমপ্লেন করলে আর চাকরি করে খেতে পারবে না।" আমি বললাম, "আপনার তো তাতে সুবিধেই হবে।"

মুখ রাঙা করে রোজী বললে, "আমি অনেকদিন বেকার ছিলাম। আমার দু'টো বোন বেকার বসে রয়েছে। আমার বাবার চাকরি নেই। চাকরি না থাকা কি জিনিস তা আমি বুঝি, ম্যান। যেহেতু আমি কিন্তলী, যেহেতু আমি একটা হাফ-নোন্ন লোকের সঙ্গে পালিয়েছিলাম, সেহেতু আমার অনুভব-শক্তি থাকতে পারে না?"

রোজী হাসলো। ভোরবেলার সেই হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা ছড়িয়ে ছিল। কেন জানি না, সেই প্রসন্ন প্রভাতে রোজীকে আমার হঠাৎ সুন্দর বলে মনে হলো।

রোজী আমাকে স্যরিয়ে দিয়ে বললে, "যাও, ওখানে দেখা করে এসো। ততক্ষণ আমি কাউণ্টার পাহারা দিতে পারবো।"

বেয়ারাকে সঙ্গে করে, আমি এক নম্বর সুইটের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন করিডরে বসে বেয়ারারা জুতো পরিষ্কার করছে। জুতোর তলায় সাদা খড়ি দিয়ে দাগ দিচ্ছে। দাগ দেওয়ার উদ্দেশ্য তখনও জানতাম না। দাগ দিয়ে ঘরের নম্বর না-দিলে জুতো গোলমাল হয়ে যায়, দু'শো নম্বর ঘরের জুতো দু'শো দশ-এ গিয়ে হাজির হয়। নিজের সু

পায়ে গলাতে গিয়ে, হোঁতকা সায়েব দেখেন সেখানে কোনো ক্ষণিকায় মহিলার হাইহিল জুতো পড়ে রয়েছে। আর সুন্দরী মেমসায়ের ঘুম থেকে উঠে নিঃসঙ্গ বিছানার পাশে রবারসোল ভারী বুট দেখে আঁতকে ওঠেন। আমাদেরই হোটেলে একবার ঘরের মধ্যে বুটজোড়া দেখে এক কুমারী মেম-সায়েব 'হেলপ হেলপ' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, বুটের মালিকও বোধহয় ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন। বেয়ারা ছুটে আসে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি গোলমালটা শুধরে নেয়। না-হলে হয়তো গণ্ডগোলটা অনেক দু'র গড়াতো, এবং গড়াতে গড়াতে মার্কোর কানে পৌঁছলে নিশ্চয়ই চাকরি যেতো। এই গণ্ডগোলের পর থেকেই জুতো বার করবার সময় তলায় খড়ি দিয়ে ঘরের নম্বর লিখে রাখার ব্যবস্থা চালু হয়।

বাইরে থেকে এক নম্বর সুইটের দরজায় নক করে আমরা দু'জন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতর থেকে শব্দ হোলো—কাম ইন। ভিতরে ঢুকে যাকে সুপ্রভাত জানালাম তিনি একটা ফর্সা হাতকাটা গেঞ্জি এবং একটা খর্বাকৃতি জাঙ্গিয়া পরে বিছানার উপর বসেছিলেন। আমাদের দু'জনকে দেখে তাঁর কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা দিলো না। ঠিক সেই ভাবেই বসে থেকে বললেন, "মিস্টার বোস কোথায়?"

বললাম, "তিনি এখনও ডিউটিতে আসেননি।"

একটু লজ্জা পেয়ে, আস্তে আস্তে বললেন, "গতরাত্রে এ-ঘরে সারারাত দু'জনে আমরা ছটফট করেছি। বালিশ কম ছিল। ডবল বেডেড রুমে মাত্র একটা বালিশ। আমি রাত্রেই কমপ্লেন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কমপ্যানিয়ন বারণ করলেন।"

বললাম, "অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি বললে তখনই বালিশের ব্যবস্থা করে দিতাম। আমি এখনই বালিশ আনিয়ে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোক উঠে পড়ে আলমারি থেকে একটা ট্রাউজার বার করতে করতে বললেন, "তার দরকার নেই। আমার কমপ্যানিয়ন অনেকক্ষণ চলে গিয়েছেন। আমিও এখনি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি ডেকেছি অন্য কারণে। এই খামটা উনি আপনাদের মিস্টার বোসের হাতে দিতে বলে দিয়েছেন। ওঁকে মনে করে দিয়ে দেবেন।" জানতে চাইলাম, সুইটা আজও

ওঁদের জন্যে রিজার্ভ থাকবে কিনা। সায়েব বুশশার্টটা পরতে পরতে বললেন, "এখনও ঠিক জানি না। পরে মিস্টার বোসকে ফোন করতে বলবেন।"

ঘর থেকে বেরিয়ে, কাউন্টারে এসে দেখলাম সত্যসুন্দরদা ইতিমধ্যে শাজাহান হোটেলের হাল ধরেছেন। তাঁকে বললাম, "ভদ্রমহিলা আপনাকে এই খামটা দিয়ে গিয়েছেন। আর ঘরে বালিশের সংখ্যা কম ছিল। ওঁদের বেশ অসুবিধে হয়েছে।"

খামটা খুলে ভিতরে উকি মেরে বোসদা বললেন, "ভদ্রমহিলা আমাকে সত্যিই লজ্জায় ফেলছেন। যার যা খুশি দু'নিয়াতে করছে। মিসেস পাকড়াশীও
বাদ যাবেন কেন? আমি এতো ইতর নই যে, এই কুড়ি টাকা না পেলে রেজিস্টারে ভদ্রমহিলার নাম বসিয়ে দেবো!"

এবার আমাকে বললেন, "গেস্টদের অভিযোগগুলো এনকোয়ারি করাটা খুব প্রয়োজনীয় কাজ। মার্কোপোলোকে বললে, এখুনি নিত্যহরিবাবুকে তাঁর ফোর্টিনথ, জেনারেশনের নাম ভুলিয়ে ছাড়বেন। তুমি ওঁকে একটু বলে এসো। আফাটার অল্ মিসেস পাকড়াশীর স্বামীর এই হোটেলটার উপর নজর আছে। যে-কোনোদিন বোর্ডে ঢুকাতে পারেন।"

ন্যাটাহারিবাবু যে কোথায় থাকেন, কোথায় তাঁর স্টোর রুমে আমার জানা ছিল না। সামনে পরবাসীয়া ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে সঙ্গে করেই আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। যাবার পথে মিসেস পাকড়াশীর সঙ্গীকে খালি হাতে নেমে আসতে দেখলাম। ভদ্রলোক গতকাল রাত্রে কিছু না নিয়েই হাটেলে এসে উঠেছিলেন।

এই বাড়িটা যেন একটা শহর। এখানে এতো ঘর আছে, এতো বারান্দা আছে এবং এতো গলিঘুজি আছে যে, চিনে নিতে বহু সময় লাগে। চেনার যেন শেষ হয় না। তিন তলায় উঠে লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'দিকে কেবল বন্ধ ঘরের দরজা ও পিতলের নম্বর দেখে মনে হচ্ছিল, ঘরগুলোতে যেন কেউ নেই। থাকলেও তারা সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় কার্পেটের পথ শেষ হয়ে গেলো। ডান দিকে একটা বন্ধ দরজা রয়েছে। ভেবেছিলাম, ওটাও হয়তো ঘর। কিন্তু পরবাসীয়া হাতলটা ঘুরোতে বুঝলাম

আর একটা পথ শুরু হলো। দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে আমরা হেঁটে চলেছি। দু''ধারে আবার ঘরের সারি। এই ঘরগুলো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নয়। পথটাও যেন হঠাৎ একটু নিচু হয়ে গিয়েছে।

পরবাসীয়ার কাছে শুনলাম, এইটাই হোটেলের সবচেয়ে পুরানো অংশ। সিম্পসন সায়েব নিজে এই দিকটা তৈরি করেছিলেন। আজও তিনি এই দিকটায় বেশী ঘোরাঘুরি করেন।

দু''একটা ঘরের দরজা সামান্য খোলা রয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে হাঁটবার পথে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। শুধু মাথার উপর যে পাখা ঘুরছে তার দোদুল্যমান ছায়া থেকে বোঝা যাচ্ছে। রেডিওর চাপা শব্দ দু' একটা ঘর থেকে কানে আসছে। একটা ঘরে দু'জন জাপানি ভদ্রলোক দু' গ্লাস বিয়ার নিয়ে বসে আছে। ডান পাশের ঘরেই এক আমেরিকান পরিবার। তার পরের ঘরে পাঞ্জাবের সরদারজী পাগড়ি এবং দাড়ির জাল খুলে মাথায় হাওয়া লাগাচ্ছেন। তার পাশের ঘরে নিশ্চয় বার্মার লোক-পরনে লুঙি। বিভিন্ন ভাষায় বাক্যালাপের কয়েকটা ভাঙা টুকরো আমার কানের কাছে ঠিকরে এলো। যেন একটা অলওয়েভ রেডিও নিয়ে আমি ছেলেমানুষের মতো চাবিটা ঘুরিয়ে যাচ্ছি এবং মূহুর্তের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার ভগ্নাংশ কানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই অন্য ভাষার স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ যেন জীবনের সামান্য সন্ধান পেলাম। একটা বাচ্চা ছেলে দার্শনিকের মতো নিস্পৃহভাবে নিজের দেহের বস্ত্রের ভার সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করছে। জামাটা খুলে ফেলেছে। প্যান্টটা খোলবার চেষ্টা করেও সে পেরে উঠছে না। চীনে বাচ্চা। সে হঠাৎ টলতে টলতে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলো। একটু হাসলো। তার কথা বুঝি না। কিন্তু ইঙ্গিতেই সমস্ত ব্যাপারটা বোঝা গেলো! বেচারা প্যান্টটা ভিজিয়েছে। কার্পেটের খানিকটাও সপসপে করে ফেলেছে।

পরবাসীয়া হাঁ হাঁ করে উঠলো। বললে, "কার্পেটটা এই সব পাজী ছেলেদের জুনো থাকবে না।" একবার এক জার্মান খোকা নাকি কার্পেটের উপরই প্রকৃতির বৃহত্তর আহ্বানে

সাড়া দিয়ে ফেলেছিল। এই পরবাসীয়াকেই আবার নাক টিপে সুইপারকে ডাকতে হয়। সেই থেকেই পরবাসীয়া বাচ্চা ছেলেদের ভয় পায়।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিলাম। পরবাসীয়া আমাকে এমনভাবে টেনে ধরলো যেন আমি একটা তাজা বোমাকে মাথায় তুলে নিতে যাচ্ছিলাম। বললে, “বাবু, এই চীনা বাচ্চাদের রকম সকম আমি বুঝি না। ওর আরও দু'ষ্টু বুদ্ধি আছে। এখনই হয়তো আবার জমাদারকে ডাকতে হবে।”

বাচ্চাটা তখন টলতে টলতে নিজের ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে না পেরে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। পরবাসীয়াকে নিয়ে খু'জতে খুজতে অবশেষে এক চীনা ভদ্রলোক আর মহিলাকে পাওয়া গেলো।

তাঁরা ইংরেজী জানেন না। বাচ্চাটাকে না পেয়ে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমান যে কখন দরজা খুলে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের এই কোণে হাজির হয়েছেন বুঝতে পারেননি। তাঁরা চীনে ভাষায় আরও কীসব ধন্যবাদ জ্ঞানাতে লাগলেন। পরবাসীয়া আন্দাজে সে সব বুঝে নিয়ে, নিজস্ব উৎকল ভাষায় মাকে প্রচুর বকুনি দিতে লাগলো। এবং এই কলকাতা শহরটা যে সুবিধের নয়, এখানে ছেলেধরার যে অভাব নেই তা বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে পরবাসীয়া বললে, “আমার লেনিনবাবুকে সন্দেহ হয়।” কলকাতার এই শাজাহান হোটেলে কমরেড লেনিন আবার কোথা থেকে হাজির হলেন? কিন্তু পরবাসীয়ার পরের কথায় বুঝলাম, লেনিনবাবু আর কেউ নন, লিনেন ক্লার্ক নিত্যহরিবাবু।

নিত্যহরিবাবুর নাকি ছেলেদের উপর খুব লোভ। সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে রাখেন। তাদের সঙ্গে আড্ডা দেন। এমন আড্ডা, যাতে কোনো ভাষা দরকার হয় না। নিজের চাদর, বালিশ, বিছানা, ন্যাপকিনের হিসেব করতে করতে নিত্যহরিবাবু মুখভঙ্গী করেন, ছেলেদের কাতুকুতু দেন; উপর থেকে বিছানার উপর লাফিয়ে পড়েন, আর ছেলেরা হৈ হৈ করে ওঠে। এর জন্যে দু'' একবার নিত্যহরিবাবু বকুনিও খেয়েছেন।

আমাকে দেখেই নিত্যহরিবাবু রেগে উঠলেন, "দাঁড়ান মশায়। আমার এদিকে বাইশখানা তোয়ালে কম পড়ছে, আর আপনি এখন এলেন কথা বলতে।" চোখে একটা চশমা লাগিয়ে ভদ্রলোক কাপড়ের পাহাড়ের মধ্যে বসে রয়েছেন। একদিকে কাচা কাপড়। আর মেঝেতে ময়লা কাপড়। "বুঝুন মশায়, আমার অবস্থাটা বুঝুন। বাইশটা তোয়ালে গাঁটের পয়সায় কিনতে গেলে, আমাকে তো ডকে পাঠাতে হবে।"

পরবাসীয়া বললে, "আপনার নামে কমপ্লেন আছে।"

"কমপ্লেন? আমার নামে? এতো বড়ো আস্পর্ধা? কে? তিরিশ বছর আমি এই হোটেলে কাটিয়ে দিলাম। লাটসায়েবের বালিশ, বিছানার চাদরের হিসেব আমি করেছি, তাঁরা কিছু বলেননি; আর কিনা আমার নামে কমপ্লেন?" বললাম, "এক নম্বর সুইটে গতকাল রাত্রে বালিশ কম ছিল।"

"কিছুতেই নয়," ন্যাটাহারিবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

আমি চলে আসতে যাচ্ছিলাম। নিত্যহরিবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হাতে খাতাটা নিয়ে বললেন, "এক নম্বর সুইট। বালিশ কম। হতে পারে না। নিত্যহরি ভটচাযের এমন ভীমরতি ধরেনি যে স্পেশাল সুইটে বালিশ কম দেবে। চলুন তো দেখি।"

হাফ শার্ট, ধুতি আর কে এন দাশের ছে'ড়া চটি পরে নিত্যহরিবাবু আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন এক নম্বর সুইটের দিকে।

যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "আপনার তো সাহস কম নয়। আপনি নিত্যহরির ভুল ধরতে এসেছেন! এই হোটেলের প্রত্যেকটা ঘরে ক'টা করে বালিশ আছে, ক'টা তোষক আছে, ক'টা তোয়ালে আছে, তা এ-শর্মার মুখস্থ। ম্যানেজার সায়েবের ঘরে আছে ছ'খানা বালিশ। তার মধ্যে দু'টো পালকের বালিশ, খোদ সিম্পসন সায়েব যা মাথায় দিতেন। দু' নম্বর সুইটে আছে আটটা। এক নম্বরে চারটে। আর আপনি বলছেন বালিশ নেই?"

এক নম্বর সুইটের চাবি খুলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেলো একটা মাৎৰ বালিশ পড়ে রয়েছে। দেখে নিত্যহরিবাবু প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই চিৎকার করে বলে

উঠলেন, “অসম্ভব! নিশ্চয়ই নেশার ঘোরে মেঝেতে খেলাধুলো করেছে, তারপর ভুলে গিয়েছে।”

আমি বললাম, “গতকাল ড্রাই-ডে ছিল।”

নিত্যহরিবাবু কিন্তু আমল দিলেন না। “হ্যাঁ! ড্রাই-ডেতে কলকাতা একেবারে বাউনের ঘরের বিধবা হয়ে যায়!”

নিত্যহরিবাবু হঠাৎ মেঝেতে বসে পড়ে খাটের তলায় উকি মারলেন। 'তারপর আবিষ্কারের আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ে তিনটে বালিশ বার করে বললেন, “দেখুন স্যর। একটু হলেই আমার চাকরি যাচ্ছিল। কেউ বিশ্বাস করতো না যে, আমি বালিশ দিয়েছি এবং সেই বালিশ ওঁরা মেঝেতে নিয়ে খেলাধুলা করেছিলেন। লাটসায়েবের বালিশ সাপ্লাই করেও, এই থাটটি ইয়ার সার্ভিসের পর নিত্যহরি ভটচাযি্যর চাকরি যাচ্ছিল।”

আমি দেখলাম, সত্যিই ঘরের মধ্যে খাটের তলায় বালিশ ছিল। আমারমুখের অবস্থা দেখে নিত্যহরিবার বোধহয় একটু দয়া হলো। বললেন, “আপনার বয়স কম। হোটেলের কিছুই দেখেননি আপনি। নেশা কি শুধু মদে হয়! একদম বাজে কথা! বেশী বয়সের মেয়েমানুষের মাথায় যখন ভুত চাপে তখন চোখে নেশা লেগেই থাকে। তা বাপু পয়সা দিয়ে হোটেলের ঘর ভাড়া করেছো। বালিশ নিয়ে খেলা করো।" নিত্যহরিবাবু ঢোক গিললেন। “কিন্তু বালিশও নিচেয় ফেলে দেবো, আবার ন্যাটাহারিকে বাম্বু দেবো, সে কি কথা!” গতিক সুবিধে নয় বুঝে পরবাসীয়া কখন আমাকে একলা ফেলে রেখে কেটে পড়েছে। এবার আমিও অ্যাবাউট টার্ন করে পালাবার চেষ্টা করবো ভাবছিলাম।

নিত্যহরিবাবু তখন বলছেন, “আপনি হয়তো ভাবছেন ধেড়ে। মোটেই নয়। রং লাগলে ধেড়েরাও খোকা শখ হয়ে যায়। ন্যাটাহারির এই স্টেটমেন্ট সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত চলবে, জেনে রাখবেন। ন্যাটাহারি পরের মুখে ঝাল খায় না, সে নিজের হাতে তিরিশ বছর ধরে বালিশ সাপ্লাই করছে।”

এবার পালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিত্যহরিবাবু হাতটা চেপে ধরে বললেন, “যাচ্ছেন কোথায়?”

আমি বললাম, “নিচেয়।”

"অত সহজে নয়। অত সহজে আমার হাত থেকে কেউ ছাড়া পায় না।” মনে হলো সেই ভোরবেলাতেও নিত্যহরিবাব্র চোখ-দুটো ধক ধক করে জ্বলছে।

“কেন, কী করতে হবে?” নিত্যহরিবাবুকে আমি প্রশ্ন করলাম। তাঁর দু'টো চোখের তেজ এবার কমে এলো। মনো হলো, নিত্যহরিবাবু নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, “আমার হাতে একটু জল দিন।”

বললাম, "জল কী করবেন?”

“পাপ! পাপ ধুয়ে ফেলতে হবে না?"

বাথরুমে বেসিন রয়েছে। কল রয়েছে। কিন্তু নিত্যহরিবাবু এক নম্বর সুইটের কলে হাত দেবেন না। যেন এ-ঘরের সর্বত্র পাপ ছড়ানো রয়েছে। বাথরুমে গিয়ে একটা মগ আবিষ্কার করলাম এবং সেই মগে জল বোঝাই করে নিত্যহরিবার হাতে ঢালতে লাগলাম। বেসিনের উপরেই একটা পাত্রে লিকয়িড সোপ ছিল। কিন্তু নিত্যহরিবাবু সেদিকে হাত বাড়ালেন না। পকেট থেকে একটা সাবানের টুকরো বার করলেন। কোথায় কখন বালিশ ঘে'টে হাত ধুতে হবে ঠিক নেই; তাই পকেটে কয়েক টুকরো সাবান নিত্যহরিবাবু, সব সময়েই রেখে দেন। কার্বলিক সাবানে হাতটা ভাল করে ধুতে ধুতে নিত্যহরিবাবু বললেন, “গত জন্মে নিশ্চয় হাজার হাজার ধোপার লাখ লাখ কাপড় আমি চুরি করেছিলাম।”

নিত্যহরিবাবু আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, “এই হোটেলের স্ট্যাটিসটিকস জানেন? বলুন তো ক'টা বালিশ আছে?"

আমি বললাম, “আমি কী করে জানবো?”

উনি ফিসফিস করে বললেন, “সাড়ে নশ। আগে হাজারটা ছিল। পঞ্চাশটা ছি'ড়ে গিয়েছে। তার তুলোগুলো আমার ঘরের এক কোণে জমা হয়ে আছে। পাপ!” আমার কানের কাছে এগিয়ে এসে নিত্যহরিবাবু মুখটা ভেঙচে বললেন, “হাজারটা পাপ!”

নিত্যহরিবাবু যেন আমার মনের মধ্যে ক্রমশ গেথে বসছেন। নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করে বসলাম, "কেন? পাপ কেন?”

“আপনার বাবা কি আপনাকে লেখাপড়া শেখাননি? তিনি কি মাস্টারের মাইনে বাকি রাখতেন?” নিত্যহরিবাবু আমাকে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করলেন। বললাম, “মাইনে তিনি সময়মতো দিয়েছেন। তাঁর সাধ্যমতো কাউকে তিনি ফাঁকি দেননি।”

“তবে? আপনার মাস্টার তাহলে কী শিখিয়েছে আপনাকে? জানেন না, হোটেলে, সরাইখানায়, শুড়িখানায় প্রতিমূহূর্তে হাজার হাজার লাখ লাখ পাপ সৃষ্টি হচ্ছে?”

"এখানে হাজার হাজার লোক আসেন নিজের কাজে। তাঁরা কী পাপ করছেন?” আমি ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলাম।

“আলবত করছে। পাপ না করলে কাউকে কি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়? না, ঘরের বাইরে রাত কাটাতে হয়?” নিত্যহরিবাবুর চোখ দু’টো আবার জ্বলতে আরম্ভ করেছে। বললেন, “কদিন চাকরি করছেন?”

“এই দিনকতক হলো।” আমি উত্তর দিলাম।

“বয়ে গিয়েছেন?” ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

“মানে?”

"রোজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?” নিত্যহরিবাবু নিজের প্রশ্নটি সরল ভাষায় উত্থাপন করলেন।

"চিনি, কিন্তু তেমন কোনো পরিচয় নেই।”

“ও ছুড়িও আমার কাছে একবার একটা বালিশ চেয়েছিল। আমি স্রেফ না বলে দিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, আমি না বলার কে? যে বালিশ চাইবে, তাকে বালিশ দাও। যত খুশি চাইবে, ততো দাও। আমার কী? আমি নিজে হাতে করে ওর ঘরে বালিশ দিয়ে এসেছিলাম। তা ছুড়ি পরের দিন ভোরবেলাতে বালিশ দু’টো ফেরত দিয়েছিল।

"দু’টো লোককে আপনাদের বুঝলাম না। আপনাদের সত্যসুন্দর বোস। ডাকবার জ্বল করেও একটা বালিশ চাইলো না। আর মার্কো সায়েব। রসিক লোক মাল টেনে টৈ-টুম্বর হয়ে থাকেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত—কোনোদিন বাড়তি বালিশ নিলে না। মেয়েমানুষ যেন বাঘ।”

আমি অবাক হয়ে নিত্যহরিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বালিশ বেশী চাইতে হলে আগে চাই ড্রিঙ্কস – আমাদের মানি-খুষিরা যাকে বলেন মাল। শাজাহানের

শুড়িখানায় যাতায়াত করেন তো?"

বললাম, ওখানে এখনও আমার ডিউটি পড়েনি।"

"উনি বললেন, "মেয়েদের বলি, মা লক্ষ্মী, কর্তাদের সব স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু বাড়ি ছাড়তে দেবে না। খুটি থেকে ছাড়া পেলেই বিপদ। কার বেড়া ভাঙবে, কার ক্ষেতে ঢুকবে কিছুই ঠিক নেই।"

নিত্যনিত্যহরিবাবুর মধ্যে আমি এক অদ্ভুত মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "সাপ! আমি এতোদিনে বুঝেছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা কেউটে সাপ ঘুমিয়ে আছে। কারুর মধ্যে সেটা চিরকালই ঘুমিয়ে থাকে। আর কারুর কারুর বাড়ি ছাড়লেই ভিতরের সেই সাপটা ফোঁস করে ওঠে। লক লক করে ওঠে জিভটা।"

আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। ওই ঘরে আর থাকতে ইচ্ছে করছিল না। নিত্যহরিবাবুরও বোধহয় ভাল লাগছিল না। তাই এক নম্বর সুইটের বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললেন, "চলুন, আমার ঘরে যাওয়া যাক।"

বালিশ, বিছানা, চাদর-এর পাহাড়ের এক কোণে নিত্যহরিবাবু শুয়ে থাকেন। বললেন, "এইখানেই আমি থাকি ; আর ছোটো শাজাহানে খাই। "ছোটো শাজাহান! সে আবার কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলাম। ," "বড়ো শাজাহানের পিছনে। বলুন তো, শাজাহানের একটা ডিনারের সবচেয়ে বেশী চার্জ— কত?" নিত্যহরিবাবু প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, "এ তো সবাই জানে। পয়ত্রিশ টাকা।"

"আর ছোটো শাজাহানে চোদ্দ পয়সা। চোদ পয়সায় ফুলকোর্স ডিনার। ভাত, ডাল, তরকারি। মাধ্যিখানে দাম বাড়িয়ে চার আনা করবে বলেছিল। শাজাহানের স্টাফরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করি। চার আনা আমরা কোথা থেকে দেবো? তখন বাধ্য হয়ে চোদ্দ পয়সায় রেখেছে, শুধু ডালটা একটু পাতলা হয়েছে ; আর থালাটা যে-যার ধুয়ে দিতে হয়।" নিত্যহরিবাবু বললেন, "আপনার কথাই আলাদা। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। চাকরিতে না-ঢুকতেই বড়ো শাজাহানের ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনার।"

আমি চুপ করে রইলাম। কী উত্তর দেবো? ন্যাটাহারিবাবু নিজেই বললেন, "আপনাদের অবশ্য জুনো সায়েব অনেক কম দেয়। গেস্টরা লাঞ্চের সময় যা খান, তার

বাড়তিগুলো দিয়ে আপনাদের ডিনার। আর ডিনারের বাড়তি দিয়ে আপনাদের পরের দিনের লাঞ্চ। আজ লাঞ্চে সায়েব আপনাদের কী খাওয়াবে জানেন?"

নিত্যহরিবাবুর খবর সংগ্রহের ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। "ম্যাড্রাস কারি। খেতে চমৎকার, কিন্তু খবরদার খাবেন না। আপনার পেট কেমন? লোহা খেলে হজম হয়ে যায়?"

"মোটেই না, পেটটা একেবারেই আমার ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট নয়।"

"তা হলে ম্যাড্রাস কারিটা একদম বাদ দিয়ে খাবেন। ওটা লন্ডনের বীরস্বামী সায়েবের আবিষ্কার। বীরস্বামী, গোল্ড মেডালিস্ট, অনারারি কুকিং অ্যাডভাইস্যর টু দি সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ার এগজিবিশনে গিয়েছিলেন, তারপর লন্ডনে রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। তাঁর কাছেই তো জুনো ইণ্ডিয়ান রান্না শিখেছিল বলে। কিন্তু আসলে বীরস্বামী ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেবেন কুক না থাকলে, জুনোর জারিজুরি এতোদিনে বেরিয়ে পড়তো। যা বলছিলাম—প্রথম দিন মাংস কিনে এনে হয় কোল্ড মিট। দ্বিতীয় দিনেও তাই। তৃতীয় দিনে বিরিয়ানী। আজকে সেই মাংসই ম্যাড্রাস কারি ফর দি স্টাফ।"

নিত্যহরিবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম। উনি বললেন, "একটু থামুন। আপনি ছেলেমানুষ। আপনাদের মনে যাতে দাগ না পড়ে, আর একটু দাগ পড়লেই যাতে ধরা পড়ে, তার ব্যবস্থা করছি। রোজী তো আপনার ঘর অকুপাই করে নিয়েছে। আপনার মালপত্তর সব পাশের ঘরে চালান হয়ে গিয়েছে। ওখানে আমি সব কিছু সাদার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

এক বাণ্ডিল কাপড়-চোপড় নিয়ে উনি জোর করে ছাদে আমার সঙ্গে চলে এলেন। রোজী নিজের ঘরে বসে তখন দাঁত বার করে হাসছে। আমাকে দেখেই বললে, "আমার কাজকর্ম সব শেষ। এখন ছাদে বসে বসে শরীরটাকে সূর্যের আগুনে মচমচে টোস্ট করবো। তারপর লাঞ্চ খাবো। তারপর জানো কী করবো? ম্যাটিনী শোতে সিনেমায় যাবো। জিমিরও যাবার কথা ছিল। কিন্তু ব্যাংকোয়েটে কাজ পড়ে গিয়েছে! ওর টিকিটটা রয়েছে। তুমি যাবে?"

আমি অবাক হয়ে গেলাম, রোজী আমাকে সিনেমায় নেমন্তন্ন করছে। বললাম, “অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমারও ডিউটি রয়েছে।”

রোজী বললে, “অল রাইট্, তাহলে আমার বোনকে নিয়ে যাই। তবে বিনা নোটিশে ওকে সিনেমায় নিয়ে গেলে ওর বয়-ফ্রেণ্ডরা দুঃখিত হয়, ডাকতে এসে তারা ফিরে যাবে।”

আর-এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। নিজের মুখভঙ্গীকে ন্যাটাহারিবাবু এতোক্ষণ বোধহয় কোনোরকমে চেপে রেখেছিলেন। পরে ঢুকেই তিনি নিজমূর্তি ধারণ করলেন। বললেন, “অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছেন মনে হলো! কিন্তু মনে রাখবেন, অতিবাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে। আরও মনে রাখবেন, চারদিকে বিষ। সব সময় ভাল করে হাত না ধুলে মরবেন।”

ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে দেখে বললেন, “আপনার এ-ঘরে সব সাদা করে দিচ্ছি। সাদা পর্দা, সাদা চাদর, সাদা তোয়ালে, সাদা টেবিলক্লথ। দরকার হয়, আমি রোজ পাল্টাবার ব্যবস্থা করবো। পাঁচটা ধোপা এই নিত্যহরির কথায় ওঠে বসে।" একটু বসেই নিত্যহরিবাবু আবার উঠে পড়লেন। “আমি চলি। অনেক কাজ। ব্যাংকোয়েটে তিনশ গেস্ট। তিনশ ন্যাপকিনের ফুল তৈরি করতে হবে।”

ন্যাপকিনের ফুল কাকে বলে জানতাম না। ওঁর কাছেই শুনলাম, আগে শাজাহান হোটেলে প্রতি কোর্সে ন্যাপকিন পাল্টানো হতো। এখন একবারই করা হয়। অতিথিরা হল-এ ঢোকবার আগেই গেলাসের মধ্যে ন্যাপকিন সাজিয়ে রাখা হয়। নিত্যহরিবাবু বললেন, “কত রকমের ন্যাপকিন মুড়েছি-পাখা, বিশপ, নৌকো, পদ্মফল, ফণিমনসা। এবারে অন্য একভাবে মুড়বো। তাতে আমার পরিশ্রম বেশী, তবু করবো। কেবল নামটির জন্যে। ইংরিজিতে বলে দি বোরস হেড'। শূয়োরের মাথা—হোটেলের ব্যাংকোয়েটে প্রতিবারই এবার থেকে আমি শুয়োরের মাথা ছাড়া আর কিছু করবো না।” আপন মনে বকতে বকতে নিত্যহরিবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক

ক্রিকেটে যেমন টেস্ট, ফুটবলে যেমন শীল্ড ফাইন্যাল, হোটেলে তেমনি ব্যাংকোয়েট। এই ব্যাংকোয়েট বস্তুটি আসলে যে কী, হোটেলের চাঁইদের কেউই তা জানেন না। জানবার সময়ও নেই কারুর।

ব্যাংকোয়েট সম্বন্ধে খোঁজখবর এলে সবচেয়ে যিনি খুশী হন, তিনি আমাদের ম্যানেজার। তিনি কাস্টমারকে সোজাসুজি বলে দেন, এতো বড়ো পার্টিকে ম্যানেজ করা শাজাহান হোটেল ছাড়া আর কোথাও সম্ভব নয়। "আমাদের চার্জ সামান্য একটু বেশী পড়ে, কিন্তু যাঁরা পার্টিতে আসবেন তাঁদের আনন্দ; আর যাঁরা পার্টি দিচ্ছেন তাঁরাও নিশ্চিন্ত।"

সপ্তাহে এক-আধটা ব্যাংকোয়েট শাজাহান হোটেলে লেগেই থাকে। আগে আরও হতো। সত্যসুন্দরদা বললেন, "আগে এমন সময় গিয়েছে, যখন পর পর পাঁচ দিন ব্যাংকোয়েট। দেড় মাস, দু' মাস আগে থেকে ব্যবস্থা না-করলে হল্ পাওয়া যেতো না।"

সত্যসুন্দরদার কাছেই শুনলাম, এখন আর সেদিন নেই। তার কারণ যে কলকাতায় ফুর্তি করবার লোক কমে গিয়েছে, বা সামাজিক মেলা-মেশা কমে গিয়েছে তা নয় ; আসলে কলকাতার ক্লাবগুলো জাঁকিয়ে বসেছে। সেখানে মদ সস্তা, খাবার সস্তা, লাভের তাড়নাটাও তেমন নেই। অথচ ইজ্জত কম নয়; বরং বেশী। ক্লাবের প্রাইভেসীতে পার্টি দিতে কলকাতার উচু মহলের নাগরিকরা পছন্দ করেন। ক্লাবের ম্যানেজমেন্টও খুশী হন। নতুন স্টাফ রাখতে হচ্ছে না, অথচ ক্লাবের তহবিলে কিছু আসছে। দেশের যা হালচাল, কিছুই বিশ্বাস নেই, কোনদিন সকালে খবরের কাগজে দেখা যাবে বোম্বাইয়ের মতো কলকাতারও বারোটা বেজে গিয়েছে। ভিজে কলকাতা রাতারাতি ড্রাই হয়ে গিয়েছে। মদের লাইসেন্সবিহীন ক্লাব অনেকটা পাতাবিহীন বাঁধাকপির মতো। বিধাতা করুন, সেই দু'র্দিন যেন সুদুরপরাহত হয়। কিন্তু সত্যিই কখনও সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শুকনো তেজস্ক্রিয় মেঘ যদি দিল্লী ঘুরে কলকাতায় এসে হাজির হয় তখন সেই দু'র্দিনে ব্যাংকোয়েট ছাড়া ক্লাবের কিছুই থাকবে না। সেইজন্য এখন থেকেই 'তাঁরা সতর্ক হয়েছেন।

কিন্তু ব্যাংকোয়েট কী আর অতোই সহজ! বিশেষ করে সে ব্যাংকোয়েটে যদি সাড়ে-তিনশ চারশ অতিথি আসেন। শাজাহানে এমন সব লোক আছে, এসব কাজে যাদের তুলনা নেই। প্রয়োজন হলে সরকারী মহলেও তাদের ডাক পড়ে। আন্তর্জাতিক অতিথিদের কাছে ভারতবর্ষের ক্ষণভঙ্গুর মান-সম্ভ্রম তারাই রক্ষে করে আসে। আমাদের পরবাসীয়ার কথাই ধরা যাক না কেন। নাইনটিন টোয়েন্টিফোরে ব্রিটিশ এম্পায়ার এগজিবিশনে যে ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিল, সেখানে কাজ করবার জন্য সে বিলেত গিয়েছিল। তারপর কতবার যে সে-লাট-বেলাটদের ব্যাংকোয়েটদায় উদ্ধার করেছে তার হিসেব নেই। ব্যাংকোয়েটের খবরে পরবাসীয়ারা খুশী হয়। দিন দু'ই যা একটু বেশী খাটতে হয়। পিঠে ব্যথা হয়, পাগুলো টনটন করতে আরম্ভ করে, কিন্তু তবু ভাল লাগে। 'ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা হলেই মার্কোপোলো খুব ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর মেজাজটা হঠাৎ খুব নরম হয়ে যায়। বাড়ির রাশভারি কর্তা যেমন বিয়েবাড়ির কাজের চাপে অনেক সময় ছেলেপিলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন, মার্কোপোলোও তেমনি বলেন, "জিমি, এটা খুবই ইমপর্টাণ্ট ব্যাংকোয়েট, এই পুওর কান্ট্রির প্রেস্টিজ নির্ভর করছে এর সাফল্যের উপর।"

জিমি বলে, "এমন ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা করবো, যা কোনোদিন কলকাতায় হয় নি।"

মার্কোপোলো জুনোর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করেন, "তুমি কী বলো?" জুনো বলে, "স্যর, নো নো, দিজ আর সিম্পল পাতিজ, নো ব্যাংকোয়েত।" ব্যাংকোয়েট বলে লজ্জা দিচ্ছ কেন, এ-সব আসলে পার্টি। জুনোর ধারণা, ব্যাংকোয়েট কাকে বলে তা ক্যালকাটার লোকরা জানে না। জুনো বলে, "এটা হাড়কঞ্জুস স্কচ সিটি।" প্যারিসে কাজ শিখে, এই পিপড়ের পশ্চাং-টেপা শহরে এসে অর্ধেক রান্নাই ভুলে গেলো। জুনো তো যে-সে লোকের পায়ের তলায় বসে রান্না শেখেনি। খোদ মসিঁয়ে হারবদু' ——দু'নিয়ার যত হোটেলের যত সেফ আছে, তাঁর নাম শুনে মাথা নত করে—তাকে নিজে হাতে কুকিং শিখিয়েছেন। মসিঁয়ে হারবদু' যাঁর শিষ্য, তিনি রান্নার জগতের বীঠোফেন। তার নাম মসিঁয়ে একফিয়ারয়। একফিয়ারয় বলতেন, "টু কুক্, ইজ টু সার্চ গড।" হারবদু'র কাছে জুনো কতবার শুনেছে, নয় কোর্সের কম ব্যাংকোয়েট ডিনার হয় না।

"হোয়াট?" মার্কোপোলো সায়েব চিৎকার করে উঠেছিলেন।

জুনো তার অ্যাপ্রনে হাতটা ঘষতে ঘষতে বললে, "হ্যাঁ, প্রথমে অডিভোর, তারপর সুপ, ফিশ, Entree, রিমভেস, রোস্ট এনট্রিমেন্ট, ডেসার্ট এবং শেষে "কফি"।

মার্কোপোলো এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আমাদের এই ব্যাংকোয়েটটা ছেলেমানুষের ব্যাপার নয়। যতদূর শুনেছি, অভ্যাগতরা দেশের এবং পৃথিবীর অনেক গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ন্যাচারালি তাঁরা চান প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ডিনার। এ্যাবাউট পনেরো টাকা পার হেড।"

নয় কোর্সের ডিনার রান্নার সুযোগ হারিয়ে জুনো বললে, "আপনার যা খুশি হুকুম করুন, আমি রেঁধে খালাস। আপনি বলুন, আমি শুধু কোল্ড মাটন এবং ব্রেড দিচ্ছি। তবে এটা আমি বলবই, প্যারিস ছাড়া আর কোথাও রেঁধে সুখ নেই। দু'নিয়ার আর কোথাও রান্নার সমঝদার নেই। সেইজন্যেই কলকাতায় হালুইকর বাউন পাওয়া যাবে; কিন্তু কলকাতা কোনোদিন একটা মঁসিয়ে হারবদু' বা একটা মঁসিয়ে একফিয়ারয়কে সৃষ্টি করতে পারবে না।"

মার্কোপোলো উঠে পড়লেন। বললেন, "তোমরা একটু বোসো, আমি একটা টেলিফোন করে আসছি। মেনুটা ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নিই।"

বোসদা তখন জুনোকে বললেন, "পুওর জুনো! তুমি দুঃখ কোরো না। আমার বিয়ের সময় তোমাকে মনের সুখে রান্নার সুযোগ দেবো। তখন দেখবো কি মেনু তোমার মাথায় আছে।"

জুনো হেসে বললে, "স্যাটা, তোমার বিয়েতে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, পোলিশ, আফ্রিকান, টার্কিস, চাইনিজ, ইন্ডিয়ান সব রকম এক একটা ডিশ করবো।"

"হে পরম করুণাময়, হে প্রভু মঁসিয়ে জুনোকে তুমি দীর্ঘজীবী কোরো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ইউ-এন-ও থেকে একটি মনের মতো কনে আমার জন্যে পাঠিয়ে দিও।" বোসদা হাঁটু গেঁড়ে, জোড়হাতে সকৌতুকে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন।

জুনো খুশী হয়ে বললে, "তোমার ফুলশয্যার রাতে যে সুপ করবো, তার নাম La Soupe des Noces oy Tourin Aux Tomates !"

বোসদা হাসতে হাসতে একটু সরে এসে বললেন, “নামটা তো বেজায় লম্বাচওড়া। আসল জিনিসটা কি, জুনোদা?”

জুনো বললে, “ছোটো করে আমরা বলি মধুযামিনী সুপ'। এই সুপ অনেকখানি তৈরি করতে হবে। তারপর আমাদের দেশে যা হয়, তাই করা হবে।”

জিমি বললে, “প্রেম করা আর খাওয়া ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তো তোমাদের ফরাসী জাতের মাথায় আসে না।”

জুনো রেগে গিয়ে জিমিকে বললে, “বাজে বোকো না।”

তারপর বোসদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, “তোমার ফুলশয্যার দিন আমরা বহু রাত পর্যন্ত খানাপিনা করবো, হৈ-হৈ করবো। তারপর গভীর রাত্রে দু’ পাত্র গরম 'মধুযামিনী স্যুপ' নিয়ে তোমার বন্ধঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করবো। যতক্ষণ না তোমরা দরজা খুলে দাও, ততক্ষণ আমরা বাজনা বাজাবো, চিৎকার করবো, ধাক্কা দেবো। তারপর আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যেমনি তুমি বা তোমার গিন্নী দরজা খুলবে, অমনি হৈ-হৈ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বো। জোর করে তোমাদের দু’জনকে ঐ স্যুপ খাওয়াবো। ঠিক আমরা খাওয়াবো না। মিসেস বোসকে খাওয়াবে তুমি, আর মিসেস বোস খাওয়াবেন তোমাকে। যতক্ষণ না তোমরা ঐ সুপ শেষ করবে, ততক্ষণ আমরা ঘর থেকে বেরবো না।"

বোসদা হেসে বললেন, “তা না হয় নাই বেরলে। কিন্তু সুপটা কিসের তৈরি শুনি। কলকাতায় সব জিনিস পাওয়া যাবে তো?” “জরুর। আমার চাই বারোটা টমাটো, ছ'টা পেয়াজ, কিছু, মরিচ, আর এক আউন্স মাখন!

"এ্যাঁ। কেবল পিয়াজ আর টমাটো দিয়ে La Soupe des Noces oy Turn Aux Tomates! আমি ওর মধ্যে নেই। আমি বিয়েই করবো না। মুখ দিয়ে ভকভক করে পিয়াজের গন্ধ বেরচ্ছে, এমন স্বামীকে কোনো মেয়েই সহ্য করবে না।"

জুনো যে সত্যসুন্দরদাকে ভালবাসে, তা তার কথাতেই বোঝা যায়। সে এবার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্কোপোলো ফিরে এলেন। বললেন, “কথাবার্তা সব হয়ে গিয়েছে। আমি মেনুটা এখনই রোজীকে ডিক্টেট করে দিচ্ছি। শুধু ক'জন ভেজিটারিয়ান, আর ক'জন নন-ভেজিটারিয়ান তা জানা যাচ্ছে না।”

জিমি বললে, “সে তো কখনই জানা হয়ে ওঠে না। শতকরা দশটা নিরামিষ করে দিই।”

জুনো রেগে বললে, “হেল! প্যারিস যদি স্বর্গ হয়, ক্যালকাটা তাহলে রাধুঁনিদের নরক। পার্টিতে না এসে কলকাতার লোকেরা বাড়িতে বসে বসে ফল খায় না কেন? মাঁসিয়ে হারবদু’ কি ভাবতে পারেন যে, একই ডিনার টেবিলে একদল ভেজিটারিয়ান, আর একদল নন-ভেজিটারিয়ান! একদল নিরামিশাশী হয়েও ডিম খায়। আর একদল নন-ভেজিটারিয়ান হয়েও বীফ খায়। আর একদল গোরু খায়, কিন্তু শুয়োরের নাম শুনলে বমি করতে আরম্ভ করে"।

বোসদা জুনোকে রাগাবার জন্যে বললেন, “এখন বল মা তারা, দাঁড়াই কোথায়?”

“হোয়াট?” জুনো প্রশ্ন করলেন।

“এই জন্যেই তো আমাদের গ্রেট রামপ্রসাদঠাকুর বলেছেন—টেল মাদার ট্যরা হোয়্যার ডু আই স্ট্যান্ড?” বোসদা বললেন।

জুনোর মুখে হাসি ফুটে উঠলো, “স্যাটা, মিস্টার প্রসাদ কি একজন গ্রেট কুক ছিলেন?”

"ভেরি ভেরি গ্রেট রাঁধুনী। ওনলি গডের জন্যে তিনি কুক করতেন।” পরবাসীয়া আসরে বসেছিল। সে এবার ম্যানেজার সায়েবের কানে কানে কী যেন বললে। ম্যানেজার জিমিকে প্রশ্ন করলেন, “ওয়েটারের কী হবে? ডাইনিং হল-এ ক’জনকে দিয়ে তুমি চালিয়ে নিতে পারবে?” "কুড়িজনের কমে অসম্ভব,” স্টুয়ার্ড— বললেন।

ব্যাংকোয়েটের সময় লোকের অভাব হয়। যেখানে যত লোক আছে, সবাইকে উর্দি পরিয়ে ওয়েটারের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কোন হোটেলে এরপর নাকি ঝাড়ুদারদেরও কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবাসীয়া চুপি চুপি খবরটা আমাকে জানিয়েছিল। তাছাড়া পুরনো লোকদেরও খবর দেওয়া হয়। যারা অনেকদিন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে (অর্থাৎ জিমি যাদের অবসর নিতে বাধ্য করেছে), কলকাতার কাছাকাছি থাকলে তাদেরও ডাক পড়ে।

জিমি বললেন, “পরবাসীয়া, তুমি এখনই বেরিয়ে পড়ো, আবদু’ল, গফুর, গদাধর, জয়া এদের সব খবর দিয়ে এসো। দু''টাকা করেই দেওয়া হবে।”

পরবাসীয়া উঠে পড়লো। আর মার্কোপোলো বললেন, "খাবার আগে ন্যাটাহারিকে একটা খবর দিয়ে যাও।”

চটি ফটর ফটর করতে করতে নিত্যহরিবাবু যখন আসরে হাজির হলেন, তখন আরও অনেকেই উঠে পড়েছেন। জুনো তার কিচেনে চলে গিয়েছে। জিমি কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে মার্কেটের ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন। মার্কোপোলো বললেন, “ন্যাটাহারি, ব্যাংকোয়েট।”

ন্যাটাহারি তাতেই সব বুঝে গেলেন। “কটা বাড়তি লোক নিয়ে আসছেন স্যর?"

“প্রায় কুড়িটা।”

"চল্লিশটা উর্দি, আর আশিটা দস্তানা আমি রেডি করে রেখে দেবো। মাথার পাগড়িও দিয়ে দিই স্যর? রাজ্যের বড়ো বড়ো লোক আসছেন। লাটসায়েব আসছেন নাকি?”

“আসতে পারেন। কিছুই বলা যায় না।" বোসদা বললেন।

নিত্যহরি বললেন, “তা হলে তো বাজনাদারদেরও সাজাতে হয়।”

“হ্যাঁ, তাদেরও জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে।”

“তাদের জামা-কাপড় তো হবেই স্যর, ন্যাটাহারি যতক্ষণ রয়েছে। কিন্তু, আমি তাই বলে গোমেজের বাজনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারবো না। ধাড়ি ধাড়ি পাঁচটা ছোঁড়া স্যর, একবার লাঞ্চের সময় কেঁকু কেঁকু করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো, আবার রাত্রে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কেঁকু কেঁকু করলে। অন্য সময়ে ভোঁসভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোবে। যন্তর হচ্ছে নিজের সন্তানের মতো। তার জামা-কাপড় তার মায়েরা দেখবে, আমাকে দেখতে হবে কেন?”

মার্কোপোলো, কেন জানি না, নিত্যহরিকে একটু প্রশ্রয় দেন। মুখ ফিরিয়ে একটু মৃদু’ হেসে বললেন, "মিস্টার বোস সব ব্যবস্থা করবেন। তুমি এখন যাও।" তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, “আমাকে একটু বেরোতে হবে। বায়রন একটা স্লিপ পাঠিয়েছে। হয়তো সুশানের কোনো খবর করতে পেরেছে। বোসকে বোলো, ব্যাংকোয়েটের সব ব্যবস্থা যেন ঠিক করে রাখে।”

হোটেলে সারাদিন উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেলো। কারুর এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। বোসদা আজ রিসেপশনে উইলিয়মকে বসিয়ে রেখে, ব্যাংকোয়েটের কাজে আমাকে নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। ওয়েটাররা প্যান্ট্রিতে বসে ফর্সা কাপড় দিয়ে ছুরি, কাঁটা, চামচ মুছে চকচকে করছে। পরবাসীয়া তাদের বলছে, “প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুনে তুলবো। হারালেই মাইনে থেকে দাম যাবে।"

আর এমনি উদ্বেগের মধ্যে আমাদের শাজাহান হোটেল ক্রমশ সেই মোহনায় হাজির হলো, দিনের নদী যেখানে রাত্রের পারাবারে এসে মেশে। সত্যসুন্দরদা ততক্ষণে ঘর সাজিয়ে ফেলেছেন। ন্যাটাহারিবাবু র কাপড়ে তৈরি সাড়ে তিনশ বুনো শূয়োরের মাথা তখন ব্যাংকোয়েট হল-এ অপেক্ষা করছে।

মানবপ্রেম সমিতি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। আজ যাঁদের নৈশ ভোজসভা, তাঁরা সম্প্রতি কলকাতায় এই আন্তর্জাতিক সমিতির একটি শাখা গড়ে তুলেছেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য মিস্টার আগরওয়ালা, মিস্টার ল্যাংফোর্ড এবং খানবাহাদর হক্, কাউন্টারের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মিস্টার আগরওয়ালা পরেছেন জাতীয় পোশাক, গলাবন্ধ কোট ও চুস্ত্। মিস্টার ল্যাংফোর্ড সান্ধ্য ইউরোপীয় পরিচ্ছদ। আর খানবাহাদু’র তাঁর মোগলাই ট্রাডিশনকে অবজ্ঞা করেননি। মানবসেবার জন্য এদের সকলেরই দু’শ্চিন্তার অবধি নেই। এদের সকলেরই অনেক কাজ আছে; অনেক সমস্যা আছে; সুখ উপভোগ করবার অনেক জায়গা আছে। কিন্তু সে-সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যে সন্ধ্যে থেকে হোটেলে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তার একমাত্র কারণ সমাজের জন্য, দেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থের জন্য তাঁরা ত্যাগ করতে চান।

“একটু খাতির কোরো”, আগরওয়ালাকে দেখিয়ে বোসদা ফিসফিস করে বালেন। ত্রিমূর্তির মধ্যে মধ্যবয়সী আগরওয়ালাকে খাতির করতে যাবো কেন, প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই বোসদা বললেন, ‘দু’ নম্বর সুইটটা ওঁরাই সব সময়ের জন্যে ভাড়া করে রেখেছেন। ওঁদের কোম্পানিরই অতিথিশালা। করবীকে চেনো তো? ওঁদেরই হোল-টাইম হোস্টেস। মাইনে ছাড়াও করবী বোনাস পায়।”

এতোদিন খবরের কাগজে স্বদেশী সংগ্রাম, বিদেশী শোষণ, হিন্দু-মুসল-মানের পার্থক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যা পড়েছি দেখলাম তার সবই মিথ্যে। মিস্টার আগরওয়ালা অতিথিদের লিস্ট হাতে ল্যাংফোর্ডের কানে কানে কী বললেন । ল্যাংফোর্ড খিলখিল করে হাসতে হাসতে আগরওয়ালার ঘাড়ে গড়িয়ে পড়লেন। সেই হাসির ঢেউ খানবাহাদু'রের উপর পড়তে দেরি হলো না। তিনটে সভ্যতা মিলে মিশে আমারই চোখের সামনে একাকার হয়ে গেলো।

এবার অতিথিরা আসতে আরম্ভ করেছেন। মার্কোপোলো বাইরে থেকে ফিরে এসে একটা ধোপভাঙা সার্ক স্কিনের সুট পরে হল-এর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হলো। কিন্তু এতো লোকের ভিড়ের মধ্যে কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

আমরাও ধোপভাঙা স্যুট পরেছি। বোসদা একসময় আমার প্রজাপতি টাইটা একটু টেনে সোজা করে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, “স্টাইলের মাথায় চলতে হবে। হাঁদাগঙ্গারাম হলেই বিপদ।”

কলকাতার কলকাতাত্ব যাঁদের নিয়ে, তাঁদের সবাইকেই বোসদা বোধহয় চেনেন। একজনকে দেখিয়ে বললেন, "উনি মিস্টার চোখানিয়া, কটন কিং। চোখানিয়া একলাই এসেছেন, মিসেসকে উনি কখনও আনেন না।" মানবপ্রেম সমিতির তিনজন সদস্যই চোখানিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

চোখানিয়া এবার আগরওয়ালার পিঠে একটা মৃদু' থাপ্পড় দিয়ে হল-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মানুষের সেবার মহৎ উদ্দেশ্যে চোখানিয়া তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে দ্বিধা করেননি। তিনি শাজাহান হোটেলে ছুটে এসেছেন।

বোসদা বললেন, “আমি মুখস্থ বলে দিতে পারি, কে কে আসবেন। কলকাতায় যত পার্টি হয়, তাতে সব ক'টা লোকই এক। কারণ সবাই এক লিস্ট দেখে ছাপানো কার্ড পাঠায়। একই লোকের কাছে রোজ নেমতন্ন যায়। রোজই তিনি জামা-কাপড় পরে সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন হোটেলে যান, না হয় বিভিন্ন ক্লাবে, না হয় আলিপুর কিংবা বর্ধমান রোডের বাড়িতে।”

বোসদা ফিসফিস করে বললেন, “কলকাতাকে এবং মানবপ্রেমিক নাগরিকদের নিজের চোখে দেখে নাও। কারণ কাল যখন খবরের কাগজে এই অধিবেশনের রিপোর্ট পড়বে, তখন আসল জিনিসের কিছুই থাকবে না। সেখানে শূধু, বক্তৃতার রিপোর্ট থাকবে। কে কি বলবেন, তার সামারি কাগজের অফিসে চলে গিয়েছে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছে!”

রোগামতো এক ভদ্রমহিলা এবার ক্যামেরা হাতে একা ঢুকলেন। বোসদা বললেন, “শম্পা সান্যাল, শীর্ণ ফরাসী সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! আগে ছিলেন ঘোষ, তারপর বোধহয় ভ্যালেংকার না কোন এক মারাঠিকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর বোধহয় সাহা, তারপর মিত্তির! এবার আবার পুরনো কুমারী নামে ফিরে এসেছেন। মিস শম্পা সান্যাল। সোসাইটি রিপোর্টার।"

“সেটা কি জিনিস?” আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম ।

“সোসাইটি জার্নাল বেরোয় না? কে কোথায় পার্টি দিচ্ছেন, কে কোথায় সমাজসেবা করছেন, কী করে পশম বুনে বাচ্চাদের জামা করতে হয়, ঘর সাজাতে হয়, রাঁধতে হয়, এইসব যেখানে লেখা থাকে। ওঁর কাগজের হাজার হাজার বিক্রি। কলকাতার সব পার্টিতে ওঁকে পাবে। ইন ফ্যাক্ট, এঁকে না হলে পার্টিই হয় না। কারণ পার্টি দিলে, অথচ সোসাইটি জার্নালে রিপোর্ট বেরলো না, তাহলে সব বৃথা।”

শম্পা সান্যাল হাতের ক্যামেরাটা দোলাতে দোলাতে কাউন্টারে এলেন। বোসদা মাথা দু’লিয়ে বললেন, “গুড, ইভনিং।”

শম্পা বললেন, “এবার আপনারই একটা ফটো ছাপিয়ে দেবো। কলকাতায় যত সুন্দর পার্টি হয়, তার অর্ধেক শাজাহানেই হয়।”

বোসদা বললেন, “অসংখ্য ধন্যবাদ।”

শম্পা বললেন, “আমার মোটেই ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন? ইচ্ছে করছে কোনো ঘরে বসে বসে আপনার সঙ্গে একলা গল্প করি।”

বোসদার মুখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কিছু না বলে তিনি চুপ করে রইলেন। নিস সান্যাল বললেন, “আপনার ঘর কোথায়? কোন তলায়?”

বোসদা বোধহয় ভদ্রমহিলার প্রশ্নে বিপদের ইঙ্গিত পেলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বেমালুম বললেন, “ছাদের উপর। আমরা তিনজনে একটা ঘরে থাকি। আমি, শংকর, আর একজন। সে বেচারা আবার আমাশায় শয্যাশায়ী হয়ে সর্বদা ঘরেই রয়েছে।”

মিস সান্যাল একটু শ্রাগ করলেন, "পুওর বয়! একটা আলাদা ঘরও দেয় না।"

"সবই ভাগ্য, শম্পা দেবী। প্রাইভেসী বলে কোনো বস্তু ভগবান আমাদের মতো হোটেল কর্মচারীদের কপালে লেখেননি।" বোসদা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, “আর কোনো পার্টি ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ, দু'টো ককটেল সেরে আসছি। মিষ্টি ফাংশন। আরও মিষ্টি লাগতো যদি আপনার মতো কোনো হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান আমার পাশে থাকতো। সত্যি বলছি, বিলিভ মি।”

উইলিয়ম ঘোষের দিকে বোসদা কি ইঙ্গিত করলেন। উইলিয়ম বললেন, "মিস সানিয়েল, চলুন আমরা হল-এ যাই।”

উইলিয়মের হাতে ক্যামেরাটা দিয়ে সোসাইটি রিপোর্টার মিস সান্যাল সামনে এগিয়ে চললেন।

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, “ক্রিমিনাল। বাঙালী মেয়েদের কেন যে ওরা হুইস্কি খেতে অ্যালাউ করে। ভদ্রমহিলার আজ মাথার ঠিক নেই।”

আজকের পার্টিতে আছেন ব্যারিস্টার সেন, রেডিওথেরাপিস্ট মিত্র, গাইনোকলজিস্ট চ্যাটার্জী, ক্রীড়া-রাজনীতিক বসু, রাজনৈতিক ক্রীড়াবিদ পাল। আর আছেন রাজারা—পাটের রাজা, তেলের রাজা, ঘিয়ের রাজা। লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, কাপড়ের রাজরাজড়ারাও বাদ যাননি। অতীতের স্পেসিমেন হিসেবে বিলীয়মান জমিদারদের দু'একজন প্রতিনিধিও আছেন।

এবার যে ভদ্রলোক শাজাহান হোটেলে ঢুকলেন তাঁকে দেখেই বোসদা ফিসফিস করে বললেন, “চিনে রাখো। লক্ষ্মীর বরপুত্র, শিল্পজগতে আমাদের আশা-ভরসা মাধব

পাকড়াশী। গরীবের ছেলে শ্রীমাধব অতি সামান্য অবস্থা থেকে সাফল্যের পর্বত-শিখরে উঠেছেন।"

ভদ্রলোক একেবারে সোজা আমাদের কাউন্টারে হাজির হলেন। তাঁর পাশের ভদ্রমহিলাকে দেখেই আমি চমকে উঠলাম, মিসেস পাকড়াশী। মোটাপাড় শান্তিপুরী সাদা খোলের শাড়ি পরেছেন। সিথিতে জলজল করছে সিদু'র। মাধব পাকড়াশী ইভনিং স্যুট পরেছেন। তাঁকে দেখেই বোসদা বললেন, "নমস্কার স্যর।" পাকড়াশী তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্যে বিখ্যাত। মিষ্টি করে বললেন, "আমি ভাল। ওঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই নানারকম অসুখে ভুগছেন।"

লজ্জাবতী গৃহবধূর মতো মিসেস পাকড়াশী মাথা নাড়লেন। "তোমার যেমন কথা। সারাদিন খেটে খেটে তুমিই শরীরটাকে নষ্ট করছো।" মাধব পাকড়াশী হেসে বললেন, "গত তিন সপ্তাহে একটা দিন যায়নি যেদিন ডিনারের নেমন্তন্ন নেই। তাছাড়া বারোটা ককটেল, চোদ্দটা লাঞ্চ। তাও গোটা পনেরো রিফিউজ করেছি। কিন্তু সব সময় রিফিউজ করাও মুশকিল।"

বোসদা মাথা নেড়ে বললেন, "আপনারা হলেন স্যর ক্যালকাটা সোসাইটির ফাদার-মাদার। লোকে তো আপনাদের আশা করবেই।"

"মুশকিল তো আমার স্ত্রীকে নিয়ে। পুজোআচ্চা নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকবেন। বাইরে বেরোতে চাইবেন না। অথচ এভরিহয়ার, এমনকি বোম্বাইতেও স্ত্রীরা স্বামীর পাবলিক রিলেশন্স অফিসারের কাজ করেন। আমাকে প্রত্যেক ফাংশনে উনি কেন এলেন না এক্সপ্লেন করতে হয়। আমার খোকার সঙ্গে কোনো শাই গার্ল অর্থাৎ কিনা লাজুক মেয়ের বিয়ে দেবো না।" "

মিসেস পাকড়াশী তখন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। "চলো, সভার কাজ বোধহয় আরম্ভ হয়ে যাবে।"

মাধব পাকড়াশী বললেন, "আঃ আমাকে একটু অর্ডিনারি লোকদের সঙ্গে থাকতে দাও। একটু ফ্রেশ অক্সিজেন মনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে দাও। ওখানে আবার আগরওয়ালা রয়েছে, এখনই মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার এলটমেন্ট সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করবে।"

"তা হলে আমি একটু এগিয়ে যাই। একে তো ইন্ডাস্ট্রি তোমাকে নাকউচু লোক বলে ভাবতে শুরু করেছে।"

"যাও, প্লিজ। এই তো প্রকৃত পি আর ও'র কাজ।" মাধব পাকড়াশী স্ত্রীকে উৎসাহ দিলেন।

মিসেস পাকড়াশী বোসদার দিকে একবার তাকিয়ে হল-এর দিকে চলে গেলেন। সেই চকিত দৃষ্টির মধ্যে বোসদা নিশ্চয়ই তাঁর ইঙ্গিত খ'জে পেলেন। আমারও মনে হলো, এই কদিনে আমিও অনেক চালাক হয়ে উঠেছি। অনেক চকিত চাহনির গোপন সংকেতও আমার কাছে সহজেই বোধগম্য হয়ে উঠছে। স্ত্রীর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে মাধব পাকড়াশী বললেন, "আমার স্ত্রী না হলে, এই সাম্রাজ্য আমি গড়ে তুলতে পারতাম না। রিয়েলী ওয়ান্ডারফুল ওয়াইফ।"

পাকড়াশী কেবল ফ্রেশ অক্সিজেনের আশায় কাউন্টারে এসে দাঁড়াননি। আরও দরকার ছিল। এবার সেই প্রসঙ্গে এলেন। "হ্যাঁ যা বলছিলাম, জার্মানী থেকে দু'জন ভদ্রলোক বোধহয় সামনের সপ্তাহে কলকাতায় আসবেন। ওঁদের জন্য দু'টো সুইট চাই। বেস্ট রুম। ক্লাবে রাখতে পারতাম, কিন্তু ওখানে বড্ড জানাজানি হয়ে যায়। ওরা যে কারণে আসছেন, সেটা আমি এখন কাউকে জানতে দিতে চাই না।"

বোসদা আমাকে বললেন, "রেজিস্টার খোলো।"

রেজিস্টার খুললাম। সুইট নেই। সব অ্যাডভান্স বুকিং হয়ে রয়েছে। বললাম, "মুশকিল হয়ে গিয়েছে। ফরেন কালচারাল মিশন আসছে, তারা দু' মাস আগে থেকে সুইটগুলো নিয়ে নিয়েছে।"

"তাহলে উপায়?" মিস্টার পাকড়াশী জিজ্ঞাসা করলেন।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে?" মিস্টার আগরওয়ালা হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

"দু'টো সুইট চাইছিলাম। কিন্তু ক্যালকাটার হোটেলগুলোর এমন অবস্থা যে মাসখানেকের নোটিশ না দিলে একটা খাটিয়াও পাওয়া যায় না।" পাকড়াশী বললেন।

"হামি থাকতে আপনি সুইট পাবেন না, সে হোয় না।" মিস্টার আগরওয়ালা বললেন। "আমাদের পার্মানেন্ট গেস্ট হাউস রয়েছে—বাই ইস্পেশাল আরেঞ্জমেন্ট উইথ শাজাহান।

আমাদের হোস্টেসকে ডাকছি।"

বোসদা আমাকে বললেন, “তাড়াতাড়ি করবী দেবীকে দু''নম্বর সুইট থেকে ডেকে নিয়ে এসো।” আমি সেদিকেই ছুটলাম।

করবী গুহ তখন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বোধহয় প্রসাধন করছিলেন। যখন দরজা খুললেন, তখনও শ্রীমতী গুহর প্রসাধন শেষ হয়নি। খোঁপাতে একটা বেলফুলের মালা জড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই কাজলকালো চোখ দু'টি বিকশিত করে তিনি মৃদু' হাসলেন।

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের বয়স নির্ধারণ করবার যে বিরল শক্তি ভগবান কাউকে কাউকে দিয়ে থাকেন, আমি তার থেকে বঞ্চিত। সাহিত্যের প্রয়োজনে, ‘কম' অথবা 'বেশী' এই দু'টি শব্দ দিয়েই আমি কাজ চালিয়ে নিই। এইটুকুও বলতে না হলে আমি খুশী হতাম। পুরুষ চরিত্রের বয়স নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে যুগ যুগান্তর ধরে এটি একটি প্রয়োজনীয় তথ্য বলে সম্মানিত হয়ে এসেছে। করবী দেবীর বয়স বেশী নয়। এবং তাঁর যুবতী শরীর যে বয়সকে গ্রাহ্য করে না, একথা জোর করে বলতে পারি। করবী দেবীর দেহের কোথাও কোথাও যেন ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ আঁকা। আয়ত চোখ, সুতীক্ষ নাক, মসৃণ গণ্ড। একটু হয়তো কমনীয়তার অভাব! করবী দেবীর গ্রীবাটি সুন্দর। আর সমান্তরাল কাঁধ। বক্ষদেশ ঈষৎ স্থূল, কোমরটা তীক্ষ্ণ শাসনে ক্ষীণ রেখেছেন।

মৃদু হেসে করবী দেবী বললেন, "আপনি না বোসের অ্যাসিস্ট্যান্ট

বললাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে একবার তিনি ডাকছেন।”

'মিস্টার বোস ডাকছেন?” ভদ্রমহিলা যেন একটু বিরক্ত হলেন। বললাম “মিস্টার আগরওয়ালা এবং মিস্টার পাকড়াশীও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন”

"ও, তাই বলুন।” করবী দেবী এবার যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শরীরের গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। ঝকঝকে নতুন গাড়ির স্টার্ট নেওয়ার মধ্যে যেমন একটা প্রচেষ্টাহীন ছন্দ আছে, করবী দেবীর চেয়ার থেকে উঠে পড়ার মধ্যেও তেমন একটা চটুল ছন্দ ছিল।

কাউন্টারে এসে দেখলাম উইলিয়ম একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললে, “বোধহয় সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এঁরা সবাই ওদিকে চলে গিয়েছেন।" আমরা দু'জনও হন্তদন্ত হয়ে

সেদিকে ছুটলাম। করবী দেবী বললেন, মিস্টার আগরওয়ালা নিজে ডাকলেন? বেলা তিনটের সময় তো ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, তখন কিছুই তো বললেন না।"

মাধব পাকড়াশী, মিসেস পাকড়াশী এবং মিস্টার আগরওয়ালা তখন
ব্যাংকোয়েট হল-এর একটা টেবিল দখল করে বসেছেন। বোসদা ঘরের কোণ থেকে মাইকটা টেনে এনে সভাপতির মুখের সামনে হাজির করলেন। মাননীয় সভাপতি শুধু মানব সেবার মহান উদ্দেশ্যে এরোপ্লেনযোগে কলকাতায় হাজির হয়েছেন। ন্যাশনাল ড্রেসে সজ্জিত সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন।" মাথার টুপিটা তিনি এবার ঠিক করে নিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে করবী দেবী ফিক্ করে হেসে ফেললেন। নিজের মনেই বললেন, "ও-হরি! ইনি! তাই বলি, দু'পরে ওকে এতো খাতির কেন?"

করবী দেবীর কথা শোনবার আগেই সভাপতির বক্তৃতা আরম্ভ হয়ে গেলো। "কলকাতার বরেণ্য নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের অমূল্য সময় ব্যয় করে এই সন্ধ্যায় এখানে সমবেত হবার যে কষ্ট আপনারা স্বীকার করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'ভারতবর্ষে আমরা এতোদিন কেবল জাতির কথাই চিন্তা করে এসেছি। কিন্তু এখন বৃহত্তর পরিধিতে মানুষের কথা ভাববার সময় এসেছে। বিশেষ করে এই ক্যালকাটারই একজন সন্তান যখন বলে গিয়েছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

সভাপতির বক্তৃতা একটা আলাদা টেবিলে বসে সাংবাদিকরা লিখে নিচ্ছিলেন। তাঁরা হঠাৎ পেন্সিল থামিয়ে নিজেদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। সভাপতির পাশে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নগেন পাল বসে ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতির কানে কানে কী যেন বললেন। সভাপতি একটু থেমে বললেন, "ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম ভরসা মাননীয় নগেন পাল আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, কবি চণ্ডীদাসের সঙ্গে ক্যালকাটার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমি বলি, মিস্টার দাস তো এই বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কলকাতাকে বাদ দিয়ে কে বেঙলের কথা চিন্তা করতে পারে?"

এবার মৃদু' হাততালি পড়লো। এবং সভাপতি ঘোষণা করলেন, "বিশ্বের প্রধান সমস্যা হলো খাবার সমস্যা। বিশেষ করে অন্ন। পৃথিবীতে যে চাল উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে প্রতিটি মানুষকে পেট ভরে খেতে দেওয়া সম্ভব নয়।" এবার সভাপতি একটি কাগজের টুকরো থেকে জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন স্ট্যাটিসটিকস মাইকের মধ্য দিয়ে সমাগত অতিথিদের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। করবী দেবী তখনও দরজার গোড়ায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে বললেন, "বেশ বিপদে ফেললেন। এমনভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি বলুন তো?"

আমি বললাম, "বক্তৃতা শেষ হলেই মিস্টার আগরওয়ালার কাছে চলে যেতে পারবেন।" করবী দেবী মুখ ভেঙচিয়ে বললেন, "এ বক্তৃতা কি আর এখন শেষ হবে!"

আমি বললাম, "এটা তো আর মনুমেন্টের তলা নয়। হোটেলের ব্যাংকোয়েট হল, বক্তৃতা এখনই শেষ হয়ে যাবে।"

সভাপতি বললেন, স্বল্প সম্পদ সবার প্রয়োজনমতো বিতরণ করার মধ্যেই রয়েছে মানব-সভ্যতার সাফল্যের চাবিকাঠি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোকদের এবং আমাদের নিজের দেশের ভাইবোনদের—যে দেশে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী জন্মেছেন—আত্মত্যাগ করতে হবে। মানবসেবা সমিতির কোনো ভোজসভায় আমরা চাল ব্যবহার করবো না। তাছাড়া আরও কুড়িজন সদস্য আগামী কয়েক বছর বাড়িতেও চাল খাবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মিস্টার এ আগরওয়ালা, মিস্টার .." সভাপতি নাম পড়ে যেতে লাগলেন। করবী দেবী আবার ফিক্ করে হেসে ফেললেন, "দু'র মশাই, আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন? এখানে সবারই কি ডায়াবিটিস?"

"মানে?" আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম।

"আগরওয়ালা ভাত খাবেন কী?ওর তো ডায়াবিটিস। আমার ঘরেও তো সিরিঞ্জ আর ইনসুলিন ইঞ্জেকশন আছে। যেদিন এখানে রাত্রের জন্য একটু বিশ্রাম করতে আসেন, সেদিন নিজেই একমাত্রা নিয়ে নেন।"

মেনু কার্ড গুলো প্রত্যেকটা টেবিলেই দু''একখানা করে দেওয়া আছে। সবাই একমনে সেটা দেখছিলেন। একজন বেশ টাইট গুণ্ডাধরনের বে'টে ও মোটা ভদ্রলোক টেবিলে জনাতিনেক বন্ধু নিয়ে বসেছিলেন। ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। আমি মাপা স্টেপে ওঁর সামনে এসে মাথা নিচু করে অভিবাদন করলাম। ডান হাতের মেমোবই ও মেনুকার্ডটা বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে, ফিসফিস করে বললাম, "ইয়েস স্যর।"

ভদ্রলোক বললেন, "এ কি নিরামিষ ডিনার নাকি?"

বললাম, "না, স্যর। আমিষ আইটেমও অনেক রয়েছে।"

"আঃ, তা বলছি না", ভদ্রলোক বিরক্ত কণ্ঠে বললেন। "বলছি, দেশে না-হয় চালের অভাব রয়েছে। তাতে না-হয় ধেনোটা খাওয়া উচিত হবে না। কিন্তু অন্য মালের ব্যবস্থা হয়েছে কী?"

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। বোসদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মূহুর্তের মধ্যে কোথা থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে স্যরিয়ে দিয়ে বললেন, "এক্সকিউজ মি স্যর, আমি মিস্টার ল্যাংফোর্ড— অথবা মিস্টার আগরওয়ালাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটা ঠ্যাং অন্য পায়ের উপর তুলতে তুলতে ভদ্রলোক বললেন, "ল্যাংফোর্ডে 'আর কাম নেই, ওই আগরওয়ালাকেই পাঠিয়ে দিন।"

এক কোণ দিয়ে মিস্টার আগরওয়ালার দিকে যেতে যেতে বোসদা বললেন, "ডেন্জারাস লোক, ফোকলা চ্যাটার্জি। আসল নাম আর. এন. চ্যাটার্জি, নাম করা বক্সার ছিল। তখন ঘুষি মেরে কে ওঁর সামনের দু'টো দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। পাঁড়মাতাল। চোখগুলো সবসময় লাল জবা ফুলের মতো হয়ে আছে। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলগুলো বুরুশের মতো খাড়া হয়ে থাকে।"

কলকাতার সব পার্টি আর ককটেলে ওঁর নেমন্তন্ন হয়। অন্তত চ্যাটার্জি নাকি খুব লাকি বয়। উনি এলে পার্টি জমতে বাধ্য। অন্তত অনেকের তাই বিশ্বাস। শুধু সিনেমার পার্টিতে এখন আর কেউ ওকে ডাকে না। অভিনেত্রী শ্রীলেখা দেবীর শাড়িতে সেবার এইখানেই উনি বমি করে দিয়েছিলেন।

শ্রীলেখা দেবী সেই থেকে বলেছেন, ফোকলা চ্যাটার্জি যে পার্টিতে আসবে সেখানে তিনি আর যাবেন না।

বোসদাকে আসতে দেখেই আগরওয়ালা উঠে পড়েছিলেন। ফিসফিস করে বোসদা বললেন, “মিঃ চ্যাটার্জি ডাকছেন।”

“ও মাই লর্ড!” বলে আগরওয়ালা ফোকলার টেবিলের দিকে চললেন। ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, “আগরওয়ালা, এ কেমন ধরনের রসিকতা? মানবসেবা করা হবে; অথচ এতোগুলো কেষ্টর জীবকে কষ্ট দিচ্ছ। মেনুতে কোনো মালের নাম নেই।”

সভাপতি তখন বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। আগরওয়ালা বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছেন। ফোকলা চ্যাটার্জি' আগরওয়ালার হাত চেপে ধরে বললেন, “পালাচ্ছ কোথায়? এখনি আমি সীন ক্রিয়েট করতে পারি জানো? আমি সভাপতি-টতি কাউকে কেয়ার করি না। কথায় বলে, ফোকলার নেই ডেন্টিস্টের ভয়।”

আগরওয়ালা বললেন, "মাই ডিয়ার ফেলো, আমাদেরও ককটেল দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সভাপতি রাজী নন। উনি সোজা বলে দিয়েছেন, এলকহলিক বীভারেজ সার্ভ করা হলে উনি বক্তৃতা করতে পারবেন না।”

অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ফোকলা বললেন, “ব্যাটাচ্ছেলে কী ভাটপাড়ার বিধবা পিসিমা! ওঁর অমন গুড়ের নাগরির মতো চেহারা মাল না-টেনেই হয়েছে বলতে চাও?”

আগরওয়ালা ফোকলাকে সামলাবার জন্য বললেন, “পাবলিকলি ওঁদের পক্ষে ড্রিঙ্ক করা . . .!”

ফোকলা এবার উঠে পড়ে বললেন, “তাই বলো। বেশ, প্রাইভেটলিই আমি ড্রিঙ্ক করবো। আমি মমতাজ-এ চলে যাচ্ছি।”

বোসদা বললেন, “বার দশটা পর্যন্ত খোলা আছে। ওখানে সবরকম ড্রিঙ্কস পাওয়া যাবে।"

“গোটাপঞ্চাশেক টাকা এখন ছাড়ো দেখি। মানিব্যাগ আনতে ভুলে গিয়েছি। আর না-হয় বলে দাও, আমার মালের টাকাটা তোমাদের এই বিলের সঙ্গে যেন ধরে নেয়।"

আগরওয়ালা বললেন, “বেশ তাই হবে।” ফোকলা চ্যাটার্জি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বার-এর দিকে চললেন। যেতে যেতে বললেন, “শ্লা, দু’-দু’টো কক্ টেল-এ নেমতন্ন ছিল। নিরিমিষ জানলে কোন ব্যাটাচ্ছেলে এই হরিসভার কেত্তন শুনতে আসতো।”

বোসদা আমাকে বললেন, “বার-এ বলে দিয়ে এসো, ওঁর কাছে যেন টাকা না চায়।”

ফোকলা চ্যাটার্জিকে বার-এ বসিয়ে আবার যখন ফিরে এলাম, তখন সভাপতি পৃথিবীর সব মানুষকে ভালবেসে, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ যে মহান আদর্শ স্থাপন করলেন, তার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছেন। প্রেম, প্রীতি ও ত্যাগ তিতিক্ষার এই পথেই যে দেশের মানুষেরা সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাবেন সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ রইলো না।

এবার ডিনার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আইনত সাপারও বলা যেতে পারে। চালের কোনো সংস্রব না থাকায়, আড়াই টাকা করে চার্জ বেশী নেওয়া হয়েছে। সাড়ে তিনশ লোকের মধ্যে তিরিশটা বেয়ারা এবং আমাদের পাঁচজন ছোকরা ঘুরে ঘুরে হিমসিম খেয়ে যাবার অবস্থা।

সভাপতি তার মধ্যেই চিৎকার করে আমাকে বলেছিলেন, “কী হে ছোকরা, এতোগুলো লোক তোমরা, অথচ এই ক'টা গেস্টকে তাড়াতাড়ি সার্ভ করতে পারছো না?”

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সভাপতি বললেন, “ইন-ইণ্ডিয়া চার পাঁচটা ছোকরা চার পাঁচশ লোককে খাইয়ে দেয়।”

মুরগীর উপর অস্ত্রোপচার করতে করতে মাধব পাকড়াশী গম্ভীরভাবে বললেন, “এর নাম ইংলিশ সার্ভিস ।"

"তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, অনেক বিষয়ে ওয়েস্ট ক্রমশঃ আমাদের পিছনে পড়ে থাকছে।”

নগেন পাল বললেন, “আপনি স্যর একটা বই লিখুন—'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দি ওয়েস্ট'।"

"লিখলেই হয়। জওহরলালের 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' যারা পাবলিশ করেছে তারা বহুবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে।"

সভাপতির ছবি আমি অনেকবার কাগজে দেখেছি। ওঁর বক্তৃতা শ্রদ্ধার সঙ্গে বহুবার পড়েছি। তাই ও'র বকুনিকে আমার বকুনি বলেই মনে হলো না। সভাপতি প্রথমে বলেছিলেন তিনি ভেজিটারিয়ান কিন্তু ডিম খাচ্ছেন। হঠাৎ মুরগীর ঘ্রাণে বোধহয় তাঁর মত পরিবর্তন হলো। পাকড়াশীকে প্রশ্ন করলেন, "মাংসটা নরম?"

"বেশ নরম। ক্যালকাটার মাংসের তুলনা নেই। এতো জায়গায় তো যাই, কিন্তু এতো 'নরম, এতো সুস্বাদ, কোথাও নেই!" পাকড়াশী মৃদ্দ, হেসে বললেন।

সভাপতি বললেন, "ওহে ছোকরা, যাও তো, একটু চিকেন নিয়ে এসো তো আমার জন্যে।" একটা ট্রে নিয়ে ওঁর সামনে ধরলাম। কোনোরকম কথাবার্তা না বলে সমস্ত ট্রেটা নিজের প্লেটে ঢেলে নিলেন তিনি। কাঁটা চামচ ফেলে দিয়ে সভাপতি ভারতীয় প্রথায় ডান হাত দিয়ে ধরে মাংসের হাড় মড় মড় করে চিবোতে লাগলেন। সেই হাড়ভাঙা শব্দে, তাঁর পাশের বিদেশী কনসালদের কয়েকজন চমকে উঠে ঘাড় ফেরালেন। নাকের সিকনিটা বাঁ হাতের রুমালে মুছতে মুছতে তিনি বললেন, "গতবারে ফরেন টুরে গিয়ে আমি এইটে আরম্ভ করি। ওদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিলাম। বম্বের ওই আধামেমসায়েব রাইটার মিস্ পোস্তদধলো আমার পাশে বসে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি খাঁটি ভারতীয়, আমি কেন শুনতে যাবো? আমি চেটে পুটে ঝোল পর্যন্ত খেয়েছিলাম"

"ওদিকে তখন আইসক্রিম দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। একসঙ্গে দু'টো আইসক্রিম টেবিলের উপর তুলে নিয়ে, সভাপতি বললেন, "এগুলো হজমিকারক। এসব পরে খাচ্ছি। তুমি ছোকরা চটপট আর একটু চিকেন নিয়ে এসো দেখি। ঠ্যাং আনবার চেষ্টা করবে, হাড় যেন কম থাকে।"

পিছন ফিরে চিকেনের খোঁজে যেতে যেতে শুনলাম, জাতীয়তাবাদী সভাপতি নগেন পালকে বলছেন, "এটা বিদেশী কনসার্ন। এখানে কোনো মায়াদয়া করবেন না। ব্যাটারা গলায় গামছা দিয়ে দাম নেবে, লাভ করবে। লাভ বিদেশে পাঠাবে, আমাদের ফরেন

একচেঞ্জ চলে যাবে। যতোটা পারি উসুল করে নিই। কোনো ভয় নেই, আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে। জোয়ানের আরক পাবেন, সোডামিণ্ট ট্যাবলেট পাবেন, কিচ্ছু ভয় নেই।"

চিকেনের আর একটা প্লেট যখন ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম, তখন তিনি করুণ সুরে বললেন, "চাট্টি ভাত না-হলে এসব জিনিস জমে না। কিন্তু কী করা যাবে, ইণ্ডিয়ার জুনো, ওয়ার্লডের জন্যে এটুকু, স্যাক্রিফাইস আমাদের করতেই হবে।"

একটা ঢেকুর তুলে আগরওয়ালা বললেন, "তোবে যাই বলন স্যর, আপনার স্পীচটা বহুত বড়িয়া হয়েছে।"

সভাপতি তখন সশব্দে আরও বিকট একটা ঢেকুর তুলে বললেন, "তা বটে। কিন্তু তার থেকে ঢের ভাল হয়েছে আজকের ডিনারের মেনু! বেটারা গলায় গামছা দিয়ে দাম নেয় বটে, কিন্তু জিনিস ভাল দেয়। ফরেন ফার্মগুলো ইণ্ডিয়াতে এইজন্যেই এতো এগিয়ে যাচ্ছে।"

করবী দেবী ইতিমধ্যে কাজ শেষ করে ফেলেছেন। মাধব পাকড়াশীর অতিথিদের জন্য আগরওয়ালার অতিথি সদনে পাকা ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উনি ফিরে যেতে পারেননি। আগরওয়ালার অনুরোধে ডিনারে বসে গিয়েছিলেন। করবী দেবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো। গোমেজের দল তখন বাজনা শুরু করে দিয়েছে। এই বাজনার একটা সুবিধে, একটা টেবিলের কথা আর-একটা টেবিলে পৌঁছয় না। সবাই প্রাইভেসীতে নিরাপদ বোধ করেন। করবী দেবী চেয়ার থেকে উঠে পড়ে হল-এর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসলেন। তারপর আমার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আপনাদের সভাপতির ভড়ং দেখলে বাঁচিনে। সুইটটা ওর থাকবার জন্যে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। আমার ছবি দেখতে চেয়েছিলেন! বললেন, 'ওখানে ওঠা তো ভাল দেখায় না। যেখানে প্রত্যেক বার উঠি, সেখানেই উঠবো। তবে রাত্রে কয়েক ঘণ্টা আপনাদের হোস্টেসের ঘরে বিশ্রাম করে নিতে আপত্তি নেই।" করবী দেবী এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন । এবং আমি কিছু বোঝবার অগেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "যাই। সম্মানিত অতিথিকে স্বাগত জানাবার ব্যবস্থা করিগে যাই!"

সম্মানিত অতিথিকে স্বাগত জানাবার অর্থ কী, সেদিন করবী দেবীর বিষন্ন অথচ কর্তব্যপরায়ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। আমারই, চোখের সামনে ব্যাংকায়েটে নিমন্ত্রিত কলকাতার সম্মানিত অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়েছিলেন। ঘোমটার আড়ালে মিসেস পাকড়াশী স্বামীর সঙ্গে মানবতার আলোচনা করতে করতে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসেছিলেন। মিস্টার আগরওয়ালা এবং তাঁর ইংরেজ সঙ্গীও কালবিলম্ব করেননি। শুধু রয়ে গিয়েছিলেন তিনি, মাননীয় সভাপতি। কর্তব্যে ক্লান্ত শরীরটাকে দু' নম্বর সুইটের শান্ত শীতল আশ্রয়ে একটু পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে থাকাও কিছু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। ক্যালেন্ডারের দিন পরিবর্তনের আগেই তিনি দ্রুতবেগে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রিসেপশন কাউন্টার থেকে তাঁর দ্রুত নিষ্ক্রমণের যে দৃশ্য সেদিন দেখেছিলাম, তা আজও ছবি হয়ে আমার স্মৃতির অ্যালবামে সাজানো রয়েছে। প্রভাতের সংবাদপত্রে তাঁর যে ফটো প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঙ্গে এই ছবির সামান্যতম সাদৃশ্য খুঁজে না পেয়ে আমি মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠেছিলাম। মনের মধ্যে সন্দেহ হয়েছিল, কে জানে, এই এমনি করেই সংবাদের জন্ম হয় কিনা, এই এমনি করেই অনেক স্মরণীয়দের বরণীয় নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় কিনা।

আজাও আমি অবিশ্বাসী নই: আজও আমি মানুষের মহত্ত্বে আস্থাশীল। তবুও কোনো অলস অবসরে যখন সেই রাত্রের কথা স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে, তা নিজের চোখদু'টো ছাড়া আর কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। মনে পড়ে যায়, করবী দেবী সম্মানিত অতিথিকে হোটেলের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। যাবার পথে তিনি একবার আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন- সে দৃষ্টিতে কেতাদু'রস্ত এক হোস্টেসের ছবিই দেখেছিলাম। কিন্তু একে বিদায় দিয়ে, একলা ফিরে আসবার পথে করবী গুহ আর একবার দাড়িয়েছিলেন। কেন যে তিনি আমার দিকে অমন ভাবে তাকিয়েছিলেন, তা আজও

আমি ভেবে পাই না। সেদিন আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় সব কিছু বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু করবী দেবীর কাজলকালো চোখে যেন যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত ক্লান্তি আবিষ্কার করেছিলাম। আমি কিছুই তেমন বুঝিনি, কিন্তু করবী দেবীর অভিমানিনী চোখ দু'টো যেন ভেবেছিল আমি সব বুঝে নিয়েছি; আমার নীরবতাই যেন করবী দেবীর অত্যাচারিত দেহকে প্রকাশ্যে অপমানিত করেছিল।

সন্ধ্যার সেই সদ্যপ্রস্ফূটিত লাবণ্য তাঁর দেহ থেকে কখন বিদায় নিয়েছে। সেই অবস্থায় আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে করবী দেবী প্রশ্ন করেছিলেন, "আর কতক্ষণ?"

আমি যেন তাঁর মধ্যে আমার পরম আপন-জনকে আবিষ্কার করে বলেছিলাম, "অনেকক্ষণ। আজ রাত্রে আমাকে জেগে থাকতে হবে।"

"বেচারা!" অস্ফুট স্বরে করবী দেবী উচ্চারণ করেছিলেন। তারপর যেন টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

সেই রাত্রির কথা মানসপটে ভেসে উঠলে আজও আমি লজ্জিত হই। অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান পাঠক, সেদিনের শাজাহান হোটেলের এক অপরিণতবুদ্ধি কর্মচারীকে ক্ষমা করুন। সেই রাত্রে মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, আমি 'বেচারা' নই। আমি পরম ভাগ্যবান। বিধাতার আশীর্বাদে মানুষের এই সংসারে আমি 'আমি' হয়েই জন্মেছি—করবী গুহ হইনি। আর যা মনে হয়েছিল, তা ভাবতে আজও আমি লজ্জিত হই। কিন্তু লিখতে বসে আজ যে লজ্জার সুযোগ নেই। সেদিন মনে হয়েছিল, বিধাতার সৃষ্টি-পরিকল্পনায় পুরুষকে তিনি অনেক ভাগ্যবান করে সৃষ্টি করেছেন। নারীর স্রষ্টা যে-বিধাতা, তিনি আর যাই হোন, সমদর্শী নন।

এই একই কথা আর একবার আমার মনে হয়েছিল। সেদিন করবী গুহকে শ্রীমতী পাকড়াশী বলেছিলেন, "হে ঈশ্বর, এমন মেয়েমানুষও তুমি সৃষ্টি করেছিলে!"

কিন্তু মাধব পাকড়াশীর ইউরোপীয় অতিথিদের শাজাহান হোটেলের দু'নম্বর সুইটে আতিথ্য গ্রহণ করতে এখনও দেরি রয়েছে। তাঁরা এসে হাজির হোন, তারপর যা হয় হবে।

তাঁরা আসবার আগেই যিনি হোটেলে এসেছিলেন, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তাঁর নাম কনি। কনিকে না দেখলে, শাজাহান হোটেলকেই আমার জানা হতো

না। অন্তত, কনিকে বিয়োগ দিলে আমার শাজাহান হোটেলের অঙ্কে বিশেষ কিছুই থাকে না। আজও যখন কোনও অপরিচিতার সংস্পর্শে আসি, আজও যখন কাউকে বিচার করবার প্রয়োজন হয়, তখন আমি কনিকে মনে করবার চেষ্টা করি। কনিকে আজ আর রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না—সে যেন এক দীর্ঘস্থায়ী রঙীন স্বপ্ন। কিংবা কে জানে, তাকে হয়তো অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল। নগর-সভাতার অন্ধকার জনারণ্যে সে যেন আমার অভিজ্ঞতা ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ বালবের কজ করেছিল— তার মুহূর্তের ঝলকানিতেই সমাজের প্রকৃত রূপকে আমি মনের ফিল্মে ধরে রাখতে পেরেছিলাম।

কনি যে কে, আমি জানতাম না। তার নামও কোনোদিন আমি শুনিনি। মার্কোপোলোই ওর একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে একদিন আমার কাউন্টারে এসেছিলেন। রোজী তখন আমার পাশে বসে নেল-কাটার দিয়ে নখ কাটছিল। কাটতে কাটতে বলছিল, “একটুও ধার নেই।”

আমি বলেছিলাম, “ব্লেড দিয়ে নখ কাটলেই পারো।"

রোজী জিভ কেটে বলেছিল, “কোথাকার ইয়ংম্যান তুমি? একজন ইয়ং লেডি তোমাকে বলছে, তার নেল-কাটারটা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, কোথায় তুমি টুক করে কোনো স্টেশনারি দোকানে গিয়ে একটা নতুন কাটার কিনে এনে তার হাতে দিয়ে দেবে, তা নয়, বলে দিলে ব্লেডে কাটো।”

'মাই ডিয়ার গার্ল, এই ইয়ংম্যান তোমাকে ভাল অ্যাডাইস দিয়েছে। ব্লেড, দিয়ে কাটলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।" মার্কোপোলোর গলার স্বরে আমরা দু’জনেই চমকে উঠলাম, উনি যে কখন ওখানে এসে পড়েছেন বুঝতে পারিনি। মার্কোপোলো মৃদু’ হাসতে হাসতে বললেন, “রোজী, এয়ারওয়েজের চিঠিটা আমি এখনই চাই। ওরা কলকাতা থেকে যে নতুন সার্ভিস ইনট্রোডিউস করবে, তাতে ঘরের সংখ্যা আরও বেশী লাগবে। ডেলি রিজার্ভেশন! চিঠিটা আপিসে রয়েছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো তো।”

রোজী তড়াং করে লাফিয়ে উঠে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে পড়লো। মার্কো তখন হেসে বললেন, “এবার কাজের কথায় আসা যাক। স্ট্রিক্টলি স্পিকিং এটা তোমার কাজ নয়-

রোজীর কাজ। কিন্তু জিমির কাছে শুনেছি, মেয়েদের একদম বরদাস্ত করতে পারে না। শাজাহান হোটেলে অন্য কোনো মেয় আসবে শুনলে ওর গা জ্বলতে আরম্ভ করে।”

মার্কোপোলো আমার হাতে একটি ফটোগ্রাফ দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, “এই সব ছবি ইয়ংম্যানদেরও দেখা উচিত নয়। তবে হোটেলে যখন চাকরি করো তখন আলাদা কথা। আদর্শ হোটেল ওয়ার্কারের জেণ্ডার ম্যাসকুলিনও নয়, ফেমিনিনও নয়। সে হলো নিউটার!”

মার্কোর মুখেই শুনলাম, ছবিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে তিনি নীল-নয়না সুন্দরী। তাঁর মাথার চুল নাকি প্লাটিনামের মতো। মার্কোপোলো বললেন, “কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসো—কনি দি উয়োম্যান ইজ কামিং।”

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে আমাদের সে বিজ্ঞাপন হয়তো আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন।

সত্যসুন্দরদা অনেকগুলো ছবি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বললেন, ডিসপ্লের কাজ শেখো। তোমাকে তো একাই একশ হতে হবে।”

ছবিগুলো সবই কনির। ঢোকবার পথে দু’টো বোর্ডে কায়দা করে ছবিগুলো টাঙিয়ে দিয়েছিলাম—কনি ইজ কামিং।

আামার টাঙানো দেখে বোসদা খুব খুশী হলেন। “বাঃ, চমৎকার হাত। বললেন গতজন্মেও তুমি শাজাহান হোটেলে ক্যাবারে গার্লদের অর্ধ-উলঙ্গ ছবি ডিসপ্লে করতে।"

প্রত্যুত্তরে হেসে বললাম, “আমি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করি না। আসলে ভাল গুরু পেলে ছাত্ররা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে।”

বোসদা বিজ্ঞাপনটা আবার পড়লেন—কনি ইজ কামিং। তারপর বললেন, " কামিং । কিন্তু কোথা থেকে কামিং জানো?"

ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। হেসে বোসদা বললেন, “অনেকে ভাবে এই সব সুন্দরীরা একেবারে নীল আকাশ থেকে শাজাহানের নাচঘরে নেমে আসে। উনি এখন মধ্যপ্রাচ্য জয় করে পারস্যের এক হোটেলে শো দিচ্ছেন। ওখান থেকে সোজা চলে আসবেন আমাদের শাজাহানে।”

বোসদার মন-মেজাজ তখন বেশ ভাল ছিল। ওঁর মুখেই শুনলাম, কনি অনেক টাকা নিচ্ছে। "ক্যাবারে গার্লরা নিয়েই থাকে"—তিনি বললেন.. "কত নিয়ে থাকে, তা শুনলে তোমাদের অনেক হোমরাচোমরা ব্যারিস্টার এবং এফআর-সি-এসধারী সার্জেন মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। তাঁদের সব গর্ব, সব সাধনা, সব বিদ্যা ক্যাবারে সুন্দরীদের নৃত্যরত পদযুগলের ধাক্কায় উল্টে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাবে।"

বাধা দিয়ে বললাম, "তুলনাটা তো ঠিক নাচের হলো না, ফুটবলের মতো শোনাচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছো।" বোসদা বললেন। "নৃত্যপটীয়সীরা তো দামী দামী মাথা নিয়ে ফুটবলই খেলেন।"

বোসদা আমাকে সাবধান করে দিলেন, "অনেক সময় গেস্টরা কাউন্টারে এসে জিজ্ঞাসা করবে, মেয়েরা কত পায়? সব সময় বলবে, 'মাপ করবেন, জানি না।' ক্যাবারের চিঠিপত্তর একেবারে কনফিডেন্সিয়াল।"

ক্যাবারে গার্লদের নেপথ্য সমাচার বোসদার কাছেই শুনেছিলাম। ছ'মাসআট মাস আগে থেকে এনগেজমেন্ট ঠিক হয়ে থাকে। প্যারিসে এমন কোম্পানি আছে যাদের কাজ হলো এইসব প্রোগ্রাম ঠিক করে দেওয়া। আমাদের হোটেল ভাষায়——চেন প্রোগ্রাম; যেমন উত্তরা-পূরবী-উজ্জজ্জ্বলাতে সাধারণত একই ছবি এসে থাকে। ক্যাবারে গার্লরাও সেই ভাবে নেচে বেড়ায়। পৃথিবীর ম্যাপে ওরা যেন কয়েকটা শহরের উপর লাল ফোঁটা দিয়ে দেয়। হয় পশ্চিম দিক দিয়ে, কিংবা পূর্ব দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করে। কোথাও তিন সপ্তাহ, কোথাও দু'' সপ্তাহের প্রোগ্রাম থাকে। এক শহরের প্রোগ্রাম শেষ হবার আগে থেকেই পরের শহরে ছবি চলে যায়। বিজ্ঞাপন ছাপা আরম্ভ হয়। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত দিয়ে তারা দেশে ফিরে আসে।

আজকাল পৃথিবীটা ছোট হয়ে গিয়েছে। একটা বিরাট ভূখণ্ড, যার নাম চীন, ক্যাবারে ম্যাপ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। ওখানেই আগে মাস পাঁচেক লেগে যেতো। এখন ভরসা কেবল মাত্র হংকং। সেখানে আর ক'দিনই বা থাকা যায়? তাছাড়া ফ্রী পোর্ট। সব কিছুতেই প্রচুর স্বাধীনতা। তাই ওখানকার রাত্রের অতিথিরা অনেক বেশী আশা করেন। ফ্রী পোর্টের অতিথিদের সন্তুষ্ট করা, অনেক মেয়ের পক্ষেই বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

ক্যাবারে-বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যটির নাম যৌবন। ওই তরল পদার্থটির জোয়ার-ভাঁটা অনুযায়ী নর্তকীদের দাম ওঠা-নামা করে। তিন মাস অন্তর তাই ছবি তোলাতে হয়। ছবি যে খুব পুরনো নয়, তার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয় এবং সেই ছবি খুটিয়ে দেখে জহুরীরা দর ঠিক করেন। মার্কোপোলোই কতবার বলেছেন, বড় ট্রেচারাস লাইন। চার-পাঁচ বছর আগের পুরনো ছবি চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে খুব। সেই জন্যে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা নামকরা ছবির দোকান বেধে দিয়েছি। সেখান থেকে ছৰি তুলিয়ে, পিছনে ছবি তোলার তারিখটা লিখিয়ে নিতে হয়। কলকাতার এক আধটা দোকানও শুনেছি এই লিস্টে আছে। এখান থেকে ছবি তুলে কুয়ালালামপুর, টোকিও, কিংবা ম্যানিলায় পাঠিয়ে দিতে হয় : এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সদু'র আমেরিকায় সে ছবি যায়। বোসদা হেসে বলেছিলেন, "হোটেলের রজনীগন্ধাদের দাম অনেক। তোমাকে দু" একটা লিষ্টি দিচ্ছি। 'হাইড্রোজেন বোমা' বলে যে জার্মান মেয়েটি সেছিল, তার রেট প্রতি সপ্তাহে একশ আশি পাউণ্ড। থাকা খাওয়া অবশ্যই ফ্রী। আর প্যাসেজ খরচা তো আছেই। তার পর ইজিপসিয়ান ফরিদা, মাখনবক্ষ (বাটার-ব্রেস্টেড) সুন্দরী বলে কাগজে বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছিল। তার এবং তার বোন-এর জন্যে প্রতি মাসে তিন হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ কিনা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। লোলা দি টমাটো গার্ল, কিউবার মেয়ে। সে রোজ দশটা করে টমাটো সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতো। একশ টাকা করে এক-একটা টমাটো বিক্রী করেছে। দাম দিয়ে দিলেই, নিজের পছন্দ মতো একটা টমাটো দেহ থেকে ছিড়ে নিতে পারো। সে তখন দাঁত দিয়ে টমাটো ফুটো করে, নিজে একটু রস চুষে নিয়ে তোমাকে দেবে। তুমি তারপর একটু চুষে তাকে আবার ফেরত দিতে পারো। সে নিতো পাঁচশো ডলার প্রতি সপ্তাহে। কিন্তু মার্জরি, অতোবড়ো গায়িকা, সে পেতো মাত্র একশ ডলার সপ্তাহে। তার গান শোনবার জন্যে তেমন ভিড়ও হয়নি। মার্জরি নিগ্রো মেয়ে —এমন অপরূপ কণ্ঠ আমি কখনও শুনিনি।"

এই যে ক্যাবারে সুন্দরীদের এতো টাকা দেওয়া হয়, এও বিরাট এক জুয়া। কলকাতার, রসিক নাগরিকরা খুশী হয়ে প্রচুর মদ খেয়ে, বার বার এসে হোটেল জমজমাট রেখে, দাম তুলে দেবেন কিনা কে জানে। সপ্তাহে ছ'দিন তারা কলকাতার রাত্রিকে দিন করে

রাখবে। শ,ধ, ড্রাই-ডেতে, অর্থাৎ যেদিন মদ বিক্রী হয় না, সেদিন কোনো শো নেই। সেদিন শুকনো গেলাস নিয়ে কে আর নাচ দেখতে কিংবা গান শুনতে চাইবে? তার পরিবর্তে রবিবারের লাঞ্চের দিন দু'পুরে স্পেশাল প্রোগ্রাম। সে প্রোগ্রাম অবশ্য অনেক সংযত। অনেক ভদ্র।

কনির বিজ্ঞাপন বেরোবার পর থেকেই রসিকমহলে সত্যি বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বোসদা বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপনের ভাষাটা এর জন্যে অনেকটা দায়ী। নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার জন্যে অভিধানে যত ভাষা ছিল, তা সিনেমা-ওয়ালা এবং আমরা খতম করে দিয়েছি। যতরকম উত্তেজক শব্দই ব্যবহার করো না কেন, আর তেমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। পোলাও, মুর্গির দোপি'য়াজা বিরিয়ানী ইত্যাদির মধ্যে কিছুদিন ডুবে থাকবার পর যা ভাল লাগে তা হলো শুক্তো আর মাগুর মাছের ঝোল। তাই বিজ্ঞাপনে সোজা ভাষায় লিখে দিয়েছিলাম, "কনি দি উয়োম্যান, মেয়েমানুষ কনি, কলকাতায় আসছে।"

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পরেই টেলিফোনে অনেক অনুসন্ধান এসেছিল। কলকাতায় যাঁদের বাবাদের অনেক টাকা আছে, যে-সব কনট্রাক্টরদের অনেক কাজের প্রয়োজন আছে, যে-সব সেলস অফিস্যররা পারচেজ অফিস্যরদের খুশী করতে চান, তাঁদের অনেকেই ফোন করেছেন। সেই সব ফোনের অনেক কলই আমাকে ধরতে হয়েছে।

"হ্যালো, শাজাহান হোটেল?"

"গুড্, আফটারনুন, শাজাহান রিসেপশন কথা বলছি।"

"কনি দি উয়োম্যান সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন? উনি এই শনিবারেই শো আরম্ভ করছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্রথম দিনেই একটা টেবিল বুক করতে চাই।"

"স্যরি। প্রথম দিনে সব বোঝাই। মাত্র সাড়ে তিন শো সীট, বুঝতেই পারছেন।"

"হ্যালো, শাজাহান হোটেল? কনি দি উয়োম্যান। অ্যাডমিশন ফি কত?"

"অ্যাডমিশন ফি সেই পাঁচ টাকাই রাখা হয়েছে। আর ডিনার সাত টাকা আট আনা।"

"ড্রেস?"

“হ্যাঁ, ড্রেসের রেসট্রিকশন আছে। ইভনিং অথবা ন্যাশনাল।”

ফোকলা চ্যাটার্জিও ফোন করেছেন। “হ্যালো, বোস নাকি? আমি ফোকলা চ্যাটার্জি কথা বলছি।”

“মিস্টার বোস এখন নেই, স্যর। আমি শংকর কথা বলছি।"

“শোনো, ওপনিং ডেটে আমার তিনখানা টিকিট চাই। মিস্টার রঙ্গনাথনের নামে।”

“একটাও টিকিট নেই স্যর। সব বিক্রি হয়ে গেছে।”

“বলো কী হে? নিশ্চয় ব্ল্যাক হচ্ছে?”

বললাম, “না স্যর, আমরা পাঁচখানার বেশী কাউকে দিইনি।”

ফোকলা চ্যাটার্জি ছাড়নেওয়ালা নন। বললেন, “বাই হুক অর ক্রুক, আমার টিকিট চাই-ই। রঙ্গনাথন তার পরের দিনই চলে যাবেন। তোমার টেবিল কারা কারা বুক করেছে, নাম বলো দেখি। তোমরা বেঙলী বয়, তোমাদের কাছে সব সময় আমরা ফেসিলিটি আশা করি। এই ক্যালকাটার সব আমোদই ননবেঙ্গলীরা এনজয় করবে, এটা কী ভাল?” ফোকলা চ্যাটার্জি— কাতর আবেদন করলেন।

বললাম, "আমার হাতে কিছুই নেই, স্যর। আমি নাম পড়ে যাচ্ছি। মিস্টার খৈতান, মিস্টার বাজোরিয়া, মিস্টার লাল, মিস্টার ম্যাকফারলেন, সাহা, সেন, চ্যাটার্জি, লোকনাথন, যোশেফ, ল্যাং চ্যাং সেন। আরও অনেক আছেন, সিং, শর্মা, আলী, বাসু, উপাধ্যায়, জাজোদিয়া, মতিরাম, হীরারাম, চুনীরাম, ছাতাওয়ালা, হুইস্কিওয়ালা।”

ফোকলা রেগে উঠে বললেন, “সব শালা ফোকটে ফুর্তি করছে । স্যর আমরা জেনুইন পার্টি টিকিট পাচ্ছি না।”

“মানে? আপনি কী বলছেন, স্যর?"

"সব শালা এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টওয়ালা। মেয়েমানুষের ফুর্তির বিলও কোম্পানির কাছে সাবমিট করবে। অথচ আমরা নিজের পয়সায় যেতে চাই, তবু জায়গা পাচ্ছি না। গবরমেন্ট আজকাল নাকডেকে ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা দেখ তো আগরওয়ালার নাম আছে কিনা।”

বললাম, "আছে স্যর, পাঁচখানা করে দু'টো টেবিল আছে।"

"যাক বাঁচালে ভায়া, ওঁকেই বলি একটা টেবিল ছেড়ে দিতে। ব্যাটা রঙ্গনাথন, তেঁতুল। বাঙ্গালোরে তেঁতুল গোলা খায়, আর বুড়ি বৌ-এর ঝাঁটা হজম করে। বেচারা বিজনেসের কাজে কয়েকদিনের জন্যে এখানে এসেছে। একটু মনটাকে তাঁতিয়ে নেবার ইচ্ছে। অথচ একেবারে নিউম্যান। ক্যালকাটার কিছুই জানে না। তার উপর ভীতু মানুষ। প্রাণের ভয়, মনের ভয়, রোগের ভয়। যেখানে সেখানে যেতে সাহস পায় না। তাই আমি গাইডের কাজ করছি।"

ফোনটা নামিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি এবার এমন একটি প্রশ্ন করলেন, যা আমি কখনও শুনিনি। বললেন, "হ্যাঁ মশাই, মোস্ট ইম্পর্টান্ট পয়েন্টটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। স্ট্যাটিসটিকসটা বিজ্ঞাপনে দেননি কেন?"

"আজ্ঞে, স্ট্যাটিসটিকস?"

"আচ্ছা, আপনি বোসকে জিজ্ঞাসা করে রাখবেন, আমি পরে জেনে নেবো।" ফোকলা চ্যাটার্জি এবার ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

'স্ট্যাটিসটিকস' শব্দের অর্থ বোসদার কাছে শুনেছিলাম। বোসদা বলেছিলেন, "ছিঃ, তুমি না হাইকোর্টে কাজ করেছো। সভ্যতার মাপকাঠি জানো না? আজকের সভ্যতায় পুরুষকে মাপা হয় ব্যাংকের ফিগার দিয়ে, আর মেয়েদের মাপা হয় দেহের ফিগার দিয়ে। ৩৬-২২-৩৪, ৩৪-২০-৩৪ এতেই আমাদের পৃষ্ঠপোষকেরা সব বুঝে নেন।"

কনির স্ট্যাটিসটিকস তখন আমাদের জানা ছিল না। মার্কোপোলো বলেছিলেন, "ছ'মাসের পুরনো স্ট্যাটিসটিকস আমার কাছে আছে। কিন্তু তা দেওয়া যায় না।"

ফোকলা চ্যাটার্জি আবার ফোন করেছিলেন। বোসদা টেলিফোন ধরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ স্যর, লেটেস্ট স্ট্যাটিসটিকসের জন্যে আমরা রিপ্লাই-পেড টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি, এখনও উত্তর আসেনি।" বোসদা আরও বলেছিলেন, "এবার খুবই সুন্দর জিনিস হবে। শুধু, নাচ নয় স্যর, সঙ্গে অন্য জিনিসও আছে।"

"কী জিনিস মশাই? একটু হিণ্ট দিন না। রঙ্গনাথনকে গরম করে রাখি। পুওর ফেলো —ও'র বউ ভদ্রলোককে ডেলি ঝাঁটা মারে!"

বোসদা বললেন, “স্যরি, এখন বলবার হুকুম নেই। ওখানেই বুঝতে পারবেন।"

রাত আটটা থেকে শাজাহান হোটেলের সামনে গাড়িতে গাড়িতে জম-জমাট।

যেন কোনো বিশাল জালে দেশের সব সুন্দর গাড়িগুলোকে মাছের মতো টানতে টানতে কেউ শাজাহান হোটেলের সামনে এনে জড়ো করেছে। গাড়ি আসছে, গেটের সামনে মুহূর্তের জন্য থামছে, দারোয়ানজী দরজাটা খুলে স্যালুট দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। সায়েব নেমে পড়ছেন।

সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে, আমাকে একবার ন্যাটাহারিবাবুর কাছে যেতে হয়েছিল। আমার বিছানার চাদরটা একটু ময়লা হয়ে গিয়েছিল। এক কাঁড়ি ময়লা কাপড়ের মধ্যে ভদ্রলোক বসেছিলেন। ন্যাটাহারিবাবু বললেন, “আপনার চাদর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা আজ গাড়ি আসছে কেমন?”

“অনেক” আমি বললাম।

“দেশের সবাই এখন সায়েব হয়ে গিয়েছেন,” ন্যাটাহারিবাবু বললেন। "১৭৫৭ সালে পলাশির আমবাগানে ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করেছিল যারা বলে, তারা হিস্ট্রির কচু জানে! আসলে ইংরেজ জিতলো তার অনেকদিন পরে, আমাদের এই চোখের সামনে—উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট। দেশটা রাতারাতি চিরকালের জন্যে ইংরেজের হয়ে গেলো।” ন্যাটাহারিবাবু থামলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, "গান্ধী যখন আন্দোলন করছেন, লোকে যখন জেলে যাচ্ছে, বন্দে মাতরম গাইছে, খদ্দর পরছে, আমরা তখন ভয় পেতাম। বেশীদিন হোটেলের চাকরি আমাদের কপালে আর নেই। আমার সম্বন্ধী চৌরঙ্গী পাড়ার সায়েবী সিনেমার অপারেটর। আমরা দু’জনে ভাবতাম, স্বাধীন হলেই এ-সব বন্ধ হয়ে যাবে। বিলিতী সিনেমায় মাছি বসবে না, শাজাহান হোটেল খাঁ-খাঁ করবে, মমতাজ বার লাটে উঠবে। ক্রাইস্ট, ক্রিকেট আর ক্যাবারেকে প্যাক করে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে সায়েবরা লম্বা দেবে। বুড়ো বয়সে আমাদের পথে বসতে হবে।”

ন্যাটাহারিবাবু এবার উঠে পড়লেন। বললেন, "আমাকে একবার আপনাদের কনি মেমসায়েবের কাছে যেতে হবে।"

কনির ঘরের দিকে যেতে যেতে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "অথচ তাজ্জব ব্যাপার, আমার বালিশের সংখ্যা শুধু বেড়ে যাচ্ছে। মদের বিক্রি ডবল হয়ে যাচ্ছে। ঘরও খালি পড়ে থাকছে না। সেই যে রঞ্জিত সিং বলেছিল, তাই হলো --সব লাল হয়ে গেলো।"

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "যাই, আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘ্যান করলে আমার চলবে না। এই কনি মেমসায়েবের আরও বালিশ লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করে আসি। আমি পাশ-বালিশ পর্যন্ত অফার করবো।" ন্যাটাহাবিবাবু নাকটা বাঁ হাতে ঘষতে ঘষতে বললেন, "ব্যাটারা পাশ-বালিশ ব্যবহার করে না। আমার মাঝে মাঝে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওদের পাশ-বালিশের নেশা ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দু'একজনের ধরিয়েও দিয়েছি। ওরা নাম দিয়েছে—ন্যাটাহারি পিলো। অভ্যাসটা একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবে না। বারোটা বেজে যাবে। এই পাশ-বালিশ নিয়ে শুয়ে শুয়েই তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো।" বাইরে এসে দেখলাম, আরও গাড়ি আসছে। বুড়ো গাড়ি থেকে ছোকরা নামছে, ছোকরা গাড়ি থেকে বুড়ো নামছে। পুরুষ কলকাতার নির্যাস যেন আমাদের এই শাজাহান হোটেলে ভিড় করছে। আর, আমরা সেইখানে বসে আছি যার দু" মাইল দূরে একদা রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র ভারত সন্ধানে আত্মনিবেদন করেছিলেন। উইলিয়ম জোন্স প্রাচ্যবাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ডেভিড হেয়ার ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

শাজাহানের মমতাজ রেস্তোরাঁয় আজ তিলধারণের স্থান নেই। রেস্তোরাঁর দরজার সামনে একটা টেবিল, টিকিট বই ও ক্যাশবাক্স নিয়ে উইলিয়ম ঘোষ জাঁকিয়ে বসে আছে। অনেকে অ্যাডভান্স টিকিট কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফোকলা চ্যাটার্জি তাঁর মিস্টার রঙ্গনাথনকে নিয়ে ইতিমধ্যেই সামনের সারিতে চেয়ার দখল করেছেন। মিস্টার চ্যাটার্জি আজ জাতীয় পোশাক পরেছেন। পরবাসীয়া দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সায়েবদের জামাকাপড়ের দিকে নজর রাখছে।

এক ভদ্রলোক বুশশার্ট পরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। পরবাসীয়া বাধা দিলে। উইলিয়ম উঠে পড়ে দরজার সামনে নোটিসটা দেখিয়ে বললে, “আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি এই ড্রেসে ঢুকতে পারবেন না।" ইংরিজীতে দরজার সামনে জ্বলজ্বল করছে 'রাইট অফ অ্যাডমিশন রিজার্ভড'।

ভদ্রলোকের মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললেন, “স্বাধীন ভারতে এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার রাজত্ব চলছে?” আমি বললাম, "যথেষ্ট সময় রয়েছে, আপনি এখনও জামাকাপড় পাল্টিয়ে আসতে পারেন।”

ভদ্রলোক রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন। কিন্তু মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ সায়েব হয়ে ফিরে এলেন। দেখতে পেয়েই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আমার আড়াইশো টাকা গচ্চা গেলো। দোকান থেকে রেডিমেড কিনে পরে আসতে হলো। আপনাদের টাইট দিচ্ছি এ বিষয়ে আমরা কাগজে চিঠি লিখবো।”

মদ বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। আটটা থেকেই তোবারক ও রাম সিং ভটাভট সোডার বোতল খুলছে। বীয়ার, হুইস্কি, রাম ও জিন বোতলের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে গেলাসের মধ্যে নাচানাচি করছে। মার্কোপোলো রাম সিং-এর কাছে খবর নিয়ে গেলেন। রাম সিং বললে, “বহুৎ গরম। ছে-সাত হাজার রুপিয়াকো সেল হো যায়েগা।”

ফোকলা চ্যাটার্জি দু’টো হোয়াইট লেবেল টেনে, একটা বড়া পেগ ডিম্পল স্কচ এর অর্ডার দিলেন। এদিকে কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা রঙ্গনাথন এক পেগ সিনদনো ভারমুথ নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখেই চ্যাটার্জি বললেন, “খ্রিষ্টান রঙ্গনাথনকে নিয়ে যে কী মুশকিলেই পড়েছি। বলছি যস্মিন দেশে যদাচার। স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে কনি, আর স্কটল্যাণ্ডের মাল ডিম্পল। কিন্তু রঙ্গনাথন সায়েব ইটালিকে কোলে করে বসে আছেন।”

রঙ্গনাথন মৃদু’ মাথা নেড়ে বিমর্ষভাবে বললেন, “ব্লাড প্রেসার”। চ্যাটার্জি বললেন, “একটা পেগ চড়ান। প্রেসার তালগাছ থেকে মাটিতে নেমে আসবে।
আর কনি আপনার সর্পগন্ধার কাজ করবে। ভারি সিডেটিভ মেয়ে-নার্ভগুলোকে যেন ঘুমপাড়িয়ে দেয়। ক্যালকাটায় ওর এই ফার্স্ট—কিন্তু আমার এক বন্ধু, কায়রোতে ওকে দেখেছে। ওর শো দেখবার জন্যে বন্ধু আমার দামাস্কাস থেকে কায়রো চলে গিয়েছিল।”

রঙ্গনাথন বললেন, "হুইস্কিটা ঠিক আমার অভ্যাস নেই।"

জিভ কেটে ফোকলা বললেন, “এই সব ইয়ংম্যানদের সামনে ও কথা বলবেন না। বাহান্ন বছর বয়সে হুইস্কি অভ্যাস করেননি শুনলে এরা হাসতে আরম্ভ করবে। ক্যালকাটায় এটা আমাদের প্রশ্নেরও অতীত।"

রাজ সিং, তোবারক আলী এবং অন্যান্য ওয়েট বয়দের ছোটাছুটি বাড়ছে, সিগারেটের কটু ধোঁয়ায় হল্-এর বাতাস ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে, যেন একটু আগেই কারা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে দিয়েছে। ঘড়ির কাঁটাও ক্রমশ দশটার ঘরে উকি মারছে, ডিনারের প্লেটের টুংটাং শব্দ যেন কোনো অর্কেস্ট্রার অংশ বলে মনে হচ্ছে। ফোকলা চ্যাটার্জি চিৎকার করে উঠলেন, “আর কতক্ষণ?”

এবার আমার পালা। সর্দিতে বোসদার গলা বুজে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কাশছেন। মার্কোপোলোও রাজী হয়েছিলেন। বলেছিলেন ইয়ংম্যানকে একটা সুযোগ দেওয়া যাক। ওধারে গোমেজের দল অবিশ্রান্তভাবে বাজিয়ে চলেছে।

বোসদা দরজার কাছ থেকে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সিনেমা হল-এর মতো হঠাৎ কোণের উজ্জ্বল আলোগুলো নিভে গেলো। স্টেজের সামনে গিয়ে মাইকটা বা হাতে নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ইঙ্গিতে অর্কেস্ট্রা বন্ধ হয়ে গেলো। গোমেজ চাপা গলায় বললেন, “চিয়ারিও।”

আমি দেখলাম সাড়ে তিনশ' লোকের সাতশ' চোখ হঠাৎ প্রত্যাশায় সজাগ হয়ে উঠলো। আমার মুখ দিয়ে আমার অজান্তেই বেরিয়ে পড়লো-“লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলমেন।” সমস্ত হল-এ সেদিন একটাও প্রকৃত লেডিকে খুঁজে বার করতে পারলাম না। তবু পুনরাবৃত্তি করলাম, “গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। শাজাহান হোটেলের এই মধুর সন্ধ্যায় আপনারা আশা করি আমাদের ফরাসী সেফের রান্না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সযত্নে চয়ন করা ড্রিঙ্কস উপভোগ করেছেন। নাউ, আই প্রেজেন্ট টু ইউ কনি। আপনাদের বৈচিত্র্যময় জীবনে আপনারা অনেক উয়োম্যান দেখেছেন। বাট সি ইজ ‘দি’ উয়োম্যান—যা এই শতাব্দীতে ভগবান একটিই সৃষ্টি করেছিলেন।” এবার আলোগুলো একসঙ্গে নিভে গেলো। সমস্ত হল- এর মধ্যে একটা

চাপা প্রত্যাশার গঞ্জন উঠলো।

চাপা প্রত্যাশার গুঞ্জন হঠাৎ যেন কোনো অদৃশ্য প্রভাবে স্তব্ধতায় বিলীন হয়ে গেলো। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই হারিয়ে যাওয়া শব্দ যেন অকস্মাৎ আলোতে রূপান্তরিত হলো। অন্ধকারের বুক ভেদ করে ছু'চের মতো সরু আলোর রেখা স্টেজের সামনে এসে পড়লো। সেই আলোর রেখা মত্ত অবস্থায় কাউকে খু'জে বেড়াচ্ছে। কে যেন স্টেজের উপর এসেও দাঁড়িয়েছে; কিন্তু মাতাল আলোর রেখা কোথাও স্থির হয়ে
দাঁড়াতে পারছে না। স্টেজের উপর যে দেহটা অন্ধকারের ঘোমটা পরে দাঁড়িয়ে লাগাছে, সেই কি কনি?

পৃষ্ঠপোষকদের ঔৎসাক্যে আর সড়সুড়ি না দিয়ে আলোর রেখাটা এবার বেশ মোটা হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় কনি? কনি নেই। সেখানে ইভনিং স্যুট পরা দু' ফুট লম্বা এক বামন ঘোরাঘুরি করছে। তার মাথায় একটা তিন ফুট উচু টুপি। বামন সায়েবের হাতে ছড়ি।

আশাহত দর্শকদের বিস্ময় প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে বামনটা টুপি টা খুলে বাঁ হাতে নিয়ে, হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে, একটা চেয়ারের উপর উঠে পড়ে বললে—"গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। আমিই কনি দি . . .". . বলে, যেন ভুলে গিয়েছে এমনভাবে বিড় বিড় করে গুনতে লাগল— ছেলে না মেয়ে, মেয়ে না ছেলে...... না, আমিই সেই মেয়েমানুষ কনি, কনি দি উওম্যান।"

দর্শকরা এবার একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠলেন। সমৃদ্ধ কলকাতার দ,'একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আর স্থির থাকতে পারলেন না। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে চিৎকার করে বললেন, "আমরা কনিকে চাই। এই বিটলে বামনটা কোথা থেকে এলো?"

পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকেও অভিনয় করতে হলো। যেন কনির বদলে এই বামনকে স্টেজের উপর দেখে আমিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি, এমন ভাব করে মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলরোন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই পাঁচ মিনিট আগেও আমি কনির ঘরে গিয়েছিলাম। ওর জামাকাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। ও একটা ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে

যাচ্ছিল। আমাকে বললে, 'তুমি অ্যানাউন্স করোগে যাও, আমি রেডি,' তারপর এই দু' ফুট ভদ্দরলোক যে কোথা থেকে এলেন!"

বামন কিন্তু দমলো না। আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই তেড়ে মাইকের কাছে এসে, মাইকটা নামিয়ে মুখের কাছে এনে, মেয়েদের মতো সরু গলায় বললে, "বিশ্বাস করুন, আমিই কনি। আমি একটা ভুল ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। যাই হোক, আপনারা যে আমার জন্যে এই রাত এগারোটা পর্যন্ত জেগে রয়েছেন, এর জন্যে আমি গর্ব বোধ করছি।" বলা শেষ করেই, বামন ক্যাবারে ... কায়দায় নাচতে আরম্ভ করলে। সমস্ত হল এবার হৈ-হৈ করে উঠলো

আমি এবার মাইকের কাছে গিয়ে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলমেন, আপনারা অধৈর্য হবেন না। আমি এখনই ডাক্তার ডাকবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। ভুল ট্যাবলেট খাবার ফলেই এই অঘটন ঘটেছে।"

বামন এবার বললে, "পাঁচ মিনিট আগে আমার নারীত্ব, আমার যৌবন সব ছিল। কিন্তু এখন তারা যে কোথায় গেলো," বামন এবার নিজের দেহটা নিজেই হাত দিয়ে খোঁজ করতে লাগলো। পকেট থেকে আর একটা ট্যাবলেট বার করে খেলো। তারপর কি যেন মন্ত্র পড়তে লাগলো। হঠাৎ আবার আলো নিবে গেলো এবং প্রথম সারির এক মারওয়াড়ী ভদ্রলোক পরমুহূর্তেই কাতর চিৎকার করে উঠলেন। "ও! আমার কোলে কে যেন এসে বসেছে।"

আমি এদিক থেকে অন্ধকারের মধ্যে বললাম, "ভয় পাবেন না। কেমন বুঝছেন:" মারওয়াড়ীর ততক্ষণে ভয় কেটে গিয়েছে। তাঁর কোলে কী জিনিস হঠাৎ ধপাস করে বসে পড়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি এবার অবলীলাক্রমে উত্তর দিলেন, "বহুত সফট —খুব নরম!"

এবার একটা আলো জ্বলে উঠলো, এবং সেই আলোতে দেখা গেলো মারওয়াড়ী ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে বসে রয়েছে কনি। তার মাথায় টায়রা, গলায় হার, পায়ের গোড়ালী থেকে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত রঙীন নরম কাপড়ে ঢাকা। এবার আরও কয়েকটা

আলো জ্বলে উঠলো এবং সেই মারওয়াড়ী ভদ্রলোককে টানতে টানতে স্টেজের উপর নিয়ে এসে দর্শকদের দিকে মাথা নত করলে, কনি দি উয়োমান।

মারওয়াড়ী ভদ্রলোক ভুড়ি নিয়ে কোনোরকমে ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলমেন, কনি আপনাদের সামনে উপস্থিত। ইনি টেলিভিশনে বহুবার অভিনয় করেছেন। একবার মহামান্য ষষ্ঠ জর্জের সামনেও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আজ আপনারা সকলেই এই বালিকার মহারাজা। কিং এমপারার অফ কনি দি উয়োম্যান!"

কনি এবার নাচতে শুরু করলো। সেই পুরো কাপড়ের আলখাল্লা সমেত নাচের মধ্যে তেমন গতি ছিল না। দর্শকরা যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কনি বললে, "মাই ডার্লিং ক্যালকাটাওয়ালাজ, আমি শুনলাম তোমাদের কয়েকজন আমার স্ট্যাটিসটিকস চেয়েছে। আমি দুঃখিত, আমার সংখ্যা কিছুতেই মনে থাকে না। তোমরা কেউ যদি আমার ফিগারগুলো হিসেব করে নিয়ে যাও। অঙ্কের কোনো প্রফেসর এখানে আছেন নাকি?"

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ উত্তর দিলেন না। "চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট?" কনি মুখ বেকিয়ে এবার প্রশ্ন করলো। এবারেও কোনো উত্তর নেই।

"এনি দর্জি?" এবারেও সভাগৃহ নিঃস্তব্ধ হয়ে রইলো। "মাই ডিয়ার ডিয়ার"--কনি কপট দুঃখে চোখ মুছতে লাগলো। "এই গ্রেট সিটিতে কি দর্জি নেই? তোমাদের গার্লরা কি সেলাই করা কিছুই পরে না?"

এবার সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমার গা-টা কিন্তু কেমন গুলিয়ে উঠলো। মনে হলো মাথাটা ঘুরছে। এখনই হয়তো পড়ে যাবো। গোমেজ আমার কোটটা টেনে ধরে বললেন, "চিয়ার আপ! খুব ভাল হচ্ছে।"

"এনিবডি, যে ভাল অঙ্ক করে?"--কনি এবার আবেদন জানালো। ফোকলা চ্যাটার্জি যেন সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে স্টেজের দিকে আসতে আরম্ভ করলেন। আমি একটা দর্জির ফিতে কনির দিকে ছুড়ে দিলাম।

এদিকে বে'টে সায়েব আবার হল এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সুবেশা সুন্দরী

কনিকে দেখে যেন সে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। জিভ বার করে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। মাথা চুলকোচ্ছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। স্টেজের অপর অংশে কনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ফোকলার হাতে ফিতেটা দিয়ে বলছে, “মাপো। গতকালও ছিল ৩৮-২৪-৩৬।”

বামনটা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের কানে কানে বললে, “আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমি কনি নই। আমার নাম ল্যামব্রেটা। ল্যামব্রেটা দি ম্যান"। তারপর মেমসায়েবের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে সে বললে, “হ্যালো মিস, আমি স্ট্যাটিসটিকসে সুপণ্ডিত। আমি পাশকরা এ্যাকাউন্টেন্ট। আমি পাশকরা দর্জি। আমি মুখে মুখে ঢাউস ঢাউস অঙ্ক কষে ফেলতে পারি।” পূর্ণ লজ্জিতভাবে কথাগুলো বলে মিস্টার ল্যামব্রেটা কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগলো।

এদিকে ফোকলা চ্যাটার্জি দীর্ঘাঙ্গিনী কনিকে মাপজোখ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দেখে ল্যামব্রেটা আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। বিচিত্র ভঙ্গিতে সেদিকে ছুটে গেলো। তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো ল্যামব্রেটার চোখ দু’টো জ্বলছে। ফোকলাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, "সরো, আমি মাপবো।”

ফোকলা প্রথমে তাকে পাত্তা দেননি। কিন্তু ল্যামব্রেটা তখন সত্যিই সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে ঠেলতে আরম্ভ করেছে। হলসুদ্ধ লোক হাসিতে হল ফাটিয়ে ফেলার উপক্রম করছে। বাধ্য হয়ে তখন বামনের হাতে ফিতেটা দিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জী ফিরে এলেন। কনি তখন গুনগুন করে গান ধরেছে। তার হাঁটুর কাছ থেকে ল্যামব্রেটা চিৎকার করে কী যেন বলছে, সে যেন শুনতেই পাচ্ছে না। কনি পা দু’টো একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল। তার পায়ের তলা দিয়ে বামন ল্যামব্রেটা দু''বার চলে গেলো। অশ্লীল ইঙ্গিতে হল-এর কয়েকজন দর্শক সিটি বাজিয়ে দিলেন। ল্যামব্রেটার সেদিকে কিন্তু খেয়াল নেই। বিনয়ে বিগলিত হয়ে সে মেমসায়েবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। কিন্তু গরবিনী, দীর্ঘাঙ্গিনী কনি যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না।

শত চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে, ল্যামব্রেটা হঠাৎ কোথা থেকে একটা মই যোগাড় করে নিয়ে এলো। মইটা কনির পিঠে লাগিয়ে সে যেমনি উঠতে আরম্ভ করেছে ওমনি কনি আবার

হাঁটতে শুরু করলে। ল্যামব্রেটাও ছাড়বার পাত্র নয়। কনির ফ্রকটা টেনে ধরে রইলো। মই-এর তলায় যে দু'টো চাকা লাগানো ছিল, এবার তা বোঝা গেলো। কারণ ল্যামব্রেটাকে নিয়ে মইটাও চলতে আরম্ভ করলো। যতই-মই এর গতি বেড়ে যাচ্ছে, ততই ল্যামব্রেটার ভয় বাড়ছে। সে যেন নিরুপায় ভয়ে কনির কোমরটা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে কনি একবার আরো দাঁড়ালো। বামন সায়েবও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে ঘুরে গেলো। এবার তার সাহস বেড়ে গিয়েছে, মই বেয়ে সে আরও খানিকটা উঠে গিয়ে বললে, "মিস কনি, তোমার জন্যে আমি একটা গোলাপফুল নিয়ে এসেছি।"

কনি সৌজন্যে বিগলিত হয়ে বললে, "তোমার মতো লোক হয় না, সত্যি সুন্দর গোলাপ ফুল।"

এই কথা শোনামাত্রই ল্যামব্রেটা উত্তেজনায় ধপাস করে মই থেকে মেঝের উপর পড়ে গেলো। কনি সেদিকে কোনো নজরই দিলে না। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, ধুলো ঝেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ল্যামব্রেটা আবার মইটা যোগাড় করে মেমসায়েবের পিঠে লাগিয়ে কনিকে চুমু খাবার চেষ্টা করলো। দৈহিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, ল্যামব্রেটা এবার মুখের ভাষায় কনিকে প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করলে। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। মই বেয়ে উঠে কানে কী বলতেই কোপবতী কনি ল্যামব্রেটার কানটা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলে। পা দু'টো শূন্যে দোলাতে দোলাতে কাতর কণ্ঠে ল্যামব্রেটা বললে, "প্লিজ, প্লিজ। আমি ক্ষমা চাইছি, মিস। আমি কখনও আর এতো লম্বা মেয়েকে প্রপোজ করবো না। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।"

ল্যামব্রেটা কে কনি যখন ছু'ড়ে মেঝের উপর ফেলে দিলে, তখন হাসতে হাসতে কয়েকজন চেয়ার থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে পড়লো। একমুহূর্তের জন্যে আলো জ্বলে উঠলো, এবং সেই আলোতে ল্যামব্রেটাকে ছুটে পালাতে দেখা গেলো।

এবার আমি মাইকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "ঐ বামনটাকে বহুকষ্টে দূর করা গেছে, এবার নাচ আরম্ভ হচ্ছে।"

আমার দিকে মিষ্টি হেসে, কনি তার বাইরের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। গোমেজের দল তখন তাদের বাজনার চটুলছন্দে মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা পশু প্রবৃত্তিগুলোর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। নাচতে নাচতে কনি স্টেজ থেকে নেমে একজনের

কোলে গিয়ে বসলো। আর একজনের রুমাল নিয়ে হাসতে হাসতে নিজের দেহের ঘামটা মুছে ফেললে। আর একজন ভদ্রলোক ডাক দিলেন, "আমরা পিছনে পড়ে রয়েছি।" কনি ছুটে সেদিকে গেলো। ভদ্রলোকের কোলে কিছুক্ষণ বসে রইলো। এবার উঠে সে মিস্টার রঙ্গনাথনকে টেনে আনলে। রঙ্গনাথনকে আদর করে বললে, "হ্যালো মাই বয়, আমার কোলে বোসো।"

রঙ্গনাথন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কনি শুনলে না, জোর করে তাঁকে নিজের কোলে বসিয়ে দিলে। রঙ্গনাথনের মনটা এতোক্ষণে বোধহয় নরম হলো। নেশার ঘোরে কনির ফ্রকটা হাত দিয়ে দেখে বললেন, "বাঃ, চমৎকার তো।"

কনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি একটা খনির মতো। যতই খু'ড়বে ততই ভাল জিনিস পাবে।"

কনির কথা থেকে রঙ্গনাথন কী বুঝলেন কে জানে। কিন্তু কনির নিজের আর সময় নেই। রঙ্গনাথনকে এবার স্টেজ থেকে স্যরিয়ে দিয়ে সে তার নৃত্য শুরু করে দিলো। এক-এক করে তার দেহের বাস খসে পড়ছে। মাথার মুকুট বিদায় নিয়েছে। হাতের দস্তানা উধাও হয়েছে। এবার স্কার্টটাও খুলে পড়লো। নারী-মাংসাশী কলকাতা এবার প্রত্যাশার উত্তেজনায় হৈ-হৈ করে উঠলো। কিন্তু পরমহূর্তেই আশাভঙ্গের বেদনা। তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা যেন হয়নি। কনি ভিতরে যে পরের পর অনেকগুলো জামা পরেছে তা তাঁরা এতোক্ষণে বুঝলেন। তারপর? তারপর আমার কিছুই মনে নেই। দেখলাম, গোমেজের মুখটা যেন ঘৃণায় এবং ক্লান্তিতে বে'কে গিয়েছে। তাঁর সহকারীরা যন্ত্রের মতো দ্রুতবেগে বাজিয়ে চলেছে। হঠাৎ মনে হলো, কনির দেহে কিছুই নেই। সেই মুহূর্তেই সমস্ত হল্‌টা অন্ধকার হয়ে গেলো। একটা পাতলা ওড়না মেঝে থেকে তুলে নিয়ে কোনোরকমে লজ্জানিবারণ করতে করতে কনি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আবার আলো জ্বলে উঠলো। প্রচণ্ড হৈ-হৈ-এর মধ্যে অবিশ্রান্ত হাততালি পড়তে লাগলো। স্টেজে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অসংখ্য জামাকাপড়ের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। বে'টে ল্যামব্রেটা স্কার্ট, প্যান্টি, ফ্রক, ব্রেসিয়ারের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে কুড়িয়ে নিচ্ছে। আমি

মাইকে ঘোষণা করলাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এবার আমাদের কয়েক মিনিট বিরতি।"

গোমেজ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "ডেথ-নেল অফ সিভিলাইজেশন -সভ্যতার মৃত্যু-ঘণ্টা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?"

আবার বাজনা বেজে উঠলো। কয়েক মিনিটের অবসরে অতিথিদের অনেকেই আরও কয়েক পেগ টেনে নিলেন। আর রঙ্গনাথনও দেখলাম হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করছেন।

আবার আলো নিভে গেলো। ঝুমুরের ঝুমঝুম শব্দে এবার সমস্ত হলঘরটা ভরে গেলো। গোমেজের সঙ্গীতযন্ত্র থেকে এক অদ্ভুত শব্দধারা বেরিয়ে আসতে লাগলো। মনে হলো, যেন কোনো গভীর অরণ্যে আমি বসে রয়েছি যেখানে 'ঘাইমৃগী' সারারাত ডাকে। পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার, তাহারা পেতেছে টের, আসিতেছে তার দিকে। আজ এই বিস্ময়ের রাতে তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে। মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে, তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে হরিণেরা আসিতেছে।'

'আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠলো। স্টেজের উপর কনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একী! কনির দেহে এবার কোনো কাপড় নেই। শুধু বেলুন। অসংখ্য রবারের রঙিন বেলুন ওর লজ্জা নিবারণ করছে। রঙিন বেলুনের উপর রঙিন আলো পড়ে নানা বিচিত্র রঙের সৃষ্টি হতে লাগলো। আর তার মধ্যেই কনি নাচ শুরু করলো। কনি নাচছে। নাচছে তো নাচছেই। নাচতে নাচতেই সে তার বেলুনশরীর নিয়ে অতিথিদের মধ্যে নেমে এলো। হাতে একটা ছোট লোহার যন্ত্র রয়েছে। সেইটা একজনের হাতে দিয়ে বললে, "একটা বেলুন ফাটাও।"

ভদ্রলোক লোহার খোঁচাটা কনির বুকের কাছের একটা বেলুনে সজোরে দিয়ে দিলেন। একটা বিকট আওয়াজ করে সেটা ফেটে চুপসে গেলো।

একটু নাচানাচি করে কনি আর একজনের কাছে গেলো। তিনিও একটা ফাটিয়ে দিলেন। বেলুনের সংখ্যা যতই কমছে কনির নিরাবরণ দেহের তত বেশী অংশ দেখা যাচ্ছে। ততই হল-এর উন্মাদনা বাড়ছে। পুরুষ হরিণদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নেই। সন্দেহের ছায়া নেই কিছু। কেবল পিপাসা আছে। আর আছে রোমহর্ষ। আজ এই বসন্তের রাতে লালসা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, স্বপ্ন সবদিকে স্ফূট হয়ে উঠেছে।

কনির দেহে এখন মাত্র তিনটে বেলুন রয়েছে। সেই বেলুনগুলো ফুটো করবার জন্যে কয়েকজন বুড়ো একসঙ্গে ছুটে এলেন। দু'ম দু'ম করে কয়েকটা আওয়াজ হলো—আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো নিভে গেলো। সেই অন্ধকারে পালাতে গিয়ে কার্পেটে পা আটকিয়ে বেচারা কনি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। অন্ধকারের মধ্যেই তাড়াতাড়ি তাকে টেনে তুললাম। হাঁপাতে হাঁপাতে সে কোনোরকমে বললে, "প্লিজ, আমার আলখাল্লাটা দাও।"

আলখাল্লাটা তার হাতে দিয়ে দিলুম এবং সে ছুটে হল, থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আলো জজ্বলে উঠলো। সেই আলোতে এতোক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমারই ঠিক পাশে কনির একজোড়া জুতো পড়ে রয়েছে। গোমেজ মাথা নিচু করে তাঁর ছেলেদের নিয়ে যন্ত্রগুলো গুছোতে লাগলেন। মাইকের কাছে গিয়ে কোনোরকমে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এই আনন্দসভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে কনি এবং শাজাহান হোটেলের তরফ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুভরাত্রি।"

এখনও মুক্তি নেই। ফোকলা চ্যাটার্জি কাছে এসে বললেন, "মিস্টার রঙ্গনাথন কনির সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।"

আরও দু'-একজন একই অনুরোধ করলেন। বললাম, "স্যরি, তার কোনো উপায় নেই।"

ফোকলা দেহটা দু'লিয়ে বললেন, "এইজন্যই আমি প্রথম শোতে আসতে চাই। পরের শোতে মেয়েটা এতোটা ফ্রী থাকবে না। কলকাতার ল' অ্যান্ড অর্ডারের মালিকরা এতোটা কিছুতেই অ্যালাউ করবে না। অন্তত লাস্ট তিনটে বেলুন কিছুতেই ফাটাতে দেবে না।" যাবার আগে ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "আর-একটা কথা, আপনি বেঙ্গলী বলেই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, ওরা বোধহয় একেবারে নেকেড হয় না। তাই না? সেটা তো ক্যালকাটায় চলে না। বোধহয় একটা পাতলা সিল্কের বা নাইলনের কিছু পরে থাকে, তাই না?"

কানের পাতা দু'টো বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। মুখে দিয়ে কথাও বেরচ্ছিল না। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।"

আমার সামনে গোমেজ তখন এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, “চলুন, এবার ঘরে ফেরা যাক।”

ফোকলা চ্যাটার্জি আর রঙ্গনাথনের মধ্যে কী কথা হলো। ফোকলা আমার হাতটা ধরে বললেন, “চলুন না, একটু প্রাইভেট কথা ছিল স্ট্রিক্টলি প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল।”

ফোকলার সঙ্গে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, “আপনাদের এখানে এলে বড় আনন্দ হয়। এমন রেসপেক্টেবল হোটেল ইণ্ডিয়াতে আর একটাও নেই। অন্য জায়গাতেও তো শো হয়, কিন্তু সেখানে ডিগনিটি থাকে না। যা বলছিলাম, আপনি বেঙ্গলী। আপনাকে আমার দেখা কর্তব্য। যাতে আপনিও মাইনে ছাড়া দু'টো পয়সা হাতে পান, তার জন্যে চেষ্টা করা আমার ডিউটি।”

আমি তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। ফোকলা চ্যাটার্জি এবার রঙ্গনাথনের দিকে ঝুঁকে, ওঁর কাছ থেকে গোটা কয়েক দশ টাকার নোট নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, “আসলে মুশকিল হয়েছে কি জানেন? মিস্টার রঙ্গনাথন খুবই লোনলি ফিল করছেন। কলকাতায় নিঃসঙ্গ পড়ে আছেন। আমি এখনই বাড়ি ফিরে যাবো। আমার ওয়াইফ এখনও ওয়েট করছেন। কনিকে একটু রাজী করিয়ে দেন যদি। রাত্রি তো এখনও বেশী হয়নি। তাছাড়া ওদের তো রাত্রিজাগা অভ্যাস আছে। সারাদিন তো ওরা ঘুমোতে পারে।"

কোনো উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। শুধু হাতটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্যরিয়ে নিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাত্রের অন্ধকারে হা-হা করে হেসে উঠলেন ফোকলা চ্যাটার্জি। হাসতে হাসতেই বললেন, “টু ইয়ং! আপনি একেবারে কাঁচা। একেবারে কচি!"

নোটগুলো নিজের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে তিনি বললেন, “বেশ মুশকিলে ফেললেন আপনি। এ-জানলে অন্য কোথাও আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করে রাখতাম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারচেজ অফিসার। ওকে তো আর যে-কোনো জায়গায় রাত কাটাতে বলতে পারি না।”

মিস্টার রঞ্জনাথনকে নিয়ে ফোকলা চ্যাটার্জির গাড়ি চলে গেলো। আমারই সামনে দিয়ে একে একে সমস্ত গাড়িগুলো তাদের মালিকদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না। আজ সন্ধ্যাতে খাওয়ার সময় পাইনি। তবু এখনও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই হঠাৎ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলকাতা এবার সত্যিই ঝিমিয়ে পড়েছে। কে যেন পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে অসুস্থ কলকাতাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে রাত্রের কলকাতার এমন শান্ত অথচ ভয়াবহ রূপ আমি কোনোদিন দেখিনি। হোটেল থেকে বেরিয়েই চিত্তরঞ্জন এভিন্যু ধরে কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে যার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তাঁর নাম স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। চৌরাস্তার মোড়ে বিচারকের বেশে বিশালবপু স্যর আশুতোষ সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্যর আশুতোষের মাথার অনেক উপরে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের চূড়ায় গোলাকার আলোর পৃথিবীটা নিজের মনে ঘুরছে।

আবার আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা করি। বোসদা বলে দিয়েছিলেন, শুধু দেখে যাবে, প্রশ্ন করবে না। তবুও দু'পুর রাতে নিজেকে প্রশ্ন করতেই হলো,

এই কি কলকাতা? এই কি আমাদের সব স্বপ্নের ধন শহর কলকাতা? না, লিবিয়ার গহন অরণ্যে সহায়-সম্বলহীন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি? সেই রাত্রেই এই কলকাতার এক নাগরিক কবিকে মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি সত্যসুন্দরদার প্রিয় কবি। সত্যসুন্দরদাই আমাকে অনেকবার পড়ে শুনিয়েছেন—

"হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;

অথবা সে-হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফে'সে।

এখন দু'রে রাত, নগরীতে দল বেঁধে নামে।

নিতান্ত নিজের সুরে তুবও তো উপরের জানালার থেকে গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।

থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।
নাগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবু ও জন্তুগুলো আন্দপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বিস্তৃত কাপড় পরে লজ্জাবশত।”

“হুজুর, আপনি এখানে?”

আমি চমকে উঠে দেখলাম, আমাদেরই হোটেলের দু’জন ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। “তোমরা এখানে?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“আমরা এখানেই ঘুমোই। রান্নাঘরে একটুও জায়গা নেই। কুকের মেটরা সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না।”

হোটেলের লাউঞ্জে অনেক জায়গা পড়ে আছে, কার্পেটের উপর ইচ্ছে করলেই কয়েকটা লোক ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে হোটেলের সৌন্দর্য নষ্ট হবে! সেখানে কাউকে ঘুমতে দেওয়া যায় না। বাইরের গাড়িবারান্দাও নিষিদ্ধ। সেখানে হোটেলের কর্মচারী পড়ে থাকলে হোটেলের সম্মানের ক্ষতি হয়। তাই স্যর আশভোষ এবং ভিক্টোরিয়া হাউসের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই ।

“তোমরা খেয়েছো?” প্রশ্ন করলাম।

“হ্যা, ছোটো শাজাহানের সঙ্গে পাকা বাবস্থা করা আছে। প্রত্যেক মিল চৌদ পয়সা। শুধু মায়াধর খায়নি।”

"কেন মায়াধর, তুমি খাওনি কেন?” আমি প্রশ্ন করলাম। মায়াধর তখন ঘাসের উপর বসে পড়েছে : যন্ত্রণায় পায়ের ডিমটা সে চেপে ধরে আছে। বেয়ারাদের একজন বললে, “ওর পায়ের ব্যথা বেড়েছে। পায়ের শিরাগুলো আজকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।”

হাঁটু গেড়ে বসে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বিনা পয়সার আলোয় দেখলাম, ওর পায়ের নীল শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে। যেন অনেকগুলো নীল সাপ একসঙ্গে ওর পা জড়িয়ে ধরেছে। সত্যদার কাছে শুনেছি, এর নাম ভেরিকোজ ভেন।

বেয়ারাদের একজন বললে, “হুজুর, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় পা দু'টোকে কেটে ফেলে দিই। আমাদের শেষ ওতেই। বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শিরাগলো ফুলতে আরম্ভ করে। সায়েবদের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয় হুজুর। স্টুয়ার্ড—জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে।”

"ডাক্তার দেখাও না তোমরা?” আমি জিজ্ঞেস করেছি।

"সুই লাগাতে হয়, অনেক টাকা লাগে। আার ডাক্তার বলে, পা দু'টোকে বিশ্রাম দাও। তা হুজুর, হোটেলের কাজ করবো আবার পা-কে বিশ্রাম দেবো তা তো হয় না।"

মায়াধরকে বললাম, “তুমি এখনও ডাক্তার দেখাওনি?”

মায়াধর বললে, “বোসবাবু এক জানাশোনা ডাক্তারের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। টাকা জমাচ্ছি—অনেক সুই দিতে হবে যে। এবার যেতেই হবে। নইলে ভরতের মতো হবে। এর পরেই সমস্ত পায়ে ঘা হবে। সে ঘা ফেটে রক্ত পড়বে। আর দাঁড়িয়ে থাকবার মতো অবস্থা থাকবে না। চাকরি চলে যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যেতে হবে হুজুর।"

'রাত অনেক হয়েছে, তোমরা শুয়ে পড়ো।” এই বলে আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

কোথায় যাবো আমি? আমি নিজেই তা জানি না। রাতের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কে এসে ঢুকলাম। সেখানেও অনেকে ঘুমিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যেও শাজাহান হোটেলের আমার সহকর্মীরা আছে কিনা কে জানে। স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার পদতলে পাথরবাঁধানো লোভনীয় জায়গাটা কয়েকজন 'ভাগ্যবান অনেক আগেই দখল করে নিয়েছে। রেলিংয়ের পশ্চিমদিক থেকে রাস্তার আলো এসে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার পা ধুইয়ে দিচ্ছে। সেই আলোর অত্যাচার থেকে রক্ষে পাবার জন্যে 'হরিরাম ধর্মশালা'র অতিথিরা বেশ সুন্দর বুদ্ধি খাটিয়েছে। চোখের উপর বড়ো বড়ো শালপাতা চাপিয়ে তারা একটা আবরণ সৃষ্টি করেছে। কর্পোরেশনের বিনা পয়সার বিতরিত আলো শালপাতার উপর এসে

আটকে গিয়েছে। তার তলায় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারেই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে আমার ভারতবর্ষ।

ঘুরতে ঘুরতে যখন আবার হোটেলে ফিরে এলাম, তখন রাত অনেক। আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে ইংরিজী ক্যালেন্ডারের পুরনো তারিখটাও শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়েছে। কেন জানি না, জনহীন কলকাতার রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, এতোদিনে আমি সাবালক হয়ে উঠছি। এতোদিন অনভিজ্ঞ বালকের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছি আমি; পরিপূর্ণ হইনি আমি। আজ রাত্রে আমি পরম পূর্ণতা লাভ করেছি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে এতোদিনে যেন নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করছি আমি।

হোটেলে ঢোকার পথে দেখলাম, সত্যসুন্দরদা তখনও রিসেপশন কাউন্টার আলো করে বসে আছেন। শাজাহানের কাউন্টারে এখন কোনো লোক নেই। পৃথিবীর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, সত্যসুন্দরদা একা জেগে রয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যসুন্দরদা যেন কিসের ইঙ্গিত পেলেন। চোখ দু'টো বোধহয় একটু লাল হয়েছিল। হাত দু'টো চেপে ধরে সত্যসুন্দরদা বললেন, "শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? কোথায় গিয়েছিলে? রাত্রে কিছুই খাওনি। জুনো সায়েবকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললে তোমাকে খেতে দেখেনি। শেষে বুড়োর কাছ থেকে গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ আদায় করে, এই ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এখন শাজাহানে কেউ আসবে না। সুতরাং নিয়ম মানবার দরকার নেই। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের ছেলেদের মতো খেয়ে নাও।" সত্যসুন্দরদা যেন বুঝতে পারছেন আমার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমার মনের সুবোধ সুশীল ইস্কুলবয়টাকে তাড়িয়ে দিয়ে, একটা অপরিচিত ভয়াবহ পুরুষ সেখানে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। কোনোরকমে বললাম, "সত্যসুন্দরদা, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"সেইজন্যেই তো স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে রেখেছি! খিদে থাকলে আধডজন স্যাণ্ডউইচে কিছুই হতো না। তাছাড়া, তোমাকে আজ খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। চমৎকার অ্যানাউন্স করেছো। কনিও খুব খুশী। কনি তো বিশ্বাসই করলে না, জীবনে কোনোদিন তুমি ক্যাবারে আর্টিস্টদের প্রেজেন্ট করোনি।"

আমার চোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে! আমার আপত্তি অমান্য করে চোখের জল কেন যে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারলাম না।

মানুষের মনের কথা বোসদা যেন অতি সহজেই বুঝে ফেলেন। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, একদিন এই হোটেলে তোমার জুড়ি থাকবে না। কাউন্টারে, বারে, ক্যাবারেতে তোমাকে না-হলে এক মুহূর্তও চলবে না।"

বোসদা এবার দেখতে পেলেন, আমি কাঁদছি। "কী হলো? ছিঃ, কাঁদছো
কেন?' পরমুহূর্তেই বোসদা আমাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন। আমার মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। শাজাহানের আগুনে এতোদিন পুড়ে পুড়েও বোসদা যে ছাই হয়ে যাননি, তা আবিষ্কার করলাম। জড়িত কণ্ঠে বোসদা বললেন, "আমি খুব খুশী হয়েছি। তুই যে কাঁদছিস, এতে আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু দেখে যা। দেখার এমন সুযোগ জীবনে আর কখনও হয়তো পাবি না। কিন্তু চিরকাল এমন থাকিস। চিরকাল যেন এমন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে পারিস।" .

'তুমি' থেকে বোসদা 'তুই'-তে নেমে গিয়েছিলেন, এবার আবার 'তুমি'-তে ফিরে এলেন। বললেন, "সাপারে বসে কনি তোমাকে খুজছিল। ভারি মিশুকে মেয়েটা। চমৎকার কথাবার্তা বলে। অনেক মজার মজার গল্প বলছিল। সারা জীবনটাই তো যাযাবরের মতো কাটিয়ে দিলো। পৃথিবীর এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে নাচতে নাচতেই ওর বসন্ত শেষ হয়ে যাবে। কনিই বলছিল, খোলোয়াড়, অভিনেত্রী এবং নর্তকীর জীবনে মাত্র একটি ঋতুই আছে। তার নাম বসন্ত ঋতু। এরা সকলেই কেবলমাত্র যৌবনে ধন্য। ভদ্রমহিলা আরও গল্প নাতেন। কিন্তু ল্যামব্রেটাকে নিয়েই বিপদ হলো। বামনটা বার-এ যেতেই কয়েকজন মহিলা ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। তাতে অপমানিত হয়ে ল্যামব্রেটা বাগানের টেবিলের উপর বসে পড়ে। ভদ্রমহিলা মেটারনিটি জ্যাকেট পরে স্বামীর সঙ্গে বার-এ বসেছিলেন। ল্যামব্রেটা তাকে বলে, 'আমার দিকে ওইভাবে তাকিও না। তোমার যে ছেলে হবে, আমার থেকেও সাইজে ছোটো হবে!'

ভদ্রমহিলা সেই শুনে ফেণ্ট হয়ে যাবার দাখিল। খবর পেয়ে আমরা আবার পাব এ গিয়ে এঁদের সামলাই। কনিও জোর করে ল্যামব্রেটাকে ঘরে নিয়ে গেলো। আড্ডাটা জমলো না।”

বোসদা বললেন, “যাও, শুয়ে পড়গে। আমিও চেয়ারে বসে একটু ঢুলে নিই। রাত চারটের সময় কয়েকজন গেস্ট চলে যাবেন, তাঁদের জাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।”

ছাদের উপরে উঠে আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে খুললাম। এই সময় কাউকেই জেগে থাকতে দেখার আশা করি না। গুড়বেড়িয়াও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু পা দিয়েই দেখলাম একটা চ্যাপ্টা মদের বোতল নিয়ে ল্যামব্রেটা ছাদের ধুলোর উপরেই বসে আছে। কোট-প্যান্ট-টাই সে কিছুই ছাড়েনি। মাঝে বোতলের মুখটা খুলে সে দু’' এক ঢোক গিলে নিচ্ছে। আমাকে দেখেই ল্যামব্রেটা উঠে দাঁড়ালো। বললে, "কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখছো?”

আমার তখন চাঁদ দেখবার মতো মানসিক অবস্থা নেই। বললাম, “ঘুমোবেন না"

মদের বোতলটা হাতে করে ল্যামব্রেটা এবার সোজা আমার সঙ্গে চলে এলো। অনুমতি না-নিয়েই ঘর খোলামাত্রই সে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ল্যামব্রেটার চোখ দু’টো দেখলে ভয় লাগে। যে আমুদে ক্লাউন কিছুক্ষন আগেও কলকাতার সাড়ে তিনশো লোককে হাসিয়ে এসেছে, সে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

ল্যামব্রেটা বললে, “আমি শুনলাম, তুমি এখানেই ঘুমোও। তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কাল থেকে ক্যাবারেতে অন্য কাউকে তুমি কনির কোলে বসতে ডাকবে না। তাহলে বিপদ হবে।”

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা কি মদে চুর হয়ে আছে? আমার উত্তরের অপেক্ষা না-করে, ল্যামব্রেটা বললে, "কলকাতার লোকরা, তোমরা জানোয়ার। তোমাদের বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদিমা কেউ মানুষ ছিলেন না। সব জানোয়ার।” বলেই ল্যামব্রেটা তার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নাচতে শুরু করলো। সঙ্গে গান। সে গানের অর্থ—‘আমাদের এই দু’নিয়ায়

সবাই জানোয়ার। যদি বিশ্বাস না-হয়, আমার সঙ্গে রাতে খারাপ পাড়ায় চলো, না-হয় অন্তত হোটেলে এসো।'

আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে। এই সময় কোন পাগলের হাতে পড়লাম! বললাম, “মিস্টার ল্যামব্রেটা, রাত অনেক হয়েছে।” ল্যামব্রেটা এবার কুৎসিত গালাগালি শুরু করলো। “রাত হয়েছে তো কী হয়েছে? কী তোমার সতী সাবিত্রী হোটেল। এখানে রাত ন'টা বাজলেই সব ব্যাটাছেলে যেন ঘুমিয়ে পড়েন!”

বললাম, “মিস্টার ল্যামব্রেটা, সারাদিন কাজ করে ক্লান্তি অনুভব করছি।” বিছানার উপর উঠে নাচতে নাচতে ল্যামব্রেটা বললে, “কনির কোলে বসে পড়বার সময় তো সে-কথা মনে থাকে না?” বললাম, “আমাকে এসব বলে লাভ কী? আমি তো কনির কোলে বসিনি।”

“না, তোমরা বসবে কেন? তোমরা রোমের পোপ, তোমরা ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, তোমরা লর্ড— বুদ্ধার ডাইরেক্ট ডিসেনডেন্ট! কনির যে একটা কোল আছে, তাই তোমরা ক্যালকাটার সিটিজেনরা জানো না।”

ল্যামব্রেটার হাবভাব দেখে মনে হলো, মদের ঘোরে সে এবার আমার ঘরের জিনিসপত্তর ভাঙতে আরম্ভ করবে।

নিরুপায় হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গুড়বেড়িয়াকে খবর করলাম। গুড়বেড়িয়া ঘুমোচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললে, “কী হয়েছে? দেবতা কিছু গণ্ডগোল করছে নাকি?"

দেবতাই বটে! বামন সায়েবকে দেখে গুড়বেড়িয়ার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অবতার। গুড়বেড়িয়াকে বললাম, “তোমার ভগবান টগবান রাখো। এখন মাতাল সায়েবকে কী করে ঘর থেকে বের করা যায় বলো?”

গুড়বেড়িয়া আমার তোয়াক্কা রাখে না। আমার খুশী-অখুশীতে তার চাকরি নির্ভর করে না। তাছাড়া, ক্ষতি যা হবার তা প্রায় হয়েই গিয়েছে। পরবাসীয়া মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে।

ভেবে দেখলাম, কোনো উপায় নেই। কনিকে ডেকে পাঠানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই। গুড়বেড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কনি মেমসা'য়ব কোথায়?"

গুড়বেড়িয়া বললে, "নিচের তলায়।" বাধ্য হয়েই ফোন করলাম। টেলিফোনটা বেজে উঠতেই কনি ফোনটা ধরলে; এতো রাত্রে কেউ যে তাকে ফোনে ডাকতে পারে, সে বোধহয় ভাবতেও পারেনি। বললে, "কে? কী ব্যাপার?"

যথাসম্ভব কম কথা খরচ করে আমার সমস্যার কথা কনির কাছে নিবেদন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলাম, "এতো রাত্রে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করা আমার উচিত নয়; কিন্তু ল্যামব্রেটার মাতলামো আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।"

কনি বেশ ভয় পেয়ে গেলো। সে যে চমকে গিয়েছে, তা তার গলার স্বর থেকেই বুঝলাম। কনি বললে, "আমি এখনই ছাদে যাচ্ছি।"

কনি ছাদে আসছে শুনে গুড়বেড়িয়া তড়াং করে উঠে দাঁড়ালো। "এতো রাত্রে ল্যাংটা মেমসায়েবদের আবার ছাদে আসবার দরকার কী?"

ছাদের দরজাটা এবার মূহুর্তের জন্যে খুলে গেলো। সেখানে স্লিপিং গাউনে দেহ আবৃত করে, মাথায় সিল্কের বনেট জড়িয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক ঘণ্টা আগে সে কলকাতার গণ্যমান্যদের মনোরঞ্জন করছিল। তার ভঙ্গীতে তখন লাস্য ছিল, যৌবনের দেহ ছিল। কিন্তু রাত্রের এই অন্ধকারে, 'আমার চোখের সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে যেন অন্য কেউ। সে আর যাই হোক—কনি দি উয়োম্যান নয়। এ কনিতে একটুও আগুন নেই। নিতান্ত একঘেয়ে হলেও, সেই পুরনো উপমাই মনে পড়ছে—তার মুখে আকাশের চাঁদের স্নিগ্ধতা।

কনি বললে, "কোথায় সে? আপনাকে অ্যাটাক করেছিল নাকি?"

বললাম, "আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু আমার ঘর অধিকার করে বসে আছে। ওখানে বসে বসে মদ খেতে খেতে অনেকটা হুইস্কি আমার বিছানার তোশকের উপর ফেলে দিয়েছে।"

আমার কথা শুনে কনি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলো। আস্তে আস্তে বললে, "আই অ্যাম সো স্যরি, বাবু।" কনি সোজা আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। ঢুকেই অস্ফুট স্বরে

বললে, “হ্যারি!”

ল্যামব্রেটার যে আর কোনো নাম থাকতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। হ্যারি নামটা শুনেই ল্যামব্রেটা চমকে উঠে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। কনিকে দেখেই, প্রথমে সে হুইস্কির বোতলটা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে। যেন ওইটা কেড়ে নেবার জন্যেই কনি ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। ল্যামব্রেটা বোধহয় সব বুঝতে পারলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রতিবাদের সাহস যোগাড় করে বললে, “আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। জানোয়ারের বাচ্চাদের আমি ছারপোকার মত। টিপে মেরে ফেলবো। তাতে তোমারই বা কী? আর এই গালফুলো বেলুনমুখো ছোকরারই কী?”

কনি দাঁতে দাঁত চেপে বললে, “হ্যারি, রাত্রি অনেক হয়েছে। তুমি এই বিনীত ভদ্রলোকের বিছানা নষ্ট করে দিয়েছো।”

“তার জন্যে আমি স্যরি। আমি ইচ্ছে করে করিনি। ছারপোকা মারতে গিয়ে বোতলটা পড়ে গিয়েছিল। তাতে ওঁর কী ক্ষতি হয়েছে? আমারই তো লোকসান হলো।”

“হ্যারি!” কনি এবার আরও চাপা, অথচ আরও তীব্র স্বরে বললে। ল্যামব্রেটাও এবারে দপ করে জ্বলে উঠলো। “বেশ করবো। আমার যা খুশী তাই করবো। তাতে তোমার কী? এক মগ বীয়ার নিয়ে এসে আমি এই ছোঁড়ার মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেবো ; দু’ বোতল রাম দিয়ে আমি নিজের কোট কাচবো; হোয়াটস দ্যাট টু ইউ?”

এমন অবস্থার জন্যে কনি বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। ল্যামব্রেটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। লজ্জায় অপমানে কনির মুখে যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, তা আমি বুঝতে পারলাম। কনি নিজের দেহের সব রাগ চেপে রেখে, আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে গেলো ঘরের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে রয়েছি। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে কনি আমাকে বললো, “প্লিজ, তুমি যদি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।”

কোনো কথা না বলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সে বোধহয় এক মিনিটেরও কম সময়ের জন্য। তারই মধ্যে যেন মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেলো। কোনো

এক আশ্চর্য উপায়ে ল্যামব্রেটা তার সংবিৎ ফিরে পেয়েছে! কনি আমাকে ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কাম ইন।"

ভিতরে ঢুকে দেখলাম, ল্যামব্রেটা একেবারে জল হয়ে গিয়েছে। বলছে, "প্লিজ। আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি রিয়েলি স্যরি।" কনি বললে, "আর নয়। আমি অনেক সহ্য করেছি।"

ল্যামব্রেটা এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমি এখনই নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি।"

"যাও। এখনি নিজের ঘরে চলে যাও।" কনি বললে।

নিজের ঘরে যাবার জন্যে উঠে পড়ে ল্যামব্রেটা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলো। অভিমানে ছোটো ছেলের মতো মুখ ফলিয়ে কনিকে বললে, "তুমি শুধু আমার দোষ দেখো। আর ওরা যে আমাকে শিম্পাঞ্জি বললে। তখন? তখন তো কিছু বললে না?" ছোটো ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে ল্যামব্রেটা নিজের ঘরে চলে গেলো। কনি কিছু বলার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু কোনো কথা না শুনে ল্যামব্রেটা নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দড়াম করে দরজা ভেজিয়ে দিলো।

আমি দেখলাম, দরজার সামনে কনি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বার জন্যে আমিও তৈরি ছিলাম না। কনি এবার আস্তে আস্তে ছাদের এক কোণে এসে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম, কনি কাঁদছে। কনি দি উয়োম্যান স্লিপিং গাউনের হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছে। আস্তে আস্তে সে এবার আমাকে বললে, "ব্রুটস্। পৃথিবীর এই লোকরা ব্রুটস্ । হ্যারির সামনে শাজাহানের বার থেকে উঠে এসে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে —'তোমার এই ক্লাউনটা শিক্ষিত শিম্পাঞ্জি না মানুষ?"

"ও যদি নিজের ঘরে বসে মাতলামো করতো কিছু বলতাম না। আমি দেখতেও যেতাম না। ওই তো আমাকে বাধ্য করলে। আমার কী দোষ?" কনি যে সত্যিই কাঁদছে তা আমার বুঝতে বাকি রইলো না। সে বললে, "তুমি কিছ মনে কোরো না। সারাদিন খেটে খুটে তুমি যখন ঘুমোতে এলে, তখন হ্যারি তোমার মুডটা নষ্ট করে দিয়ে গেলো।"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, “তাতে কী হয়েছে। উনি তো আর জেনে শুনে কিছু করেননি। নেশার ঘোরে কেউ কিছু করলে, তার জন্য তাকে দোষী করা চলে না।”

কনি বললে, "যাই, ওকে আর একবার দেখে আসিগে যাই।" কনি এবার ল্যামব্রেটার ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকে গেলো। আজ আমার ঘুম আসবে না। গুবেড়িয়াকে এক গ্লাস জল আনতে বলে, আমি আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু কনির কী হলো ল্যামব্রেটার ঘরে সেই যে সে ঢুকেছে, আর বেরোবার নাম নেই। ঘরের মধ্যে আলো জলছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। ঘরের দরজাটা কনি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা দু’জনে কি কোনো কথা বলছে? না তো। ফিসফিস করে কথা বললেও কাঠের পার্টিশন ভেদ করে কিন্তু, গুঞ্জন এই স্তব্ধ রাত্রে আমার কানে এসে হাজির হতো।

গুড়বেড়িয়া আমার হাতে জলের গেলাসটা দিয়ে দিলো। জলটা এক নিশ্বাসে পান করে ফেললাম। বুকের ভিতরটা যেন একেবারে শুকনো মরুভুমি হয়ে ছিল। গুড়বেড়িয়া এতোক্ষণে কোনো গণ্ডগোলের আভাস পাচ্ছে।এই রাত্রে ছাদের ঘরগুলোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। সেখানে কোনো অঘটন ঘটলে তার চাকরিটাই আগে যাবে। গুড়বেড়িয়া ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে, "ল্যাংটা মেমসায়েব নিচে চলে গিয়েছেন তো?”

আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম, মেমসায়েব এখনও যাননি।

“এ্যা! যাননি? তাহলে কোথায় তিনি?”

ইশারায় গুড়বেড়িয়াকে দেখিয়ে দিলাম। গুড়বেড়িয়া বললে, “হুজুর, যতদু’র মনে হচ্ছে ঘরের আলো নেভানো। তাই না?”

বললাম, “আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" সন্দেহ নিরসনের জন্যে গুডবেড়িয়া এবার সোজা ল্যামব্রেটার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ঘরের কাছাকাছি গিয়ে, কাঠের ফাঁক দিয়ে সে উকি মেরে নিঃসন্দেহ হতে চাইলো, ঘরের আলো নিভে গিয়েছে কিনা। আমি তখনও বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। গুড়বেড়িয়া ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো। বললে "সব্বোনাশ হুজুর। বুলু আলো জ্বলছে।”

‘তাতে তোর কী?” আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম।

'কী বলছেন, সায়েব! ঘর একেবারে অন্ধকার থাকলে আমি এতোটা ভয় পেতাম না।” পরবাসীয়া আমাকে প্রথম দিন বলে দিয়েছিল, “আলো থাকলে ভয় নেই, আলো না থাকলেও তেমন ভয় নেই, কিন্তু দু'শমন হচ্ছে ঐ বুলু আলো।” গুড়বেড়িয়ার এবার কেঁদে ফেলবার অবস্থা। চোখ মুছতে মুছতে বললে, “আমাকে শনিতে ধরেছে। আমার আর চাকরি থাকবে না।"কাঁদতে কাঁদতে সে নিবেদন করলে, "ল্যাংটা মেমসায়েবদের উপর কড়া নজর রাখবার হুকম আছে। তদের বার-এ ঢুকতে দেওয়া বারণ ; তাদের ঘরে কোনো পুরুষমানুষদের ঢুকতে দেওয়া বারণ ; কোনো পুরুষমানুষের ঘরেও তাদের প্রবেশ নিষেধ। যদি কারর ঘরে সে ঢুকেও পড়ে, দরজা হাট করে খুলে রাখতে হবে। আমার চাকরিটা আজ গেলো হুজুর!”

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, “অতে। ভয় পাচ্ছো কেন? এই রাত্রে কে তোমার ছাদে আসছে?”

“আপনি জানেন না। মার্কোসায়েব রবারের জুতো পরে কখন যে এসে পড়বেন, কিছুই ঠিক নেই। সায়েব কোনো কথা শুনবেন না। সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে দু'র করে দেবেন। করিমকে সেবার যেমন সায়েব ঘাড় ধরে বের করে দিলেন। তখনকার ল্যাংটা মেমসায়েব একজন সায়েবকে রাত্রে ছেড়ে দিতে বলেছিল। ছেড়েও দিয়েছিল করিম। পাঁচটা টাকার জন্যে করিমের সব গেলো।”

গুড়বেড়িয়া এবার দরজায় ধাক্কা দেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। চাকরি যাবার ভয়ে বামনাবতার তার মাথায় উঠেছে। আমি বাধা দিলাম। বললাম, “গুড়বেড়িয়া, সারাদিন কাজ করে বহু পরিশ্রান্ত লোক এখন ঘুমোচ্ছে। এখন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি কোরো না।" গুড়বেড়িয়া আমার কথার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত খুজে পেলো কে জানে। মনে হলো সে সন্দেহ করছে, মেমসায়েবের ওই ঘরে ঢুকে পড়ে নীল আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পিছনে আমারও কোনো হাত আছে। গুড়বেড়িয়া এবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব আর ভাষায় প্রকাশ করতে সাহস করলে না।

আজ রাত্রের আকাশকে আমার বড় বিষণ্ন মনে হচ্ছে। যেন সৃষ্টির ভাণ্ডারে যত আনন্দ ছিল, পৃথিবীর বেহিসেবী মানুষরা সব উড়িয়ে দিয়েছে। যা পড়ে আছে? সে কেবল

দুঃখ। কারোর জন্য কোথাও এক ফোঁটা প্রশান্তি অবশিষ্ট নেই।

ল্যামব্রেটার ঘরের দরজা এবার খুলে গেলো মনে হলো। ঘরের নীল আলোটা এখন আর জলছে না। সেখানে নির্ভেজাল অন্ধকার। আন্ন সেই অন্ধকারের মধ্য থেকেই শ্বেতদ্বীপবাসিনী কনি লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির দিকে আসতে আসতে সে আমাকে দেখতে পেলো। আমাকে সে যে দেখতে পাবে তা বোধহয় তার হিসাবের মধ্যেই ছিল না। কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করেই সে নিজের ঘরে চলে গেলো।

"গন্ধ পাচ্ছি। বেশ গন্ধ পাচ্ছি। নিত্যহরি ভট্চার্যির নাককে ফাঁকি দেওয়া কঠিন কাজ।" আমার ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন। রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি। সেই সময়েই নিত্যহরিবাবু নিজের ঘর ছেড়ে উঠে এসেছেন। রাত্রে ওঁর মোটেই ঘুম আসে না; তাই আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবার জন্যে আমার ঘরে চলে এসেছেন। আমার তোশক এবং বিছানা চাদরের অবস্থা ঘরে ঢুকেই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, "তা বেশ বেশ। আমাদের শাস্ত্রেই রয়েছে যস্মিন্ দেশে যদাচার।"

গতরাত্রে আমার ঘরে যে কাণ্ড হয়েছিল তা এবার তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, বললাম, "মাতাল সায়েবটা বিছানার উপর উঠে যা কাণ্ড করলে।"

ন্যাটাহারি আমাকে কতখানি বিশ্বাস করলেন তা তাঁর কথা থেকেই বুঝলাম। মুখ বেকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মশাই, এই নিত্যহারি ভট্টাচার্যও তার বাবাকে একদিন বলেছিল যে, তাকে শিখ পাঞ্জাবীতে ধরে নিয়ে "

এ রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম না-করতে পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ন্যাটাহারিবাবু , অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "কতবার আর রিপিট করবো? আপনার বাবা কী আপনাকে দু'ধের বদলে পিটুলি গোলা খাইয়ে মানুষ করেছেন? আপনার ব্রেনটা যে কিছুই মনে রাখতে পারে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। নিত্যহরিবাবু বললেন, "বাবার কাছে আমি শিখ পাঞ্জাবীর গল্প বানিয়ে ছাড়লাম। বাবা ঋষিতুল্য সরল মানুষ, আমাকে বিশ্বাস করলেন। মহাপাপ করেছিলাম। উপরে যিনি রয়েছেন, তিনি তো সব দেখছেন। সেখানে ফাঁকি দেবার উপায় নেই! সব কর্মের নগদ বিদায় দেবার জন্য হাতে থলে নিয়ে তিনি সংসারের ফটকে এসে রয়েছেন। না হলে, রাঢ়ী শ্রেণী, ফুলিয়া মেল, ভরদ্বাজ গোত্র নিত্যহারি ভট্টচার্যকে ধোপার কাজ করতে হয়? দু'নিয়ার পাপ দু''হাতে ঘাঁটতে হয়? সারারাত ধরে এই পোড়া হোটেলের ঘরে ঘরে, খোপে খোপে যত পাপ তৈরি হচ্ছে, যত অনাচার বালিশে, তোশকে, চাদরে,

কাপড়ে মাখামাখি হচ্ছে তা সব আমাকে পরিষ্কার করতে হয়?” নিত্যহারিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

তারপর যেন আমাকে সাবধান করবার জন্যেই বললেন, “এমন হতো না, বাউনের ছেলে, লেখাপড়া শিখে আমিও এতোদিনে বাবার মতো বঙ্গবাসী কিংবা রিপন কলেজে একটা প্রোপেচারি করতে পারতাম। প্রেপেচার তো আমার বাবাও ছিলেন। প্রেপেচারের রক্তই তো মশাই এই শর্মার শিরায় শিরায় বইছে।” নিত্যহরিবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কী ভেবে গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, “সে রক্তের এক ফোঁটাও আজ আর এই শরীরে নেই,

কবে জল হয়ে গিয়েছে। শিরা কেটে দিলে নিত্যহরির দেহ থেকে এখন যা বেরোবে সে আর রক্ত নয়, সে কেবল সাবান আর সোডার ফেনা।”

নিত্যহরিবাবু বললেন, "ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বয়ে গিয়েছিলাম, মশাই। একদিন রাত্রে তো মদ গিললাম। পাল্লায় পড়ে বেপাড়ায় গেলাম। কিন্তু বাবা আমার মাটির মানুষ। বই ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। মাও তথৈবচ। পরের দিন ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?রাত্রে ফিরলি না কেন?' . আমি বললাম, ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সোজা ফিরছিলাম; এমন সময় শিখ-পাঞ্জাবীর পাল্লায় পড়লাম। ওরা ধরে নিয়ে গেলো। সারারাত কান্নাকাটি করায় আজ সকালে ছেড়ে দিলো।”

নিত্যহরিবাবু একবার ঢোক গিললেন। “গায়ে আমার মদের গন্ধ ছাড়ছিল। তবু মা আমায় বিশ্বাস করলেন, শিখ-পাঞ্জাবীদের বিছানায় শুয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছে। আপনিও বলছেন, ওই বাটকুলে সায়েব আপনার বিছানা নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে। দেখবেন মশাই।”

আমি মৃদু’ হাসলাম। নিত্যহরিবাবু বললেন, “কলকাতায় কত কচি কচি ছেলের বারোটা এইভাবে হোটেল, রেস্তোরাঁয় আর খারাপ জায়গায় বেজে যাচ্ছে, তার খবর তো আর গবরমেন্ট রাখে না। বেচারা গবরমেণ্টকেই শুধু দোষ দিই কেন, বাপেরাই রাখে না। তারা ভাবছে, তাদের ছেলেদের শিখ পাঞ্জাবীতেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।”

নিত্যহরিবাবু ততক্ষণে আমার বিছানা থেকে চাদরটা গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন। গুটোতে গুটোতে বললেন, "তোশকটাও পালটিয়ে দিই। দূরে থাকুন। পাপ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করুন।"

নিত্যহরিবাবুকে বললাম, "হাত ধোবেন?" নিত্যহরিবাবু রেগে উঠলেন। "কতবার আর ধোবো? হাত ধুয়ে ধুয়ে যে চামড়া পচে গেলো; এই সমস্ত হোটেলটাকে যদি বিরাট একটা ডেটলের গামলায় চুবিয়ে রাখা যেতো, তবে আমার শান্তি হতো।"

ওঁর ভাবগতিক দেখে আমার আর কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু নিত্যহরিবাবু ছাড়লেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "ভাল করেননি মশাই। ছিলেন শর্টহ্যাণ্ডবাবু ভাল কথা। কাউন্টারের আসুন-বসুন-বাবু' হলেন, তাও চলে যায়। কিন্তু তাঁতির আবার এঁড়ে গোরু কেনার শখ হলো কেন? ঐ রাতের নাচে যাবার কী দরকার ছিল

বললাম, "শখ করে কী আর গিয়েছি, নিত্যহরিদা? চাকরিটা তো রক্ষে করতে হবে?"

কে যেন নিত্যহরিদার ক্রোধাগ্নিতে জল ঢেলে দিলো। চাকরির কথাতে জ্বলন্ত নিত্যহরিদা দপ করে নিবে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক ভাই। এই পোড়া পেটটার জন্যে দুনিয়াতে লোকে কি না করছে? এই পোড়া পেট না থাকলে ন্যাটাহারি শর্মাও দু'নিয়ার লোকের পরনের কাপড় ঘেঁটে মরতো না।"

আমি বললাম, "এই পোড়া পেটটাই তো আমাদের সর্বনাশ করেছে। এই পেট না থাকলে ক্যাবারে গার্ল কনিকেও দেহ উলঙ্গ করে নেচে বেড়াতে হতো না।"ন্যাটাহারিবাবু এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "পেট ছাড়াও একটা জিনিস আছে, তার নাম স্বভাব। আপনাদের এই মেমসায়েবকে আমার কিন্তু ভাল লাগেনি।"

ভাবলাম, গতরাত্রের ঘটনাটা বোধহয় তিনি জেনে গিয়েছেন। কিন্তু ন্যাটাহারিবাবুর কথা থেকেই বুঝলাম তিনি অন্য ঘটনার কথা বলছেন। নাকের চশমাটা সোজা করে নিয়ে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "হ্যাঁ বাপু, যা সারাজন্ম সাপ্লাই করে আসছি, দু'টো এক্সট্রা বালিশ চাও বুঝতে পারি। তা না। আর এতো লোক থাকতে কিনা আমাকে! আমি তো মশাই ট্যারা! আরে মশাই, আমি খোঁজ করতে গিয়েছি আরও বালিশ লাগবে কিনা। তার উত্তর

সোজাসুজি দিয়ে দে। তা না, ঠাণ্ডা ঘরের গরম মেমসায়েব রেগেই আগুন। বলে কিনা, আমার অ্যাসিস্টান্টকেও আমার লাগোয়া এয়ারকন্ডিশন ঘর দিতে হবে।

আমি বললাম, আমি বালিশের মালিক, ঘরের মালিক নই। তবু মেমসায়েব, এই কথা বলতে পারি, শাজাহান হোটেল আপনাকে ঠাণ্ডা ঘর দিলেও, আপনার অ্যাসিস্টাণ্টকে দিতে পারবে না। মেমসায়েব বললেন, 'তাহলে সে কোথায় থাকবে?" আমি বললাম, যেখানে শাজাহান হোটেলের জন্য সবাই থাকে, ছাদে।

মেমসায়েব মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই শাজাহান হোটেলে মাসের পর মাস কত নাচের মেয়ে আসছে, তারা কেউ তো অ্যাসিস্টান্ট নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা এসে খোঁজ করে কোথায় তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। বিছানা নরম আছে কিনা। বালিশ ঠিক আছে কিনা।" ন্যাটাহারিবাবু এবার থামলেন।

আমি বললাম, "তাতে হয়েছে কি?"

"যা হবার তা হয়েছে!" ন্যাটাহারিবাবু মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "শালা|"

ন্যাটাহারিবাবু র মাথা চাপড়ানোর কারণ বুঝতে না পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "ভগবান কি আপনার মাথায় এক ফোঁটাও ঘি দেননি? আপনি কি চোখে দেখতে পান না? অমন লক্ষী প্রতিমার মত মেমসায়েব আর কোথায় ঐ বামনাবতার। কিন্তু মশাই, কি বলবো শাস্ত্রেই বলছে—যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম! কোথায় অত বড়ো নাচিয়ে, যার জন্যে আমাদের সায়েবরা হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন, আর কোথায় তার ল্যাংবোট বামন—যার শো থাকলো আর না থাকলো। অথচ বাটঁকুলের সে কী তেজ! বলে কিনা—কনি, তুমি এখানে থেকে যাও, আমি চললাম। সেই শুনে ছুড়ির মুখ শুকিয়ে আমসি। বললে— প্লিজ, তুমি রাগ কোরো না। আমি যা হয় করছি। বামন তো জানে ছুড়ি তার মুঠোর মধ্যে। ও আরও রাগ দেখালে। বললে, তুমি এখানে থেকে যাও, নাচো, লোকের হাততালি কুড়োও। আমার এসবের দরকার নেই।' কনি তখন বলে কি জানেন? নিজের কানে না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছাদে আমাকে একটা ঘর দিতে পারো না?"

নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য এতো বছর এই শাজাহান হোটেলে ময়লা কাপড় ঘে'টে মরছে। সে সব বোঝে। মনে মনে বললাম, পাশাপাশি ঘর চাও নিশ্চয়! মুখে বললাম, আমি জানি না। জিমি সায়েবকে ডেকে দিচ্ছি।

জিমি সায়েব এসে কি করলে জানি না। দেখলাম, ল্যামব্রেটা উপরে চলে গেলো। মোসায়েব ঠাণ্ডা ঘরেই রয়ে গেলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলো, মাঝখান থেকে পুওর উলুখাগড়ার ভেলুয়েবল লাইফটা চলে গেলো। আমি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, রাত্রে একস্ট্রা বালিশ লাগবে কিনা। রেগে গিয়ে তার উত্তরই দেওয়া হলো না। বরং ন্যাকা সেজে, রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো বালিশ? ঘরে তো দু'টো বালিশ রয়েছে। সিঙ্গলরুমে আর বালিশ নিয়ে কি আমি রোস্ট করে খাবো?"

"কালী, কালী, ব্রহ্মময়ী মা আমার!" নিত্যহরিবাবু এবার উঠে পড়লেন। "যাই আমি। এতোক্ষণে ধোপাগুলো কাজে ফাকি দিয়ে গাঁজা টানতে বসে গিয়েছে নিশ্চয়।" যাবার সময় ভদ্রলোক আমার চাদর আর বালিশ দু'টো নিয়েই তুলে নিলেন।

আমি বাধা দিতে গেলাম। বললাম, "বেয়ারা রয়েছে, সে নিয়ে যাক। না-হয় আপনার ধোপাদের কাউকে পাঠিয়ে দিন। আপনি......"

ন্যাটাহারিবাবু পরমহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় নবরূপে প্রকাশিত হলেন। তাঁর চোখদু'টো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো। বললেন, "ছেলেপলে নেই বলে আমার মধ্যে ভগবান কি মায়া দয়া দেননি? তুমি আমাকে এতো বড়ো কথা বললে? তোমার থেকেও আমার ছেলের বয়স কত বড়ো হতে পারতো তা তুমি জানো?" ন্যাটাহারিবাবু কথা শেষ না করেই ঘর থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।

এই ভোরবেলাতেই আমার ঘরে যে এমন একটা ব্যাপার হয়ে যাবে, তার জন্যে গুড়বেড়িয়া প্রস্তুত ছিল না। সে ঘরে ঢুকে বললে, "আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

চা-এর পাত্র শেষ করে ঘরের বাইরে এসে দেখলাম, কনি কখন ছাদের উপরে উঠে এসেছে। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে কনি শাজাহান হোটেলের মাথায় বসে সূর্যদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। ভোরবেলার সূর্যকিরণে এমন সব গোপন পদার্থ থাকে, যার সান্নিধ্যে সুন্দরীদের সৌন্দর্য নাকি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কে জানে, হয়তো তাই। কিন্তু

ভোরবেলায় এই প্রকাশ্য সূর্যসেবায় উপস্থিত অন্যান্য জীবদের যে সামান্য অসুবিধা হতে পারে, তা যেন কনির খেয়াল নেই।

সুসজ্জিত বেশবাসে রোজীও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মার্কোপোলো এই সময় কিছু ডিক্টেশন দিয়ে কাজের বোঝা হাল্কা করে রাখেন। আমাকে দেখেই রোজী তির্যক দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করলো। আমি বললাম, “গুড মর্নিং” রোজী আমার শুভেচ্ছা ফেরত দিলো না। বরং দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটতে আরম্ভ করলো। রেগে গিয়ে আমি বললাম, “মিস্টার মার্কোপোলোও সেদিন তোমাকে বলেছেন—ব্লেড দিয়ে নখ কাটতে হয়।"

হয়তো রোজীকে এমন ভাবে বলা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ওর উপর আমার কেমন একটা সহজাত রাগ ছিল। রোজী প্রথমে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। ঠিক রাঙা নয়। বীরভূমের রাঙামাটির পথে কিছুক্ষণ হাঁটলে কালো জুতোর যেমন রং হয়, ওর মুখের রং ঠিক সেই রকম হয়ে উঠলো। রোজী বললো, "আমি এখনই জিমিকে সঙ্গে করে মার্কোপোলোর কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে বোসকেও ডাকবো।”

এবার সত্যি আমার ভয় হলো। জিমি লোকটা মোটেই ভাল নয়। শুধু শুধু এই সকাল বেলায় গায়ে পড়ে রোজীকে অপমান করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। রোজী ছাড়বে না। শাজাহান হোটেল থেকে আমাকে তাড়াবার সামান্য সুযোগ পেলে সে তা ব্যবহার করবেই। গম্ভীরভাবে বললাম, “মার্কোপোলোকে তুমি কী বলবে?”

"আমি বলবো, এই ছোকরাকে কিছুতেই রাখা চলতে পারে না।”

মনের রাগ চেপে রেখে বললাম, “কেন? কী তোমার ক্ষতি করেছি?” রোজী এবার দু'স্টু হেসে, আড়চোখে কনির উলঙ্গ দেহের দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস করে বললে, “আমার ক্ষতি নয়, তোমার নিজের ক্ষতি। তোমার বয়সের কোনো ইয়ংম্যানকে ছাদের ঘরে রাখা কিছুতেই উচিত নয়।”

আমি এবার ভরসা পেলাম। রোজী এবার হাতের চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, "ডোন্ট বি ওভারকনফিডেন্ট। ঐ রাক্ষসীটা তোমার মাথা খাবার জন্যে হাঁ করে রয়েছে,

আমি বলে রাখলাম।” রোজী আমাকে উত্তর দেবার কোনো প্রকার সুযোগ না দিয়ে, নাচের লীলায়িত ভঙ্গীতে সিড়ি দিয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করলে।

আমি আর একবার অবাক হয়ে আমার চারিদিকের পৃথিবীকে দেখতে লাগলাম। এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি? যে-আমি এই মূহূর্তে শাজাহান হোটেলে চাকরি নিয়ে বসে আছি, সেই আমিই কি একদিন কাসুন্দিতে বাস করতো? সুধাংশু ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্যাটারসনদা, চিনিদা, কানাইদা, পলিনদা, কেষ্টদা, ধারগেদার সঙ্গে গল্প করতো? এই-আমিই কি একদিন মেট্রো সিনেমাতে ছবি দেখতে এসে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল? একবার মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি আমি—দু'নিয়াতে শাজাহান হোটেল বলে কিছুই নেই; কাসুন্দের মাঠে বসে, বিজয়া দশমীর দিন সিদ্ধি খেয়ে মাথা গোলমাল করে ফেলেছি। আবার পর মূহূর্তে কনির দিকে নজর পড়ে গেলো। ঐ তো স্কটল্যান্ড-দু'হিতা কনি ভারতীয় সূর্যের কিরণে তার দেহটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্নান করাচ্ছে। এইটাই সত্য, কাসুন্দেটাই স্বপ্ন। শাজাহান হোটেল থেকে চুরি করে কয়েক পেগ হুইস্কি চড়িয়ে আমি স্বপ্ন দেখছি— কাসুন্দে বলে একটা জায়গা ছিল, যেখানে একদিন আমার যাতায়াত ছিল।

আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর থেকে ছাদের কেন্দ্রে চলে এলাম। ন্যাটাহারিবাবু আত্মা যেন আমার উপর ভর করেছে। মনে হলো, কনি সূর্য-বিলাস করছে না, সর্বপাপাহারি দিবাকরের জ্যোতিতে নিজেকে শুদ্ধ করে নিচ্ছে। আমাকে দেখেই কনি ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে, “গুড মর্নিং” আমিও বললাম, “গুড মর্নিং।”

কনি এবার বললে, “তোমরা এতো বোকা কেন? এমন সুন্দর ছাদটাকে তোমরা সানবেদিঙের জন্য ভাড়া দাও না কেন? রিজার্ভড ফর সানবেদিঙ করে তোমরা অনেক টাকা রোজগার করতে পারো।”

আমার উত্তর দেওয়ার আগেই ছাদের একটা ঘর থেকে গ্রামোফোন বেজে উঠলো। কনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, “কে এমন বেরসিক? এই ভোরবেলায় কোনোরকম শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না।”

আমার মনে হলো শব্দটা যেন মিস্টার গোমেজের ঘর থেকে ভেসে আসছে। কনি অধৈর্য হয়ে বললে, “যে বাজাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই তোমাদের কলিগ। তুমি কি তাকে গ্রামোফোন বন্ধ করতে বলবে? সারারাত তো আমাকে গানের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। আবার এখনও?”

যা ভেবেছি তাই। সোজা মিস্টার গোমেজের ঘরে গিয়ে দেখলাম, বুশশার্ট এবং পায়জামা পরে একটা চেয়ারে মিস্টার গোমেজ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সামনে একটা গ্রামোফোন রেকর্ড আপন মনে বেজে চলেছে। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। এই ভোরবেলায়, এই সোনা-ছড়ানো সকালে বেলাশেষের গান কেন? এখনই যেন পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাবেন। আমাদের বিদায় নেবার মুহূর্ত যেন সমাগত। সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না আমি। কিন্তু মনে হলো, কেউ যেন আমাকে কোকেন ইঞ্জেকশন দিয়ে ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে।

গোমেজ আমাকে দেখে বিষণ্ন হাসিতে মনটা ভরিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, "শুনুন, মন দিয়ে শুনুন।”

আমারও শোনবার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কনি এতোক্ষণে হয়তো চিৎকার করতে শুরু করবে। কানে কানে বললাম, “কনি আপনাকে ডাকছে।”

গোমেজ এবার বিরক্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গোমেজকে দেখেই কনি একটা টার্কিশ তোয়ালে নিজের দেহের উপর বিছিয়ে দিলে; আস্তে আস্তে বললে, “মিস্টার গোমেজ, এই ভোরবেলায় কোনো শব্দ আমার ভাল লাগে না।"

কে যেন গোমেজের দেহে বিদ্যুতের চাবুক মারলো। এই হোটেলে তার অবস্থা কি গোমেজের জানতে বাকি নেই। হোটেলের প্রধান ভরসা কনি, যার জন্যে এক রাত্রে আট-ন'হাজার টাকার বিক্রি বেড়ে যায়, তার ইচ্ছের উপর যে সামান্য একজন বাজনদারের মতামতের কোনো মূল্য নেই তা তিনি জানেন, 'তবু তাঁর দেহটা মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলো। কনি গোমেজের এই পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে। তোয়ালেটা স্যরিয়ে আরও খানিকটা রৌদ্র উপভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে সে বললে, "কী হলো?”

গোমেজ কোনোরকমে বললেন, "মিস কনি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অসুবিধে ঘটাবার জন্যে আমার লজ্জার শেষ নেই। তবে আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন সেই জন্যেই।"

গোমেজ সোজা এইবার নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিলেন। কনি হঠাৎ তার মাদুর থেকে উঠে পড়লো। স্লিপিং গাউনটা পরতে পরতে বললে, "মিস্টার গোমেজ!" কনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

গোমেজ কিছুই শুনতে পেলেন না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে গ্রামোফোনটা বন্ধ করে দিলেন। কনি ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে গোমেজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আমিও পিছন পিছন গিয়ে দেখলাম কনি বলছে, "আজকের তারিখে কী হয়েছিল?"

গোমেজ এখন কাউকে ভয় পাচ্ছেন না। ম্যানেজমেন্টের আদরিণী, দর্শকদের প্রিয় কনি যেন তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "তুমি নাচো, তুমি গান গাও। আর তুমি জানো না আজকের তারিখটা কী।

কনি ভয় পেয়ে গিয়েছে। মন্ত্রবলে গোমেজ যেন তাকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছেন। কোনোরকমে সে বললে, "আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করো। বলো আজকের তারিখে কি হয়েছিল?"

অপমানিত সঙ্গীতজ্ঞ নিজের মনেই বললেন, "সুরের রাজা, আমাদের রাজাধিরাজ, আজকের দিনে অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আজও তিনি আমার রাজা। আমি রক-অ্যাণ্ড-রোল বাজাই, আমি ক্যাবারেতে সঙ্গীতের সুর দিই, তবু আজও তিনি আমার রাজা।"

আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি। বলে ফেলেছিলাম "কে? বীটোফেন?"

মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে গোমেজ বলেছিলেন, "আমার রাজা অন্য জন। তিনি দরিদ্র। তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন, আবার খ্যাতি হারিয়েও ছিলেন। একজন ধর্মযাজকের বাড়িতে তিনি বাজাতেন। যাজক একদিন লাথি মেরে আমাদের রাজাকে বের করে দিয়েছিলেন। আমাদের দরিদ্র রাজা তারপর শুধু দুঃখই পেয়েছেন। তাই বোধহয় অন্যের দুঃখ তিনি বুঝতেন। কিন্তু পৃথিবীতে কে তার মূল্য দেয়? সুরের রাজা অনাদর, অবজ্ঞা,

অবহেলার মধ্যে মাত্র পায়ত্রিশ বছর বয়সে মর্ত্যালীলা সাঙ্গ করলেন। কিন্তু আহা, সে মৃত্যুর মধ্যেও কী অপরূপ সৌন্দর্য! মৃত্যুপথযাত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাঁর যুবতী স্ত্রী বললেন, "কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ," তিনি বলতে চাইলেন। কিন্তু সংসারের কথা নয়, গানের কথাও নয়। কোনোরকমে শ্বাস টানতে টানতে বললেন, "কথা দাও, আমার মৃত্যুসংবাদ এখন প্রকাশ করবে না। বেচারা আলনেৎস শহরের বাইরে গিয়েছে। বন্ধুর আমার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হতে পারে। অথচ এখনই জানাজানি হলে, আমার চাকরিটা অন্য লোকে নিয়ে নেবে। তুমি তো জানো, একটা চাকরি ওর কত প্রয়োজন।" মৃত্যুর মুখোমখি হয়ে এমন কথা একমাত্র মোৎসার্টই বলতে পারতেন। এমন মন বলেই তো অমন সুর জন্ম নিতে পেরেছিল।"— গোমেজ এবার নীরব হলেন।

"এই মুহুর্তে মোৎসার্টকে কবরে শুইয়ে দিয়ে যেন গোমেজ ফিরে এসেছেন। ছলছল চোখে গোমেজ বললেন, "চাকরি না থাকার কী যন্ত্রণা তিনি জানতেন।

তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরের রাজা বন্ধুকে ভুলতে পারেননি। আর পারেননি তাঁর মৃত্যুর গানকে। Mozart's Requien— K626– মৃত্যুর কয়েক মাস আগে একজনের ফরমায়েশে সামান্য কয়েকটা আগাম টাকার বিনিময়ে তিনি এই সুর সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছিলেন। অসুস্থ দেহে সঙ্গীত সরস্বতীর পুজোর মধ্যেই তিনি কাঁদতেন। বলতেন, এ আমার নিজেরই রিকুয়েম। আমি বেশ বুঝছি, আমার মৃত্যুর গান আমি নিজেই রচনা করে যাচ্ছি। কিন্তু এই বিকল দেহ আমাকে গান শেষ করবার সময় দেবে তো? আমার যে এই সুর শেষ করতেই হবে।"

মৃত্যুর কিছু আগে মোৎসার্ট তাঁর প্রিয় শিষ্য এবং বন্ধুদের বিছানার পাশে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কথা বলবার শক্তি তখন তাঁর নেই। ইঙ্গিতে বললেন—শুরু করো— Mozart's Requiem। তারপর গানের চরমতম মূহুর্তে এসে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মোৎসার্ট সংজ্ঞাহীন। অচৈতনা অবস্থায়ও মনে হলো সেই গানই গেয়ে চলেছেন।

"তাঁর শেষ কথা কী জানো?"—গোমেজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। আমি দেখলাম কনিও কেমন হয়ে উঠেছে। সে ফ্যালফ্যাল করে হোটেলের এক সামান্য বাজনদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গ্রামোফোনের উপর মোৎসার্টের রিকুয়েম চড়াতে চড়াতে গোমেজ বললেন, "তাঁর শেষ কথা, — Did I not tell you that I was writing this for myself?"

মৃত্যুর গান তখন যন্ত্রের বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে মরছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা দেহের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে যেন মহাশূন্যে মিশে যাবার জন্যে ছটফট করছে। জীবনের প্রভাত বেলায় আমরা মৃত্যুসন্ধ্যার সাক্ষাৎ পেলাম। শুভদৃষ্টির লগ্নেই যেন আমার বন্ধুকে বিধবা যোগিনীর সাজে দেখলাম।

গোমেজ যেন তাঁর জড় দেহটাকে শাজাহান হোটেলের ছাদে ফেলে রেখে কোন সুদু'রের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। আর কনি হঠাৎ সচেতন হয়ে নিজের উলঙ্গ দেহটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে স্লিপিং গাউনের ভিতর বন্দী করে ফেললে। কনি কাঁদছে।

আমার বিশ্বাস হয়নি, চোখটা মুছে নিয়ে আবার দেখলাম, সত্যিই আমাদের রাত্রের রমণী কনির গণ্ডেও অশ্রুর রেখা। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে গোমেজকে সে বললে, "আই অ্যাম সারি।" তারপর ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কনির সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গোমেজকে এতোদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। একটা রেস্তোরাঁর সাধারণ বাজনদার বলেই ধরে নিয়েছিলাম। অনেকদিন আগে বাজিয়েদের সম্বন্ধে সায়েব একবার বলেছিলেন, "হোটেলে কিংবা রেস্তোরাঁয় সঙ্গীত পরিবেশন করে বলেই এরা কিছু, জানে না, এমন নয়। কলকাতার হোটেলে এমন সঙ্গীতশিল্পী দেখেছি, সুযোগ এবং সুবিধে পেলে যে হয়তো বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পারতো।"

বোসদাও বললেন, "গোয়ানিজ খ্রীষ্টান ছোকরাগুলোকে তোমরা চেনো না।

সঙ্গীতে এদের জন্মগত অধিকার। সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এদের জীবনে যেন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সারা দিন চেলো, ভায়োলিন, ক্লারিওনেটগুলো কোলের পাশে নিয়ে শুয়ে আছে। সময় হলেই যন্ত্রের জামাকাপড় পরে নিচে নেমে যাচ্ছে। মমতাজ

রেস্তোরাঁয় উপস্থিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে একমনে বাজিয়ে তারা আবার যন্ত্রের মতোই উপরে ফিরে "আসে। জামাকাপড় খুলে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এদের যেন আর কোনো জীবন নেই।"

এরই মধ্যে প্রভাতচন্দৰ গোমেজ যেন ব্যতিক্রম। তিনিও যন্ত্রের মতো শাজাহান হোটেলে সঙ্গীত পরিচালনা করে থাকেন বটে, কিন্তু অবসর সময়ে অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। যে পৃথিবীতে সুরের রাজারা সবার অলক্ষ্যে এসে ভীড় করে থাকেন।

গোমেজের ঘর থেকে বেরিয়ে কনি আবার রৌদ্রে এসে বসলো। সে যেন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। প্রভাতচন্দ্র গোমেজ তার সব গর্ব এবং দম্ভকে মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছে।

কনি সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বললে, "এমন রোদ যদি আমরা ইউরোপে প্রতিদিন পেতাম, তা হলে আমাকে আর করে খেতে হতো না।" আমি ওর কথার অর্থ' বুঝতে না পেরে কনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কনি হেসে বললে, "এমন রোদে পুড়তে পেলে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠতো। এখন যারা অ্যাট্রাকটিভ, তারা প্রকৃতির খেয়াল ; তখন সুন্দরী হওয়াটাই নিয়ম হয়ে যেতো – আমাদের আর কদর থাকতো না।"

রাত্রের ক্যাবারে সুন্দরীদের যে একটা সাধারণ জীবন থাকে, তার সঙ্গে যে সহজ হয়ে কথা বলা যায়, তা ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না। কনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "ভাবছি, এবার থেকে প্রত্যেক বছর একবার ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা করবো। তা হলে গায়ের রংটা ভদ্রস্থ করে নেওয়া যাবে।" কনি আরও বললে, "দাড়িয়ে রয়েছো কেনো?;" একটা সূর্যমুখী চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসে পড়ো।"

আমি বসলাম। কনি বললে, "হ্যারিকে দেখেছো?"

আমার ধারণা ছিল, রাতের মত্ততার পর ল্যামব্রেটা এখনও ঘুমিয়ে আছে। কনিও তাই ভেবেছিল। আমি বললাম, "আমি দেখছি মিস্টার ল্যামব্রেটা এখনও ঘুমোচ্ছেন কিনা।" কনি বললে, "যদি হ্যারি ঘুমিয়ে থাকে, তবে ওকে ডিসটার্ব কোরো না ।"

মনে মনে একটু রাগ হলো। একজন ক্যাবারে গার্ল-এর সাকরেদ কিছু এমন ভি-আই-পি নন যে, তাঁকে ব্রেকফাস্টের সময়েও ডিসটার্ব করা যাবে না! মুখে অবশ্য বললাম, “আমরা হোটেলে কাজ করি, লোককে ডিসটার্ব না করার আর্ট আমাদের জানা আছে।”

ল্যামব্রেটার ঘরের দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে উকি মেরেই কিন্তু আমার ভয় হলো। বিছানায় কেউ শুয়ে আছে বলে মনে হলো না। ভাল করে দেখবার জন্যে জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। কোথায় ল্যামব্রেটা? সে তো বিছানায় নেই! ল্যামব্রেটা তবে কি বাথরুমে?কিন্তু সেখান থেকেও তো কোনো শব্দ আসছে না। এবার দরজার গোড়ায় এসে নিজের ভুল বুঝলাম। দরজাটা চাবি বন্ধ।

কনি আমাকে ওখানে অপেক্ষা করতে দেখেই উঠে এলো। নিজের দেহটা সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। দেহটা আছে এই পর্যন্ত। সেটা ঢাকা থাকলো, না খোলা রইলো, সেটা চিন্তা করবার বিষয়ই নয়। কনি দরজার কাছে এসেই প্রশ্ন করলে, “হ্যারি ভিতরে নেই?”

“দরজা তো বন্ধ।" আমি বললাম।

কনি এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। “কোথায় গেলো সে?”

আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন কনি অধৈর্য হয়ে উঠলো। "কিছু, বলছো না কেন? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে?”

ভাল বিপদে পড়া গেলো। কোথায় ল্যামব্রেটা, তা আমি কেমন করে জানবো? কনির চোখ ছলছল করছে। কোনোরকমে সে বললে, “তুমিই এর জন্যে দায়ী। কেন তুমি রাত্রে আমাকে ডেকে আনলে? একটা নিরীহ ছোট্ট মানুষ যদি তোমার ঘরে গিয়ে একটু গোলমাল করেই থাকে, সেটা সহ্য করা যায় না?”

কনির কথা শুনে আমি অবাক। আমাকে আক্রমণ করা তখনও শেষ হয়নি। কনি বলে চললো, “এই যে আমি, এতো সহ্য করি। আমি ও হ্যারি যে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষের হাজার রকম অত্যাচার মুখ বুজে হজম করে যাই, আমরা তো কারুর কাছে কমপ্লেন করি না।”

কনির সজল চোখের দিকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকিয়ে রইলাম। কনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, “জানো, গতকাল ও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে

কাঁদছিল? ঘরের মধ্যে ঢুকে কতবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ক্ষমা চাইলাম, তবু হ্যারি আমার সঙ্গে কথা বললে না। অভিমানে সে মুখ ঘুরিয়ে থাকলো।"

আমি হয়তো কিছু বলতাম। কিন্তু তার আগেই ছাদের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। দ্রুতবেগে গিয়ে টেলিফোনটা ধরলাম। রোজী কথা বলছে। "হ্যালো, রোজী? কী ব্যাপার?"

"না ইয়ংম্যান, তোমার সঙ্গে রোজীর ক্যাপাসিটিতে কথা বলছি না। টেলিফোন অপারেটারের ডিসেন্ট্রি হয়েছে। বোর্ডে বসতে পারছে না, তাই আমি কাজ করছি।"

"অপরকে সাহায্য করার যে মনোবৃত্তি তুমি দেখাচ্ছো, তা সত্যি প্রশংসা যোগ্য।" আমি বললাম। রোজী বললে, "তোমাকে ডিসটার্ব করার ইচ্ছে আমার ছিল না। ফোন এসেছে। একজন ভদ্রলোক তোমাদের কনির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন। তাঁকে দিলাম।"

"হ্যালো!" ওদিক থেকে একজন বলে উঠলো। আমি বললাম, "ইয়েস।" ভদ্রলোক কনি দি উয়োম্যানের মধুকণ্ঠ শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তার জায়গায় পুরুষকণ্ঠ শুনে একেবারে হতাশ হলেন। বললেন, "হামি একটু কোনির সঙ্গে বাত-চিত করতে চাই।"

"কে আপনি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হামি একজোন পাবলিক আছি। থোড়া ডিসকাশন ওঁর সাথে কোরা দোরকার।"

আমি বললাম, "স্যরি। ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যায় না। উনি কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলেন না।"

পাবলিক ভদ্রলোকটি একটু অসন্তুষ্ট হলেন। "এ আপনি কী কোথা বোলছেন। কেলকাটায় আমাদের সঙ্গে মীট না করলে, পরিচয় কী কোরে হোবে?"

হোটেলে চাকরি করলে রাগ করবার উপায় নেই। শরীরে রাগ থাকলে তার কপালে হোটেলের অন্ন নেই। তাই ভদ্র ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করে ললাম, "কনির সঙ্গে দেখাও হয় না; ফোনেও কথাবার্তা চলে না।"

পাবলিকটি বললেন, "প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে পর্যন্ত ফোনে কোথা চোলে, আর আপনাদের কোনি দি উয়োম্যানের সঙ্গে কোথা চোলে না?" বললাম, "আজ্ঞে, তাই। তবে

আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, বলতে পারেন; আমি কনিকে জানিয়ে দেবো।”

ভদ্রলোক হতাশ হয়ে বললেন, “তামাম দু’নিয়ার অনেক হোটেল আমি দেখেছি, কিন্তু কেলকাটার মতো ব্যাড ম্যানারস, কোথাও দেখিনি।" তারপর নিবেদন করলেন, “হামার মোশয়, জানবার দোরকার ছিল, হামার প্রেজেন্টেশন উনি পেয়েছেন কিনা।”

“কী প্রেজেন্টেশন?” আমি প্রশ্ন করলাম। দুর থেকে দেখলাম কনি আমার দেরিতে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

পাবলিকটি বললেন, “কুছু ফ্লাওয়ার আর কুছু ফুরুট পাঠিয়েছি আজ সোকালে। এখনও উনি পাননি?”

“যদি পাঠিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই পাবেন।” এই বলে ফোনটা নামিয়ে দিলাম। কনি আমার কাছে ছুটে এসে বললে, “কোনো খারাপ খবর নাকি?” আমি গম্ভীরভাবে বললাম, “না।”

কথা শেষ করতে না-করতেই দেখলাম একটা বিশাল ফুলের তোড়া এবং এক ঝুড়ি ফল নিয়ে গুড়বেড়িয়া উপরে উঠে এলো। গুড়বেড়িয়া সেগুলো মেমসায়েবের চরণতলে নিবেদন করলে। দেখলাম, ফুলের তোড়া থেকে একটা কার্ড ঝুলছে। তাতে সেই পাবলিক ভদ্রলোকটির নাম এবং টেলিফোন নম্বর।

কনি উপহারের দিকে ফিরেও তাকালো না। সে তখন ছোটো মেয়ের মতো কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ওকে সেই মুহূর্তে দেখে মনে হলো, সে যেন আমাদের নামত বা ডোমজুড়ের কোনো সরল মেয়ে; আমাদের এই বিশাল শহরে তার সাথী হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছে।

গুড়বেড়িয়া মেমসায়েবকে কাঁদতে দেখে ঘাবড়ে গেলো। জিজ্ঞাসা করলে,

“কী হয়েছে? মেমসায়েবের কি ফল পছন্দ হয়নি?” আমি বললাম, “আমাদের বে’টে সায়েবের কোনো খবর রাখো?”

গুড়বেড়িয়া আমাদের রক্ষে করে দিলো। সে বললে, “বে’টে সায়েব? তিনি তো বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছেন।” যাবার আগে ল্যামব্রেটা গুড়বেড়িয়ার কাছে খবর নিয়েছেন, কাছাকাছি কোথায় বেড়ানো যায়। গুড়বেড়িয়া বলেছে সেন্ট্রাল এভিন্যু ধরে কিছুটা

হাঁটলেই এসপ্ল্যানেড পড়বে। তারপর চৌরঙ্গী, ধরে কিছুটা গেলেই গড়ের মাঠ—হাওয়া খাবার জায়গা। সায়েব তখনই গুড়বেড়িয়াকে একটা আধুলি দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছেন।

কনি এবার একটু সাহস ফিরে পেলো। তার মেঘভরা মুখে কিছুক্ষণের জন্যে হাসির সূর্যকে দেখতে পাওয়া গেলো। বললে, "দাঁড়াও, একটু মজা করা যাক।" পায়ের গোড়া থেকে সে ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে, কার্ডটা খুলে ফেলে দিলো। আমার কাছ থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কয়েকটা কথা লিখলে। ল্যামব্রেটার ঘরে ঢুকে কনি একটা ফুলদানির খোঁজ করতে লাগলো। বললে, "এ কেমন হোটেল যে, প্রত্যেক ঘরে ফুলদানি নেই?"

বললাম, "নিচের সব ঘরে আছে। শুধু ছাদে নেই।"

"কেন? এখানে যারা থাকে, তারা কি মানুষ নয়?" কনি একটু বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করলো। তারপর একটা কাঁচের গেলাসের মধ্যেই যত্ন করে ফুলগুলোকে সাজিয়ে রাখলো।

সাজানো শেষ করে দরজা বন্ধ করতে করতে কনি বললে, "জানো হ্যারি অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, এই অচেনা শহরে কনি কোথা থেকে তার জন্যে ফুল যোগাড় করে আনলো!" হ্যারিকে খুশী করবার একটা সুযোগ পেয়ে কনি নিজেও বেশ খুশী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সে আনন্দ কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আমার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কনি। আবার চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমি বললাম, "এতো ভাববার কী আছে? এখনই ভদ্রলোক এসে পড়বেন।"

কনি তেমন ভরসা পেলো না। সে বলল, "আমার ভয় লাগে। বামন মানুষ, কোথাও রাস্তা পেরোতে গিয়ে হয়তো বিপদ বাধিয়ে বসলো।"

আমি আবার ভরসা দিলাম। বললাম, "দেখুন না, এখনই এসে পড়বেন।" আর মনে মনে বললাম, 'এতো আদিখ্যেতা কেন? বদমেজাজী লোকটা যতক্ষণ বাইরে থাকে, ততক্ষণই ভাল। এসেই তো আবার গোলমান করবে।'

আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে এমনভাবে মিলে যাবে আশা করিনি। আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাদের দরজা খুলে যিনি ঢুকলেন, তিনি ল্যামব্রেটা। ল্যামব্রেটার

মেজাজ এখন বেশ ভাল রয়েছে। সে গুনগুন করে গান গাইছে। গানটা কি, আমি বুঝতে পারিনি। কনি নিজেও বুঝতে না পেরে ল্যামব্রেটার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কী গান গাইছো, হ্যারি?"

হ্যারির ইংরিজী উচ্চারণ সাবধানে অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম সে কি গান গাইছে। খাঁটি ভারতীয় প্রথায় হাততালি দিয়ে ল্যামব্রেটা গাইছে—জয়জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম ।

ল্যামব্রেটা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলো? সে বললে, "কনি, ওয়াণ্ডারফুল গান।" তারপর নেচে নেচে ভুল উচ্চারণে গাইতে লাগলো—"পাটিটো প্যাভনো সীটারাম।"

ল্যামব্রেটাকে কনি প্রশ্ন করলে, "কী করছিলে এতোক্ষণ? আমি ভেবে ভেবে মরি।"

ল্যামব্রেটা বললে, "ঐটাই তো তোমার স্বভাব।" তারপর ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার তো ঘুম হয় না! আমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার নেকেড, ড্যান্সের রিদম নষ্ট হয়ে যায়!"

কনি ল্যামব্রেটার কাছ থেকে এই উত্তর শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার চোখ দু'টো ছলছল করে উঠলো। সে বললে, "হ্যারি! পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে তুমি আমাকে এই কথা বললেন!"

প্রভাতের প্রসন্নতা সত্যিই হ্যারির উপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারলো। কনির হাতটা ধরে বললে, "তোমার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম। তুমি এখনও ছোট্ট গার্লের মতো ; আমার রসিকতা বোঝো না?"

কনিও আমার সামনে অপ্রস্তুত হয়ে চোখের জল মুছে নিলো। ল্যামব্রেটা বললে, "মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে নদীর ধারে চলে গিয়েছি বুঝতে পারিনি। সেখানে দেখলাম, একদল লোক ফুটপাতের উপর বসে বসে গান গাইছে। ভেরি সুইট গান। ভেরি নাইস পিপল। রিয়েল জেণ্টলমেন। তারা আমাকে দেখেই গান বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাকে তারা নমস্কার করলে। আমি বললাম, তোমরা কী গান গাইছো? তোমাদের সুইট হার্টদের জন্য গান? ওরা মার্কেন্টাইল ফার্মের বেয়ারা, দারোয়ান, আমার কথা বুঝতে পারলে না। বললে, 'ভোরবেলায় এখন কেবল গড। কেবল সীতারাম। সীতারাম।'

একজন' দেখলাম একটু চালাক। ইংরিজীতে বললে, ঠিক বলছেন হুজুর সীতারামজীর হার্টও ভেরি সুইট।”

ওয়ান্ডারফুল গান শুনে ল্যামব্রেটা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি। গঙ্গার ধারে, ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে সেও গান ধরলে— রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

কলকাতার ফুটপাতের নাগরিকরা সায়েবকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সায়েবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের কষ্ট হচ্ছে। অথচ সায়েবকে কোথায় বসতে দেবে? সায়েবের তখন গানের নেশা ধরে গিয়েছে। সে নিজেই এসে ওদের শতরঞ্জির মধ্যিখানে বসে পড়লো। সায়েব জীবনে অনেক গান নকল করেছে। এই গানও সে ধরে ফেলেছে। হাতে তাল দিতে দিতে, গানের অর্থ না বুঝে সে তখন প্রচণ্ড উল্লাসে গেয়ে চলেছে— রঘুপতি রাঘব।

সায়েবকে তার গানের সঙ্গীরা যত্ন করেছে। বলেছে, “হুজুর, আমরা কয়েকটা ফুল দেবো আপনাকে?” সায়েব বলেছে, “নিশ্চয়ই। ফ্লাওয়ার দাও।” ওরা সায়েবকে গোটা কয়েক গাঁদাফুল দিয়েছে। বলেছে, “একলা একলা ফিরতে পারবে তো?” সায়েব বলেছে, “হ্যাঁ।”

ওরা কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি। বলেছে, “কলকাতা হুজুর, ভেরি ব্যাড প্লেস।” তারপর ওদেরই একজন সায়েবের সঙ্গে শাজাহান হোটেলের গেট পর্যন্ত এসেছে।

পকেট থেকে কয়েকটা- গাঁদাফুল বের করে ল্যামব্রেটা আমাদের দেখালো। বললে, “ওয়াণ্ডারফুল।”

গুনগুন করে নতুন শেখা গান গাইতে গাইতে ল্যামব্রেটা নিজের ঘরে ঢুকলো। পরম যত্নে দেওয়া গাঁদাফুলগুলো টেবিলের উপর রাখলো। কনির রূপমুগ্ধ কলকাতার এক পাবলিকের পাঠানো মূল্যবান ফুলের তোড়া সত্যিই ওই সামান্য কয়েকটা গাঁদাফলের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে রইলো।

আমি নিজের ঘরে চলে গিয়ে ডিউটিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। কিন্তু আবার বাধা পড়লো। বাথরুমে যাবার জন্যে দরজাটা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় গুড়বেড়িয়া এসে বলল, "মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।"

আবার গেলাম। আমাকে দেখেই ল্যামব্রেটা বললে, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কনিকে সমস্ত দু'পুর ধরে আমি শেখাবো, তারপর আজ রাত্রে আমরা দু'জনে গাইবো—রঘুপতি রাঘব রাজারাম। প্লেজেন্ট স্যরপ্রাইজ।" কনি বললে, "তোমার কী মনে হয়? গুড আইডিয়া?"

আমার মুখটা শুকিয়ে গেলো। আমি বললাম, "আপনারা আর্টিস্ট, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।"

কনি বললে, "তা তো জানি। কিন্তু শাজাহান হোটেলের অতিথিরা কি খুশী হবেন?"

ল্যামব্রেটা বললে, "ওয়াণ্ডারফুল। প্রত্যেকটা মানুষ খুশী হতে বাধ্য।" বললাম, "গডের নাম শোনবার জন্যে কেউ হোটেলে আসে না।"

কনি বললে, "তাদের রুচি তো আপনারা তৈরি করবেন।" আমি উত্তর দিলাম, "মিস্টার স্যাটা বোস বলেন, রুচি অনেকদিন আগে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এক যুগের কলকাতাওয়ালার। তাঁদের রুচির ছাঁটটা আরেক যুগের হাতে দিয়ে বিদায় নেন। তাঁরা আবার অন্য যুগের হাতে সেই ছাঁটটা দিয়েই চলে যান। তাই শাজাহান হোটেলের কোনো পরিবর্তন হয় না। এখানে সেই আদি অকৃত্রিম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাই চাল, রয়েছে।"

ল্যামব্রেটা অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, "তা হলে এই গানটা চলবে না?" "চলার কোনো সম্ভাবনা নেই," আমি উত্তর দিলাম।

কনি বললে, "তোমার মতের উপর কথা চলে না।"

আমি বললাম, "ওই গানের মধ্যে এমন একটা লাইন আছে, যাতে আমাদের অতিথিরা অফেণ্ডেড হতে পারেন।"

"কোন লাইনটা?" ল্যামব্রেটা চিৎকার করে উঠলো।

"সব কো সুমতি দে ভগবান।" আমি বললাম। "আমাদের অতিথিরা কী ভাববেন? তাঁদের কি সুমতি নেই?"

ল্যামব্রেটা রেগে গিয়ে বললে, "তোমরা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এখনই ঘর থেকে চলে যাও। আমি এখন বিশ্রাম নেবো।"

কনিও ভয় পেয়ে গেলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। আমিও আর-এক মূহূর্ত দেরি করলাম না। আমাদের পিছনে ল্যামব্রেটা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে। কনি বললে, "সকালের দিকে ওর মেজাজ সাধারণত ভাল থাকে। আজ ভোরবেলাতেই চটে উঠলো।"

আমি নীরবে হাসলাম । কনি বললে, "স্যরি, তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। এখন চলি। আবার দেখা হবে রাত্রে। মমতাজ রেস্তোরাঁয়।"

মমতাজ-এ তিলধারণের জায়গা নেই। সমস্ত টেবিল অনেক আগেই বুকড্ হয়ে গিয়েছে। হাই সার্কেলের চাপে পড়ে বোসদা দু'-একটা এক্সট্রা টেবিলও কোনোরকমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন সব স্তর থেকে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসে যে, না বলা যায় না।

জিমি আবার কয়েকজন লোককে সামনের দিকে বসবার ব্যবস্থা করে গেলো। বোসদা বললেন, "সামনের কয়েকটা রোতে বসবার জন্যে লোকে ঘুষ দিতেও রাজী। জিমিটা পারে না এমন কাজ নেই।"

মদের সেল আরও বেশী। আবগারী ইন্সপেক্টর উকি মেরে দেখে খুশী হয়ে চলে গেলেন। গবর্নমেন্টের ইনকাম বেড়ে যাবে। আবগারী শুল্ক, স্ফূর্তি শুল্ক খাতে অনেক টাকা ট্রেজারিতে জমা পড়বে।

জামা-কাপড় পরে হল-এর মধ্যে ঢুকে দেখলাম, আজ কয়েকজন মহিলা এসেছে। কলকাতা কালচারের অঙ্গ এই ফ্লোর-শো। শিক্ষিতা এবং আধুনিকা ভারত-ললনারা তাই এই তীর্থভূমিতে না-এসে পারেন না।

বোসদা হল-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে মৃদু' হেসে বললেন, "আমরা যে রেটে সভ্য হয়ে উঠছি, তাতে অদু'র ভবিষ্যতে মডার্ন ভারতীয়রা স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেলিডান্সারদের দেখতে আসবেন। পশ্চিম যে দরজা খুলে দিয়েছে! সাধে কি আর কবিগুরু লিখে গিয়েছিলেন—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে এই শাজাহানের মহামানবের সাগরতীরে।"

যে-মহিলারা পুরুষের এই হংসরাজ্যে বকের মতো বসে আছেন, তাঁদের সাজ সজ্জার বর্ণনা বোসদার এক অধ্যাপক বন্ধু কিছুদিন আগে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নামও কী এক বোস। শাজাহান হোটেলের ভিতরটা দেখবার কৌতূহলে তিনি একবার এসেছিলেন। কলকাতার মধ্যবয়সী আধুনিকাদের দু' একজনকে দেখে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এদের সাজ-সজ্জায় সম্পূর্ণ নতুন রীতি। এমন 'আছে-আভাস ব্লাউজ' ও 'মিছে-আবরণ শাড়ি' আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্পনারও অতীত ছিল।

বোসদা হেসে বন্ধুকে বলেছিলেন, "দেখতে এসেছো দেখে যাও। কিন্তু মহাজনদের পথ অনুসরণ কোরো না। তোমাদের সাহিত্যিক নগেন পাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন, তাই আসা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন! রোজ একবার বার-এ না এলে তাঁর চলে না। নগেন পালকে আজও দেখলাম। ক্যাবারে সুন্দরীর আবির্ভাব প্রতীক্ষায় ঘরের এক কোণে একটা হুইস্কির পেগ নিয়ে বসে আছেন। নগেন পাল সামনে ছোট্ট একটা নোটবই রেখেছেন। মদের ধাক্কায় কোনো আইডিয়া এলেই ওখানে নাকি লিখে রাখেন।

"আরে মশাই! এদিকে শুনুন।" দেখি ফোকলা চ্যাটার্জি আমাকে ডাকছেন। আজকেও তিনি এসে গিয়েছেন। ফোকলা চ্যাটার্জির সামনে এক লাজুক ছোকরা চুপচাপ বসে রয়েছে। চুলগুলো ঢেউখেলানো। মুখের মধ্যে নবযৌবনের নিষ্পাপ সরলতা এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। ইভনিং স্যুট পরেছে ছেলেটি।

"দেখুন, এর কোনো মানে হয়? অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে কখনও ক্যাবারে দেখা যায়? আপনি বলুন তো?" ফোকলা আমাকে প্রশ্ন করলেন। ছোকরা দেখলাম এক 'লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে বসে আছে।

ফোকলা বললেন, "তুই নির্ভয়ে একটু ড্রিঙ্ক কর। কেউ জানতে পারবে না। আমি মামা হয়ে তোকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি। কেউ জানতে পারবে না। বাড়িতে তো বলে এসেছি, তুই আমার সঙ্গে বেরোচ্ছিস। অত যদি ভয়, আজ রাত্রে আমার কাছে থেকে যাবি।"

ফোকলা আমাকে বললেন, "আপনাদের হোটেলের সবচেয়ে দামী ককটেল কী আছে? তাই দিয়েই ভাগ্নের হাতেখড়ি দিই।"

আমি বললাম, “সিলভার গ্রেড্। এক পেগ সাড়ে বারো টাকা।”

“ওতে কী আছে?” ফোকলা জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম “ভদকা, ফ্রেশ লাইম, সিরাপ আর ডিম। হাতেখড়ির পক্ষে সুবিধে হবে কি? তার থেকে ম্যানহাতান ককটেল দিই না? হুইস্কি, ভারমুথ আর শেরি, shaked with ice"

ফোকলা রেগে উঠলেন। বললেন, “মশায়, এটি আমার ভাগ্নে। ভাগ্নী নয়। ভারমুথ দিয়ে ব্যাটাছেলের অন্নপ্রাশন হয়, আমি কখনও শুনিনি। আর দাম তো দেখছি সাড়ে চার টাকা! তাতে কী মাল থাকবে?”

সিলভার গ্রেড-এর অর্ডার দিয়ে দরজার কাছে এসে দেখলাম বোসদা হাসছেন। বললেন, “যার হাতেখড়ি হচ্ছে, সে কে জানো? মিসেস পাকড়াশীর সন্তান। পাকড়াশী সাম্রাজ্যের প্রিন্স অফ ওয়েলস।”

এবার শো আরম্ভ হবার কথা। আমাকে স্টেজের উপরে উঠে বলতে হবে, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আই প্রেজেন্ট টু ইউ কনি দি উয়োম্যান।”

কিন্তু ল্যামব্রেটা এখনও হাজির হয়নি। কনিও নেই। হল থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি লিফটে চড়ে উপরে এসে দেখলাম, দরজার সামনে ন্যাটাহারিবাবু দাঁত বার করে হাসছেন।

“কনি আর ল্যামব্রেটাকে দেখেছেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, “আমাকে এখন জ্বালাতন করবেন না। আপনার বামনাবতার কালকে আমার দু’টো বালিশ ছিড়ে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে তুলোতে বোঝাই।”

কনির ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কিন্তু কোথায় কনি? কনি ভিতরে নেই। দরজা খোলা পড়ে রয়েছে।

প্রথনে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শো আরম্ভ হবার এই প্রয়োজনীয় মুহুর্তে ভদ্রমহিলা কোথায় গেলেন? পাঁচ টাকার টিকিট কেটে, আর পঞ্চাশ টাকার মদ্যপান করে যারা মমতাজ-এর সুকোমল চেয়ারে বন্দি হয়ে বসে আছেন, তারা যদি এখন শোনেন ফ্লোর শো বন্ধ, তা হলে এই রাত্রে শাজাহান হোটেলের কর্মচারীদের কপালে কি আছে তা কল্পনা করে আমি শিউরে উঠলাম। টিকিটের দাম হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মদ? সে তো

আর পাকস্থলী থেকে উদ্ধার করে বোতলে আবার ঢেলে রেখে দেওয়া যাবে না। ফলে এখনই কাঁচের গেলাস ভাঙবে, টেবিল চেয়ার উল্টোবে, এবং ফোনে পুলিসের শরণ নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো গতি থাকবে না। এমন অবস্থা অনেকদিন লাগে একবার হয়েছিল শুনেছি। পুলিস এসে মাতালদের হাত থেকে হোটেল কর্মচারীদের কোনোরকমে রক্ষে করেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল তারপর। ইংলণ্ডেশ্বরের সেবক পুলিসবৃন্দ শাজাহান হোটেলে সেবিত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। মাতালদের তাড়িয়ে তাঁরাই আবার সেদিন মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা মমতাজের টেবিল চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। মেনু কার্ড দেখে নামী দামী ডিনারের অর্ডার দিয়েছিলেন। ওয়াইন কার্ডের দিকে নজর দিয়ে বারম্যানদের হাঁক দিয়ে বলেছিলেন, "হ্যায় খিদমগার একটা হুইস্কি, শরাব, ব্রান্ডি পানি লে আও।" মাটির তলায় অন্ধকার সেলারে শাজাহানে সযত্ন সঞ্চিত ব্ল্যাক লেবেল, ব্ল্যাক ডগ, ডিম্পল স্কচ, ভ্যাট এবং জানি ওয়াকারের বোতলগুলো সেদিন যেন আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল। ঐশ্বর্যময় শাজাহানের মণিমুক্তো লুট করে চেঙ্গিজ খাঁয়ের দল সেদিন যখন বিদায় নিয়েছিলেন, তখন ম্যানেজারের কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা। অথচ কিছুই বলবার উপায় ছিল না। কারণ এঁরা ম্যানেজারের লাগাতার অনুরোধে কোনো কাষ্টমারকে গ্রেপ্তার করেননি। গ্রেপ্তার করলেই কোর্ট। এবং কোর্ট-ঘর মানেই ব্যাড পাবলিসিটি।

কনির শূন্য ঘরে এসে প্রথমেই সেই ভয় হলো। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ছাদে উঠে এলাম। আমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় পাশের ঘর থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো। ল্যামব্রেটা বলছে, "যাও। তোমার যদি এতোই দরদ, একলা যাও।"

কনি কাতর স্বরে বললে, "প্লিজ, তুমি অবুঝ হয়ো না। চলো।"

ল্যামব্রেটা এবার ফোঁস করে উঠলো। "আমার গায়ে হাত দিও না বলছি। ভাবছো ওতেই আমি গলে যাবো।"

ফিসফিস করে কনিকে বলতে শুনলাম, "এই আস্তে, লোক শুনতে পাবে।"

ল্যামব্রেটা এবার তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো। সে বললে, "কিছুতেই নয়। 'আমি যাব না।"

ছাদ থেকে বেরিয়ে আমি এবার ল্যামব্রেটার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় নক করলাম। কনি এবার বেরিয়ে এলো। রাত্রের শোয়ের জামাকাপড় পরে সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তার দেহ থেকে মূল্যবান ফরাসী সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাকে দেখেই কনি সব বুঝতে পারলে। আর একবার ভিতরে ঢুকে গিয়ে বললে, "গেস্টরা রেগে উঠছেন, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।"

ল্যামব্রেটা মুখে হাত দিয়ে বিছানায় চুপচাপ বসেছিল। গম্ভীর মুখে, বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "ইউ উয়োম্যান, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না।"

একটা কুৎসিতদর্শন বামনের বিরক্ত ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে কনি ভয় পেয়ে গেলো। কনি বুঝতে পারছে না, সে কী করবে। আমি এবার ঢুকে পড়ে বললাম, "আর দেরি হলে আমাদের হোটেলে আগুন ধরে যেতে পারে।"

কনি বললে, "দোহাই তোমার, চলো।" ল্যামব্রেটা বললে, "ঠিক হ্যায়, এই শেষবারের মতো চললাম। দেখি কাল থেকে কে আমাকে ঘর থেকে বের করতে পারে।"

আমি ও কনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ল্যামব্রেটা নিজের জামাকাপড় পরতে লাগলো। কনির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। বললে, "ওর যে কী সব অন্যায় হুকুম। বলুন তো—ক্যাবারে ইজ ক্যাবারে। অভিনয়ের সঙ্গে জীবনের কী সম্পর্ক আছে?হ্যারিকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। একেবারে ছেলেমানুষ। বলে কিনা শোতে কোনো লোকের কোলে তুমি বসতে পারবে না।"

কনিকে এতোক্ষণ কিছুই বলিনি। এবার বললাম, "এমন লোক নিয়ে দল তৈরি করলে আপনার জনপ্রিয়তা কমে যাবে। অভিনয়ে আপনি কী করলেন আর না করলেন তার কৈফিয়ত আপনি অন্য কাউকে দেবেন কেন?"

কনি বললে, "ঠিক বলেছেন। আমার নিজের দলের আর্টিস্ট রোজ আমাকে জালাতন করবে, এ অসহ্য।" তারপরেই যেন ল্যামব্রেটার জুতোর শব্দে ভয় পেয়ে গিয়ে

বললে, "ও যেন শূনতে না পায়।"

"লেডিজ অ্যান্ড জেটলমেন!" আজ অভিজ্ঞ অভিনেতার মতোই রঙ্গমঞ্চের সামনে মাইক ধরে দাঁড়ালাম। "গুড ইভনিং। শাজাহান হোটেলের এই ময়ূর সন্ধ্যায় আপনারা আশা করি আমাদের ফরাসী সেফের রান্না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চয়ন করা মদ উপভোগ করেছেন। নাউ, আই প্রেজেন্ট টু ইউ কনি। কনি, দি উয়োম্যান। আপনাদের বৈচিত্র্যময় জীবনে আপনারা অনেক উয়োম্যান দেখেছেন, কিন্তু হিয়ার ইজ 'দি' উয়োম্যান। —যা এই শতাব্দীতে ভগবান একটিই সৃষ্টি করেছেন!"

গত রাত্রের মতো আবার আলো নিভলো। গত রাত্রের সেই মানুষগুলোই আজও যেন এখানে বসে রয়েছে; কিংবা যারা এখানে আসে তাদের সবারই স্বভাব এক। কেননা আজও সেই রকম গুঞ্জন উঠলো। তারপরই সেই ছন্দপতন। প্রত্যাশী মানুষদের আশাভঙ্গ। কনি দি উয়োম্যান নেই। তার বদলে বামানাবতার ল্যামব্রেটা।

কিন্তু ল্যামব্রেটা? এই মুহূর্তে তাকে দেখে কে বলবে সে কয়েক মিনিট আগেও বিছানায় পড়েছিল; কিছুতেই আসতে চাইছিল না। সেই ক্লান্ত, বদমেজাজী, বিমর্ষ লোকটা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। অন্য একটা বামন যেন তিন ফুট উচু টুপি হাতে বলছে, "গুড ইভনিং লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন। আমিই......মেয়েমানুষ কনি। আমার জন্য এই রাত্রি পর্যন্ত আপনারা সে বসে রয়েছেন এর জন্য আমি গর্ব বোধ করছি।"

তারপর গতকালও যা হয়েছিল, ঠিক তাই হলো। আলো নিভে গিয়ে হঠাৎ কনি কোথা থেকে হাজির হলো। সামনের সারির একজন ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, "আমার কোলে কে যেন বসেছে।" অন্ধকারের মধ্যে বললাম, "ভয় পাবেন না।"

আজ বোধহয় কনি লোক চিনতে ভুল করেছিল, একেবারে বুঝনদার লোকের কোলে গিয়ে বসে পড়েছিল। লোকটি চিৎকার করে বললে, "পেয়েছি! 'আলো জ্বালাবেন না।"

এই রকম অবস্থার জন্যে সব সময়ই প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ বোসদা আমাকে বারবার দিয়েছিলেন। এক মুহূর্ত দেরী না করে, আলোটা জালিয়ে দেবার ইঙ্গিত করলাম। মমতাজের সব আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠলো। বিপদের সঙ্কেত পেয়ে যেন আলোর দমকল নক্ষত্রবেগে কোথা থেকে ছুটে এলো। কনি এবার জোর করে

ভদ্রলোকের কোল থেকে উঠে এলো, কনি হাঁপাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মতো সময় কারোর ছিল না।

কনির নাচ শুরু হয়ে গেলো। নাচের প্রাগৈতিহাসিক ছন্দ যেন দামামা বাজিয়ে রাতের অতিথিদের অন্তরের পশুটাকে জাগিয়ে তুলছে । বাধাবন্ধহীন সেই অরন্যশক্তি কোট-প্যান্ট-টাই-এর খাঁচা ভেঙে এই মূহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে 'আসতে চাইছে। ল্যামব্রেটাও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সুন্দরী কণির প্রতি তার অনূরাগের বিচিত্র ভঙ্গী দর্শকদের দেহে আরও সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে বেচারা যে কনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এবং কনির মন জয় করবার জন্যে পরিশ্রম করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠেছে, তা আর কারোরই বুঝতে বাকি নেই ।

উপস্থিত মহিলারাও সে দৃশ্য দেখে— ও লর্ড, বলে অস্বস্তিতে সঙ্গীদের দেহে ঢলে পড়ছেন, কিন্তু তাঁদের মুখের প্রশ্রয়পূর্ণ চাপা হাসিতেই বোঝা শাৰা, তাঁরা আধুনিকা। রুচির কোনো অনূদার আইন দিয়ে পুরুষদের তাঁরা বেধেঁ রাখতে চান না।

ল্যামব্রেটা চেষ্টা করছে, কনির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার। কিন্তু কনির সেদিতে মোটেই খেয়াল নেই। পুরুষসর্বস্ব এই সান্ধ্য মেলায় সে যেন যৌবন ও সৌন্দর্যের দম্ভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকদের সারিতে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন মহিলাকে ল্যামব্রেটা সম্বন্ধে বলতে শুনলাম—“পুওর ফেলো। আহা বেচারি।” মহিলার সঙ্গী বললেন, “অযথা দুঃখ কোরো না। এরা অভিনয় করছে।” মহিলা তাঁর সঙ্গীর হাতটা চেপে ধরে, দেহটাকে তাঁর দেহের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, “বাজে বোকো না, ডার্লিং। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। ওর চোখে যে আগুন দেখছি, তা কিছুতেই অভিনয় নয়। আমরা মেয়েমানুষ, সব বুঝতে পারি।”

মহিলা বোধহয় এবার আমাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গীকে তিনি কী যেন ফিসফিস করে বললেন। সঙ্গী আমাকে ডেকে বললেন, "এক্সকিউজ মি, কনি আর ঐ বামনটার সম্পর্ক কী?”

বললাম, “জানি না।”

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "ওরা কি এক ঘরে রাত্রি কাটায়?" বললাম, "না, আমরা ওঁদের দু'টো ঘর দিয়েছি।"

মহিলা এবার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। বললেন, "তাতে কিছুই বোঝা যায় না, ডার্লিং। এরা তো হোটেলের লোক, এ-সব ব্যাপারে এক্সপার্ট। জিজ্ঞাসা করো।"

মধ্যবয়সী এই মহিলার রুচিহীন জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। হোটেলে চাকরি করে আমরা যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি। আমাদের যেন ঘরসংসার নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। লজ্জাশরম নেই। ভদ্রমহিলা বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝলেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, "ম্যাগো! এই মেয়েগুলোর চোখে কোনো পর্দা নেই।"

পর্দা কোথায় আছে তা সরে আসতে আসতেই দেখলাম। আমাদের সন্ধানী চোখগুলোকে অমান্য করে টেবিলের তলায় শাড়ীর পা একটা ট্রাউজারের পা-কে বেপরোয়াভাবে জড়িয়ে ধরেছে। সভ্যতার গহন অরণ্যে একটা মাকড়স্যর জালের সঙ্গে আর একটা মাকড়স্যর জাল জট পাকিয়ে গিয়েছে।

কনি নাচছে। সঙ্গে ল্যামব্রেটাও নাচছে। কনির দেহের গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ল্যামব্রেটার বেগও দ্রুততর হচ্ছে। তাতে তাল দিয়ে সে যেন এই রূপসী যুবতীর মন হরণের চেষ্টা করছে। কিন্তু ল্যামব্রেটা হাঁপিয়ে উঠছে। লম্বা ঠ্যাঙ দিয়ে যে দুরত্ব কনি একবার অতিক্রম করছে, ল্যামব্রেটাকে সেখানে তিনবার পা ফেলতে হচ্ছে।

কনি বোধহয় বুঝতে পারছে, তার সঙ্গীর দম ফুরিয়ে আসছে। কনির রুমালটা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেলো। করুণায় গদগদ বামন সেটি তুলে সুন্দরীর করকমলে প্রত্যর্পণ করে বোধহয় একটু আশার আলো দেখতে পেলো। সেই মুহূর্তেই কনি তার সঙ্গীকে কী যেন বললে। এবার কনি হঠাৎ অগ্নিমূর্তি ধারণ করলে। দূরের দর্শকরা ভাবলেন, কনির ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে বামনাবতার বোধহয় কোনো কুপ্রস্তাব করেছিল। কনি হঠাৎ নাচের ভঙ্গীতেই ল্যামব্রেটাকে তাড়া করলে। বলতে লাগলো -"পাজী শয়তান, দুর হটো। তোমার এইটুকু দেহে এতো কুবুদ্ধি?"

ভয় পেয়েই যেন ল্যামব্রেটা আরও কুঁজো হয়ে স্টেজের বাইরে এসে দাঁড়ালো। আর তাকে বিদায় করে নিশ্চিন্ত হয়ে লাস্যময়ী কনি তার যৌবননৃত্য শুরু করলে। আমার দৃষ্টি

তখন কনির নাচের দিকে নেই। আমি তখন একমনে ল্যামব্রেটার দিকে তাকিয়ে আছি। ল্যামব্রেটা গতকাল অনেকক্ষণ ধরে নেচেছিল। আজ অনেক আগেই ফিরে এসেছে। অন্য কেউ বুঝলো না। কিন্তু আমি বুঝলাম ল্যামব্রেটার দম ফুরিয়ে আসছিল। সে আর পারছিল না। ওর সেই অবস্থা দেখেই কনি হঠাৎ নিজের রুমালটা মেঝেতে ফেলে দিলে। ল্যামপেটার ভাঁড়ামির সুযোগ নিয়ে বললে, "তুমি এবার বিশ্রাম নাও।"

বেচারা হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। ঘামে দেহের জামাকাপড়গুলো ভিজে উঠেছে। কনির কিন্তু ক্লান্তি নেই। সে আবার দম দেওয়া লাট্টুর মতন নাচতে শুরু করেছে। মমতাজ-এর সব আলোগুলো কখন নিভে গিয়েছে। শুধু একটা রঙ্গীন আলোর রেখা কনির অর্ধউলঙ্গ দেহের উপর পড়ে তাকে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে।

ল্যামব্রেটা নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে মনে হলো। আমার দিকে সে এবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সে-অন্ধকারেও মনে হলো, তার চোখ দু'টো মোটরের হেডলাইটের মতো জ্বলছে। ফিসফিস করে সে আমাকে বললে, যে লোকটার কোলে কনি প্রথমে গিয়ে বসেছিল, তাকে তুমি চিনতে পারবে? তার মাথায় আমি সোডার বোতল ভাঙবো। আমাকে তোমরা এখনও চেনোনি। লোকটা কনিকে খামচে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "রাগ করবেন না। চুপ করে থাকুন।"

ল্যামব্রেটা বললে, "আব্দার নাকি? এভরিহয়ার লোকরা কনির উপর অত্যাচার করবে, আর আমি সহ্য করে যাবো?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "মিস্টার ল্যামব্রেটা, আপনার সঙ্গে ডিবেটিং করার মতো সময় আমার নেই। এই যে হলঘরে এতোগুলো লোক দেখছেন তাদের মর্জির উপর আমার চাকরি নির্ভর করছে। এরা যদি কোনোরকমে অসন্তুষ্ট হয়ে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো"

ল্যামব্রেটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "ইফ দে ফাস্ট, উই স্টার্ভ। কিন্তু খেতে আরম্ভ করে ওরা যে কনিকে খেয়ে ফেলবে। তখন?"

হা ঈশ্বর, এ কোন পাগলের হাতে পড়লাম? তোমরা এখানে নাচতে এসেছো। তার জন্যে আমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমরা অনেক টাকা নিয়েছো। অনেক টাকা দিতে

হচ্ছে বলে, মালিকরা খাবার ও মদের দাম বাড়িয়ে দিয়ে আরও টাকা তুলে নিচ্ছেন। এর মধ্যে আমরা, দরিদ্র কর্মচারীরা, কোথা থেকে আসি? আমাকে আমার কাজ করতে দাও। চিৎকার করে বলতে দাও, লেডিস অ্যান্ড জেটলমেন, শাজাহান হোটেলের তরফ থেকে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনাদের ক্লান্ত দেহ এবং মনকে দু'দণ্ড শান্তি দেবার জন্যই আমরা এখানে সামান্য আয়োজন করেছি। এর মধ্যে কোথাকার তুমি হরিদাস পাল, আমাদের বিরক্ত করতে আসছো কেন?

ল্যামব্রেটা আমার ব্যবহারে বোধহয় আরও বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে, দেখাচ্ছি। তোমাদের আমি মজা দেখিয়ে ছাড়বো।"

এরই মধ্যে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। শাজাহান হোটেলের ইলেকট্রিসিয়ান এই পুরুষ মেলায় আমার ইঙ্গিতে সুইচ টিপে প্রায় নিরাবরণ কনিকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তার পরের মুহূর্তেই আবার আলো জ্বলে উঠেছে। স্ক্রিনের পিছনে এসে একটা আলখাল্লা পরে কনিও তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে প্রশ্ন করলে, "হ্যারি কোথায়?"

আমি বললাম, "ওঁকে ঠিক রাখা আমাদের মতো সামান্য লোকের কাজ নয়। রেগেমেগে কোথায় যে উধাও হলেন কে জানে।"

কনি মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে নিজের ডান হাতের কনুইয়ের কাছে হাত বোলাতে লাগলো। হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "তোমাদের এখানে অনেকে এতো ড্রিঙ্ক করে যে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সম্পর্ণ আউট হয়ে গিয়েছিলেন।"

আমি কনির মুখের দিকে তাকালাম। কনিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধভাবে বললে, "একটু আয়োডিন দিতে পারো? ভদ্রলোক বোধহয় নখ কাটেন না। নেশার ঘোরে এমনভাবে খামচে দিয়েছেন যে হাতটা জ্বালা করছে।"

ল্যামব্রেটা এবার কোথা থেকে এসে হাজির হলো। বললে, "ভদ্রলোক? কাদের তুমি ভদ্রলোক বলছো, কনি?" দেখলাম ল্যামব্রেটা কোথা থেকে একটু তুলো এবং আয়োডিন যোগাড় করে এনেছে। কনির হাতটা ধরে পরম যত্নে সে আঁচড়ানো জায়গাটা আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো। কনি চোখ বুজে বললে, "উঃ! হ্যারি, আমার লাগছে।"

ল্যামব্রেটা গম্ভীরভাবে বললে, “শয়তানদের মাথায় ভগবানের অভিশাপ নেমে আসুক।”

কনি শান্ত হয়ে, নিজের জ্বালা ভুলে গিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললে, "ছিঃ হ্যারি, ভগবানের নামে কাউকে গালাগালি দিতে তুমিই না আমাকে বারণ করেছিলে? তাতে যে অমঙ্গল হয়।”

হ্যারি বললে, “একদম বাজে কথা। এই ডার্টি ডেভিলদের সর্বনাশের জন্য তুমি যা খুশি করতে পারো, গড বাধা দেবেন না। তিনি তোমাদের উপর মোটেই অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, তিনি সুখী হবেন। তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করবেন!”

এতোদিন পরে, আজও লিখতে লিখতে আমি কনি ও সেই কুৎসিতদর্শন ল্যামব্রেটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের এই সংসারে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এলাম। কিন্তু সু এবং কু ন্যায় এবং অন্যায়ের এই অপরূপ প্রদর্শনীতে স্রষ্টার যে কি পরিকল্পনা রয়েছে তা আজও আমার কাছে পরিস্ফুট হলো না। আজও আমার চোখের সামনে সেই রাত্রের দৃশ্যটা হঠাৎ পুরনো চলচ্চিত্রের নতুন প্রিন্টের মতো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। আমি দেখি ল্যামব্রেটা ঈশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে, ‘ও লর্ড, কার্স দেম। হে ঈশ্বর, এদের তুমি অভিশাপ দাও। তোমার ধিক্কার বজ্রসম এই ঐশ্বর্যময় অথচ কুৎসিত সভ্যতার উপর নেমে আসুক। কে জানে, এই অর্ধ উন্মাদ বামনের সেই কাতর প্রার্থনা উদাসী সৃষ্টিকর্তার কানে পৌঁছেছিল কি না। হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অপমানিত মানবাত্মা কত বিচিত্র্য ভাষায় বার বারই তো সেই একই কাতর আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে কি?

ন্যাটাহারিবাব একবার বলেছিলেন, “ভগবান? ওঁর নাম করবেন না, মশাই। ঘেন্না ধরে গিয়েছে। উনিও আর এক গবরমেন্ট। ঠিক গবরমেন্ট আপিসের মতো ওঁর কাজ কারবার। ওঁর আপিসে যদি কোনোদিন যান, দেখবেন হাজার হাজার পিটিশন রোজ এসে জমা হচ্ছে। ভগবানের কর্মচারীরা সব ‘নো অ্যাকসান, মে বি ফাইল্ড' লিখে ফাইলে ঢুকিয়ে রাখছে। কস্মিন, কালে কেউ কোনোদিন সে-সবে হাত দেয় না।”

ন্যাটাহারিবাবু আরও বলেছিলেন, "হাসছেন মশায়? রক্ত গরম আছে, মনটা কচি কচি আছে, ফিক করে হেসে নিন। একদিন কিন্তু কাঁদতে হবে। বলে রাখলাম, শুধুই কাঁদতে হবে। তখন বিশ্বাস হবে আমার কথা। তখন জানতে পারবেন, ভগবানের আপিসে আর একটুও জায়গা নেই। কত বড় বড় লোকের ফাইল সেখানে পাথরের মতো অচল হয়ে পড়ে আছে—আর আপনি ভাবছেন আপনার ফাইল, এই ন্যাটাহারি ভট্টাচার্যের ফাইল ভগবান মন দিয়ে দেখবেন? ভগবানের টাইম নেই মশাই। পেটি কেস ডিসপোজালের টাইম অতোবড় অফিসারের থাকতে পারে না।"

হয়তো আমার ছেলেমানুষি। হয়তো এমন মন নিয়ে শাজাহান হোটেলে চাকরি করতে যাওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু ল্যামব্রেটা ও কনিকে স্টেজের পিছনে একলা রেখে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল গডের "অফিসে আর একটা ফাইল বাড়লো। ল্যামব্রেটা সায়েবের পিটিশন সেখানে গিয়ে রেজিস্ট্রি হবে। কিন্তু কে জানে বোধহয় ওই পর্যন্তই। ওইখানেই আবেদনের মৃত্যু। ল্যামব্রেটা অপেক্ষা করবে, কনি অপেক্ষা করবে। ভাববে, এইবার বোধহয় খবর আসবে। তারপর একদিন অপেক্ষার শেষ হবে। কনির যৌবনে ভাঁটার টান পড়বে। ল্যামব্রেটার ভাতে টান পড়বে। শাজাহান কেন, পৃথিবীর কোনো ক্যাবারেতেই তাদের আর দেখা যাবে না। নতুন কনি নতুন কোনো বামনের সঙ্গে লীলায়িত ভঙ্গীতে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবে। ও তারাও আবার মদ মত্ত অতিথিদের আহ্বান জানিয়ে বলবে, 'গুড্ ইভনিং, লেডিস অ্যান্ড জেণ্টলমেন।' জেণ্টলমেনরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। তাঁদেরই মধ্যে কে আবার তাঁর হিংস্র কামোন্মত্ত নখ দিয়ে সেদিনের কনিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবেন। সেদিনের বামন ল্যামব্রেটাও হয়তো আজকের মতোই অধৈর্য হয়ে আবার আবেদন জানাবে। কিন্তু কিছুই হবে না। আবার ফাইল খোলা হবে। আবার বিচারের প্রত্যাশায় অধীর ল্যামব্রেটা দিন গুনতে থাকবে।

কিন্তু এ-সব কি আমি ভাবছি? আমি হোটেলের রিসেপশনিস্ট। আমার এখন অনেক কাজ আছে। ক্লান্ত নর্তকী যখন কিছুক্ষণের বিশ্রামের জন্য জনান্তরালে গিয়েছেন, তখন আমার বিশ্রামের সময় নয়। তখন দাঁড়িয়ে চিন্তা করার জন্যে হোটেল আমাকে মাইনে দিয়ে রাখেনি। এখনই আমার মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত! বিনয়ে বিগলিত হয়ে

উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাদের জানানো উচিত, কনি দি উয়োম্যান এখনই আসবেন। মাত্র কিছুক্ষণ আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আমাদের বেয়ারাদের হুকুম দিয়ে মদিরা আনুন। তারপর আবার সে আসছে।'

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। শাজাহান হোটেলের ক্যাবারে অ্যানাউন্সার, আমার আরও কাজ আছে। সেই কাজ এখন আমাকে ধীর মস্তিষ্কে, সার্কাস পার্টির ক্লাউনদের মতো নিপুণভাবে করতে হবে। সেই সব কাজ কেমনভাবে আমি করতে পারি, তার উপরই আমার চাকরির ভবিষ্যৎ। তার উপর নির্ভর করবে, শাজাহান হোটেলের বিনামূল্যে বিতরিত অন্ন আমার টেবিলে কতদিন এসে হাজির হবে।

মাইকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করে আমি স্টেজ থেকে ফ্লোরে নেমে এলাম। এবার অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তদারক।

একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকলেন, "হ্যালো, স্যর, একটু শুনুন না।" ফোকলা চ্যাটার্জির টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "না হয় সামনের টেবিলে বসিনি। তাই বলে একটু আমাদের কমফর্টের দিকে নজর দেবেন না!"

আমি বললাম, "সে কী! আপনাদের হুকুম তামিল করবার জন্যেই তো আমরা রয়েছি।"

ফোকলা বললেন, "দেখুন না, ভাগনেকে নিয়ে কী বিপদে পড়েছি। শুধু বলছে, ফিরে চলো, ফিরে চলো।"

মাস্টার পাকড়াশীর দিকে তাকালাম। বেচারার চোখে ঘুম জড়ো হয়ে রয়েছে। মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, "ভাগনেটাকে হাতেখড়ি দিতে নিয়ে এলাম, একটু আদর-আপ্যায়ন করুন-না-হলে শাজাহান হোটেল সম্বন্ধে ওর খারাপ ওপিনিয়ন হয়ে যাবে।"

আমি জুনিয়র পাকড়াশীকে নমস্কার করে বললাম, "আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? আপনার মামার সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক, নিজের মনে করে শাজাহান হোটেলকে ব্যবহার করবেন।"

মামা এবার ভাগনেকে বললেন, "হ্যাঁ ব্রাদার, স্পোর্টিং স্পিরিটে লাইফ এনজয় করবে। কতক্ষণের জন্যেই আর আমরা এই পৃথিবীতে ব্যাটিং করতে এসেছি। যতক্ষণ

ক্রিজে থাকবে, উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলে যাও।” শ্রীমান পাকড়াশী ক্রিকেটের উপমায় একটু হেসে ফেললে। মামা বললেন, “তোমার বাবার সমালোচনা করা উচিত নয়। কিন্তু ওঁর নজর শুধু বিজনেসের দিকে। উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলবার চেষ্টা করলেন না।" শূন্য গেলাসের দিকে নজর দিয়ে মামা এবার বললেন, “গেলাসে যে কিছুই নেই। তাই বলি, কথাবার্তায় ফ্লো আসছে না কেন। পেট্রল ট্যাঙ্ক খালি থাকলে গাড়ি চলবে কি করে? কিছু একটা কইকুলি সাজেস্ট করুন।”

“আদি অকৃত্রিম হুইস্কি। ওর মতো জিনিস নেই।” আমি বললাম। ফোকলা চ্যাটার্জি সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, “মশাই, প্লেন অ্যাণ্ড সিমপল হুইস্কি তো সেই অ-আ-ক-খ পড়বার সময় থেকে চালিয়ে আসছি। স্পেশাল ককটেল কিছু, সাজেস্ট করুন।”

বললাম, “পিঙ্ক লেডি।"

“জিনের সঙ্গে ডিমের সাদাটা মিশিয়ে যা তৈরি হয় তো? না মশাই, ওটা আমার মোটেই ভাল লাগে না।”

“তা হলে হোয়াইট লেডি।”

"জিন আর লাইমের ভদ্র নাম। না মশাই। আপনার ইমাজিনেশন এমন পুওর হয়ে যাচ্ছে কেন? জিন ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছেন না! আমাদের বন্ধু স্যাটা বোসকে ডাকুন।”

সত্যসুন্দরদা আমার ইঙ্গিতে দ্রুতবেগে এগিয়ে এলেন। ফোকলা চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে বললেন, “যেমন আমার ভাগনে তেমনই আপনার এই শিষ্যটি। এখনও নভিস। একটা সুইটেবল্ ড্রিঙ্কের বুদ্ধি দিতে পারছে না। শ্রীমানের কাছে মামার প্রেস্টিজ আর থাকবে না।”

সত্যসুন্দরদার চোখ দু’টো বুদ্ধির দীপ্তিতে নেচে উঠলো। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, "এই সব ছেলেছোকরারা নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছে। আর আমরা আপনারা সেকেলে হয়ে পড়ছি। সেইজন্যে আমি যে ড্রিঙ্ক সাজেস্ট করছি তার নাম ওল্ড ফ্যাশন্ড। ক্যানাডার হুইস্কির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুট সোডা।"

ফোকলা বললেন, “চমৎকার।” বোসদা বললেন, "মার্জনা করবেন, এই ড্রিঙ্ক আপনার পছন্দ না হলে আমি যা সাজেস্ট করতাম তার নাম মস্কো মিউল।”

“অ্যাঁ! এই বুড়ো বয়সে মিউল! ছি ছি, লোকে বলবে কী!” ফোকলা চ্যাটার্জী হা-হা করতে লাগলেন।

শ্রীমান পাকড়াশী এবার আস্তে আস্তে বললে, “আমি কিন্তু মামা আর খাবো না"। ফোকলা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, “কি মুশকিলেই যে পড়া গেলো! না রে, তুই আর খোকাটি নেই! বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোর বার্থ সার্টিফিকেটটা একবার একজামিন করে দেখিস। সেই তো সেবার ভূমিকম্পের বছরে তোর জন্ম হলো। তোর বাবার তখন ঘোর দু'র্দিন। ডিপ্রেসনে সব যেতে বসেছে। তুই হয়েছিস খবর পেয়ে পাকড়াশী সায়েবকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে বিলেত থেকে চিঠি পাঠালাম। তা তোর বাবা আমাকে কি লিখে পাঠালে জানিস? হা হা হা" ফোকলা চ্যাটার্জি যেন অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন।

পাকড়াশী-জুনিয়র মামার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। হাসির দমক কোনোরকমে সামলে নিয়ে ফোকলা বললেন, “তোর বাবা লিখলে, কী করো সংসার চলবে জানি না। বোঝ, মাধব পাকড়াশী নিজের হাতে লিখছে, যে এখনই ছেলে অ্যাফোর্ড করতে পারে না! সেই সব চিঠি ছিড়ে ফেলে দিয়ে কি বোকামিই যে করেছি! বোস সায়েব আমাকে সেকেণ্ড ড্রিঙ্কটাই দাও। আমি ওল্ড ফ্যাশন্ড নই। মস্কো মিউল ছাড়া আমাকে কিছুই মানায় না। ক্যালকাটা মিউল নামে যদি কিছু থাকে তাও দিতে পারো।”

"আর ওঁকে?” পাকড়াশী-জুনিয়রের দিকে ইঙ্গিত করে আমি প্রশ্ন করলাম। বোসদা বললেন, “মিস্টার চ্যাটার্জি, এরা ইয়ংম্যান। জীবনটা এখন এদের কাছে স্পার্কলিং রাইন ওয়াইনের মতো। আপনার অনুমতি নিয়ে মিস্টার পাকড়াশীকে স্পার্কলিং রেড হক দিই। ওয়ান্ডারফুল জিনিস। আমার জন্ম বছরে বোতলে ভরা হয়েছিল।”

“ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল! এইজন্যেই স্যাটা বোসকে ন-হলে আমার চলে না। শাজাহান হোটেল মাইনাস স্যটা বোস ইজিকলটু মাধব ইন্ডাস্ট্রিজ মাইনাস মাধব, হ্যামলেট মাইনাস প্রিন্স অফ ডেনমার্ক, বাংলা সাহিত্য মাইনাস রবি ঠাকুর, রামকৃষ্ণ মিশন মাইনাস বিবেকানন্দ, অ্যাণ্ড লাস্ট বাট নট দি লিস্ট ফোকলা চ্যাটার্জি মাইনাস ড্রিঙ্ক।” হা-হা করে

হাসছেন ফোকলা চ্যাটার্জি। কিন্তু হাসতে হাসতেই যেন তিনি কেমন হয়ে পড়লেন। স্যাটাদাকে বললেন, “ড্রিঙ্ক ছাড়া আমি থাকতে পারি না মশাই। কিছুতেই পারি না। বেলা পড়লেই, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার যেমনি কলকাতাকে ঘোমটা পরিয়ে দেয়, অমনি আমি যেন কেমন হয়ে যাই। কিছুতেই নিজেকে আটকে রাখতে পারি না। বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল, পুরনো সুরে কে যেন আমাকে ডাকতে আরম্ভ করে।" ফোকলা চ্যাটার্জি'র এই আকস্মিক পরিবর্তনে শুধু আমি নয়, পাকড়াশী জুনিয়রও ভয় পেয়ে গেলো। সে বললে, “মামা!” মামা তখন সত্যসুন্দরদার হাতটা ধরে বলছেন, “আমার কেন এমন হয় বলতে পারেন? বেগ, বরো, অর স্টিল, প্রতিদিন আমাকে মাল টানতেই হবে।”

বোসদা বললেন, “মিস্টার চ্যাটার্জি, বিচলিত হবেন না।” কিন্তু ফোকলা চ্যাটার্জির চোখ দু’টো তখন সজল হয়ে উঠেছে। কালো পাথরের অনুর্বর বুকে হঠাৎ যেন শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে। ফোকলা চ্যাটার্জি নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, “আমি মানুষ না মশাই। আমি জানোয়ার। আমি একটা মস্কো মিউল। না-হলে, নিজের ভাগনেকে নিয়ে কেউ ড্রিঙ্ক করতে আসে? জানেন, ওর নাম আমিই দিয়েছিলাম। সারা জীবন ধরে নিন্দের বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই দিদি যখন চিঠি লিখে পাঠালে, ভাগনের একটা নাম দিয়ে দিও, তখন আমার মাথায় একটা নামই এসেছিল— অনিন্দ্য।" অনিন্দ্য পাকড়াশীর মুখের দিকে ফোকলা চ্যাটার্জি পরম স্নেহভরে তাকিয়ে রইলেন। তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, “এখনো ফ্রেশ রয়েছে।”

বোসদা মিস্টার চ্যাটার্জি'র ড্রিঙ্কগুলো আনবার জন্যে বেয়ারাকে বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফোকলা চ্যাটার্জি বারণ করলেন। গোপনে নিজের মনের মধ্যে ঐ কুৎসিতদর্শন লোকটা যেন কিসের হিসেব করছেন। কেন যে এঁর মনের মধ্যে এই সব চিন্তা জট পাকিয়ে বসলো তাও বোঝা যাচ্ছে না। বোসদাকে তিনি বললেন, “একটু দাঁড়ান। ভেবে নিই।” হঠাৎ ফোকলা চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে পুরনো বিলগুলোর টাকা বের করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, “অনিন্দ্য চলে আয়।” মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনিন্দ্য পাকড়াশীও উঠে পড়লো। মদের নেশায় ফোকলা চ্যাটার্জি কি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন?

এই সামান্য কয়েকটা পেগে বোল্ড আউট হবার ছেলে তো ফোকলা চ্যাটার্জি নন। এই তো কয়েক মুহূহূর্ত আগেও তিনি উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলার পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

বোসদা বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, ক্যাবারের শেষ অঙ্ক দেখবেন না?" ফোকলা চ্যাটার্জি বিষণ্নভাবে অসম্মতি জানালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "আই অ্যাম স্যরি, স্যাটা। অনিন্দ্যকে এখানে আনা আমার কিছুতেই উচিত হয়নি।"

আমাদের বিস্মিত ও অভিভূত করে ফোকলা চ্যাটার্জি নিজের ভাগনের হাত ধরে যখন অসমাপ্ত আনন্দসভা থেকে বিদায় নিলেন, মমতাজের আলোগুলো তখন আবার নিভতে আরম্ভ করেছে। বেয়ারারা তখন শেষবারের মতো দ্রুতগতিতে ভদ্রমহোদয়দের টেবিলে ড্রিঙ্ক পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে।

আবার নাচ শুরু হলো। রঙিন আলোর মেলায় মেয়েমানুষ কনির ফানুস নৃত্য। সারা অঙ্গে ফানুস বেধে কনি যেন প্যারাসুটবাহিনী হয়ে স্টেজের উপর এসে নামলো।

স্টেজে নামবার আগে কনিকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তোমার হাত কেমন?" কনি বলেছিল, "আমার ও-সব মনে থাকে না। হ্যারিই ওতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।" কনি আরও বলেছিল, "এখন স্টেজে যাবার মুখে আমাকে ঐসব অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিও না। ওতে আমার মুড নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

আমি আর মনে করিয়ে দিইনি। কনিও এবার অতিথিদের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলো। আশ্চর্য! যে এতোক্ষণ এমন বিষণ্ন গাম্ভীর্যে নিজেকে পরিপূর্ণ রেখেছিল সে-ই যে নিমেষের মধ্যে এমন চটুল লাস্যময়ী হয়ে উঠতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

উপস্থিত অতিথিরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। চিৎকার উঠলো। সিটি বাজলো। প্রতিদিন যা হয়, যুগ যুগ ধরে শাজাহান প্রমোদকক্ষে যা হয়ে আসছে, তারই পুনরাবৃত্তি হলো। তবু কেন জানি না, বেশ বুঝতে পারলাম, কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে। গত রাত্রে যে কনি নেচেছে, সে যেন আজ এখানে উপস্থিত নেই। তার নৃত্যে প্রাগৈতিহাসিক উদ্দামতার অভাব ছিল না, তার নয়নে বিষাক্ত সর্পিণীর ভয়াবহতাও ছিল। তবু পান্থশালার নর্তকী আজ ক্লান্ত, তার মুড সত্যিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আজও দর্শকরা ফানুস ফাটালেন। সর্বজাতির কামনা-কলুষিত উল্লাস যেন একদেহে মমতাজের এই ঐতিহাসিক কক্ষে লীন হয়ে গেলো। তবু সংক্ষিপ্ত। বিষণ্ণ নর্তকী আজ অনেক আগেই দর্শকদের শিকারীচোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবার আলো জ্বলে উঠলো। মৃদু' গুঞ্জনে মমতাজের হলঘর ভরে উঠলো। বাড়ি ফেরার তাড়ায় কে আগে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো।

মাইকটাকে যথাস্থানে স্যরিয়ে দিয়ে, বেয়ারাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে

হল থেকে বেরোতে গিয়ে সত্যসুন্দরদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। "কনি কোথায়”? সত্যসুন্দরদা প্রশ্ন করলেন। বললাম, "জানি না, আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।” সত্যসুন্দরদা বললেন, “বেশ গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়া গেলো। ম্যানেজার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। লাস্ট সিকোয়েন্সের সময় জিমি দাঁড়িয়ে ছিলো। সে বোধহয় মার্কোর কাছে লাগিয়েছে।”

শুনলাম, ম্যানেজার কনির মনঃসংযোগের অভাব লক্ষ্য করেছেন। জিমির সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হয়েছে। জিমি বলেছে, “কম্পিটিশানের মার্কেট, একবার বদনাম রটলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্য হোটেলে তিন তিনটে মেয়ে আগামীকাল থেকে একসঙ্গে নাচতে শুরু করবে। ওরা বলে বেড়াচ্ছে, এক মায়ের তিন মেয়ে। তিন বোন না ছাই। আঠারো বছর বয়সের আগে ছুড়িরা কেউ কারার মুখ দেখেনি। আর এখানে বিজ্ঞাপনের জোরে তিন বোন হয়ে গিয়েছে।”

বোসদা বললেন, “ম্যানেজার কি করে ল্যামব্রেটার কথা শুনলো? তুমি কিছু বলেছো?”

“আমি?”

বোসদা বললেন, “ওঁদের ধারণা যত নষ্টের গোড়া ওই বেঁটে সায়েব। ওর জন্যেই কনির নাচ খারাপ হচ্ছে।”

আমি বললাম, “ও বেচারীর কি দোষ?একজন পাবলিকই তো কনিকে আঁচড়ে দিয়ে সব গণ্ডগোল করে দিলো।”

বোসদা বললেন, “ম্যানেজার কিছু একটা করবেন। সেইজন্যেই আমাকে ডেকেছিলেন।”

"কী করবেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা হাসলেন। বললেন, “এতো উতলা হচ্ছো কেন? এতো বড়ো হোটেল চালাতে হলে ম্যানেজমেন্টকে কত কী করতে হয়।”

আমার কেন জানি না ভয় হলো, কনির কোনো ক্ষতি হবে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোসদা যেন বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, "বলেছি না, এর নাম পান্থশালা। কেউ এখানে থাকবে না। কারোর উপর মায়া বাড়িয়ো না।”

আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ দু’টো স্যরিয়ে নিলাম! বোসদা বললেন, “দোষ তো কনিরই। হোটেলের চাকরবাকরগুলো পর্যন্ত বামনটাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। জিমি নিজে বললে, "কনি তার বামনের জন্যেও একটা এয়ারকন্ডিশন ঘর দাবি করেছিল।”

আমি তখন ওসব শুনতে চাই না। ম্যানেজার ও জিমি কি ফন্দি এঁটেছেন তাই জানতে চাই। কিন্তু জানা হলো না। বোসদা কিছু প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। আমিও বোসদার মুখ-চোখের ভাব দেখে আর জোর করতে সাহস করলাম না।

ব্যাপারটা যে আর চাপা নেই, তা পরের দিনই বোঝা গেলো। হোটেলের কাজে শ্রীমতী করবী গুহর সুইটে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী করবী গুহ তখন তার প্রাত্যহিক কর্তব্য সেরে ফেলেছেন। ফুলের দোকানদারের প্রতিনিধি তাঁর অর্ডার নিয়ে গিয়েছেন। ন্যাটাহারিবাবু তারপর সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, “মা জননী, আজ আপনাকে কোন রংয়ের পর্দার কাপড়, বিছানার চাদর পাঠাবো বলুন।”

আমার সামনেই করবী দেবী বলছেন, “অনা লোকদের বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর রংয়ের পর্দা দেখি, কত নতুন নতুন রং বেরোচ্ছে, আপনার ভাঁড়ারে সেই সেকেলে রংগুলো পড়ে রয়েছে।"

ন্যাটাহারিবাবু সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'মা জননী বাড়ি আর এই হোটেল কি এক জিনিস? গেরস্ত যদি নিজের দরজায় থলে টাঙিয়ে রাখে তাহলে তাই দেখেও মানুষের চোখ জুড়িয়ে যাবে।”

করবী দেবী তাঁর টানা টানা চোখ দু’টো নিয়ে নিত্যহরিবাবুর দিকে কেমন ভাবে তাকালেন। আস্তে আস্তে বললেন, “আমাকেও তো এই সুইটটা ভাল করে সাজিয়ে রাখতে হবে। রংয়ের সঙ্গে রং না মিললে এই গেস্ট-হাউসের কী থাকবে বলুন?”

নিত্যহরিবাবু উত্তর দিলেন, “আমি যতক্ষণ আছি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নিত্যহরি যে করে পারে, রোজ আপনার রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে যাবে। তবে মা জননী, নিত্যনতুন এই রংয়ের খেলা না দেখালেই নয়?”

নিত্যহরিবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আমি বললাম, “আপনার কোনো অসুবিধে থাকলে ম্যানেজারকে জানাতে পারি। নিত্যহরিবাবু কি আপনার পছন্দমতো চাদর এবং পর্দা দিতে পারছেন না?”

করবী দেবী যে এই ভোরবেলায় স্নান সেরে ফেলেছেন, তা তাঁর চুলের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। নিজের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে করবী দেবী বললেন, “আপনার কিছু

বলবার দরকার নেই। নিত্যহরিবাবু মনে কষ্ট পাবেন। ভারি সুন্দর মানুষটি। কেন জানি না, ওঁকে আমার খুব ভাল লাগে। ডাকবারে খাঁটি সোনা। এখানে এতোদিন থেকেও নষ্ট হয়ে যাননি।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “মিস্টার পাকড়াশীর অতিথিরা কবে হাজির হচ্ছেন”। তাঁদের জন্যে কোনো স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার থাকলে আমাদের এখনই বলে দেবেন।”

করবী দেবী বললেন, "মিস্টার আগরওয়ালা চান, ওঁদের সেবার যেন ত্রুটি না হয়। আমি ঠিক করেছি দু’জনকে দু’টো কেবিন দিয়ে দেবো। আর এইটাকে আমার বেডরুম করে নেবো। অসুবিধার কোনো কারণ নেই। আগে চার-পাঁচজন গেস্টও একসঙ্গে এখানে থেকে গিয়েছেন।"

তারিখের কথায় করবী বললেন, “ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ওটা জেনে রাখলে কাজের সুবিধে।” টেলিফোনটা তুলে নিয়ে করবী বললেন, "দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসে পড়ুন।”

বসে বসে দেখলাম, করবী দেবীর পা দু’টো যেন পদ্মফুলের মতো। তার উপর সোনালী রংয়ের হাল্কা চটি পরেছেন। পায়ের আঙুলগুলো আলতার রংয়ে লাল হয়ে আছে। করবী হেসে বললেন, “আপনার সেই সভাপতির কীর্তি জানেন? ফিরে গিয়ে পার্সেল পোস্টে এই চটিদু’টো পাঠিয়ে দিয়েছেন। পায়ের মাপটা কখন যোগাড় করলেন কে জানে।" আমি বললাম, “আপনার পায়ে মানিয়েছেও ভাল।”

করবী খিলখিল করে হেসে উঠলেন। “অতো বুঝি না। তবে সবাই যাঁকে মাথায় করে রেখেছিল, তাঁকে যে পায়ের তলায় রাখতে পারছি, এতেই আমার আনন্দ। জানেন, নেশার ঘোরে মাননীয় অতিথি সেই রাতে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিলেন।”

টেলিফোনে কথা শেষ করে করবী আমাকে জানালেন, “কর্তাকে পেলাম না। তিনি ফ্যাক্টরীতে গিয়েছেন। প্রথমে গৃহিণী ধরলেন, পরে পাকড়াশী জুনিয়র। কেউ কিছুই খবর রাখেন না। তবে পুত্র পাকড়াশী অনুগ্রহ করে আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”

আমি বললান, "খবরটা পেলে আমাদেরও একটু জানিয়ে দেবেন।" আমি এবার চলে আসছিলাম। করবী দেবী বললেন, "উঠছেন কেন?, একটু ওভালটিন খেয়ে যান।" আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এই হোটেলে কেউ কখনও আমাকে এমন আন্তরিকভাবে কিছু খেতে বলেনি। করবী বললেন, "থাকি হোটেলে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে ছোট্ট সংস্যর পেতে বসেছি। আমার নিজের রান্নাবান্নার কিছু সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছি। আপনাদের হোটেলের কফি আমার সব সময় ভাল লাগে না। তখন হিটার জ্বেলে আমি নিজেই চা কফি বা ওভালটিন করে নিই।"

দেখলাম হিটারে করবী একটু আগেই জল চড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, "এর থেকে প্রমাণ হয় না যে, শাজাহান হোটেলের কফি খরাপ। এর থেকে এইটটুকই প্রমাণ হয় যে, মাঝে মাঝে রান্নার সুযোগ না পেলে বাঙালী মেয়েদের ভাত হজম হয় না!"

করবী হেসে ফেললেন। বললেন, "তা যা বলেছেন। আমার মাঝে মাঝে খুব রাঁধতে ইচ্ছে করে।

ওভালটিনের কাপে চুমুক দিতে দিতে করবী দেবী কনির কথা তুললেন। "আপনি তো ওদের সঙ্গে ঘোরেন। ব্যাপারটা কী?"

তাঁর প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, "আমি ওঁদের সংগে ঘুরতে যাবো কেন? তবে আমি মিস্টার ল্যামব্রেটার পাশের ঘরে থাকি, এই পর্যন্ত"।

"এবং সেই ঘরেই কনি দি উয়োম্যান সারাক্ষণ পড়ে থাকেন!" করবী আবার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন। আমি বললাম, "হাজার হোক ওঁর সহশিল্পী। একসঙ্গে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছেন।" করবী বললেন, "কিন্তু তার মানেই কি একটা বামনের কথায় উঠতে-বসতে হবে?"

কি বলছেন আপনি?" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"শো-তে বামন তাঁর কৃপাপ্রার্থী, করুণাভিখারী। বাইরে ঠিক উল্টো। কনি বামনের সেবাদাসী। তার বদমেজাজের বিরুদ্ধেও কথা বলবার সাহস রাখেনা মেয়েটা।"

আমি বললাম, "তাতে কী এসে যায়? শো-তে ওঁরা কি করছেন সেইটাই আমাদের ভাববার কথা।"

"শো নিয়ে ভাববেন আপনাদের কাস্টমাররা," করবী বললেন। "শোয়ের বাইরে তারা যা করে, তা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। কারণ আমরাও এই হোটেলে থাকি।"

উত্তর দেবার কিছুই খুজে পেলাম না। ওদের জীবন নিয়ে আমরা কেন যে এমন কৌতূহলী হয়ে উঠছি, তা বুঝতে পারি না। করবী বললেন, "এটাও এক ধরনের বিলাস। ক্যাবারে নর্তকীর তো অর্থের চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের আনন্দের জন্যে রাজা-মহারাজা, ধনী এবং ধনীপুত্ররা নর্তকীর পায়ের তলায় ডালি দিয়ে যায়। সুতরাং অবসরের একটা বিলাস না থাকলে খারাপ লাগে। কেউ বাঁদর পোষে, আবার কেউ বামনকে লাই দিয়ে মাথায় তোলে!"

বললাম, "বেচারা যে বামন, তার জন্যে আপনার কষ্ট হয় না?"

করবী বললেন, "ওরা দেখছি আপনার মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা বোঝেন না কেন যে, বামন বলেই লোকটা করে খাচ্ছে। আপনার মতো লম্বা হলে কেউ ওকে কনির সঙ্গে স্টেজে অ্যাপিয়ার হতে দিতো? এ লাইনে আমি অনেকদিন রয়েছি। একটা কথা জেনে রেখে দিন—ভিক্ষে এবং এন্টারটেনমেন্টের জগতে বিকলাঙ্গ, বীভৎসদর্শনের অনেক সুযোগ। এদের যোগাড় করবার জন্যে শিল্পীরা অনেক দাম দেয়।" করবী দেবী একটু থামলেন। তারপর বললেন, "দাম দাও, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মাথায় তুলো না। তাতে যে-হোটেলে তুমি নাচছো, তাদের ক্ষতি, আর নিজেরও সর্বনাশ।"

করবী দেবীকে নমস্কার করে এবার কাউন্টারে এলাম। এবং সেখানকার কাজকর্ম শেষ করে উপরে উঠে গেলাম। কনিকে ছাদের উপরেই দেখতে পেলাম। সে মুখ শুকনো করে বসে আছে মনে হলো। রৌদ্রে পিঠ দিয়ে সে একমনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে কনি সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিলো, তারপর সেটা ছুড়ে এক কোণে ফেলে দিয়ে বললে, "গুড মর্নিং"।

জানি আজকের সকালটা কনির পক্ষে তেমন গুড নয়। তবু অভিবাদন ফেরত দিয়ে বললাম "গুড মর্নিং।" কনি এবার উঠে দাঁড়ালো। উকি মেরে ল্যামব্রেটার ঘরের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো সে ওকে দেখছে কিনা। কোনো কথা না বলে কনি এবার সোজা আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

জামাকাপড় পালটিয়ে এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু কনির জন্যে তা হবার উপায় নেই। কনি একটা চেয়ারের উপরে বসে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার ডিউটি কি শেষ হয়ে গেলো?” বললাম, “এখনকার মতো ছুটি। আবার সন্ধ্যাবেলায় যা হয় হবে।”

কনি এবার একটু সঙ্কোচবোধ করতে লাগলো, আমাকে ওর যেন কিছু বলবার আছে, অথচ বলতে পারছে না। “কিছু বলবেন?” তাকে প্রশ্ন করলাম। কনি উত্তর দিলো, “যদি তোমার খুব অসুবিধে না হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বেরোতাম।”

কনি কলকাতার কিছুই জানে না। তাছাড়া তাদের মতো মেয়ের একলা বেরিয়ে পড়াও নিরাপদ নয়। তাই ইচ্ছে না থাকলেও রাজী হয়ে গেলাম।

কলকাতা ঘুরে বেড়াবার জন্য প্রসাধন শেষ করে কনি যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তখন তাকে দেখে কে বলবে, ভোরের এই মেয়েটিই রাত্রের কনি দি উয়োম্যান। স্ট্রহ্যাট, কালো চশমা ও হাঁটু পর্যন্ত টাইট স্কার্ট পরা এই মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে কোনো ইউরোপীয় ট্যুরিস্ট ললনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সবেমাত্র চুকিয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে।

কনির চোখেমুখে এখন ট্যুরিস্ট সুলভ চঞ্চলতা। ছেলেমানুষিতে সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, অথচ অচেনা অজানা জায়গার ভীতিও সম্পুর্ণ কাটেনি। এইরকম দু’জন আমেরিকান কুমারীর গল্প হবস সায়েবের কাছে শুনেছিলাম। বাবার সঙ্গে তারা ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরিয়েছিল। ভদ্রলোকের বোম্বাইতে কিছু কাজ ছিল। তাঁকে সেখানে রেখে দু’ই বোন একা একা রাজধানী দিল্লী দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। সেখানে তারা নাকি মেডেনস্ হোটেলে উঠেছিল। ট্যুরিস্ট মেজাজে জিনিসপত্র কিনতে কিনতে দিল্লীতে তারা সব টাকা খরচ করে ফেলে। অনন্যোপায় হয়ে তারা বাবাকে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠালে, কিন্তু টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার চক্ষু চড়কগাছ। তাঁর কুমারী কন্যাদ্বয় লিখেছে— "All money spent. Can stay maidens no longer." চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু্য ধরে হাঁটতে হাঁটতে কনি ও আমি চৌরঙ্গীতে এসে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, “এবার কোথায় যাবেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, না লাটসায়েবের বাড়ি?”

কনি ও-সব নামে কোনো আগ্রহই দেখালে না। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এবার যে স্লিপটা বের করে সে আমার হাতে দিলে, তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। সেই কাগজের টুকরোতে শহরতলীর এক অখ্যাত গলির নাম লেখা আছে। "এইখানে আপনি যেতে চান?" আমি কনির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"হ্যাঁ, ওইখানেই যেতে হবে। না হলে কি আমি কলকাতার সৌন্দর্য দেখবার জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছি ভাবছো?"

একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে কনি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে বললে, "আমি সেই গ্রেট ম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই—প্রফেসর শিবদাস দেবশর্মা দি গ্রেট। যাঁর রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল, লর্ড কারজন কোনোদিন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। জঙ্গীলাট লর্ড কিচেনার কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হয়েও যিনি কিচেনারকে জানাতে দ্বিধা করেনি যে, জাহাজডুবিতে তাঁর মৃত্যু হবে।"

কনি প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেটের গৌরবময় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। তাঁর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ, লর্ড ব্রেবোর্নের অকালমৃত্যু, জার্মানির অধঃপতন, গোয়েরিঙের আত্যহত্যা, সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ ও বিদেশিনী বিবাহ এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। প্রফেসর শিবদাস কিন্তু এও জানিয়েছিলেন যে, অদু'রভবিষ্যতে ভারত কমনওয়েলথের আওতা থেকে মুক্তি পাবে না।

কনি ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কাগজ বার করেছিল। তার এক কোণে লেখা -প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল। সেখান থেকেই জানলাম এই মহাপুরুষ পাবলিসিটিতে বিশ্বাস করেন না। এবং কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে মহাপাপ বলে মনে করেন।

প্রফেসর শিবদাসই গোপনে মহাদেব দেশাই মারফত কস্তুরবাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামীর একটি ভয়াবহ ফাঁড়া আছে। কিন্তু তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। স্বামীর কোলে মাথা রেখেই এই সতী রমণী ইহলীলা সংবরণ করতে পারবেন। অষ্টম এডোয়ার্ডকে এক্সপ্রেস চিঠি মারফৎ শিবদাস দি গ্রেট যে কবচ ধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা যদি তিনি ধারণ করতেন, তা হলে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্যভাবে লেখা

হতো। এই আণবিক শক্তিসম্পন্ন কবচ প্রস্তুতের জন্য যাগ-যজ্ঞে যে তিয়াত্তর টাকা চার আনা খরচ হয়, তার থেকে এক আনা বেশী নেওয়াকে শিবদাস দি গ্রেট গো মাংস ভক্ষণ পাপের সমান বলে মনে করেন।

কণিকে ফিরে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে শুনলে না।

শহরের প্রান্তে এক কানাগলিতে শিবদাসের গবেষণাগার। আমরা যখন সেখানে হাজির হলাম, তখন তিনি ঘরের মধ্যে গানি ব্যাগ, হেসিয়ান, উলপ্যাক সম্বন্ধে ক্লায়েন্টদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

শিবদাসের সহকারী একটু পরেই আমাদের ভিভবে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, শিবদাস দি গ্রেট পৈতে বার করে কনিকে আশীর্বাদ করলেন। কনি বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছিল। নাইলনের মোজা সমেত পা দু'টো যেন লীলায়িত ভগীতে দরজার কাছ থেকে পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে গেলো। নিজের স্কার্টটা সামলে নিয়ে, কনি পা মুড়ে একটা আসনের উপর বসে পড়লো। ওর স্নিগ্ধ, ভক্তিনয় মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে, কনি আমাদেরই ঘরের কেউ নয়। আমাদের মা, মাসিমা, দিদি স্কার্ট পরলে হয়তো এমনি করেই দেবতার মন্দিরে নিজেদের পূজা নিবেদন করতে আসতেন।

শিবদাস দি গ্রেট এবার তাঁর ধুর্ত— অনুসন্ধানী চোখে কনিকে যাচাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি কনির মাথায় হাত রাখলেন। চোখ বুজে কিসের যেন ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর তাঁর পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ইংরেজীতে বললেন, “মাদার, মাদার, নো ফিয়ার। শিবদাস উইল সেভ ইউ"

কনি কিছু বুঝতে না পেরে, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালে। আমি এতোক্ষণ খালি পায়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম; বললাম, "উনি বলছেন, 'ভয় পেয়ো না। চিন্তা কোরো না।"

কনি কোনো কথা বলতে পারলে না। সে কেবল পরম নির্ভয়ে শিবদাসের হাতটা জড়িয়ে ধরলে। তার চোখে হঠাৎ অশ্রুর মেঘ জমতে শুরু করলে!

শিবদাস দি গ্রেট-এর বৈশিষ্ট্য তিনি প্রথমে কোনো প্রশ্ন করেন না। আগন্তুকের মুখ দেখেই তিনি তাঁর ভুত এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন। কিন্তু ওইখানেই যতো মুশকিল। ঐ

প্রথম বাণীতেই তো ভক্তদের মন জয় করতে হবে! অথচ কাজটা যে বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই।

শিবদাস দি গ্রেট কনির বয়স, কনির হাবভাব, কনির বেশবাস থেকে তার সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। এ-মেয়ে যে বি-টুইল, হ্যাণ্ডিকাপ বা ইণ্ডিয়ান আয়রন সম্বন্ধে খোঁজ করতে আসেনি তা জ্যোতিষ না জেনেও যে কেউ বলে দিতে পারে। তবু শিবদাস কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন। সেই অবসরে ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে কনি তাঁর পায়ের গোড়ায় ভক্তিভরে রেখে দিলো।

শিবদাস এবার অর্থপূর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তোমার মন যা চাইছে তাই পাবে।" কনির মুখ এবার একশো ওয়াটের বাতির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে যেন এইটকু জানবার জন্যেই এতোটা পথ ভেঙে এখানে হাজির হয়েছে।

শিবদাস দি গ্রেট কনিকে বললেন, "তোমার দু'টো হাতই সোজা করে আমার সামনে মেলে ধরো।" কনি তাই করলে। শিবদাস সেখানে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আবার কনির মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুমি মা, অনেক সহ্য করেছো। কিন্তু তোমাকে আরও সহ্য করতে হবে।"

কনি সজল চোখে বললে, "আরও?" কনি ভুলেই গিয়েছে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। জ্যোতিষীর আন্দাজে-ছোঁড়া ঢিল বোহয় ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছে। কনি যে অনেক সহ্য করেছে, তা তো আমার নিজের চোখেই দেখেছি। কনি বললে, "হ্যারির যদি মঙ্গল হয় আমি আরও অনেক সহ্য করতে রাজী আছি, প্রভু।" :

শিকার তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে মহাত্মা শিবদাসের মুখ এবার উজ্জজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি চোখ বন্ধ করে, স্থূল দেহটাকে আমাদের সামনে ফেলে রেখে সুক্ষশরীরে কনির ভবিষ্যৎ সমীক্ষায় পাড়ি দিলেন। কনি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলো। তার দেহ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলবার মতো সাহস নেই তার।

শিবদাস দি গ্রেট এবার চোখ খুলে মৃদু' হেসে বললেন, “সব বুঝেছি। তোমার কি চাই, আমার আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু তবু সেটা তোমার নিজের মুখেই আমি একবার শুনতে চাই। নিজে আব্দার করে মায়ের কাছে - চাইলে মা যে খুশী হন।"

কনি যা বলবে, তা সে কিছুতেই বলতে পারছে না। তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে। জনপদের চিত্ত-বিনোদিনী যেন অবগুণ্ঠনবতী বালিকা বধূর সলজ্জ দ্বিধায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কনি আজ বলবে। যা না বললেও চলতো, তাই সে শিবদাস দি গ্রেটের কাছে প্রকাশ করবে।

কিন্তু কনি যা বললো তার জন্যে আমি কেন স্বয়ং শিবদাস দি গ্রেটও প্রস্তুত ছিলেন না।

কনির ঠোঁটটা একবার কেঁপে উঠলো। হয়তো আমি না থাকলে তার পক্ষে আরও সুবিধে হতো। আস্তে আস্তে সে বললে, “প্রভু, আপনারা ইচ্ছা করলে সব পারেন। আমার যা আছে সব আপনার গডের পুজোর জন্যে আমি হাসিমুখে দিয়ে দেবো, আপনি হ্যারিকে একটু লম্বা করে দিন। আমি সুখ, সম্পদ, "স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই চাই না। শুধু হ্যারি যদি সাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তা হলে, আমি ধন্য হবো। সে বে'টে হোক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে যেন তাকে বামন না বলে।”

মানুষের এই সংসারে দেখে দেখে হৃদয় আমার অসাড় হয়ে গিয়েছে। দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, অবজ্ঞা আজ আর আমাকে তেমনভাবে অভিভূত করে না। তবু বলতে লজ্জা নেই, হঠাৎ আমার দেহের সমস্ত লোমগুলো বিষাদের বিচিত্র অনুভূতিতে খাড়া হয়ে উঠলো। মন বোধহয় কনিকে এতোদিনে বুঝতে পারালো। নিঃশব্দ কণ্ঠে আমার অন্তরাত্মা যেন বলে উঠলো, ‘ও এই জন্যে! ওরে অবুঝ, বোকা মেয়ে, এইজন্যে তুমি আমাকে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছো। আমার সময় নষ্ট করেছো। তা বেশ করেছো। আমি মোটেই অসন্তুষ্ট হইনি। যদিও ছেলেমানুষি, যদিও লোকে শুনলে তোমাকে এবং আমাকে দু''জনকেই পাগল বলবে, তবু আমি রাজী আছি, তুমি যেখানে যেতে চাইবে—আমার সব কাজ ফেলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি।

ভুত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা শিবদাসও তাঁর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "মেমসায়েব কী বলছেন?" আমি বললাম, "হ্যারি বলে ওঁর এক সঙ্গী আছে সে বামন। তার সঙ্গে . . .

"বলতে হবে না। বুঝে নিয়েছি," শিবদাস বললেন। "সেই বামনকে বড়ো করতে হবে। তাকে টেনে হেঁচড়ে প্রমাণ সাইজের করে দিতে হবে।"

"হ্যা প্রভু। তার জন্যে আপনি যা চাইবেন, তাই দেবো।"

এমন সুবর্ণ সুযোগ প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেট অনেক দিন পাননি। এমন একটি শিকারকে নিজের হাতের গোড়ায় পেয়ে তাঁর মনটা যে বেশ খুশী-খুশী হয়ে উঠেছে, তা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, "এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। বামন থেকে দৈত্য, দৈত্য থেকে বামন আমাদের দেশে পুরাকালে অনেকবার হয়েছে।"

ভদ্রলোক যে এই সরলপ্রাণ মেয়েটির মাথায় একটা বড় কাঁঠাল ভাঙবার মতলব ভাঁজছেন তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই এই জোচ্চুরি নিজের চোখের সামনে দেখতে পারছিলাম না। আমার হাওয়া যে তাঁর অনুকলে বইছে না, তা প্রফেসর শিবদাসের সাবধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলো। আমার চোখ এড়িয়ে নিজের মনেই শিবদাস দি গ্রেট বললেন, "এর নাম বামনাবতার যজ্ঞ। খুবই দু'রূহ এবং শ্রমসাধ্য যজ্ঞ। সাতদিন সাত রাত প্রধান পুরোহিতকে একভাবে হোম করতে হবে।"

শিবদাস দি গ্রেট হয়তো এবার খরচের বিরাট ফিরিস্তি দিতেন। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক আমার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভয় পেয়ে গেলেন। আমাকে একটু বাজিয়ে নেবার জন্যেই যেন প্রশ্ন করলেন, "কিছু বলবেন?"

আমি গম্ভীরভাবে কাসুন্দের ডায়ালেক্টে বললাম, "একটা কথা মনে রাখবেন, আমি শাজাহান হোটেলের কর্মচারী। ভবিষ্যতে আপনি নিশ্চয়ই চান শাজাহান হোটেলের ভিজিটররা এখানে আসুক। এই ভদ্রমহিলা আমাদের সহকর্মী।"

কনি আমাদের কথা বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি ইংরিজীতে বললাম, "হ্যারির অসুবিধেগুলো ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" কনি বললে, "থ্যাংক ইউ।

তোমাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না।”

আমি যে কী ধরনের চীজ তা শিবদাস দি গ্রেট বেশ বুঝে গিয়েছেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তিনি কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন, “বামনাবভার যজ্ঞ একালে হয়তো একমাত্র আমিই করতে পারি।”

কনি অধীর হয়ে বললে, “তাহলে প্রভু, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি শাজাহান হোটেলে শো বন্ধ করে দিয়ে আপনার এখানে বসে থাকবো। হ্যারিকেও হাতে পায়ে ধরে, কোনোরকমে মত করিয়ে এখানে নিয়ে আসবোখন।”

আমার দিকে তাকিয়ে কনি বললে, “আমাদের তো সাপ্তাহিক কন্ট্রাক্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে হয়, আমি আর বাড়াবো না। তুমি গিয়ে মার্কোপোলোকে বুঝিয়ে বোলো।”

শিবদাস দি গ্রেট কিন্তু মাথা নাড়তে লাগলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “এই যজ্ঞের কিন্তু একটা কুফল আছে। হোমের পর বামন লম্বা হবে, প্রমাণ আকারের মানুষের সঙ্গে তার কোনো তফাতই থাকবে না। কিন্তু. . . . "

কনি বলতে যাচ্ছিল, 'কোনো কিন্তু নয়, হ্যারির জীবনের সব দুঃখ শেষ হবে, সে যদি আর একটু বড়ো হয়ে উঠতে পারে।'

শিবদাস দি গ্রেট এবার আমার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললেন, "যজ্ঞের পর সে কিন্তু বেশীদিন বাঁচবে না। তার পরমায়ু ক্ষয় করেই তাকে আকারে বড়ো করে তুলতে হবে, ছ'মাসের বেশী কাউকে এখনও আমি বাঁচতে দেখিনি।”

কনির মুখটা এবার নীল হয়ে উঠলো। সে ভয়ে শিউরে উঠলো। “হ্যারি, মাই ডিয়ার হ্যারি, বাঁচবে না! হয় না। না না, আমি কিছুই চাই না!” কনি নিজের স্কার্টটা সামলে এবার তড়াং কার শিবদাসের সামনে থেকে উঠে পড়লো।

শিবদাস বললেন, “ঈশ্বর যাকে যা করতে চেয়েছেন সে তাই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে তিনি কুপিত হন।”

কনি মন দিয়ে কথা শুনলে। ঝুকে পড়ে ভারতীয় প্রথায় তাঁর পা স্পর্শ করলে।

শিবদাস দি গ্রেট একটা বাক্স খুলে ছোট্ট মাদু'লি বার করলেন। সর্ব শান্তি কবচ। বললেন, "এক্সট্রা-পাওয়ারফুল কবচ। আণবিক শক্তিসম্পন্ন। স্নান করে, খালি পায়ে ধারণ কোরো। আর ধারণের দিনে কারণ পান বা অনাচার নিষেধ"।

কনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবচটা নিয়ে বললে, "আমি ড্রিঙ্ক করি না।" আরও দশটা টাকা শিবদাস দি গ্রেটের হাতে দিয়ে কনি প্রশ্ন করলে, "আমি পরলে, হ্যারি শান্তি পাবে তো?"

"নিশ্চয়ই পাবে। সেইজন্যেই তো এই এক্সট্রা-স্পেশাল কবচ," শিবদাস দি গ্রেট শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন।

সারা পথ কনি গম্ভীর হয়ে রইলো। একবারও কথা বললে না। হ্যারিকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার শেষ আশা সে শিবদাস দি গ্রেটের জ্যোতিষ গবেষণাগারে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। একবার শুধু, সে বললে, "এবার বোধহয় আমি শান্তি পাবো। তাই না?"

হোটেলে ফিরে এসেই দেখলাম কেমন একটা থমথমে ভাব। সত্যসুন্দরদা একমনে কাউন্টারে কাজ করে যাচ্ছেন। কনিকে তিনি দেখেও দেখলেন না। কনি লিফটে উপরে চলে গেলো। আমি সত্যসুন্দরদার কাছে ফিরে এলাম।

রোজীটাও ওখানে বসে টাইপ করছিল। একটা চিঠি টাইপ করা শেষ করে সেটা পড়তে পড়তে রোজী বললে, "হ্যালো ম্যান, তাহলে সকালটা খুব ফুর্তিতে কাটালে। জলি গুড টাইম।"

আমি উত্তর দিলাম না। রোজী এগিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, "পুওর ফেলো, যতই চেষ্টা করো, কিছুই হবে না। কনির বুকের ভিতর যিনি বসে রয়েছেন তাঁর নাম ল্যামব্রেটা। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও তাহলে তোমাকে অনেক বেটে হতে হবে!"

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, "রোজী, মিস্টার মার্কোপোলো এই চিঠি গুলো সই করবার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন।"

রোজী বুঝলে, স্যাটা বোসের সামনে আমাকে নাস্তানাবুদ করা যাবে না। সুতরাং সে এবার চিঠিগুলো নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে স্কার্ট দু'লিয়ে, জুতোর খটখট আওয়াজ করে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে গেলো।

সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমরা না বেরোলেই পারতে। হ্যারিটা বেশ বিপদ বাধিয়েছে। শুধু চিৎকার করছে। বেয়ারাদের গালাগালি করেছে। বলেছে, যেখান থেকে পারো মদ নিয়ে এসে দাও। গুড়বেড়িয়া বলেছে, ডেরাই ডে। তাও শোনেনি। শেষ পর্যন্ত চরম বোকামি করেছে। জিমির কাছে গিয়েছে। জিমিটা এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলেছে, এখনই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো, কিছু ব্যবস্থা হবে। ল্যামব্রেটা বোকার মতো সোজা ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে নক করেছে। তারপর বুঝতেই পারছো। কোনো ক্যাবারে গার্ল'-এর ডান্সিং পার্টনার যে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হল্লা করতে পারে তা মার্কো পোলো সায়েবের জানাই ছিল না।"

বোসদা একটু থামলেন। তারপর বললেন, "হয়তো কিছু হতো না। এদিকে জিমি খবর এনেছে অন্য হোটেলে দশদিন ফ্লোর-শোর সীট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিটের জন্য মারামারি চলছে। আমাদের অথচ তেমন চাহিদা নেই। কয়েকটা অ্যাডভান্স বুকিং ক্যানসেলও হয়েছে।"

"তাহলে?" আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম!

"যত নষ্টের গোড়া তো ওই বামনটা! কনির একমাত্র দোষ বামনটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছে। জিমি প্রথমে যা সাজেশন দিয়েছিল ম্যানেজার তাতে কান দেননি। এখন আবার অনেক কথা হয়েছে বোধহয়। হয়তো কনিকে এখনই ডেকে পাঠাবেন।"

বোসদার সন্দেহ যে অমূলক নয় তা একটু পরে রোজী ফিরে আসতেই বোঝা গেলো। রোজী খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললে, "ফল ফলেছে। স্বয়ং মার্কোপোলো দি ম্যান এবার কনি দি উয়োম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাকে ঘর থেকে ইনি বের করে দিলেন। আমারই হয়েছে মুশকিল। তোমাদের কাছে দাঁড়ালে, তোমরা বলো ম্যানেজার ডাকছে। ম্যানেজারের কাছে গেলে তিনি বলেন, কাউন্টারে বোসকে হেল্প করোগে যাও। তোমরা কেউ আমাকে পছন্দ করো না।"

আমি বললাম, "অনেক কাজ হয়েছে, এবার একটু বিশ্রাম নাও।" রোজী বললে, "বেশ।" কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে পড়ে সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বের করে চুষতে লাগলো।

বোসদা বললেন, "রোজী, তুমি এতো চকোলেট ভালবাসো কেন?"

রোজী বললে, "আমার গায়ের রং আর চকোলেটের রং এক বলে!" আমি দেখলাম রোজী রেগে উঠছে। বোসদাকে বললাম, "আমি তা হলে যাই।"

বোসদা বললেন, "হ্যাঁ, যাও! মেয়েটার কী হলো দেখা দরকার। হাজার হোক বিদেশ বিভূঁই। আমিও যেতাম। কিন্তু হেভি প্রেসার।"

চলে যাও বলা সত্ত্বেও চলে যেতে পারলাম না। কনির ভাগ্যাকাশে যে মেঘ জমা হয়েছে তা কোনদিকে যাবে তা জানবার জন্যে মনটা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বোসদা বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝলেন। খাতা লিখতে লিখতে বললেন, "এখন আর চেপে রাখবার কোনো মানে হয় না। ওঁরা ঠিক করেছেন, ল্যামব্রেটাকে নাচতে দেবেন না। কনিকে একাই আসরে হাজির হতে হবে। ল্যামব্রেটার সঙ্গে ওঁদের কোনো কন্ট্রাক্ট নেই। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে।"

চমকে উঠে আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না। কাজ করতে করতেই বললেন, "কাউকে দোষ দিতে পারো না তুমি। কনিকে দেখবার জন্যেই লোকে পয়সা দিচ্ছে—ল্যামব্রেটার নাচ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

নিজের মনেই লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর কী ভেবে লিফটে না চড়ে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি।

ড্রাই-ডের সেই বিষণ্ন মধ্যাহ্নে কনির ঘরে আচমকা অমনভাবে ঢুকে পড়াটা নিশ্চয়ই আমার উচিত হয়নি। ভব্যতার ব্যাকরণে অভ্যস্ত আজকে আমি নিশ্চয়ই তেমন দুঃসাহস দেখাতে পারতাম না। কিন্তু অনভিজ্ঞ আমি সেদিন পেরেছিলাম। কনিকে ম্যানেজমেন্ট কী বলেছে তা জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল।

আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। সেদিন কনির ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি। বরং লাভ হয়েছিল। প্রচুর লাভ। পৃথিবীর দু'র্লভ বিত্তবানদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলে মনে করি। মানুষের জগতে যারা জগৎ শেঠ, মেডিসি, রথচাইল্ড, নিজাম, টাটা কিংবা বিড়লা হয়ে বসে আছেন, আমি যেন তাঁদেরই একজন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চিবুকে হাত দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে কনি বসে আছে। তার পোষমানা চুলগুলো মুখের উপরে এসে পড়েছে। কনি আমাকে দেখেও কোনো কথা বলছে না। যেন রেনেশাঁস যুগের কোনো দক্ষ ভাস্করের প্রস্তরকন্যা এই মৃত্যুমুখর জাদু'ঘরে কাচের শো-কেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি সব বুঝতে পারলাম। নিজের বুদ্ধিতে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। মন বুঝবার ক্ষমতা যদি ইস্কুলে পড়বার সময় থাকতো তাহলে এতোদিনে আমার জীবনের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হতো। লেখাপড়া শিখে কোর্ট প্যান্ট পরে বড় চাকরি করতে পারতাম। শাজাহান হোটেলের ত্রিসীমানায় নিশ্চয় আমাকে আজ দেখা যেতো না।

বুঝেছি। অথচ কী বলবো আমি? বলতে হলো না কিছু। কে যেন আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে, "আই অ্যাম স্যরি। বিশ্বাস করো আমি দুঃখিত।"

কনি বললে, "আমিও যাচ্ছি। হ্যারিকে একলা ফেলে রেখে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটা অনুরোধ করেছি। আই হ্যাভ্ আসকড ফর 'ওয়ান ফেভার। হ্যারি যেন এর কিছুই না জানতে পারে। ওকে বলবো আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে আমিই চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। আই হোপ, ওরা ওদের কথা রাখবে। ওরা হ্যারির জীবনকে নিশ্চয়ই সর্ণনাশের পথে ঠেলে দেবে না। ও চেষ্টা করছে। ও সব শক্তি দিয়ে নিজের পূর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। বিশ্বাস করো, ও পারছে না। যদি এ-সব কথা ওর কানে যায়, চিরদিনের জন্যে ও হেরে যাবে।"

কনি একটু থাকলো। "ওরা ভেবেছে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমাদের জিমি এমনভাবে হাসলো যে, আমার সমস্ত গা রি-রি করে উঠেছিল। ফর এ ডোয়ারফ! একটা বামনের জন্যে আমি নাকি আমার ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিচ্ছি। কিন্তু, ওরা জানে না। ওদের দোষ নেই।"

কি বলছে কনি? কনির কথার অর্থ কী? কনির হাতের মধ্যে যে ছোট্ট একটা ফটো ছিল, তা এতোক্ষণ আমার নজরে পড়েনি। আমাকে দেখেই কনি বোধহয় আড়াল করে রেখেছিল। এখন কনির আর কোনো লজ্জা নেই। অন্তত আমার কাছে তার কিছুই

লুকোবার নেই। আমারই সামনে সে একমনে ছবিটা দেখতে লাগলো। আমিও দেখলাম। লবণাম্বুর অপর পারে, সমুদ্র ও পর্বতে ঘেরা স্কটল্যান্ডের কোনো অখ্যাত শহরতলীর কোনো অখ্যাত মহিলার ম্লান ছবি। তাঁর কোলে এক নবজাত শিশু। তাঁর পাশে আর একটি ছেলে। সাতআট বছর বয়স হবে।

কনি বললে, "চিনতে পারো?" কেমন করে চিনবো আমি? কনি সজল নয়নে বললে, "আমার মা।" তারপর একটু দ্বিধা করে, কোনোরকমে বললে, "হ্যারির মা।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ। আমি কোলে রয়েছি। হ্যারি, আমার ব্রাদার হ্যারি, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন? তখন কেউ কি জানতো হ্যারি আর বড়ো হবে না!" কনি এবার নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। কান্নার বন্যা এসে ক্যাবারে নতর্কীর রহস্যময় ব্যক্তিত্বকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। কনি বললে, "হ্যারি বড়ো হয়নি। কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক করেছে।"

সেদিন কনির মুখেই সুদু'র ইংলণ্ডের এক মা, ভাই এবং বোনের গল্প শুনেছিলাম। সংসারে কেউ তাদের দেখবার ছিল না। বামন ভাই-ই রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করেছে। বেটে বয় টেবিলের নাগাল পায় না। তাই গেটে কাজ নিতে হয়েছে। বিনয়ে বিগলিত বামন অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে স্যুইং-ডোরের দরজা খুলে দিয়েছে। অতিথিরা আমোদ পেয়ে হাতে কিছু বকশিস গুজে দিয়েছেন। আর এমনি করেই বিধবা মা আর বোনের সংস্যর চালিয়েছে হ্যারি।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যারি কেমন যেন পাল্টাতে শুরু করেছে। হ্যারি 'ডিফিকাল্ট' হয়ে উঠেছে। মদ খেতে শুরু করেছে। কেউ পারতো না। একমাত্র মা ছাড়া, কেউ ওকে সামলাতে পারতো না। কত রাতে মা ওকে বার থেকে তুলে এনেছেন। কনি লেখাপড়া শেখেনি। তেমন লেখাপড়া শেখবার সুযোগও ছিল না। কিন্তু দাদার কাছে গান শিখেছিল। মেজাজ ভাল থাকলে দাদা গান শেখাত। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁর মেয়েরা কেমনভাবে নাচে তা দেখিয়েছে। অন্য অনেকে সে নাচ দেখে হা হা করে হেসেছে। কিন্তু কনি কিংবা তার মা কোনোদিন হাসতে পারেননি।

নিজের অজান্তেই কনি একদিন নিজের জন্য নর্তকীর জীবন বেছে নিয়েছে। দাদাকে সে আর চাকরি করতে দেয়নি। বলেছে, তুমি বাড়িতে থাকো। মা'র সঙ্গে গল্প করো, তাহলেই হবে। হ্যারি রাজী হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার লোকের যাওয়া আসার পথের ধারে রেস্তোরাঁয় সুইং-ডোরটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার মোটেই ভাল লাগতো না।

মাকে লুকিয়েই হ্যারি কনির কাছে পয়সা চাইতো। সেই পয়সা নিয়ে খুব করে মদ গিলতো। তারপর মদে চুর হয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরে আসতো। মা কিছুই বলতেন না। তবু হ্যারি ভয় পেতো। মা রাগ করলে, কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু গম্ভীরভাবে বাড়ির সব কাজ করে যেতেন। হ্যারি তখন আর চুপ করে থাকতে পারতো না। মার হাত ধরে ক্ষমা চাইতো। কাঁদতে কাঁদতে বলতো, 'মা, আমি আর কখনও তোমার অবাধ্য হবো না।'

'মা আর নেই। তবু আজও হ্যারি মাকে ভয় করে।" কনি চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে বললে। "মরবার আগে মা বিছানার পাশে হ্যারি এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হ্যারিকে বলেছিলেন, 'তুমি লক্ষী ছেলে হয়ে থাকবে তো? কনি যা বলবে তাই শুনবে তো?" ছোট্ট ছেলের মতো হ্যারি রাজী হয়েছিল। মা বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু সব দেখতে পাবো।' মা তারপর আমাকে বলেছিলেন, 'হ্যারি যদি অবাধ্য হয়, যদি তোর কথামতো না চলে, তাহলে চোখ বন্ধ করে মনে মনে তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস।"

কনি বললে, "আজও যখন ওর সঙ্গে আর পেরে উঠি না, যখন দাদা আমার নেশার ঘোরে পাগল হয়ে ওঠে, তখন ওকে ভয় দেখাই, বলি—মা কে বলে দেবো।

আজও মন্ত্রের মতো কাজ হয়। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ভাল ছেলে হয়ে ওঠে। যেন সে তার জ্ঞান ফিরে পায়। কিন্তু তারপরেই ওর অভিমান হয়। গুম হয়ে বসে থাকে। আমার সঙ্গে কথা বলে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। তখন দাদাকে আদর করতে আরম্ভ করি। দাদার অভিমান ভাঙাতে আমার অনেক সময় লাগে। বলতে হয়, আমি না তোমার ছোট বোন? আমি অতো বুঝবো কী করে? যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায়, তুমিই তো আমাকে বকবে। দরকার হলে, ইউ সুড্ বক্স মাই ইয়ারস। দাদা তখন আবার পাল্টে যায়। আমাকে আদর করতে আরম্ভ করে। বলে, 'ইস্। দেখি, কে আমার বোনের

কান মলে দেয়! কার এতোবড়ো আস্পর্ধা। আমার লক্ষ্মী বোন, আমার সোনা বোন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব ঘুম পেয়েছে। তুমি এবার ঘুমোতে যাও।'

আমি বলি, 'তুমি না ঘুমোলে, আমি ঘুমোতে যাবো না।' দাদা হেসে ফেলে। বলে, বেশ বেশ। তারপর আমার দাদা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে।” কনি একটু হাসলো।

আর সেই মুহূর্তে কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে ছাদের উপর কনি এবং ল্যামব্রেটার যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তার রহস্য স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কনি এতোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে সে বললে, “হ্যারিকে একলা ফেলে, কোথায় আমি ঘুরে বেড়াই বলো? স্কটল্যাণ্ডে ওকে রেখে, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না। তাই ওকে নাচের সঙ্গী করে নিয়েছি। কিন্তু হ্যারি পারে না। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা দেখে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। অথচ বোঝে না, অভিনয় অভিনয়ই।” কাঁদতে কাঁদতে কনি বললে, “আমার নিজের দাদা, তবু বলবার উপায় নেই। এমনই এক প্রফেশনে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।”

হয়তো আরও কথা হতো। কিন্তু ল্যামব্রেটা হঠাৎ কনির ঘরে এসে ঢুকলো। তার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

ল্যামব্রেটার সঙ্গে ছাদে আমার আবার দেখা হয়েছে। নিজের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে ছোট্ট ছেলের মতো আমাকে ডেকে ল্যামব্রেটা বলেছে, “ওহে ছোকরা, শোনো। হলো তো। যেমন আমাদের রাগিয়ে দিলে, এখন মজাটা টের পাচ্ছো তো? আমরা তোমাদের শাজাহানকে কলা দেখিয়ে চলে যাচ্ছি।" ল্যামব্রেটা বলেছিল, ‘মার্ক মাই ওয়ার্ডস। তোমাদের এই পচা শহরে আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না।’

সত্যিই ওরা কোনোদিন আর কলকাতায় ফিরে আসেনি। কিন্তু কে-ই বা আসে? যৌবনের মরসুমী ফুল হাতে করে কোন পান্থশালার প্রিয়াই আবার ফিরে আসবার সময় পায়? তবু আজও আমার কনির কথা মনে পড়ে যায়। ভোরের আলোয়, দ্বিপ্রহরের নিঃস্তব্ধতায়, সন্ধ্যার কোলাহলে এবং রাত্রের অন্ধকারে যাকে দেখেছি সে যেন একটা কনি নয়। কনি দি গার্ল, কনি দি মাদার, কনি দি সিস্টার মিলিয়েই যে কনি দি উয়োম্যানের সৃষ্টি, তা ভাবতে আজও আমার কেমন আশ্চর্য লাগে।

এই বৃহৎ পৃথিবীর কোন প্রান্তে আজ কনি তার ভাইকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে কে জানে! কোনো প্রখ্যাত হোটেলে এখন নিশ্চয়ই তার স্থান হবে না!

কোনো অবসন্ন সন্ধ্যায় কোনো অখ্যাত পানশালায় 'চৌরঙ্গী'র প্রবাসী পাঠক যদি কোনো বিগতযৌবনা নর্তকীকে কোনো বামনের সঙ্গে নাচতে দেখেন, তবে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করবেন তার নাম কনি কি না। যদি সত্যিই সে কনি হয় তবে অনুগ্রহ করে আমাকে একটা চিঠি লিখবেন। আমি বড়ো সুখী হবো। আমি সত্যই আনন্দিত হবো।

কনি চলে যাওয়ার পরও শাজাহান হোটেলের দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই হোটেলে প্রতিদিন যারা আসে এবং চলে যায়, কনি তো তাদেরই একজন। কত মানুষই তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে হাজির হচ্ছেন। আগন্তুকরা ক'দিনই বা থাকেন। কেউ এক সপ্তাহ, কেউ তিনদিন, কেউ বা মাত্র একদিন। কয়েক ঘণ্টা থাকেন এমন অতিথিরও অভাব নেই। একভাবেই চলেছে। ওয়েলকাম এবং ফেয়ারওয়েল, রিসেপশন এবং গুডবাই, সাদর অভ্যর্থনা ও বিদায় অভিনন্দন যেন গায়ে গায়ে, হাতে হাত দিয়ে জড়াজড়ি করে শাজাহান হোটেলে বসে রয়েছে। আসার মধ্যে তবু সামান্য প্রত্যাশা আছে, কিন্তু যাওয়ার মধ্যে কিছুই নেই। কেউ সেদিকে নজর দেয় না। বোসদা বলেছেন, “গড়ে তিন দিন থাকেন আমাদের অতিথিরা। এদের মধ্যে কেউ যদি পনেরো দিন থাকেন তা হলে মনে হয় যেন যুগযুগান্ত ধরে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আর দু’ একজন, যাঁরা এখানেই মাসিক হারে থাকেন, তাঁরা তো আমাদেরই একজন হয়ে যান।”

কিন্তু তিনি তো আর অতিথি নন। যাদের জীবন হোটেল অতিথিদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে সে তো তাদেরই একজন। সে যদি আমাদেরই দলে হয় তবে তার বিদায় নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়হীন জীবনেও ছাপ রেখে যাবে। কিন্তু কিছুই হয়নি।

বোসদা ছাদে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে আমাকে বলেছিলেন, "আমরা হোটেলের লোকেরা বড়ো উদাসী। কিন্তু আমাদের থেকেও অনাসক্ত এই বাড়িটা। কনি কেন, কাউকে মনে রাখে না। আমাদেরও মনে রাখবে না, দেখে নিও। এই যে আমরা বছরের পর বছর সুখে-দুঃখে ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নীরবে পান্থশালায় বিলাসী পথিকদের সেবা করে গেলাম, ইতিহাসের এই উদাসী প্রাসাদ তাও মনে রাখবে না। আমরা যখন থাকবো না, তখনও সে নতুন রং এবং নতুন চুনসুরকির স্নো পাউডার মেখে কলকাতার এই রাজপথে বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য আপন মনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। একবারও আমাদের কথা মনে পড়বে না।”

আমার মনটা বোসদার কথায় কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। বোসদা বলেছিলেন, "নিজের কথাটাই শুধু ভাবলে চলবে কেন? এই অনুরাগহীন নির্লিপ্ততার আর একটা দিক। এই যে আমরা এখন কাজ করছি, আমাদেরও আগে এমনি করেই তো আরও অনেকে শাজাহান হোটেলের সেবা করে গিয়েছেন। আরও অনেক নিত্যহরিবাবু বালিশ বগলে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছোটাছুটি করেছেন, আরও অনেক স্যাটা বোস দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবরাখবর নিয়েছেন। আরও অনেক কনি তাদের শুভ্র নগ্নদেহের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গীতে প্রমোদকক্ষকে মোহময় করে তুলেছে, আরও অনেক প্রভাতচন্দ্র গোমেজ তাদের শব্দযন্ত্রে নিঃস্তব্ধ রাত্রিকে মুখর করে তুলেছে। কিন্তু কেউ তাদের মনে রাখেনি। মনে রাখবার কথাও নয়।"

"ভাবছো কাব্য করছি, তাই না?" বোসদা হেসে বলেছিলেন, "হবস সায়েব তো তোমাকে অতো ভালোবাসেন। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে তো ওঁর অতো আগ্রহ, সেকালের সঙ্গে একালের একটা যোগসূত্র উনিই তো রক্ষে করেছেন, উনিও বলেন—টু-ডে অ্যান্ড টু-মরো। আজ আর আগামী কাল। এই নিয়েই আমাদের হোটেল। বিগতযৌবনা ইয়েস্টারডের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গতকাল সম্বন্ধে আমাদের একটাও মাথাব্যথা নেই।"

বোসদা দাড়ি কামানো শেষ করে ব্লেডটা তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "আমার যে সাহিত্য আসে না। মাতৃভাষায় দখল থাকলে মনের ভাব কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। সোজা বাংলায় বলতে গেলে আমাদের গুড মর্নিং শুরু হয় টু-ডে দিয়ে। দিনের শেষে রাতের অন্ধকারে টু-ডের তলানিটুকু যখন ডাইনিং হল-এ পড়ে থাকে, তখন আমরা ট,-মরোর জন্যে পরিকল্পনা করতে বসি। টু-ডেটাই যে কখন ইয়েস্টারডে হয়ে জীবনের বোঁটা থেকে ঝরে পড়ে তার খোঁজই রাখি না।"

শুধু শাজাহান হোটেলের কর্মচারী কেন, শাজাহানের পৃষ্ঠপোষকরাও ইয়েস্টারডের খবরাখবর নিতে ভালবাসেন না। খবরের কাগজে নতুন নর্তকী আসছে, তার বিজ্ঞাপন পড়েই তাঁরা আবার খোঁজখবর করতে লাগলেন। কনি যে কোথায় গেলো তা কেউ

একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করলেন না। এবার মধ্য এশিয়া থেকে আর এক নর্তকী আসছেন।

আমাদের বিজ্ঞাপন পড়েই ফোন আসতে শুরু করেছে। "হ্যালো, শাজাহান হোটেল? হ্যাঁ মশায়, এতোদিনে তাহলে আপনাদের সুমতি হলো। এতোদিনে একটা বেলি-ডান্সার আনাচ্ছেন!" আমি বলেছি, "হ্যাঁ, আপনারা আনন্দ পাবেন।"

ফোনের ওদিক থেকে উত্তর এসেছে, "দেখবেন মশায়, জেনুইন বেলিডান্সার তো? যা ভেজালের যুগ পড়েছে, কিছুই বিশ্বাস নেই।" আমি ভদ্রলোকের কথার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। পাশেই বোসদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিলেন। বললেন, "হ্যাঁ স্যর, এটা শাজাহান হোটেল। এটা কলকাতার সস্তা রেস্তোরাঁ নয় যে, রাজাবাজারের জিনিস ইজিপ্সিয়ান বলে চালিয়ে দেবো।"

ভদ্রলোক বোধহয় একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "আমাদের কী দোষ মশায়। ঠকে ঠকে আমরা শিখেছি। জেনুইন বেলি ডান্সার বলে টিকিট কিনে দেখি প্যাকিং বাক্সর মতো চৌকো মেয়ে নাচছে। বডির কোনো মুভমেন্টই নেই। জানেন, একটা জেনুইন বেলি ডান্সারের পেটের মাসল, প্রতি মিনিটে কতবার মুভ করে?" বোসদা বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু টেলিফোন নামিয়ে রাখলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। চোখ বন্ধ করে থেকে বেচারা হরিণ যেমন ভেবেছিল শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পাবে, আমরাও তেমনি মাঝে মাঝে ভাবি টেলিফোন ছেড়ে দিলেই রক্ষা পাওয়া যাবে।

একটু পরেই আবার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বোসদা বললেন, "আমি আর ধরছি না, তুমি ম্যানেজ করো। শাজাহান হোটেলে এতোদিন চাকরি করে কেমন ওস্তাদ হয়েছো দেখি।"

টেলিফোন তুলেই বুঝলাম, সেই পুরনো ভদ্রলোক। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল। উনি বললেন, "ব্যাপার কি মশাই? হঠাৎ কথা বলতে বলতে লাইন কেটে গেলো।" বলসাম, "ভেরী স্যরি। মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়।" ভদ্রলোক বললেন, 'টেলিফোনে কমপ্লেন করে দিন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, “তা হলে স্যর, আপনি কবে আসছেন?”

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, “আগামী কালের জন্য দু'টো চেয়ার রেখে দিন।”

আমি বললাম, “আমাদের নতুন নিয়ম স্যর, টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ ফার্স্ট উইকে সম্ভব নয়। কাউকে পাঠিয়ে টিকিটটা কাটিয়ে নিয়ে যাবেন।” ভদ্রলোক আমার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝলেন। বললেন, “হেভি ডিমাণ্ড বুঝি? তা তো হবেই। জেনুইন বেলি-ডান্সার হলে ক্যালকাটার লোকরা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেই।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই বোসদা বললেন, "হবে। চেষ্টা করলে এ-লাইনে তুমি টিকে থাকতে পারবে।”

“আমরা তো চেষ্টা করেও টিকে থাকতে পারছি না।" কে বোসদার কথার সুত্র ধরেই মন্তব্য করলেন। চেয়ে দেখি বুশ-শার্ট পরা এক ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক হাসছেন।

“আরে কী সৌভাগ্য! অনেকদিন অধমদের মনে করেননি, কী ব্যাপার?” বোসদা ভদ্রলোককে প্রচুর খাতির করে বললেন। “মনে করেও কী হবে? যা কৃপণ মানুষ আপনারা! হাজার সাধ্যসাধনা করেও আপনার হাত দিয়ে জল গলবে না। কিছুতেই মুখ খোলেন না।” বোসদার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন। বোসদা সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, “গরীবকে এবং শাজাহান হোটেলকে যদি মারতে চান, তাহলে মারুন। আপনার যা ইচ্ছে হয় তাই বলুন। তবে একটা কথা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই দাসানুদাস আপনাদের সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।" ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে বললেন, “যাক, আপনার শাজাহানী বিনয় ছাড়ুন। কোনো ইন্টারেস্টিং মাল এসেছে নাকি?”

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোনো গোপন রহস্য আছে নাকি? কিসের জন্যে বোসদা এতো আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছেন, লেনদেনই বা কিসের? বোসদা একটু চিন্তা করলেন। তারপর পেন্সিলটা কানে গুজে বললেন, “না, এখন একটাও ইন্টারেস্টিং কেস নেই। কাল বোধহয় আসছে।”

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, "না, মিস্টার বোস, আমি প্রফেশন্যাল লোক। আপনার বেলি ডান্সার লায়লা-তে ইন্টারেস্টেড নই।" বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, "না না, ওসব নয়। আমরা কি আর মানুষ চিনি না? আপনি যাতে ইন্টারেস্টেড, এমন কিছুই কাল আসছেন।"

ভদ্রলোক এবার চলে গেলেন। বোসদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী, অমন বোকার মতো চেয়ে আছো কেন? ভদ্রলোককে খাতির করবে। উনিও আমার মতো মিস্টার এস বোস। খবরের কাগজের নামকরা রিপোর্টার। মাঝে মাঝে খবরের খোঁজে আসেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন সুন্দর ব্যবহার। এখান থেকেই কত খবর যোগাড় করে নিয়ে গিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই খবরগুলো ঘটেছে অথচ বুঝতে পারিনি। পরের দিন মিস্টার বোসের রিপোর্ট পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি। মিস্টার বোস বলেন, 'ইন্ডিয়ার আট আনা খবর তো এখন এয়ারপোর্ট এবং হোটেলে তৈরি হচ্ছে।' ভদ্রলোক কাল হয়তো আবার আসতে পারেন। যদি আসেন সাহায্য কোরো।"

"কী সাহায্য করবো?" আমার মনে ছিল না। কিন্তু দেখলাম সত্যসুন্দরদার মনে আছে। তিনি বললেন, "কেন, কালই না পাকড়াশীদের আতথিরা করবী দেবীর গেস্টরুমে এসে হাজির হচ্ছেন!"

পাকড়াশীদের অতিথির কথা আবার মনে পড়ে গেলো। কলকাতায় তাঁদের দিনপঞ্জীর বিবরণ করবী দেবীর অনেক আগেই পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। নতুন আগন্তুকদের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় শ্রীমতী করবী গুহ নিশ্চয়ই তাঁর গেস্টহাউস যথাযথভাবে সাজিয়ে ফেলেছেন।

তদন্তের জন্যে টেলিফোনে দু' নম্বর সুইটকে ডাকলাম। করবী দেবী টেলিফোন ধরলেন। "কে? শংকরবাবু? বাঃ আপনি তো বেশ লোক। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে টেলিফোন করছেন। তবু আসবেন না।"

বললাম, "আপনারই তো খবর দেবার কথা ছিল। তা ছাড়া এখন আপনার কোনো অতিথি থাকতে পারেন।" করবী দেবী বললেন, "কবে যে মুক্তি হবে জানি না। কবে পৃথিবী থেকে বিজনেস ট্রানজাকসন উঠে যাবে বলতে পারেন?" বললাম, "হঠাৎ এ-সব প্রশ্ন

করছেন কেন? বিজনেস ট্রানজাকসন, সাংস্কৃতিক সফর, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ-সব যদি উঠে যায়, তাহলে আমাদের তো আবার পথে দাঁড়াতে হবে।”

করবী দেবী বললেন, “হয়তো আপনাদের চাকরি থাকবে না। কিন্তু শান্তি পাবেন। আমার দু''একটা অতিথির নমুনা যদি দেখতেন।”

আজকাল আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে। বললাম, “কেন, আপনার তো সিলেকটেড গেস্ট। আমাদের মতো সার্বজনীন পুজোর নৈবেদ্য তো আপনাকে সাজাতে হচ্ছে না।” করবী দেবী বললেন, “গেস্টরুমে চলে আসুন। তখন আপনার সঙ্গে কথা হবে।”

আমার হাতে কাজ ছিল না। আমার ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আট ঘণ্টা ধরে অতিথিদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা এবং বিমর্ষ মুখে বিদায় জানিয়েছি। একটা টি-পার্টির ব্যবস্থাও করেছি। এমন চা-চক্র আমাদের এখানে লেগেই আছে। আমাদেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মাইক ঠিক করে দেওয়া, যিনি পার্টি দিচ্ছেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করা, এ-সব আমাদের প্রতিদিনের রুটিন। এবার একটু বিশ্রাম মন্দ লাগবে না। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে করবী দেবীর সুইটে এসে হাজির হলাম।

করবী দেবীর তখন সান্ধ্যস্নান শেষ হয়ে গিয়েছে। মূল্যবান এবং দু’র্লভ ফরাসী সেন্ট দেহে ছড়িয়ে করবী দেবী একটা রকিং চেয়ারে বসে ছিলেন, আমাকে দেখেই তাঁর দোদু’ল্যমান দেহ থমকে দাঁড়ালো। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওঁর বয়স বুঝতে ভুল করেছিলাম। আগে যা ভেবেছি উনি তত বয়সিনী নন। করবী দেবী বললেন, “সমস্ত দিনটা আজ যেভাবে গিয়েছে, তা ভাবতে আমার গা বমি বমি করছে।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। করবী দেবী বললেন, “আপনাদের স্বাধীন ভারতবর্ষে কয়েকটা জিনিস খুব বেড়েছে। কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্টর, পারচেজ অফিস্যর, অ্যাকাউন্টস অফিস্যর—এদের জন্যেই যেন পৃথিবী এখনও সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মিস্টার আগরওয়ালাকেই বা কী বলবো। অতিথি নির্বাচনে তাঁর কোনো রুচি নেই। যারা হোটেলের ভিতর দেখেনি কোনোদিন, যারা কোনোদিন ড্রিঙ্কের ড শোনেনি, তাদেরও তিনি দু''নম্বর সুইটে নেমন্তন্ন করছেন, তাদেরও তিনি বার-এ ঢোকাচ্ছেন।”

করবী দেবী এবার রকিং চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, কফি তৈরি করবার জন্য হিটারে জল চড়িয়ে দিলেন। সুইচটা অন্ করে দিয়ে করবী দেবী একবার ড্রেসিং আয়নায় নিজের দেহটাকে যাচাই করে নিলেন। নিজের রাঙানো ঠোঁটটা আয়নাতে একটু খুঁটিয়ে দেখলেন। মাথার খোঁপায় যে রজনীগন্ধা ফুলগুলো সযত্নে সাজানো ছিল সেগুলো অবহেলাভরে খুলে খুলে টেবিলের উপর রাখতে লাগলেন। তারপর দুঃখ করে বললেন, “ছুরি কাঁটা ধরতে জানে না, চা কিংবা সুপ খেতে গিয়ে চোঁ চোঁ করে আওয়াজ করে, খাওয়ার শেষে বিশ্রী শব্দ করে ঢেঁকুর তোলে, এমন সব লোকদের আগরওয়ালা স্যর স্যর করেন। আশ্চর্য!”

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে কফির অপেক্ষায় বসে রইলাম। করবী দেবী বললেন, "আবার এক-একজন ম্যানারে দুরস্ত। কিন্তু কি ধাতু দিয়ে যে ভগবান ওঁদের তৈরি করেছেন তা আজও ধরতে পারি না।" আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "যে-দিন আমরা এই ধাতুর রহস্য বুঝতে পারবো, সেদিন শাজাহান হোটেল আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠবে। সেদিন হয়তো মিস্টার আগরওয়ালা আপনাকে ধরে রাখতে পারবেন না।”

করবী দেবী বললেন, “যদি অদৃশ্য কোনো ফুটো দিয়ে দিন কয়েকের জন্য আমার এই ঘরের দিকে নজর রাখেন তবে মানুষ সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানতে বাকি থাকবে না। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকতো, তা হলে এতোদিনে আরও একখানা মহাভারত তৈরি হয়ে যেতো।"

করবী দেবী বললেন, “অথচ ছোটবেলায় ভাবতাম মানুষ কত মহৎ। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। এখন কী ধারণা হয়েছে জানেন?” হিটারের সুইচটা বন্ধ করে দিতে দিতে করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

বললাম, “আপনি হয়তো ভাবছেন মানুষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" করবী দেবী হেসে ফেললেন।

বললেন, “আমার এখন ধারণা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর থাকুন না থাকুন, একজন ঘাঘু পারচেজ অফিস্যর নিশ্চয়ই আছেন। তিনি সংসারের সব কিছু পারচেজ দাম না দিয়ে করতে চান। শুধু, স্যাম্পেল আর নমুনা ব্যবহার করে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবার বুদ্ধিতে এরা অদ্বিতীয়।”

করবী দেবী এখনও হাসছেন। কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন, “আজ যে ভদ্রলোককে মিস্টার আগরওয়ালা এনেছিলেন, তিনি বেশী কথা বলেন না। মদ খাবার লোভও আছে, অথচ মাতাল হবার ভয় আছে। মদও খেলেন। তারপর এখন অন্য এক হোটেলে ক্যাবারে দেখতে গিয়েছেন, মিস্টার আগরওয়ালা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ ভদ্রলোক দক্ষিণদেশ থেকে মাঝে মাঝে আসেন, আর প্রচুর মাল কিনে নিয়ে যান। তা তোমাকে মাল গছাবার জন্য এঁরা খাওয়াচ্ছেন খাও, গেস্টরুমে নিয়ে এসেছেন থাকো, কিন্তু তাই বলে ভণিতাগুলো! বিশ্বাস করবেন না, ভদ্রলোক ড্রিঙ্কের মধ্যেই একবার জুতো খুলে আহ্নিকটা সেরে নিলেন। মিস্টার আগরওয়ালা তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বললেন, মিস্টার রঙ্গনাথন, আপনার কাছে এইটাই শেখবার। যেখানেই থাকুন গডকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না।' রঙ্গনাথনের তখন নেশা ধরেছে। আহ্নিকে বসবার আগে পর্যন্ত ক্যাবারে মেয়েদের নাচ সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছিলেন। আগরওয়ালার কথা শুনে বললেন, “আমার ওয়াইফের ভয়ে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফিয়ারফুল লেডি। সন্ধ্যেবেলায় পুজো না করলে আমাকে খেতে দেবে না।'

রঙ্গনাথনের নাম শূনে আমি একটু অবাক হলাম। মনে পড়ে গেলো, মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি একবার মমতাজ রেস্তোরাঁয় ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। করবী দেবী বললেন, “ফোকলার সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মিস্টার রঙ্গনাথন এখন মিস্টার আগরওয়ালার স্কন্ধে ভর করেছেন। নিস্টার আগরওয়াল। আমাকে টেলিফোনে মনে করিয়ে দিলেন রঙ্গনাথন বড় শক্ত বাদাম, কিছুতেই ভাঙতে চায় না। মাঝে মাঝে ওকে শুধু কন্জার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। এক লক্ষ কন্জার অর্ডার ওর হাতে রয়েছে। তাছাড়া এই অর্ডারটা বাগাতে পারলে রিপিট অর্ডার আসতে বাধ্য।”

কফির কাপে চুমুক দিয়ে করবী দেবী বললেন, “এক এক সময় খুব মজা লাগে। জানেন, আগরওয়ালা বলে রঙ্গনাথন একটা শাইলক। ব্যাটাছেলে সব বোঝে। মার্কেটের ওঠা-নামা ওর নামতার মতো মুখস্থ। এই মালটা যে বাজারে অনেক রয়েছে তা রঙ্গনাথন জানে। তাই আগরওয়ালাকে পিষে যতো পারে রস বের করে নেবার চেষ্টা করছে। আগরওয়ালা সুবিধে করতে না পেরে, শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে আমার এখানে পাঠিয়েছে।”

করবী গুহ এবার শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিলেন। বললেন, “এই জন্যেই মনে হয় পৃথিবীতে বেচা এবং কেনার হাঙ্গামাটা না থাকলেই ভাল হতো।” আমি প্রশ্ন করলাম, “মিস্টার রঙ্গনাথন কী বললেন?”

“রাজী হয়ে গিয়েছেন। আগরওয়ালার সমস্ত স্টকটাই কিনে নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। রঙ্গনাথন যাবার সময় কী বললেন জানেন? বললেন, 'ক্যালকাটা, বোম্বে এই কারণেই ফ্লারিশ করছে। বিজনেস এই দু'ই গ্রেট সিটিতে অনেক সাইন্টিফিক লাইনে রান করছে। ক্যালকাটাওয়ালা এবং বোম্বেওয়ালারা জানে কী করে সেল করতে হয় । এখানকার বিজনেসম্যানরা মুদিখানার দোকান থেকে সেলসম্যানশিপ শেখেনি।' রগনাথনের নেশা হয়েছিল।”

“রঙ্গনাথনকে আউট করবার জন্যে কী ড্রিঙ্ক আনিয়েছিলেন? জন হেগ?” আমি কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

করবী দেবী হেসে বললেন, “রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে যেমন আমি লিনেন ব্যবহার করি, তেমনি যেমন লোক তেমন ড্রিঙ্ক সিলেক্ট করবার চেষ্টা করি। ওঁর জন্যে আনিয়েছিলাম ওল্ড স্মাগলার। ওল্ড স্মাগলারের রঙীন নেশায় ভদ্রলোক বোল্ড আউট হয়ে যাননি। কিন্তু টলমল করছিলেন। সেই অবস্থায় বলেছিলেন, 'মিস্টার আগরওয়ালা, আপনি একটা ইস্কুল খুলুন। এই ক্যালকাটাবও বহু বিজনেসম্যান সেল করতে জানে না। তাদের সঙ্গে ডীল করতে গেলে আমার ব্লাড প্রেস্যর বেড়ে যায়, মনে হয় ঠিক যেন আমার ওয়াইফের সঙ্গে ডীল করছি।"

রঙ্গনাথন থেকে আমরা মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের অতিথিদের কথায় ফিরে এলাম। করবী গুহ বললেন, “অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল ফোন করে ঠিক করে নেওয়া। মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশীকে আপনি চেনেন নাকি?”

বসলাম, “সামান্য পরিচয় আছে।”

“আগে থেকেই ওঁকে চিনতেন?” করবী দেবী প্রশ্ন করলেন। "না, এইখানেই আলাপ হয়েছিল,” আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা! এই হোটেলে? উনি কি এখানে আসেন? কেমন লোকটি বলুন তো?"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

করবী দেবী হেসে বললেন, "আছে, প্রয়োজন আছে। ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।" করবী দেবী এবার ওঁর টেলিফোনটা তুলে ধরলেন।

টেলিফোনে আবার অনিন্দ্য পাকড়াশীর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পাকড়াশী জুনিয়র আজকাল অনেক কাজ করছেন। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজ নামে শিল্প সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাঁকে একদিন বসতে হবে। তার জন্যে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। "শিক্ষা নয়, অগ্নিপরীক্ষা"—একদিন অনিন্দ্য পাকড়াশী নিজেই আমাদের বলেছিলেন।

অনিন্দ্য পাকড়াশীকে আপনারা দেখে থাকবেন। দেশের তরুণতম শিল্পপতিদের তিনি একজন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কনফারেন্সের পর ফিনান্সের উত্তাপে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করা তাঁর মুখের যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তা দেখে আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না এই অনিন্দ্য পাকড়াশীই একদিন 'আমাদের সঙ্গে সরল প্রাণে গল্প করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতেন। লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতেন আমাদেরই এই শজাহান হোটেলে। বলতেন, "সিগারেট খাওয়াও আমার বারণ। মা মোটেই পছন্দ করেন না।" অনিন্দ্য এল:তন, "আমার বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। বাবা বলেন, ইণ্ডাস্ট্রিতে, ট্রেডে, কমার্সে শান্তি নেই। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কয়েক বছর স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করি; ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের দেশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। তারপর রুটিনের ঘানিতে একদিন তো বাঁধা পড়তেই হবে। কিন্তু মা রাজী হলেন না।"

একটু থেমে পাকড়াশী জুনিয়র বলেছিলেন, "জানেন, আমার ছবি আঁকতে কতো ভাল লাগে, অথচ একটুও সময় পাই না। গাড়ি করে যেতে যেতে যখন দেখি গড়ের মাঠে সবুজ ঘাসের উপর বসে বসে কোনো শিল্পী ছবি আঁকছে, তখন আমার মনটা উদাস হয়ে ওঠে। এলিয়ট, অডেন আর পাউণ্ডের কবিতা পড়া আমার নেশার মতো ছিল। বাংলাও পড়তাম। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এদের কবিতাও আমার খুব ভাল লাগতো। সমর সেন পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার খুব দুঃখ হতো। আমাদের দেশের লোকরা সত্যিই এতো কষ্ট পায়? জানেন, মাকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। মা

তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। মা বললেন, ওরা যে কবি। হয়তো জীবনে ওঁদের যথেষ্ট সুখ আছে, শান্তি আছে, তবুও লেখবার সময় চোখের জল ফেলতে হয়। কাব্যের নিয়মই এই। পৃথিবীতে যারা সামান্য একটু সুখে আছে, স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, দারিদ্র্যের আদালতে তাদের অভিযুক্ত না করলে, সাধারণ লোক পয়সা দিয়ে ওঁদের কবিতার বই কিনে পড়বে কেন? ওঁদের সঙ্গে যদি আলাপ হয়, দেখবে এ'রা আমাদেরই মতো সাধারণ জীবন যাপন করছেন।" এই অনিন্দ্যকেই আমি চিনতাম। আবার আমার থেকে অনেক বেশী চিনতেন শ্রীমতী করবী গুহ।

করবী দেবী একদিন বলেছিলেন, "ধনীর দু'লাল এখনই পান্থশালা পরিদর্শনে আসছেন! বিদেশী অতিথিদের জন্যে ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না দেখবেন। নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হুকুম দেবে হিয়া কা মাটি হুয়া ফেকো, আর হুয়া কা মাটি হিয়া ফেকো। এদের কাছে আমাদের শিখতে হবে কেমন করে অতিথি আপ্যায়ন করতে হয়!"

ঝলমলে টি-শার্ট আর কাঠকয়লা রংয়ের ট্রপিক্যাল ট্রাউজার পরে এবং একটা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নাচাতে নাচাতে অনিন্দ্য পাকড়াশী একটু পরেই নিউ আলিপুর থেকে এসে হাজির হলেন। করবী দেবী অনিন্দ্যকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "খাতায় কলমে যদিও সুইট, আসলে এটা হোটেলের একটা উইং। বেশ কয়েকজন গেস্টকে আমি অ্যাকোমোডেট করতে পারি, "

"অ্যাকোমোডেট নয়, আশ্রয় বলুন।" অনিন্দ্য হেসে উত্তর দিলেন। ঘরের ব্যবস্থাগুলো খুটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "বিশ্বাস করবেন, আমি কখনও হোটেলে থাকিনি! মা মোটেই পছন্দ করেন না। এই ক'বছর তো বোম্বাই ব্রাঞ্চে ছিলাম, তা সহজেই হোটেলে থাকতে পারতাম! মা কিন্তু মাসিমার ওখানে ব্যবস্থা করে দিলেন। মেসোমশাই ওখানকার এজেন্ট। ওঁর আন্ডারেই আমার চাকরি।"

অনিন্দ্য ছোটোছেলের মতো হেসে বললেন, "যাঁরা আসছেন এ'রা জার্মানির এক বিরাট কারখানার মালিক। এদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। বাবা সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছেন। এখন কোথাও পান থেকে চুন খসলে, আমাকেই তার জন্যে

দায়ী হতে হবে। সুতরাং কী করি বলুন? এ সবের আমি কি বুঝি? বাবার কাছে আমার যাতে মুখ রক্ষে হয়, সে ব্যবস্থা আপনাদেরই করতে হবে।”

অনিন্দ্য কিছুই দেখলেন না। আমাদের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন। করবী দেবীর রকিং চেয়ারে বসে পড়ে অনিন্দ্য বললেন, “সামনের কয়েকটা দিন আমার কাটলে হয়। মা বলেছিলেন, 'বাবার তখন তেমন অবস্থা ভাল নয়। এক বিলিতী কোম্পানীর এজেন্সী পাবার জন্যে বাবাকে নাকি পর পর তিনদিন লাঞ্চ ড্রপ করতে হয়েছিল।' আমার ভাগ্যে আবার দেখা যাক কী আছে; কিন্তু লাঞ্চ ড্রপ করতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।”

করবী গম্ভীরভাবে বললেন, “এখন দিনকাল পালটিয়েছে।” অনিন্দ্য বললেন, “ঠিক বলেছেন। মাকে আমি কথাটা শুনিয়ে রাখবো। কাল ভোরে আমি এরোড্রোমে যাবো, সেখান থেকে এখানে আসবো, ওঁদের সঙ্গে আঠার মতো লেগেও থাকবো। তারপর যা-হয় তা হবে।”

আমি উত্তর দিলাম, “এর পরে আপনার মায়ের আর কিছু বলবার থাকবে তবে আগে থেকে আপনার বক্তব্যটা জানিয়ে রাখা মন্দ নয়!" অনিন্দ্য পাকড়াশী আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বললেন, “আমার মাকে আপনি চেনেন না। মা ভাববেন, কাজলের আমার কাজে মন বসেনি। ও-হরি আপনাদের বলাই হয়নি, কাজল আমার ডাক নাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার বন্ধুরা আমাকে কাজলা দিদি বলে রাগাতো। দেখা হলেই দু’র থেকে চিৎকার করতো—বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই।" করবী গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমি কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম, “আপনি বুঝি খুব শ্লোক আওড়াতেন?”

“মোটেই নয়। মাঝে মাঝে শুধু, কোটেশন দিতাম। কবিতায় উত্তর দিতে আমার খুব ভাল লাগতো। এখন কিন্তু আমি কাঠ হয়ে যাচ্ছি। বাবার হোটেলে থাকা এক জিনিস, কিন্তু বাবার আপিসে চাকরি—রিগারাস ইমপ্রিজনমেন্ট। মায়ের ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কিছুদিন বাইরে থাকি। বাইরে কাজ করলে ট্রেনিং ভালো হয়, মায়ের ধারণা। না হলে, নিজের পেটের ছেলেকে কে আর বাইরে রাখতে চায়, বলুন। বাবা আগে দু''একবার

আমাকে নিয়ে আসবার কথা তুলেছেন, মা মত দেননি। এবার, বাবা প্রায় জোর করলেন। বাবার ধারণা, মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ঘরানা শিখে নেবার সময় এসেছে। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজের এখন দু'টি প্রবল শত্রু, জানেন তো। কথাটা কিছু, আমার নিজের নয়। আমার বাবা প্রায়ই বলেন— পাবলিক সেকটর আর করোনারি থ্রম্বসিস।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্য বললেন, "এবার উঠি। মায়ের অর্ডার, ক্লাবে গিয়ে একটু টেনিস খেলতে হবে।"

আজও মনে পড়ে, সেদিন অনিন্দ্য বিদায় নেবার পর, আমরা দু''জন অনেকক্ষন নির্বাক হয়ে বসেছিলাম। নাম কাজল, কিন্তু আসলে যেন শুভ্র। অনিন্দ্য আমাদের হোটেলের এই অশুচি পরিবেশে যেন স্নিগ্ধশুচিতার পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। করবীও চুপ করে থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, "চমৎকার। এমন ছেলেকে মিসেস পাকড়াশী কেমন করে যে বছরের পর বছর বাইরে রেখেছিলেন!"

"ভাবী রাজার মায়ের মতো, ভাবী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মাকেও অনেক "স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।" আমি উত্তর দিলাম।

করবী নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, "আশা করি তাই যেন হয়।" সেদিন আমি মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলাম। যাক, কিছু ভালও দেখলাম। হোটেল মানে তো শুধু খারাপ নয়। এখানে অনেক ভালও আসে।

পরের দিন ভোরে আমি উঠে পড়েছিলাম। তখন রাতের অন্ধকার কাটেনি। ছাদের উপর নিশ্চল পাথরের মতো একটা লোক তখনও বসেছিলেন। তাঁর নাম প্রভাতচন্দ্র গোমেজ। ওই ভোরবেলাতেই প্রভাতচন্দ্র গোমেজ যে ব্রাহ্মের প্রদর্শিত পথে কালো তিক্ত কফি নিজে হাতে তৈরি করে পান করেছেন, তা তাঁর পাশে শূন্য কাপটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন ছাদের কোণে ঐভাবে কিসের অপেক্ষায় বসে আছেন কে জানে?

প্রভাতচন্দ্র আমাকে দেখতে পেলেন, ইশারায় কাছে ডাকলেন। বললেন, "আমার জীবনে এই একটাই বিলাসিতা আছে। সূর্যের জন্য পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে থেকে আমি নতুন চিন্তার খোরাক পাই।"

বললাম, “আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শুধু একটা গেঞ্জি পরে বসে আছেন।” প্রভাতচন্দ্র গোমেজ আমার কথায় যেন কান দিলেন না। নিজের মনেই বললেন, “ঠাণ্ডা লেগে এখান থেকে আমি বিদায় নিলে পৃথিবী একটুও গরীব হবে না। অনেকদিন আগে একজন মানুষ ঠাণ্ডাকে অবহেলা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেদিন কিন্তু পৃথিবী সত্যিই গরীব হয়ে গিয়েছিল। আজও সে ক্ষতি পূরণ হয়নি।”

প্রভাতচন্দ্রের কথার মধ্যে এমন এক বিষণ্ন ঝংকার আছে যা আমার মতো বেসুরো মানুষকেও সহজে আকৃষ্ট করে। প্রভাতচন্দ্র বললেন, “তিনি সঙ্গীতের সেক্সপিয়র ; তাঁর নাম বীঠোফেন। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, আমার যদি তেমন একটা রেকর্ড—লাইব্রেরি থাকতো, তাহলে আজ এই মুহূর্তে আপনাকে শোনাতাম বীঠোফেনের নাইনথ সিমফনি— the most gigantic instrumental work extant."

আমি বললাম, “ঈশ্বরের আশীর্বাদে একদিন আপনার যেন সব হয়।” “তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর বিচার?” প্রভাতচন্দ্র গোমেজ প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। “তাহলে হাণ্ডেল এবং বাক্, কী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন? তাহলে কী বীঠোফেন কালা হয়ে যান? মানব সভ্যতার এই দীর্ঘ ইতিহাসে আর একজনও বীঠোফেন সৃষ্টি হয়নি। যদি আপনি পৃথিবীর মধুরতম সিমফনি শুনতে চান তাহলে বীঠোফেন যে ন'টি রেখে গিয়েছেন তাই আপনাকে শুনতে হবে; যদি আপনার এমন পিয়ানো ফোর্ট সোনাটা শোনবার লোভ থাকে যার কোনো তুলনা নেই, তাহলে বীঠোফেনের বত্রিশটার মধ্যেই একটা পছন্দ করতে হবে। আর স্ট্রিং কোয়ার্টে? সেখানেও আপনার ভরসা তাঁর সতেরোটি রচনা। আর অতি সাধারণ উপায়ে যদি অসাধারণ শব্দ ঝংকার সৃষ্টির রহস্য আপনি আবিষ্কার করতে চান, তাহলে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে নির্জনে বসে বসে আপনাকে হাণ্ডেলের পুজো করতে হবে। একবারে তিনি হয়তো আপনাকে অনুগ্রহ করবেন না। কিন্তু আপনাকে হতাশ হলে চলবে না। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। তারপর একদিন এমনই কোনো অন্ধকার এবং আলোর মিলন মূহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন বীঠোফেন কেন বলেছিলেন Go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means."

এবং আলোর মিলন মূহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন বীঠোফেন কেন বলেছিলেন - Go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means."

প্রভাতচন্দ্র হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তাঁর পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ ভুলে তিনি আবার পূর্বদিগন্তের দিকে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে স্যরিয়ে নিলেন। সহজ পথে অসাধারণকে পাবার গোপন মন্ত্রটি যেন ওই আকাশের এক কোণে কোথাও অদৃশ্য কালিতে লেখা রয়েছে।

আমি আর কোনো কথা না বলেই, ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। হোটেলের সবাই তখনও গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছে। কিন্তু আমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। করবী দেবীরও। তিনি এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। মার্কোপোলোর সঙ্গে তাঁর এবং আগরওয়ালার কথা হয়েছে। কদিন আমাকে বিশেষ অতিথিদের জন্যে বিশেষ ডিউটি দিতে হবে।

সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার কিন্তু শুধু প্রভাতচন্দ্রের কথা মনে হচ্ছিল। সহজ পথে মহানকে পাবার জন্যেই যেন আমরা সবাই কাঙালের মতো রাস্তায় পাতা পেতে বসে আছি।

করবী দেবীর ঘরে টোকা মারতেই, তিনি দরজা খুলে দিলেন। তাঁর অতিথিশালা তখন অতিথি অভ্যর্থনার জন্যে প্রায় প্রস্তুত। ঘরের কোণে এবং টেবিলে কেমন সুন্দর ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে দিয়েছেন করবী দেবী। রংয়ের সঙ্গে রং মিলেছে। করবী বললেন, "এক এক সময় ভাবি, ইনটিরিয়র ডেকরেটরের কাজ করবো। কেমন দেখছেন?" বললাম, "চমৎকার।" করবী বললেন, "বেচারা ন্যাটাহারি বাবুকে কাল খুব খাটিয়েছি। যে রংয়ের পর্দা এনে দেখান তাই আমার পছন্দ হয় না।"

শেষে ন্যাটাহারিবাবু নিবেদন করলেন, 'মা জননী, যদি অপরাধ না নেন, তা হলে একটা কথা বলি। আমি তো লাটসায়েবের বিছানাও করেছি। রয়েল ফ্যামিলির মেম্বাররা যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছেন, তখনও বিছানা বালিশের জন্যে এই ন্যাটাহারি ভটচায্যিকেই

ডাকতে হয়েছে। এই অধমের হাতে তৈরি বিছানাতেই শুয়ে লর্ড রিডিং এমন সুখ পেয়েছিলেন যে, ঘুম থেকে উঠতে এক ঘণ্টা দেরি করেছিলেন। সকালের সমস্ত প্রোগ্রাম একঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। আর এমনই অদৃষ্ট আমার যে, এখন দু'টো জার্মান সায়েবের জন্যে ঘর সাজাবার পর্দা পছন্দ করাতে পারছি না। করবী তখন বলেছিলেন, 'এই সব ব্যবস্থার উপর একজন ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে — খারাপ কিছু ঘটলে তাঁর বাবার কাছে তিনি ছোটো হয়ে যাবেন।"

ন্যাটাহারিবাবু তখন কান থেকে পেন্সিলটা খুলে বলেছিলেন, 'ব্যাপার যদি এতোই গুরুতর হয়, তাহলে মা জননী একটা কথা বলি। ঘরের পর্দা, টেবিলের কাপড়ের জন্যে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। সমস্ত নজরটা বিছানার উপর দিন। ফর্টি ইয়ার লিনেনের কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তাতে বলছি, বিছানাটা হোটেলের সবচেয়ে ইম্পর্টাণ্ট আইটেম। বিছানাটা যদি ভাল পায়, খারাপ খাবার হলেও লোকে কিছু বলবে না। বিছানা এমনভাবে করতে হবে, যাতে সবাই ভাবে সে নিজের চেনা বিছানাতেই শুয়ে আছে। দোষ দিতে পারেন না, মা জননী। লাইফের সবচেয়ে ইম্পর্টাণ্ট সেণ্টার এই বিছানা। এই বিছানাতেই আমরা হাসি, এই বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে আমরা কাঁদি, এই বিছানাতেই আমাদের জন্ম, এই বিছানাতেই আমাদের মৃত্যু। অথচ মা লক্ষ্মী, আজকালকার আপনারা এ-দিকটা একেবারেই নজর দেন না। ন্যাটাহারি যখন থাকবে না তখন এই হোটেলের যে কী হবে!'

ন্যাটাহারিবাবু তারপর তাঁর যত রংয়ের পর্দা আছে, তার এক একটা নমুনা মাথায় করে করবীর ঘরে হাজির হয়েছিলেন। এবং তার মধ্যে থেকেই তিনি একটা পছন্দ করেছেন। "কেমন দেখছেন?" করবী আমাকে এক কাপ চা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন। আমার মাথায় তখনও হাণ্ডেল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বললাম, "সহজ অথচ সুন্দর হয়েছে।" করবী হাসলেন। "সব সৌন্দর্যের রহস্যই তো ওই। এই যে অনিন্দ্য পাকড়াশী। ওঁর জন্যেই বা আমরা দু''জনে এতো পরিশ্রম করছি কেন? উনি সহজ অথচ সান্দর বলে, তাই না?"

সেদিন ব্রেকফাস্টের একটু আগেই দমদম বিমানঘাঁটি থেকে দু''জন বিদেশী অতিথিকে নিয়ে মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের বিরাট ক্লাইসলার গাড়ি শাজাহান হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ডক্টর রাইটার এবং মিস্টার কুর্টের আকার বিশাল, এবং গুরুত্ব ততোধিক।

করবী আজ মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটা শাড়ি পরেছেন। মাথার খোঁপা রজনীগন্ধার গোছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনেকদিন আগে সরস্বতী পুজোর দিন আমার অলকাদিকে এমনি দেখাতো। এমনি সহজ অথচ গম্ভীর বেশে অলকাদি গার্লস কলেজের পূজামণ্ডপে যেতেন।

করবী গুহ আমাদের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অতিথিদের দেখে ভারতীয় প্রথায় হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানালেন। অনিন্দ্য আমার ঘাড়ে ওঁদের মালপত্তরের দায়িত্ব চাপিয়ে করবী দেবীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

পোর্টারের মাথায় সব মালগুলো চাপিয়ে, আমি যখন দু''নম্বর সইটে এসে হাজির হলাম, তখন চমকে যাবার অবস্থা। দু''নম্বর স্যুইটের মেঝেয় করবী কখন আলপনা এ'কে ফেলেছেন। ওঁরা বলছেন, “এ-গুলো কী?” অনিন্দ্য বলছেন, “আমাদের ট্র্যাডিশনাল পেন্টিং। সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে আমাদের গৃহবধূরা এই আলপনা দিয়ে থাকেন।” ডক্টর রাইটার বললেন, “বাঃ চমৎকার!” তারপর তিনি নিজের ক্যামেরা মেঝের উপর ফোকাস করতে আরম্ভ করলেন। ছবি তোলা শেষ করে রাইটার বললেন, “অ্যামেচার ঘরের মেয়েরা এমন আর্ট ওয়ার্ক করতে পারে! কোনো প্রফেশনাল শিল্পী এগুলো করেননি?”

অনিন্দ্য বললেন, “মোটেই না। অবশ্য মিস্ গুহকে আপনি একজন ট্যালেন্টেড শিল্পী বলতে পারেন।”

মিস্টার কুর্ট জুতোর ডগা নাড়তে নাড়তে বললেন, “মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ্, বীয়ার?” অনিন্দ্য বললেন, “নিশ্চয়ই!” কিন্তু আমাকে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে হলো, আজ ড্রাই ডে।

“হোয়াট?” অসন্তুষ্ট মিস্টার কুর্ট প্রশ্ন করলেন।

অনিন্দ্য ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন। বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা খারাপ দিনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন আমাদের এই স্টেটে মদ বিক্রি বন্ধ। সেদিন বার এবং রেস্তোরাঁর ম্যানেজাররা সব স্পিরিচুয়াস লিকার তালাবদ্ধ করে রাখেন।"

মিস্টার কুর্ট এমন কোনো সংবাদ জীবনে শোনেননি। বললেন, "ইউ মিন টু সে, একদিন তোমরা পুরোপরি ড্রাই! ইচ্ছে করে ইণ্ডিয়ার নরম্যাল লাইফ একদিনের জন্যে তোমরা পঙ্গু করে দাও? এবং তুমি বলতে চাও, এইভাবে, এই সব লাস্ট সেঞ্চুরির পচে যাওয়া আইডিয়া নিয়ে তোমাদের কান্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যশনের সূচনা করবে?"

এই অশুভ সূচনায় অনিন্দ্য যে বেশ ঘাবড়ে গেলেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। কিন্তু তখন কে জানতো, আরও অনেক কিছু, বাকি রয়েছে!

অনিন্দ্য তাঁর দেশের সব অপরাধ যেন নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বিদেশী অতিথিদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন বাংলা দেশকে তাঁর হুকুমেই সপ্তাহে একদিন ড্রাই করে দেওয়া হয়। মাথা নিচু করে বিরক্ত অতিথির কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ডক্টর রাইটার এবার তাঁর বন্ধুকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। ইংরেজীতেই বললেন, "কলকাতা তবু তো মন্দের ভাল। ভারতের পশ্চিমে, আরব সাগরের তীরে বোম্বাই বলে একটা শহর আছে, সেখানে প্রত্যেক দিনই শুকনো দিন। শুনেছি, এক বোতল বীয়ারের জন্যেও সেখানে তোমাকে পারমিট নিতে হবে।"

মিস্টার কুর্ট এবার হতাশ হয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। করবী এই অবস্থা দেখেই বোধহয় ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আমার মনে হলো, অনিন্দ্য যাতে তাঁর সামনে বিব্রত বোধ না করেন সেই জন্যেই তিনি সরে গিয়েছেন। কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো একটু পরেই। করবী একটা নরম রবারের চটি পরে, বেণী দু'লিয়ে আবার ড্রইংরুমে এসে ঢুকে অতিথিদের ভারতীয় প্রথার নমস্কার করলেন।

ওঁরা দু'জনেই অবাক হয়ে করবীর মুখের দিকে তাকালেন। ওঁর পিছনে ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে দু'টো ডাব। বিদেশী দু''জন জীবনে এমন অদ্ভুত ফল

দেখেননি। ডক্টর কুর্ট একটু অবাক হয়ে বললেন, "কী জিনিস?" করবী হেসে বললেন, "নেচার আমাদের জন্যে ইণ্ডিয়াতে এই ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করেছেন। ডাব।"

"ড্যাব! নেভার হার্ড— অফ ইট!" ডক্টর রাইটার বলে উঠলেন। করবী দু'টো ডাব ওঁদের দিকে এগিয়ে বললেন, "গ্রীন কোকোনাট কি তোমরা এর আগে দেখোনি? ইণ্ডিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে এই ডাব খেয়ে থাকে।" অনিন্দ্য তাঁর অতিথিদের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন।

করবী মোহিনী হাসিতে মুখে ভরিয়ে বললেন, "এই ডাব ড্রিঙ্ক করাও একটা আর্ট। ইচ্ছে করলে এর জল গ্লাসে ঢেলে আপনাদের দিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি চাই, আমাদের গ্রামের লোকেরা যেভাবে ড্রিঙ্ক করে আপনারা সেইভাবে খান।"

কুর্ট একটু উৎসাহ বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কীভাবে ড্রিঙ্ক করতে হবে বলো?" করবী হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের গ্রামের লোকরা এমনভাবে ফুটোতে মুখ রেখে খায় যে, একফোঁটা জল গায়ে বা জামায় পড়ে না। কিন্তু সেটা বেশ শক্ত ব্যাপার।"

কুর্ট সঙ্গে সঙ্গে করবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ডাবে মুখে দিয়ে তিনিও যে খেতে পারেন, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন ডাবটা এক মিনিটের জন্যে করবীর হাতে দিয়ে নিজের কোট খুলে ফেললেন। করবী এবার বললেন, "মিস্টার কুর্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এইভাবে খেতে গিয়ে তোমার জামায় দাগ হবে, এবং আমাদের দেশের দু'র্নাম হবে। আমি তোমাদের জন্যে স্ট্র পাইপের ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

ডক্টর রাইটার বললেন, "আমাকে একটা পাইপ দাও। যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সে-বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে 'নো হাউ' নিতে আমার মোটেই আপত্তি নেই।" মিস্টার কুর্ট বললেন, "হে ভারতীয় সুন্দরী, আমরা জার্মান—অত্যন্ত গোঁয়ার। মাথায় যখন খেয়াল চেপেছে তখন আমি ট্রাই করবই।"

করবী বললেন, "হে বিদেশী পুরুষ, তোমার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ; কিন্তু তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আমার বকুনি রইলো।"

কুর্ট এবার ভারতীয় প্রথায় ডাব খেতে গিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলেন। প্রথমে এক ঝলক জল এসে তাঁর জামা কাপড় ভিজিয়ে দিলো। তারপর ভদ্রলোক বিষম খেয়ে কাশতে লাগলেন। করবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কুর্টের হাত থেকে ডাবটা কেড়ে নিলেন। কুর্ট তখন কাশছেন এবং কাশতে কাশতে হাসছেন। করবী বলছেন, "আর নয়, অনেক হয়েছে। শেষে হয়তো রটে যাবে, ইণ্ডিয়াতে আপনাদের মেরে ফেলবার ফন্দি আঁটা হয়েছিল।"

কুর্ট এতোক্ষণে সামলে নিয়েছেন। ভিজে জামার দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। একটু লজ্জিত হয়েই বললেন, "মিস গুহ, আমি সত্যিই দুঃখিত। ঘরে ঢুকেই প্রথমে ড্রিঙ্কের জন্যে মাথা গরম করা উচিত হয়নি।" ডক্টর রাইটার গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার দু'র্ব্যবহারের জন্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছো। হয়তো মিস গুহ আরও শাস্তির ব্যবস্থা করছেন।"

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। এবার কুর্ট এবং রাইটার বিশ্রামের জন্যে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ওঁরা চলে যেতেই অনিন্দ্য যেভাবে করবী গুহের দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন তা আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমারই সামনে অনিন্দ্য বলেছিলেন, "সত্যি, আপনার তুলনা নেই। প্রথমেই আমাদের সম্পর্কটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। আপনি কী আশ্চর্যভাবে অবস্থার মোড় ফিরিয়ে দিলেন।"

করবী মূহূর্তের জন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। শাড়ির খুটটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, "আপনি কি এখন কিছু, খাবেন? ওঁদের তো তৈরি হতে সময় লাগবে।" অনিন্দ্য বলেছিল, "রাজী আছি, এক শর্তে। ওরা নিজেদের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমরা চলুন মমতাজে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।"

করবী একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু জোর করে বলতে পারলেন না। অনিন্দ্য আমাকে বললেন, "আপনিও চলুন। খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যাবে।" আমি বলেহিম, "ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমার কাজ আছে।"

অনিন্দ্য হয়তো সরল মনেই আমার কথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু করবী দেবী সব ফাঁস করে দিলেন। বললেন, "না, ওঁর খাবার অসুবিধে আছে। হোটেলের কর্মচারী তো। গেস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে চেয়ারে বসে খাবে কী?"

অনিন্দ্য বললেন, "হোটেলের স্টাফ তো কী হয়েছে? উনি তো আমার গেস্ট।" করবী বললেন, "তা হয় না। গেস্টদের সঙ্গে অতটা মেশামেশি ম্যানেজমেণ্ট পছন্দ করে না।"

অনিন্দ্য তাঁর তখনকার ছেলেমানুষি নিয়ে বলেছিলেন, "তা কিছুতেই হয় না। আমি এখনই ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি।"

যে-অনিন্দ্য সেদিন সামান্য একজন হোটেল কর্মচারীর অপমানে বিচলিত হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, তিনি আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন কে জানে! আজ তাঁর বক্তৃতা পড়লে মনে হয়, মানুষের সম্বন্ধে সব শ্রদ্ধা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর এখন ধারণা, পৃথিবীর সাধারণ মানুষরা যেন মাধব ইন্ডাস্ট্রিকে ঠকাবার জন্যে সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্র করছে। তারা শুধু, শিল্পপতিদের কাছে মাইনে নেয়, টিফিন খায়, ওভারটাইম পায়, বোনাস আদায় করে, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই দিতে চায় না। গবর্নমেন্টের প্রশ্রয় পেয়ে, এবং কমুনিস্টদের উস্কানিতে সমস্ত কান্ট্রি যেন ইণ্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

এই অনিন্দ্যই হোটেলে বসে বসে একদিন করবী এবং আমাকে বই বের করে শুনিয়েছিলেন—

> "মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে
> নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে,
> তবুও কোথায় সে অনির্বচনীয়
> স্বপ্নের সফলতা-নবীনতা?
> শুভ্র মানবিকতার ভোর"

করবী বলেছিলেন, "দাঁড়ান, আপনার মাকে টেলিফোন করে বলে দেবো। কাজে মন না দিয়ে ছেলে ব্যাগে করে কবিতার বই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" অনিন্দ্য বলেছিলেন,

“আপনাকে আমি বাছাই করা কবিতার বই দিয়ে যাবো। তারপর দেখবো আপনি কেমন না কবিতার ভক্ত হয়ে ওঠেন।”

কাজের অছিলায় আমি বেরিয়ে এসেছি। ওঁরা দু”জনে সোজা মমতাজ-এ চলে গিয়েছেন, ব্রেকফাস্টের জন্যে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে এঁরা দু"জন আবার সাইটে ফিরে গিয়েছেন। একটু পরেই অনিন্দ্য বেরিয়ে এসে আমাদের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, “ওরা দু”জনেই এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। একটু পরে যা হোক করা যাবে। এখন আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে হবে।”

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এর পর কত সময়ই তো অনিন্দ্য নষ্ট করেছেন। আমরা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে গিয়েছি, উনি চুপচাপ দেখে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে বলেছেন, “সত্যি, অদ্ভুত চাকরি আপনাদের। কত রকমের মানুষকে দেখবার সুযোগ পান আপনারা। এখন বুঝছি, ইংরেজী উপন্যাসে হোটেল থাকলে তা কেন সহজে জমে যায়।”

ঘরে, রাত্রির অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও কত নাটক এমনই ভাবে অভিনীত হচ্ছে কে জানে? কে তাদের খবর রাখে?

যাঁদের আমি চিনি না, জানি না, তাঁদের জীবননাট্য বিয়োগান্ত না মিলনান্ত, তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। কিন্তু দু”নম্বর সাইট? সেখানে এই মুহূর্তে করবীকে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা ভাবতে আমার মন অজানা ভয়ে শিউরে উঠলো। প্রভাতচন্দৰ গোমেজ ইশারায় আমাকে ডাকলেন। ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, “এখনও জেগে রয়েছেন!”

প্রভাতচন্দ্র হাসলেন। “ঘুম আসে না। রাত্রিটাকে দিনের মতো ব্যবহার করে করে অভ্যাসটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। ড্রাই-ডের রাত্রিটা তাই তারাদের সঙ্গে ভাব করে কাটিয়ে দিই। বেশ লাগে।”

আমি আর একটা টুল নিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। প্রভাতচন্দ্র বললেন, “আপনাদের বয়স কম, এখন ঘুমের প্রয়োজন। বয়স বাড়লে আপনাকেও ঘুমের জন্যে সাধ্যসাধনা করতে হবে।” আমি নীরবে হাসলাম। বললাম, “মিস্টার গোমেজ, আপনি তো এতো চিন্তা করেন। রাতের নক্ষত্র, ভোরের সোনালী সূর্য তো একান্তে আপনার মনের সঙ্গে

সংযোগ স্থাপন করে। বলতে পারেন, আমাদের জীবনে কেন সাসপেন্সের সৃষ্টি হয়েছিল? কেন আমরা অনাগত আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি?"

গোমেজ বললেন, "শুনেছি, হিন্দুদের শাস্ত্রে এর উত্তর আছে। কিন্তু আমি অশিক্ষিত খ্রীষ্টান বাজনদার, তার খবর রাখি না। আমি আপনাকে গানে উত্তর দিতে পারি। সামান্য ছায়াছবির গান, কিন্তু সেখান থেকেই আমি আমার জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলাম—কে সারা সারা।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"মানে", গোমেজ এবার মৃদু'কণ্ঠে ইংরিজী গান ধরলেন, "কে সারা সারা। The future is not ours to see যা হবার তা হবে।" গান শেষ করে গোমেজ বললেন, "একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এই হোটেলে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এই গানের রেকর্ডটা দিয়ে যান। একদিন আপনাকে শুনিয়ে দেবো। আমি শিখেছি, ভবিষ্যতের খোঁজ নেওয়া আমাদের কাজ নয়—কে সারা সারা।"

গোমেজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সত্যিই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। রাত্রের তারারা যেন গোমেজের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে—কে সারা সারা।

অনিন্দ্য পরের দিন আবার এসেছিলেন। সে দিন ভোরেই তিনি করবীকে একলা পেয়ে বলেছিলেন, "যদি আপনি কিছু না মনে করেন, তবে একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।" করবী বলেছিলেন, "আপনাদের বন্ধু মিস্টার আগরওয়ালার আমি হোস্টেস। সুতরাং বলতে গেলে আপনারই স্টাফ আমি। সতরাং অনুরোধ নয়, হুকুম করুন।"

অনিন্দ্য এমন উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই হেসে বললেন, "ও বুঝেছি, আপনি কালকের প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু আমি রাগ করছি না। কালকে এখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে বেশীক্ষণ বসিনি। সোজা দোকানে চলে গিয়েছিলাম। একলা হোটেলে বন্দী হয়ে থাকেন, তাই ভাবলাম, আমার প্রিয় কবিদের বইগুলো হয়তো আপনাকে আনন্দ দেবে।"

এসব কথা করবীই পরে আমাকে বলেছিলেন। ওঁরা দু'জনে যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। করবীরও সাহস বেড়ে গিয়েছিল। বইগুলো হাতে নেবার আগে অনিন্দ্যর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আপনার প্রিয় কবি যে আমারও প্রিয় কবি হবে, সেটা কেমন করে ধরে নিলেন অনিন্দ্যবাবু?"

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "এর উত্তর জীবনানন্দ বা সমর সেন কেউ দেননি। কিন্তু আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। স্পেকুলেশন। ব্যবসাদার লোক আমরা, ফাটকায় সিদ্ধহস্ত।" করবী বলেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের সেবা করলে আপনি সত্যিই অনেক কাজ করতে পারতেন।"

"দাঁড়ান, এখন এই জার্মান সায়েবদের সেবা করে মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর মঙ্গল করি।" অনিন্দ্য হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন, "তবে জেনে রাখবেন, চিরকাল আমি এমন থাকবো না। এই সব হুজগ থেকে মুক্তি পেয়ে আমিও একদিন নিজের খুশিমতো কবিতা আর ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকবো।"

সেদিন সকালেই খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় 'কলকাতায় জার্মান শিল্প প্রতিনিধি" এই শিরোনামায় বিশিষ্ট অতিথিদের যে সংবাদ ছাপা হয়েছিল, তাতে মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের নামও প্রকাশিত হয়েছিল। মাধব পাকড়াশী শারীরিক অসুস্থতার জন্যে যে দমদম বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্য শ্রীমতী পাকড়াশীও যে দমদম পর্যন্ত যেতে পারেননি, তাও খবরের কাগজ পড়ে জানা গেলো।

কাগজ পড়তে পড়তে করবী যখন অনিন্দ্যর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, তখন আমিও সেখানে বসে রয়েছি। করবী দেবীই আমাকে জোর করে সেখানে রেখে দিয়েছিলেন। অনিন্দ্য বললেন, "আমি জানি না, ওসব মায়ের নিজের পরিকল্পনা আমাদের পি-আর-ও সেনকে ডেকে নিজেই প্রেসনোট তৈরি করে দিয়েছেন। বাবা বলেছিলেন, তিনি দমদমে যাবেন। কিন্তু মা বললেন, আমাকে সুযোগ দিতেই হবে। সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন—বাবার 'অসুস্থ' হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না।"

করবীর ইচ্ছা ছিল আমি দু''নম্বর সুইটের ড্রইং রুমে তাঁর সঙ্গে বসে থাকি। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। দু'' নম্বর সুইটে আমার স্পেশাল ডিউটি থাকলেও প্রতিদিনের

কাজ থেকে একেবারে ছুটি পাইনি।

কাউন্টারে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করেছি। এমন সময় রিপোর্টার মিস্টার বোসের আবির্ভাব ঘটলো। মিস্টার বোস বললেন, "কেমন আছেন? আপনার গুরুদেব মিস্টার স্যাটা বোসই বা কোথায়? ওই জার্মান পার্টি সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর চাই-ই।"

আমি বললাম, "মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের জনসংযোগ অফিসার নিশ্চয়ই তাঁদের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।"

"সেই বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে কাগজ চালাতে পারলে মালিকরা আর আমাদের মতো রিপোর্টারদের মাইনে দিয়ে রাখতেন না। বনস্পতি নয়, আসল ঘি চাই আমি। এখন সেই নির্ভেজাল খবরের উৎস কোথায় বলে দিন

আমি চুপ করে রইলাম। মিস্টার বোস কিন্তু নীরব হলেন না। তিনি যে অনেক খবর রাখেন তা পরের কথা থেকে বুঝলাম। মিস্টার বোস প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের ডিলাক্স স্যুইটের মিস গুহ যদি ইচ্ছে করেন আমাকে খবর দিয়ে বড়লোক করে দিতে পারেন।"

বললাম, "ওঁর ঘরে এখন বাইরের লোক আছে। যদি একটু পরে আসেন।"

"কোনো আপত্তি নেই। আমি ততক্ষণ এসপ্ল্যানেডে রেলের পাবলিসিটি অফিসে একটু ঢু' মেরে আসি।"

মিস্টার বোস যেতেই করবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। "বিখ্যাত হবার এই সুযোগ। সংবাদপত্র প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" করবী বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না, আপনি সাইটে চলে আসুন।"

ওখানে অনিন্দ্য তখনও বসে রয়েছেন। আমার কথা শুনে করবী বললেন, "হোস্টেসদের সব সময় নেপথ্যে থাকতে হয়। প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অনিন্দ্যবাবু।"

কাগজের নাম শুনেই অনিন্দ্য একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "পি-আর-ওকে সামনে না রেখে বাবা কিংবা মা কেউ কাগজের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন না। আমার ভয় লাগছে।"

করবী দেবী বললেন, "ভয়ের কিছুই নেই। আমি তো থাকবো।"

মিস্টার বোসকে করবী কিন্তু দু''নম্বর সাইটে আসবার অনুমতি দেননি। যে কয়েকজন লোক সোজা দু''নম্বর সাইটে এসে ঢুকতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। লাউঞ্জের এক কোণে মিস্টার বোসের সঙ্গে ওঁরা দু'জন সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমাকে ডেকে করবী বলেছিলেন, "প্লিজ, আমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন না।"

চায়ের অর্ডার দিয়ে আমি কাউন্টারে ফিরে আসতে আসতে শুনেছিলাম, করবী বলছেন, "মিস্টার পাকড়াশী নতুন ইণ্ডাস্ট্রিতে আসছেন। বাংলা দেশকে তিনি ভালবাসেন। এই ভারত-জার্মান শিল্পসহযোগিতার উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।"

অনিন্দ্য বললেন, "আপনারা যদি এই অতিথিদের সম্বন্ধে ভাল করে লেখেন, আমাদের সুবিধা হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের এই কারখানা চালু হলে আমরা অনেক বেকার যুবককে চাকরি দিতে পারবো—সেই সব বেকার যুবক, যাদের দুঃখের কথা আপনারা কাগজে লিখে থাকেন।"

যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিস্টার বোস সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। পরের দিন তিনি সত্যিই তাঁর কথামতো কাজ করেছিলেন। কলকাতার অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের মুখপাত্র শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশীর সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের দীর্ঘ বিবরণ ডবল কলম শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই কাগজ হাতে অনিন্দ্য প্রায় লাফাতে লাফাতে শাজাহান হোটেলে এসে হাজির হয়েছিলেন। করবীকে উচ্ছসিতভাবে বলেছিলেন, "বাবা এবং মা দু'জনেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। এঁরা ভাবছেন, খোকা কী করে এমন পাবলিসিটি করলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি এখানে। কেন জানেন? যে মহিলার দূরদর্শিতায় এই প্রচার সম্ভব হয়েছে, তাঁকে—"

"আপনার ধন্যবাদ জানাতে, তাই তো?" করবী অনিন্দ্যর মুখ থেকে কথাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই শেষ করে দিলেন।

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "আমাকে এতোই অন্তঃসারশূন্য ভাবছেন কেন? অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছে আমাদের হয় না?"

করবী চুপ করে গেলেন। অনিন্দ্য জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার অতিথিরা নিশ্চয় আপনাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে!"

"মোটেই নয়। আমাকে যে সব দেশী ভি-আই-পিদের সেবা করতে হয়, সে তুলনায় এ'রা ডেমি-গড। বার-এ গিয়ে ড্রিঙ্ক করেন, ক্যাবারে নাচ দেখেন, তারপর নিজেরাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েন। নিজের খেয়ালে নিজেরা থাকেন, আমাকে বড় একটা জ্বালাতন করেন না।"

অনিন্দ্য বললেন, "এখন তাঁদের দেখছি না কেন?"

"হল-এ ব্রেকফাস্ট করছেন।" করবী বললেন।

অনিন্দ্য খুশী মেজাজে বললেন, "যাক, আমি আর চিন্তা করি না। এ ক'দিন সব সময় এদের কথাই ভাবতে হচ্ছিল। আজ থেকে নরম্যাল হয়ে যাবার চেষ্টা, করবো। তারপর যেদিন ওঁরা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট সই করবেন, সেদিন থেকে আমি তো মুক্তবিহঙ্গ।"

সারা দিনের কাজ শেষ করে সবেমাত্র নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা মেরে করবী যে আমার ঘরে ঢুকবেন, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

করবী আমার ঘরের চেয়ারে এসে বসলেন। দেখলাম দু'শ্চিন্তায় তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। "কী ব্যাপার?" আমি প্রশ্ন করলাম। "আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।"

করবী তখনও হাঁপাচ্ছেন। "না, নিজেই চলে এলাম। আমার ঘরে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলা চলতো না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কী করা উচিত বলুন তো?"

করবীর দেহ কাঁপছে মনে হলো। কোনোরকমে বললেন, "সেদিন বুঝতে পারিনি। সন্দেহ হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম, মিস্টার পাকড়াশীর জন্যে মিস্টার আগরওয়ালা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।"

করবীর কাছেই শুনলাম, দু' নম্বর স্যুইটের মালিক মিস্টার আগরওয়ালা তাঁকে ফোনে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, "খুবই গোপন—টপ সিক্রেট। রাইটার এবং কুর্টের উপর একটু নজর রাখতে হবে। এঁদের মনের অবস্থা কেমন বুঝেছো?"

করবী বলেছিলেন, "বিজনেস ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গে কথা বলিনি।"

“বলতে হবে; না-হলে সুন্দরী হোস্টেস রেখে আমার কী লাভ হলো?” আগরওয়ালা উত্তর দিয়েছিলেন।

করবী তখনও ভেবেছিলেন, মাধব পাকড়াশীর জন্যেই মিস্টার আগরওয়ালা খোঁজখবর নিচ্ছেন। ফোন নামিয়ে রাখবার আগে আগরওয়ালা বলেছিলেন, “এ‘দের সেবা-যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়, এদের খুশী থাকার উপর ভবিষ্যতে অনেক কিছু নির্ভর করবে।”

করবীর কথার তখনও কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। করবী বললেন, “এই মাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আগরওয়ালা এ‘দের সঙ্গে আলাদা দেখা করবার মতলব ভাঁজছেন। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ভিতরের খবরাখবর জেনে নিয়ে উনি এখন নিজেই আসরে নামতে চান। পাকড়াশীর পরিবর্তে আগরওয়ালার সঙ্গে কারখানা তৈরি করলে জার্মানদের ক্ষতি কী? সবার অলক্ষ্যে আগরওয়ালার আসবার ইচ্ছে। যখন পাকড়াশীদের কেউ থাকবে না, তখন গোপনে এ‘দের সঙ্গে দেখা করে নিজের কাজ হাসিল করতে পারলে ভাল হয়। আমাকে কয়েকবার ফোন করে আগরওয়ালা জানতে চেয়েছিলেন অনিন্দ্য কতক্ষণ হোটেলে থাকে। গত কালও ফোন করেছিলেন আজকের প্রোগ্রাম জানবার জন্যে। আমি মিথ্যে করে বলেছিলাম, যতদূর জানি রাত্রে অনেকক্ষণ থাকবেন। কিন্তু বোধহয় ধরা পড়ে গিয়েছি। মিস্টার আগরওয়ালাকে গোপন খবরাখবর দেবার জন্যে কে একজন মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি আছেন; তিনি বলেছেন, অনিন্দ্য যাতে সন্ধ্যেয় হোটেলে না যায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। মিস্টার আগরওয়ালা বলেছেন, সেজন্যে যা খরচ হয় তা তিনি দেবেন। বাগানবাড়ি, মদ এবং অন্য কিছুর জন্যে মিস্টার চ্যাটার্জি যেন কার্পণ্য না করেন।”

“কী নাম বললেন, ফোকলা চ্যাটার্জি?” আমি প্রশ্ন করলাম। “হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।” করবী দেবী বললেন। “এখন কী করি বলুন তো? এমন অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। এতোদিন ভাবতাম যাঁর চাকরি করি, আমি তাঁর। অনিন্দ্যবাবর দেওয়া কবিতার বইগুলো পড়ে মনে হচ্ছে আমারও নিজের সত্তা আছে। আমার সব কাজের জন্যে অন্তরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।” এতোগুলো কথা গুছিয়ে বলতে গিয়ে করবী

হাঁপাতে লাগলেন। বললেন, "আমার সাহস হচ্ছে না। আপনি একবার ওঁকে ফোন করবেন?"

বললাম, "আমি ফোন ধরে দিতে পারি, কিন্তু আপনাকেই কথা বলতে হবে।" ফোনে আর একটু দেরি হলে অনিন্দ্যকে আর পাওয়া যেতো না। অনিন্দ্য বললেন, "ব্যাপার কী?" বললাম, "এখানে মিস গুহের সঙ্গে কথা বলুন।"

করবীকে অনিন্দ্য বললেন, "আজ আর হোটেলে আসছি না। তার বদলে মামার সঙ্গে বেরবো। মামা বলেছেন, কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। উনি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাবেন। তারপর গঙ্গার ধারে যাবো। মামার হঠাৎ কবিতা শোনবার ইচ্ছে হয়েছে। আমি পড়ে যাবো, মামা শুনবেন। মামা যা কাঠখোট্টা মানুষ—এমন সুযোগ আর কখনও না আসতে পারে।"

করবীর ঠোঁট কাঁপছে। বললেন, "ও-সব অন্য একদিন হবে। আজ আপনি এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চলে আসুন।"

"কী বলছেন আপনি?"

"আপনাকে আমার এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে।" করবী এবার টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত দেহ ম্যালেরিয়া রোগীর মতো ঠকঠক করে কাঁপছে।

করবী আর কালবিলম্ব না করে নীচে নেমে গেলেন। আমিও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। কাউন্টারে গিয়ে উইলিয়মের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলাম। উইলিয়ম এখন আমার উপর সদয়— আমাকে সে খুশী করতে চায়। যদি আবার কোনোদিন ডিনারে শ্রীমতী রোজীর সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা থাকে, তখন কে তার বদলে ডিউটি দেবে?

আমাদের সামনেই যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে তা বুঝতে পারিনি। কারণ অনিন্দ্য এবং মিস্টার আগরওয়ালা প্রায় একই সঙ্গে হোটেলের মধ্যে এসে ঢুকলেন। বেশ খুশি মনে আগরওয়ালা হোটেলে আসছিলেন, কিন্তু অনিন্দ্যকে দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। নাভির তলায় ঝুলেপড়া প্যান্টটাকে কোমরের উপর তুলতে তুলতে আগরওয়ালা প্রশ্ন করলেন, "আপনি?"

অনিন্দ্যও একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, “অতিথিদের খোঁজখবর করতে।” আগরওয়ালা ঢোক গিলে বললেন, “কিচ্ছু, প্রয়োজন ছিল না। আপনাদের আশীর্বাদে আগরওয়ালার গেস্টরুমে কোনো অতিথিরই কষ্ট হয় না। মিস গুহকে এতনা রুপিয়া তলব আমি কি বাজে বাজে দিচ্ছি?”

অনিন্দ্য বললেন, “আপনাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো। কলকাতার কোনো হোটেলে ভাল সাইট খালি ছিল না। অর্ডিনারী রুমে তো এ'দের রাখা যেতো না। বাবা নিজেই আপনাকে ফোন করে কথা বলবেন।”

আগরওয়ালা যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, “আরে, কী যে বোলেন। বিজনেসে হামরা যদি এক কোনসার্ন আর এক কোনসার্নকে না দেখি, তাহলে চলবে কী করে? আপনার ফাদার হচ্ছেন আমাদের ওল্ড ফ্রেন্ড।”

অনিন্দ্য এবার আগরওয়ালার আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অবলীলাক্রমে আগরওয়ালা বললেন, “হামি এক বন্ধুর খোঁজে এসেছি। তার বার-এ বসে থাকবার কথা। তাকে নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাবো। আপনার অতিথিদের কোনো ডিফিকাল্টি হলে হামাকে জরুর জানাবেন।”

অনিন্দ্য আর সময় নষ্ট না করে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আগরওয়ালা সোজা লাউঞ্জের টেলিফোন বুথে ঢুকে কারুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর কাউন্টারে এসে বললেন, “আমি মিস্টার আগরওয়ালা আছি।” তারপর নিবেদন করলেন, মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি যদি তাঁর সন্ধানে এখানে আসেন, তাহলে বলে দেবেন, মিস্টার আগরওয়ালা মিসেস চাকলাদারের ওখানে চলে গিয়েছেন।

মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ পরেই শাজাহান হোটেলে এসে হাজির হয়েছিলেন। কাউন্টারে এসেই বললেন, “স্যাটা! আর পারা যায় না। এই বৃদ্ধ বয়সে একটা দশটা-পাঁচটার চাকরি পেলে বেচে যেতাম।”

বোসদা বললেন "ব্যাপার কি মিস্টার চ্যাটার্জি?”

ফোকলা বললেন, “সে সব পরে বলছি। এখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটু মাল আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন?”

বোসদা বললেন, “কেন লজ্জা দিচ্ছেন? জানেনই তো অধমদের হাত-পা বাঁধা, লাউঞ্জে ড্রিঙ্ক সার্ভ করবার হুকুম নেই।”

“এ-শ্লা গভরমেন্ট কবে যে ডকে উঠবে! এই শ্লাদের জন্যেই কি আমরা স্বদেশী করেছিলাম। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, মাস্টারদা কি এদের জন্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন?” ফোকলা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন। বোসদা ঈষৎ হেসে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, “শ্লা মাল বিক্রি হচ্ছে তাতে দোষ নেই, কিন্তু খোলা জায়গায় খাওয়া চলবে না, শিবঠাকুরের দেশে এ কী আইন রে বাপ। আপনাদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। ভদ্দরলোকের ছেলে, এ-লাইনে এসেছেন, অথচ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই শুনে রাখুন, ব্যাটাচ্ছেলেরা কোনদিন বললো বলে যে, ল্যাভেটরি ছাড়া অন্য কোথাও ড্রিঙ্ক করা চলবে না।”

বোসদা বললেন, “আপনাদের সঙ্গে অনেকের তো জানাশোনা আছে, তাদের প্রতিবাদ করতে বলুন না।”

ফোকলা বললেন, “তাহলেই হয়েছে। সব ব্যাটা মালের সাপোর্টে লুকিয়ে গজগজ করে, কিন্তু পাবলিকলি একটা কথা বলবে না। রাস্তায় সব ব্যাটা ঘোমটা দিয়ে ভাটপাড়ার বিধবা সাজবে। এ-ব্যাটারা এমন, যদি গভরমেন্ট কাল হুকুম দেয় তো এরা ল্যাভেটরিতে বসে বসেও ড্রিঙ্ক করে চলে যাবে, তবু একটি রা কাটবে না। একটি লোক পারতো, সে আমার দিদি, মাধব পাকড়াশীর ওয়াইফ। কিন্তু দিদি আমার একদম সেকেলে। ড্রিঙ্ক জিনিসটা মোটেই দেখতে পারে না।”

বোসদা বললেন, “তাই বুঝি?”

ফোকলা বললেন, “দিনরাত শুধু মহিলা সমিতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি, আর না হয় পুজো নিয়ে পড়ে রয়েছেন। দিদি যদি একবার বলতো, লুকিয়ে মদ খাওয়ার থেকে খোলাখুলি মদ খাওয়া ভাল, তা হলে হয়তো গভরমেন্ট একটু কান দিতো।”

স্যাটা বোস বললেন, “আপনার কষ্ট হচ্ছে, বার-এ চলে যান।” ফোকলা বললেন, “উপায় নেই, মশায়। এক ভদ্রলোকের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।”

আমি বললাম, "আপনি কি মিস্টার আগরওয়ালার কথা বলছেন? তিনি আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গিয়েছেন।" ফোকলা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁর জন্যেই অপেক্ষা করছি। ফোন করেছিলেন আমাকে, অথচ আমি ছিলাম না। বলেছেন, এখনই যেন শাজাহান হোটেলে চলে আসি।" সত্যসুন্দরদা বললেন, “মিস্টার আগরওয়ালা মিসেস চাকলাদার-এর ওখানে গিয়েছেন।”

“মিসেস চাকলাদার!” ফোকলা হা হা করে হাসতে লাগলেন। “কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই, মশায়। এই শর্মা, দিস ফোকলা চ্যাটার্জিই আপনাদের আগরওয়ালাকে মিসেস চাকলাদারের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। মশাই, গেরুস্ত বাড়ি, শান্তিতে একটু ড্রিঙ্ক করবার সুযোগ ছিল। আমাদের মতো মাতালদের শান্তিনিকেতন। রেট একটু বেশী। ড্রাই ডে-তে মিনিমাম অ্যাডমিশন চার্জ কুড়ি টাকা। তা এরা লেবু কচলিয়ে কচলিয়ে তিতো করে দেবে। আগরওয়ালারা অন্য দিনেও গেস্ট নিয়ে যেতে শুরু করেছে। দু'নিয়ার যত কন্ট্রাক্ট, যত লাইসেন্স, সব একজন চাইলে চলবে কি করে? রোজ রোজ যাচ্ছে, কোনদিন কাগজের লোকদের নজরে পড়ে যাবে। মধুচক্র ফাঁস হয়ে যাবে।” ফোকলা চ্যাটার্জি ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, “চিরকাল শুধু পরের বোঝা বয়ে বেড়ালাম। আমার থ্রু দিয়ে এন্টারটেন করিয়ে কলকাতার কত ব্যাটাচ্ছেলে বিজনেসে লাল হয়ে গেলো। আমার মশাই লাভের মধ্যে হয়েছে খারাপ লিভার। ফ্রি মাল গিলেছি, আর মাঝে মাঝে দু''চারশ টাকা পেয়েছি। ক্যাপিটাল নেই যে। থাকলে দেখিয়ে দিতাম। অ্যাদিনে কত বেকার শিক্ষিত ছেলে ফোকলা গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিজে চাকরি পেয়ে যেতো।”

আমি বললাম, “মিস্টার আগরওয়ালা আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবেন।”

“পেটের ছেলে কিছু পড়ে যাচ্ছে না—একটু দাঁড়াক্, না।” ফোকলা চ্যাটার্জি রেগে গিয়ে বললেন। কপালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন। তারপর নিবেদন করলেন, “কিছু মনে করবেন না, বেঙ্গলী মেয়েগুলো যে গুড ফর নাথিং। মেয়েদের সাহায্য না পেলে কোনো জাত বড় হয় না। আমরা কেন, স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন, নারীজাতিই আমাদের শক্তির উৎস। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা একটুও কষ্ট করবে না। মিস্টার রঙ্গনাথনকে তো মনে আছে। ভদ্দরলোকের হাতে লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট। বেঙ্গল সম্বন্ধে ওঁর বেশ

শ্রদ্ধা ছিল। খুব ইচ্ছে ছিল, কোনো ঘাঙালী মেয়ের সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করেন। সব খরচা দিতে রাজী। তা আপনাকে দুঃখের কথা বলবো কী, কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। হলোও তেমনি, মিসেস কাপুর ওঁর সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করলেন। যে অর্ডারটা আমরা পেতে পারতাম সেটা মিস্টার কাপুর পেয়ে গেলেন। অথচ কাগজ খুলে দেখন, শুধু দুঃখ আর দুঃখ।"

ফোকলা চ্যাটার্জি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাই, ঘুরে আসি।"

যেতে গিয়ে হঠাৎ ফোকলা চ্যাটার্জি ঘুরে দাঁড়ালেন। "অনিন্দ্যকে দেখেছেন?" বোসদা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, "আজ্ঞে, উনি জার্মান অতিথিদের দেখতে এসেছেন।"

"হু"," ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে কেউ কি অনিন্দ্যকে ফোন করেছিল?"

ফোকলা চ্যাটার্জি'র চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে আমার কেমন ভয় হতে লাগলো। ।"

বললাম, "হ্যাঁ, ডক্টর রাইটার ফোন করেছিলেন

"সিওর?" ফোকলা প্রশ্ন করলেন।

"আমার এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করেছিলেন।" আমি উত্তর দিলাম। "আই সী।" ফোকলা উত্তর দিলেন। "আমার যেন মনে হলো কেউ বাঙলায় কথা বলছে।"

আমি উত্তর দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোনোরকমে বললাম, "ঠিকই ধরেছেন। প্রথমে আমি কথা বলেছিলাম। ডক্টর রাইটার আমাকেই সংযোগ করে দিতে বললেন।"

ফোকলা চ্যাটার্জি উত্তর দিলেন, "আচ্ছা।"

ফোকলা চ্যাটার্জি চলে যেতে আমি আশ্বস্ত হলাম। আর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করলেই আমি কী যে বলে ফেলতাম কে জানে।

বোসদা এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মুখের ভাব থেকেই তিনি সব বুঝে নিলেন। তিনি জানেন, ডক্টর রাইটার বিকেল থেকে একবারও কাউন্টারে আসেননি। তবু তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। আমি এবার কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে

পড়লাম। ঠিক সেই সময়েই বোসদা খাতার মধ্যে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "হোটেল জগতের গুরুদেবরা লিখে গিয়েছেন—বৎস, তোমার এবং তোমার অতিথির মধ্যে একটা কাউন্টার রয়েছে, একথা সর্বদা মনে রাখবে। নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতা রাবণের হাতে পড়েছিলেন।"

সেই রাত্রে করবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ফোকলা চ্যাটার্জির কথা তাঁকে বলবো। কিন্তু পারলাম না। দেখলাম, তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়েছি। অনিন্দ্যবাবু চলে গিয়েছেন, এবং ওঁরাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন আগরওয়ালা এলেও আর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।" করবীর কাছেই শুনলাম, অনিন্দ্য এমনভাবে ডেকে পাঠাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। করবী উত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলেন, "আপনাকে প্রয়োজন আছে। এদের দু''জনকে সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।"

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে করবী ঘেমে উঠছিলেন। "আবার আসবেন উনি কাল সকালে। ওঁকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। আমার কেমন ভয় ভয় করছে।"

বোসদার সাবধান-বাণী তখনও আমার কানে বাজছিল। হোটেলে চাকরি করতে এসে, আমি জড়িয়ে পড়তে রাজী নই। তবু আমাদের চোখের সামনে আগরওয়ালা পাকড়াশীদের সর্বনাশ করবেন তা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু কিছুদিন পরে জানতে পেরেছিলাম, পাকড়াশী বাণিজ্য সাম্রাজ্য বাইরে থেকে যতটা মনে হতো ততটা শক্তিশালী ছিল না। এই জার্মান সহযোগিতা না পেলে হয়তো তাঁদের প্রাসাদের ভিত নড়ে উঠতো। করবী তখন আনন্দে চোখের জল ফেলছিলেন। অনিন্দ্য জানে না, কিন্তু তাকে সর্বদা কাছে কাছে রেখে, আগরওয়ালার হাত থেকে তিনি পাকড়াশীদের রক্ষে করতে পেরেছিলেন।

কাগজে সেদিন ছবি বেরিয়েছিল। জার্মান সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন মাধব পাকড়াশী। তাঁর বাঁদিকে শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশীকে দেখা যাচ্ছে।

এই ছবিটার দিকে তাকিয়েই করবী আনন্দের অশ্রু, বিসর্জন করেছিলেন।

এইখানেই শেষ হতে পারতো। শাজাহান হোটেল এবং করবীর জীবন থেকে অনিন্দ্য পাকড়াশী এইখানেই সরে যেতে পারতেন। অন্তত সেইটাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু, সবার অলক্ষ্যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এমন ঘটনা ঘটবে তা কারুর হিসাবের মধ্যে ছিল না।

আমি কেবল অনিন্দ্যর ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলাম। করবীর সজাগ দৃষ্টির বাইরে থাকলে, মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের পরিবর্তে যাঁর ছবি কাগজে বের হতো তাঁর নাম মিস্টার আগরওয়ালা। কিন্তু কই, অনিন্দ্য তো একবারও মনের সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেলেন না? আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, করবীও সে জন্যে একটুও দুঃখিত হলেন না। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন, অন্তত আমার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু কই?

আসলে তখনও আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝলাম, যেদিন সন্ধ্যের একটু পরেই কালো চশমায় চোখ দু'টো ঢেকে, সিল্কের শাড়ি পরে এবং সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে মিসেস পাকড়াশী হোটেলে এসে ঢুকলেন। অনেকদিন তাঁকে হোটেলে আসতে দেখিনি। হয়তো জার্মান অতিথিদের উপস্থিতির জন্যই তাঁর আসা সম্ভব হয়নি। এখন তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। পুত্র অনিন্দ্যকে নিয়ে মাধব পাকড়াশী হয়তো বোম্বাই কিংবা দিল্লীতে রওনা হয়েছেন। আর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এক নম্বর সাইটও খালি রয়েছে।

মিসেস পাকড়াশী কাউন্টারে আমাকে দেখে বোধহয় একটু হতাশ হলেন। বললেন, "মিস্টার বোস কোথায়?"

"ওঁর ডিউটি শেষ হয়েছে। এখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোনো কাজ হয়।"

মিসেস পাকড়াশী বললেন, "ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।"

বোসদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বোসদা বললেন, "কখন ঘর চান জেনে নিলেই পারতে। আমাকে আবার তোলা কেন?" বললাম, "আপনার কাস্টমার। আমাদের সঙ্গে লেনদেন করতে চান না।"

বোসদাকে দেখেই মিসেস পাকড়াশী কাউন্টার থেকে এগিয়ে এলেন। একট দূরে দাঁড়িয়ে ওঁরা দু''জনে কীসব কথাবার্তা বললেন। তারপর কাউন্টারে ফিরে এসেই আমাকে

বললেন, "এক নম্বর স্যুইটের চাবিটা দাও তো।" চাবি হাতে করে ওরা দু'জনেই উপরে উঠে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, অথচ ওঁদের দু'জনের কাররই দেখা নেই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে আহত সর্পিণীর মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে মিসেস পাকড়াশী হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। উনি চলে যেতেই বেয়ারার হাতে স্লিপ দিয়ে বোসদা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

বোসদা বললেন, "বোসো।" আমি বসলাম। বললাম, "মিসেস পাকড়াশীর জন্যে কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা করতে হবে?"

"না, ও-সবের কিছুই করতে হবে না," বোসদা চিন্তিত হয়ে বললেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী? তুমি নিশ্চয়ই জানো। অথচ আমাকে বলোনি।" আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা বললেন, "করবী এবং অনিন্দ্যর কথা জিজ্ঞাসা করছি। এরা এতোদদূর এগোবার সময় পেলো কখন?"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি নিশ্চয়ই সব দেখেছো, সুতরাং তোমার কাছে চেপে রেখে লাভ নেই, অনিন্দ্য করবীকে বিয়ে করতে চায়। শাজাহান হোটেলের দু''নম্বর স্যুইটের হোস্টেসের জন্যে মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রিন্স-অফ-ওয়েলস পাগল হয়ে উঠেছে।"

কেন জানি না, প্রথমেই আমার মনের মধ্যে আনন্দের শব্দহীন উল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনিন্দ্য এবং করবী! মন্দ কী? সংসারের সব উত্তাপ থেকে করবী নিশ্চয় অনিন্দ্যকে রক্ষা করবেন। আর অনিন্দ্য যদি করবীর শুষ্ক মনের মরুভূমিতে জল সিঞ্চন করে ফসল ফলাতে পারে, তা হলে আমাদের পরিচিত পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

বোসদা বললেন, "বিপদ হলো আমাদের। এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি। মিসেস পাকড়াশীর ধারণা অনিন্দ্যকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে করবী। তার ছেলেমানুষি, তার সরল নিষ্পাপ মনের সুযোগ নিয়ে হয়তো মুহূর্তের কোনো অধঃপতন ঘটিয়েছে এবং এবার সে তা চড়া দামে ভাঙাতে চাইছে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এর মধ্যে আমরা আসছি কী করে?"

“মিসেস পাকড়াশী আমাদের স্নেহ করেন। যে কারণেই হোক এই হোটেলের উপর তাঁর দূর্বলতা আছে। তাছাড়া এখন বিপদে পড়ে এসেছেন। বিপদে পড়লে পরম শত্রুকেও সাহায্য করতে হয়।”

"সাহায্য?" আমি বোসদাকে প্রশ্ন করলাম।

“উনি অননুরোধ করছিলেন, আমরা যদি কেউ করবীর সঙ্গে কথা বলি। আমি বলেছি, সেটা মোটেই শোভন নয়, সম্ভবও নয়। উনি এখন নিজেই করবীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।”

আমি চুপ করে রইলাম। বোসদা বললেন, “আমি বলে ফেলেছি। এই হোটেলে একমাত্র তোমার সঙ্গেই করবী কথাবার্তা বলেন।”

“কেন, ন্যাটাহারিবাবু তো রয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ লোক।” আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না। “পাগল হয়েছো?” বোসদা বললেন। “ব্যাপারটা তুমি, আমি, মিসেস পাকড়াশী এবং করবী ছাড়া পৃথিবীর আর, কেউ যেন না জানতে পারে।”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজী হতে হয়েছিল। করবী তখন দু”নম্বর সাইটে একলা চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর একখানা কবিতার বই পড়ে ছিল। পাখির নীড়ের মতো চোখদু’টি তুলে ‘বনলতা সেন-ভঙ্গিতে’ করবী প্রশ্ন করলেন, “এতোদিন কোথায় ছিলেন?”

হেসে বললাম, “কোথায় আর থাকবো? শাজাহানের একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত ওঠা-নামা করছি।”

করবী বললেন, “আমি অনেকদিন পরে একটু শান্তিতে রয়েছি। আমার এখন একজনও অতিথি নেই। পাকড়াশীদের কুপোকাৎ করতে না পেরে, মনের দুঃখে আগরওয়ালাও এ-দিক মাড়াচ্ছেন না। 'ফোন করেছিলাম। শুনলাম, ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবিটিস একই সঙ্গে আক্রমণ করেছে। সুতরাং এখন কয়েকদিন আমি চুপচাপ বসে বসে পরম আনন্দে কবিতা পড়বো, গান গাইবো, বাইরে বেড়াতে যাবো, যা খুশী তাই করবো।”

এবার আমাকে নিজের কথায় আসতে হলো। "আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করবো।”

“প্রস্তাব?” করবী দেবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

“হ্যাঁ কিংবা না করবার স্বাধীনতা আপনার। কিন্তু একটা শর্ত আছে। বিষয়টা কাউকে, এমনকি অনিন্দ্যবাবুকেও বলতে পারবেন না।”

অনিন্দ্যর নাম শুনেই করবীর মুখে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। কোনোরকমে বললেন, “আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, তবে আমি দিব্যি করছি তোমার শর্ত পালন করবো।”

“আমিও তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু মিসেস পাকড়াশী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।”

মিসেস পাকড়াশী বলেছিলেন, শাজাহান হোটেলে নয়। অন্য কোথাও এঁরা দু”জনে সাক্ষাৎ করবেন। করবী রাজী হননি। হোটেলের বাইরে যেতে তিনি অভ্যস্ত নন, একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনে মিসেস পাকড়াশী টেলিফোনেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন। “আই সী! এখন আমার বিপদ, তিনি যা বলবেন তাই শুনতে আমি বাধ্য। কিন্তু ব্যাপারটা সে গোপন রাখবে তো?”

“আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে তো?” করবীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

“আমরা প্রখ্যাত হোটেলের কুখ্যাত হোস্টেস। মারোয়াড়ীর চাকরি করে মা-ভাইবোনদের প্রতিপালন করি, আমাদের কথার কীই-বা মূল্য থাকতে পারে।” করবী দেবী দুঃখিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশীর হোটেলে আসবার সেই দিনটি স্মৃতির পর্দায় আবার যেন দেখতে পাচ্ছি। যে-করবী কত স্বনামধন্যকে অবলীলাক্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে অপরের ভবিষ্যত উজ্জ্জ্বল করেছেন, তিনি সেদিন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, “আমার ভাল লাগছে না। কথাবার্তার সময় আপনি থাকবেন।”

“তা কখনও হয়?” আমি বললাম। “বরং আমি বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।”

নিজের গাড়িতে নয়, একটা ট্যাক্সিতে চড়ে মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শাজাহান হোটেলে হাজির হয়েছিলেন। ঢোকবার মুখেই, রিপোর্টার মিস্টার বোসের সঙ্গে যে ওঁর দেখা হয়ে যাবে তা তিনি আশা করেননি। মিস্টার বোস বললেন, “কী ব্যাপার? পি টি আই-এর খবরে দেখলাম প্যারিসের সমাজসেবা সেমিনারে যাবার কর্মসূচী আপনি শেষ মূহূর্তে পরিবর্তন করলেন?”

মিসেস পাকড়াশী মৃদু' হাস্য করে উদাসভাবে বললেন, “চিন্তা করবেন না মিস্টার বোস। বোম্বাই-এর মিসেস লক্ষ্মীবতী প্যাটেল আমার অনুরোধে শেষ মূহূর্তে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে রাজী হয়েছেন।”

মিস্টার বোস বললেন, “সে তো অন্য কথা। ক্যালকাটার যে-গৌরব আপনি প্যারিসে গিয়ে বাড়িয়ে দিতেন, তার তো কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না।”

মিসেস পাকড়াশী বললেন, “আপনাদের প্রীতি এবং ভালবাসার জোরেই তো এতোদিন দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রার্থনা করুন, আমার শরীরটা যেন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে।”

রিপোর্টারকে বিদায় করে, চিন্তিত মুখে মিসেস পাকড়াশী আমাকে প্রশ্ন করলেন, “দু''নম্বর স্যুইটের অসভ্য মেয়েটি আছে তো?”

মাত্র দশ মিনিট কিংবা বোধহয় তাও নয়। দু'নম্বর স্যুইটের দরজা খুলে মিসেস পাকড়াশী আবার বেরিয়ে এলেন। সত্যসুন্দরদা তাঁকে হোটেলের বাইরে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে বোসদা বললেন, “করবীকে বোলো, মিসেস পাকড়াশীর কথা না শুনলে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে। ভদ্রমহিলা আমাকে জানিয়ে দিতে বললেন।”

করবী আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এই বিশাল জগতে করবী একা, আপনজন বলতে তাঁর কেউ নেই। পুরুষের একাকিত্ব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই বিদেশী পরিবেশে করবীর অবস্থা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে উঠলো। বেশ তো ছিলেন, কেন

শুধু শুধু এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়লেন? আর উপদেশ নেবার লোক পেলেন না তিনি? শাজাহান হোটেলের কনিষ্ঠতম কেরানী জীবনের বৃহত্তম সমস্যায় করবীকে কি পরামর্শ দেবে?

করবী আমার দিকে একবার তাকালেন, তারপর আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। ফু'পিয়ে কেঁদে উঠলেন, "এ আমার কী হলো?"

কোনো অনুরাগ জর্জরিতা আত্মীয়বন্ধু-বিহীনা মহিলার নিরাশ হৃদয়ের কান্না কখনও শুনেছেন কী? দুঃখ জর্জরিত আমাদের এই সংসারে এমন কিছু দু'র্লভ দৃশ্য নয় সেটি। আমি অনেকবার শুনেছি, এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি, তারা সম্পূর্ণ এক। দীর্ঘশ্বাস এবং অভিযোগ মেশানো সেই কান্নার বর্ণনা দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র কোনো বেঠোফেন, মোৎসার্ট বা ভাগনার সুরের মূর্ছনায় তার রূপ দিতে পারতেন; কোনো শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা ডিকেন্স হয়তো কানে শুনলে কলমে তার বর্ণনা দিতে পারতেন। সে আমার সাধ্যের অতীত।

শাজাহান হোটেলের দু'নম্বর স্যুইটের দেওয়ালের ইঁটগুলো যেন সভয়ে প্রতিধ্বনি তুললো, এ আমার কী হলো?

কী হলো? তুমি ভালবেসেছিলে, সবার অগোচরে তুমি এক সুদর্শন নির্মলপ্রাণ যুবককে তোমার মন দিয়েছিলে। তুমি আন্দাজ করেছিলে সেও হয়তো তোমার প্রতি সামান্য অনুরক্ত, অন্তত তার মনের কোথাও তোমার জন্যে সামান্য কোমল স্থান আছে। কিন্তু কেবল সেই পর্যন্ত। তারপর? তারপর যে এতোদূর এগিয়েছে, তা তো জানা ছিল না। অনিন্দ্য যে বাড়িতে বলেছে সে এগিয়ে যেতে মনস্থির করেছে, তা তো সে নিজেও বলেনি। মিসেস পাকড়াশীই অজান্তে করবী গুহ কে সেই পরম আশ্চর্য, পরম প্রিয়, পরম মধুর সংবাদটি দিয়ে গেলেন!

"সাবধান। পাকড়াশী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সামান্যতম ক্ষতিও আমি সহ্য করবো না। অনিন্দ্যর বয়স কম, সে বোঝে না। ছিঃ, তাই বলে তুমি! তুমি না মেয়েমানুষ? তোমার অন্তর বলে কোনো জিনিস নেই?" মিসেস পাকড়াশী প্রশ্ন করেছিলেন।

মিসেস পাকড়াশী বলেছিলেন, "কেন যে জার্মানদের এখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন কত টাকা হলে ছাড়বে বলো?"

করবী গুহ ফ্যালফ্যাল করে মিসেস পাকড়াশীর দিকে তাকিয়েছিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, "টাকা?" .

"হ্যাঁ হ্যাঁ। যার জন্যে আমার এই অশান্তির সৃষ্টি করেছো। যার জন্যে আমার প্যারিস যাওয়া হলো না।" মিসেস পাকড়াশী উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশী উঠে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, "মনে থাকে যেন তুমি কথা দিয়েছো, অনিন্দ্য এসবের কিছুই জানবে না। আর যেহেতু আমি নিজেই তোমার দরজায় এসেছি, সেই জন্যে টাকার অঙ্কটা বাড়িও না। একটু ভেবে দেখো। আমি আবার খবর নেবো।"

করবী গুহ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনিন্দ্য পাকড়াশী অন্তত তাঁর কথা চিন্তা করেছেন! সব গাম্ভীর্য হারিয়ে ছেলেমানুষের মতো করবী গুহ সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। "কই, আমাকে তো এখনও বলেননি? আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা উচিত ছিল না? আমি যে রাজী হবো, সেকথা তিনি ধরে নিলেন কেমন করে?"

"হয়তো আপনার চোখেই তা ধরা পড়ে গিয়েছিল।" আমি বলেছিলাম।

"ওঁর চোখেও আমি তা দেখেছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি।" করবী তখন কেবল অনিন্দ্যর কথাই ভাবছেন, মিসেস পাকড়াশীর সাবধানবাণী তাঁর মাথাতেই আসছে না।

আমি কোনো উপদেশ দিতে পারিনি। পাকড়াশীদের ক্ষমতার কথা আমার জানা আছে। অনাগত ভবিষ্যতে করবীকে কিসের সঙ্গে যে পরিচিত হতে হবে কে জানে। আমি ঘর থেকে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলাম। গোমেজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে। সেখানে তখন সুরের শিশুরা খেলা শুরু করে দিয়েছে। গোমেজের ঘর থেকে কলহাস্যে বেরিয়ে পড়ে মানব সমুদ্রের উপকূলে তারা যেন ছোটাছ,টি করছে। এমন সময় গোমেজ যে ঘরে শুয়ে থাকতে পারেন আশা করিনি।

আমাকে দেখে বললেন, "শরীরটা অসুস্থ, বাজাতে যেতে পারিনি। প্রায়ই বমি আসছে। তাই শুয়ে শুয়ে মোৎসার্টের ভায়োলিন কনসার্টো শুনছি। প্রকৃত ভায়োলিন

কনসার্টো তিনি মাত্র পাঁচটি রচনা করে গেছেন।” গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে প্রভাতচন্দ্রের দেহ পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। শুয়ে শুয়েই বলতে লাগলেন, “পাঁচটাই সালসবার্গে সৃষ্টি, ১৭৭৫ সালে। পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে যে, একজন ঊনিশ বছরের ছেলে এই ভায়োলিন কনসার্টো রচনা করেছেন?”

আমি বললাম, “আপনি উত্তেজিত হবেন না, একটু বিশ্রাম নিন।” “শোনো,” ফিসফিস করে গোমেজ বললেন। “যদি বসুন্ধরার গোপনতম বেদনাকে আবিষ্কার করতে চাও, তবে কান পেতে মোৎসার্টের ভায়োলিন কনসার্টো শোনো।” রেকর্ডের গান শোনবার সেদিন আমার প্রয়োজন ছিল না। আমি কান পেতে দু''নম্বর সাইটে একটু আগেই হৃদয়ের বেদনাময় কান্না শুনে এসেছি।

ন্যাটাহারিবাবু পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কি ব্যাপার, মশাই? দু’নম্বর স্যুইটের মা জননী আমার আজ আর লিনেন পছন্দ করলেন না, ফলওয়ালাকেও বকুনি দিলেন না।”

বললাম, “জানি না।” ন্যাটাহারিবাবু মাথা নাড়লেন। “উহ, ভাল লাগছে না আমার। শাজাহান হোটেলে এতো বছর কাটিয়ে আমি এখন সব আগে থেকে বুঝতে পারি। বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই।”

ফোকলা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “আগরওয়ালার গেস্ট হাউসের অফিসারটি মেয়েমানুষ না কেউটে সাপ? কাউকে মানে না। খোদ আগরওয়ালার স্লিপ নিয়ে এক ভদ্দরলোকের জন্যে এসেছিলাম। সোজা ভাগিয়ে দিলো। ইণ্ডিয়ান ফার্মদের মশায় এই মুশকিল — ডিসিপ্লিন বলে কিছুই নেই। আমেরিকায়, বিলেতে এমন তো কত গেস্ট হাউস আছে। সেখানকার কোনো কল গার্ল' এমন সাহস করবে?”

সত্যসুন্দরদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কিছু বুঝছো?”

বলেছিলাম, “কেউ বোধহয় কিছু বুঝতে পারছে না।”

করবীও কিছু বুঝতে পারছিলেন না। চুলগুলো আঁচড়াবার সময় পর্যন্ত তিনি পাননি। আমাকে ঘরের মধ্যে পেয়ে করবী ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন “কেউ যদি আমাকে ভালবাসে এবং আমি যদি তাকে ভালবাসি, তাহলে তাকে বিয়ে করবার মধ্যে অন্যায়

কী?" আমি চুপ করে রইলাম। করবী নিজের মনেই বললেন, "কে কি বলবে, তাতে আমাদের কী এসে যায়?" আবার পর মহূর্তেই তিনি স্তিমিত হয়ে এলেন। "লোকে খারাপ বলবে। আগরওয়ালার হোস্টেসকে বিয়ে করেছে পাকড়াশী সাম্রাজ্যের রাজপুত্র।"

একটু ভাবলেন করবী গুহ। "লোকেরা যা খুশি ভাবুক, কি বলেন? আর অনিন্দ্যর মা, তিনি কেন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন? তাঁর ছেলেকে সুখী করবার দায়িত্ব, সে তো আমি নিচ্ছি। চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন," করবী এবার অভিযোগ করলেন। আমার মুখে এখনও কথা নেই। করবী বললেন, "কারুর কথা শুনবো না আমি। আমরা এগিয়ে যাবো।"

এই প্রগলভা করবীর সঙ্গে কি আমার এতোদিনের পরিচয় ছিল ?

আবার দেখা হয়েছে। মিস্টার আগরওয়ালার গেস্ট হাউসে অতিথিদের যাতায়াত বন্ধ। আমাকে দেখেই করবী মৃদু' হাসলেন। "শুনেছেন, মিসেস পাকড়াশী আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আগরওয়ালাকে বলে আমার চাকরি খাবার ব্যবস্থা করাতে পারেন জানিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন।" এবার হাসিতে ভেঙে পড়লেন করবী। বললেন, "আপনিই আমাকে বিপদে ফেলেছেন। না-হলে আমি সব ঠিক করে ফেলতে পারতাম।"

"আমি?"

"হ্যাঁ আপনিই তো আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন অনিন্দ্যকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।"

"দিব্যি ভাঙুন না, আমার কি?"

"তা কখনও হয়? অনিন্দ্যর যে তাতে ক্ষতি হবে।" করবী গম্ভীরভাবে বললেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখতে দেখতে করবী বললেন, "ভয় দেখালেই আমার মাথার ঠিক থাকে না। ছোটোবেলা থেকে কেউ আমাকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারেনি। অনিন্দ্য এসেছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এতো মন খারাপ কেন?" আমি কিছুই বলতে পারলাম না।"

ভয় দেখিয়েছিলেন মিসেস পাকড়াশী, সত্যি কথা। কিন্তু সেই রাতে তাঁকে নিজেই সত্যসুন্দরদার কাছে আসতে হলো। মুখে শুকিয়ে কালি। করবী টেলিফোনে শাসিয়েছে

তার হাতেও জিনিস আছে। তার হাতেও এমন আণবিক বোমা আছে, যা মিসেস পাকড়াশীর সোনার সংসার মুহূর্তে গুড়ো গুড়ো করে দেবে। মিসেস পাকড়াশী আর যেন সেই গরবিনী মহিলা নেই। করবীর আণবিক বোমায় তিনি যেন ইতিমধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। মিসেস পাকড়াশীও সেদিন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। শাজাহান হোটেলের এক নম্বর সাইট ভূত হয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে কেন টেনে এনেছিল। মিসেস পাকড়াশী বলেছিলেন, "কাউকে কোনোদিন আর বিশ্বাস করা চলবে না।"

বোসদা পাথরের মতো নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

সেই রাত্রে করবী গুহ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খুশিতে ঝলমল করছেন তিনি।

মিসেস পাকড়াশী একটু আগেই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন জানি। করবীর হাতে একটা ছবির খাম। নিজেই বললেন, "রাজী হয়েছেন! রাজী না-হয়ে উপায় ছিল না। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, জামাই, সংসার এদের কাছে না হলে মুখ দেখাবেন কি করে? বলেছিলেন, তিনি আর কোনো বাধা দেবেন না। প্রথমে ওঁর একটু সন্দেহ ছিল, ভেবেছিলেন আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। তারপর দেখালাম।" করবী এবার খামটা নাড়ালেন! "আপনাকেও দেখাতে পারবো না। এক নম্বর স্যুইটের ঘরের ভিতরে তোলা ছবির নেগেটিভ।"

"মিসেস পাকড়াশী প্রথমে চমকে উঠলেন। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, তাঁর গোপন অভিসারের অমন সর্বনাশা দলিল কি করে করবীর হাতে এলো।" ভয়ে ভয়ে করবীকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, "ও লর্ড, এ-সব কোথা থেকে এলো?" সোজাসাজি উত্তর না দিয়ে করবী বলেছিলেন, "পাঁচজনের হাতে ঘোরার চেয়ে একজনের কাছে থাকাই কি ভাল নয়?"

আমি বললাম, "সত্যি, কোথা থেকে পেলেন? বন্ধ ঘরের ভিতরকার এমন ছবি যে কেউ তুলে রাখতে পারে তা আমার জানা ছিল না।"

করবী বললেন, "এই হোটেলেরই কেউ আমাকে দিয়েছে। না-হলে পেলাম কেমন করে? মিসেস পাকড়াশী আমাকে ভালবাসেন না বলে কেউ কি আমার জন্যে চিন্তা করে

না?” করবী এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন। “রাজী হয়েছেন। ভুলেও তিনি আর আমার পথে বাধা দেবেন না।”

“এবার কী বলুন তো?” করবী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

অনভিজ্ঞের মতো আমি বলেছিলাম, “এবার শাজাহান হোটেল ছেড়ে নিউ আলিপুর।”

করবী আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন। আপনি থেকে হঠাৎ তুমি হয়ে গেলাম। “আমাকে তোমরা একেবারে ভুলে যাবে। তোমরা কোনোদিন তো আমাকে শাজাহান হোটেলের সহকর্মী বলে মনে করোনি।”

“আপনি নিজেই ভুলে যাবেন। ডিনার বা ব্যাংকোয়েটে কোনোদিন শাজাহান হোটেলে এলেও আপনি একবারও কাউন্টারের দিকে তাকাবেন না, বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সোজা হল-এ চলে যাবেন। আমরা কিন্তু তখনও রসিদ কাটবো, বিল তৈরি করবো, খাতায় লেখালেখি করবো, টেলিফোন ধরবো, স্টুয়ার্ডের বকুনি খাবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারও ভেরিকোজ ভেনগুলো হয়তো ফুলে উঠবে।”

“তোমার এ-চাকরি ভাল লাগে না?” করবী বলেছিলেন।

“মোটেই না। একটা দশটা-পাঁচটার চাকরি কোথাও করে দেবেন তো? তখন কত বড় বড় চাকরি তো আপনার হাতে থাকবে।”

“সব দেবো। আমার জন্যে এতো করেছো তুমি, আর এইটুকু করবো না।” আমি বলেছিলাম, “গুড নাইট।”

করবী বলেছিলেন, “গুড নাইট।”

ফিরে এসে বিছানায় শয়ে সামান্য কিছুক্ষণ হয়তো ঘুমিয়েছিলাম। রাত্রি অনেক হয়েছে। হঠাৎ গুড়বেড়িয়া দরজায় ধাক্কা দিলে। দু’নম্বর স্যুইটের মেমসায়েব আমাকে ডাকছেন।

চোখে একটু জল দিয়ে আবার নেমে গেলাম। দেখলাম, করবী যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

নিজের মাথাটা চেপে ধরে করবী গুহ বললেন, “একি করলাম আমি। আমাকে বাঁচাও ভাই।” হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো করবীর চোখ দু'টো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।.

শান্ত করবার চেষ্টা করে বললাম, “ছিঃ, এমন করতে নেই। কী হয়েছে বলন? একটু আগেও তো আপনাকে দেখে গেলাম। তখন তো কিছুই বললেন না।”

ভয়ার্ত শিশুর মতো করবী বললেন, “ভেবেছিলাম, কাউকে বলবো না, যে যাই বলক, অনিন্দ্যকে আমি ছাড়তে পারবো না। জীবনে কিছুই তো পাইনি; একজন যদি আমাকে ভালবাসা দেয়, কেন আমি নেবো না?”

করবী এবার একটু থামলেন। তারপর বললেন, “মিসেস পাকড়াশীর অতো চিতা কেন? আমি কি ওঁর ছেলেকে যত্ন করবো না, না তাঁকে ভালবাসবো না?” আমাকে সামনে রেখে কোনো অদৃশ্য আদালতে করবী যেন সওয়াল করলেন। করবীকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললাম, “হঠাৎ এই কথা ভাবছেন কেন?”

“ভাববো না! অনিন্দ্যর মা যখন আমার ঘর থেকে শুকনো মুখে চলে গেলেন, তখন আপনি তাঁকে দেখেননি, তেজপাতার মতো তাঁর দেহটা কাঁপছে। আমি বলেছিলাম, আপনি আর কোনো বাধা দেবেন না তো? উনি বলেছিলেন, না। আরও বলেছিলেন, হয়তো খোকার চেয়ে তোমার বয়স একটু বেশী। তবু কিছু বলবো না। তারপর ফু'পিয়ে কেদে উঠেছিলেন তিনি। মিনতি জানিয়ে বলেছিলেন, আমার ছবির নেগেটিভটা বিয়ের আগে ছিড়ে ফেলবে তো? আমার হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, কাউকে বলবে না তো?

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। করবী দেবী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, “এমনভাবে বিয়ে করবার কথা তো ছিল না। শাশুড়ীকে ভয় দেখিয়ে, তাঁর দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনিন্দ্যর মতো ছেলের গলায় মালা দেবার কথা তো ছিল না।”

করবী এবার থামে মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন ছবি আছে কি না। তারপর কী ভেবে আমার সামনেই সমস্ত খামটা কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেললেন। তারপর অকস্মাৎ নিজের সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, “অসম্ভব। আমার শ্বশর, আমার শাশুড়ী, তাঁরা গর্জন। এমন ভাবে, নোংরা পথে আমি অনিন্দ্যর বাড়িতে উঠতে পারবো না। আমার পাপ হবে, অনিন্দ্যর অমঙ্গল হবে।”

চোখের জল মুছে করবী এবার সহজ হবার চেষ্টা করলেন। বললেন, “মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এখানে আমার কেউ যে আপনজন নেই। তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।”

ঘৃণা ও গ্লানি করবীর মনে কোন সর্বনাশা চিন্তার জন্ম দিয়েছে তখনও বুঝতে পারিনি। পরের দিন একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল আমার। তখন হোটেলে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। দু'নম্বর সাইটে করবীর প্রাণহীন দেহ তখন পুলিস দরজা ভেঙে উদ্ধার করেছে।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, “মা জননী আমার এক শিশি ঘুমের ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছে।”

করবীর মৃতদেহ যখন হোটেল থেকে বার করে মর্গে পাঠানো হয়েছিল, তখনও আমি যাইনি।

ন্যাটাহারিবাবু ফিরে এসে বললেন, “একবার গুডবাই করে এলেন না? আমি মশাই সবচেয়ে ভাল চাদরটা পুলিসের গাড়িতে দিয়ে দিয়েছি। মা জননী আমার কেন যে হোটেলে এসেছিল! সেই প্রথম যেদিন ওঁকে দেখেছিলাম, সেদিনই আমি সবাইকে বলেছিলাম, এ তো হোটেলের মেয়ে নয়, এ আমার মা জননী। তখন আমার কথায় কান দেওয়া হয়নি। এখন বোঝো।” নিজের মনেই বকবক করতে করতে ন্যাটাহারিবাবু বেরিয়ে গেলেন।

শুনেছি, নিভৃত মধুর ভাবনার অবসরে পুরনো দিনের স্মৃতিরা ভিড় জমায়। একান্তে মধুর ভাবনায় ডুবে থাকার মতো সচ্ছল অবসর আমার নেই, তবুও সময়ে অসময়ে এবং কারণে-অকারণে শাজাহান হোটেলের বেদনাবিধূর স্মৃতির মেঘগুলো আজও আমার হৃদয়ের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। কেন এমন হয়, কেমন করে হয় তা জানি না, জানবার মতো কৌতূহলও আমার নেই। তবে এইটুকু এতোদিনে বুঝেছি যে, শাজাহান হোটেলকে না দেখলে পৃথিবীর পাঠশালায় আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। মানুষের মনের গহনে যে গোপন মানুষটি ঢুকিয়ে রয়েছে তাকে যদি চিনতে হয় তবে পথের ধারে পান্থশালায় নেমে আসতে হবেই।

যেদিন পরম বিস্ময়ে ধর্মাধিকরণের অভাবনীয় রহস্যময় রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলাম, সেদিন অন্ধকার পথের নিশানা দেবার জন্য আমার পাশে এক অভিজ্ঞ জীবনদরদী ছিলেন। সেদিন কোনো কিছুই আমাকে খুঁজে বার করতে হয়নি; যা আমার জানবার প্রয়োজন, যেমনভাবে তা দেখাবার প্রয়োজন তা সেই পরমস্নেহশীল বিদেশী নিজেই ব্যবস্থা করেছিলেন। শাজাহানের সরাইখানায় অসংখ্যের ভিড় থেকে অসাধারণকে খুঁজে বার করে আমাকে দেখাবার জন্যে কেউ নেই। তবু এই আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় ভূবন পথপ্রদর্শকহীন এক সামান্য কর্মচারীকে বহু, মণিমাণিক্য উপহার দিয়েছে। কল্পনার রঙে যে পরম প্রতিভাবান শিল্পী সাহিত্যের পটে নব নব চরিত্রের সৃষ্টি করেন, তিনি আমার নমস্য। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতার ক্রীতদাস। আমার স্মৃতির কারাগারে বন্দী পুরুষ ও নারীর দল সুযোগ পেলেই বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, তাদের মুক্তি দাবি করে, আমি স্বাধীন মনে কল্পনার সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ পাই না!

আজও তারা কারার বন্ধন ছিন্ন করে চৌরঙ্গীর পাঠকের মনের জানালার ধারে এসে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু হোটেলের সামান্য কর্মচারী আমি কী করবো? নিজের অক্ষমতার

তীব্র যাতনা সেইদিন বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন শাজাহান হোটেলে মিসেস্ পাকড়াশী পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। ককটেল পার্টি—রিসেপশন ট অনিন্দ্য অ্যান্ড শ্যামলী।

অনিন্দ্যর বিবাহ উপলক্ষে ডিনার পার্টি পাকড়াশী-হাউসে ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শাজাহানের উর্দিপরা বয়রা সেখানে গিয়ে পরিবেশন করেছিল। আমারও যাবার হুকুম হয়েছিল। বোসদা বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আমাকে সে যাত্রা রক্ষা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “ম্যানেজারকে জানাবার প্রয়োজন নেই, তোমার বদলে আমিই যাবো’খন।”

সেদিন অনেক রাত্রে বোসদা হোটেলে ফিরে এলেন। আমি তখন ঘর থেকে একটা চেয়ার বের করে ছাদের উপর চুপচাপ বসেছিলাম। বোসদা যখন ফিরে এলেন, তখন -ঘামে তাঁর শার্ট ভিজে গিয়েছে। আমাকে বসে থাকতে দেখে রাগ করলেন। বললেন, "শুধু শুধু এখনও জেগে রয়েছো কেন?”

আমি হাসলাম। গলার টাইটা আলগা করতে করতে বোসদা বললেন, “দেড় হাজার লোকের স্পেশাল কেটারিং তো সোজা জিনিস নয়। হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে।” আমি তখনও চুপ করে ছিলাম। বোসদা বললেন, “কী এতো ভাবছো?” বললাম, “কিছুই না।” একটা সিগারেট ধরিয়ে বোসদা বললেন, “আমরা ছোটো বেলায় সুর করে গাইতাম—ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা।”

বললাম, “সারাজীবনই তো আপনি আমাদের মতো পরের ভাবনা ভেবে গেলেন।” বোসদা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, “তোমরা কী আমার পর?”

“যাদের আপন ভাবছেন, একদিন হঠাৎ বুঝবেন, তারা সবাই পর।” আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে বললাম। অন্ধকারে সিগারেটের অস্পষ্ট আলোকে আমার মুখটা বোসদা বোধহয় ভালভাবে দেখতে পেলেন না। বললেন, “কেন? বিপদে পড়লে তুমি কি আমাকে দেখবে না?”,

মনে মনে বললাম, নিজেকে আমার বুঝতে একটুও বাকি নেই। এই তো দু’সম্বর সাইটে আমার সাহায্যপ্রার্থিনীকে কেমন দেখলাম।'

দেখে দেখে এবং শাজাহানের বিষ গ্রহণ করে করে সত্যসুন্দর বোস নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। আকাশের দিকে একঝলক ধোঁয়া ছড়ে দিয়ে বললেন, “সংসারের হোটেলখানায় কেউ কাউকে সার্ভ করতে পারে না। আমরা কেবল ভাল ওয়েটারের মতো সামনে ট্রে ধরতে পারি, তার থেকে যার যা পাওনা তুলে নিতে হবে।”

কথা শেষ করেই বোসদা এবার হেসে উঠলেন। বললেন, “এখন তোমাকে আর ঐ ট্রে ধরতে হবে না। তোমাকে যা ধরতে হবে তার নাম পেগ। কারণ মিসেস পাকড়াশী ককটেলের ব্যবস্থা করেছেন, এই হোটেলেই। শুধু ডিনারে আজকাল কলকাতার কোনো শুভ কাজ সম্পন্ন হয় না। এখন পাকস্পর্শের পর জলস্পর্শ। অর্থাৎ কোনো হোটেলে একদিন বিশেষভাবে নির্বাচিত অতিথিদের সেবাযত্ন। এ সবের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে, কারণ কাল থেকে ওখানে তোমার ডিউটি, মিস্টার সরাবজী হবেন তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু সে-সব পরে শূনবে, এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।”

“আর আপনি?” আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

“আমি এখন স্নান করবো। স্নান সেরে গায়ে একটু পাউডার ছড়িয়ে কিছুক্ষণ কুমীরের মতো চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে থাকবো, তারপর রাত-ডিউটির জন্যে একতলায় নেমে যাবো।”

এই পরিশ্রমের পর রাত-ডিউটি। আমি বারণ করেছিলাম। আমার হয়ে মিসেস পাকড়াশীর বাড়িতে তিনি যখন কাজ করে এসেছেন, তখন আমি এবার ওঁর বদলীতে যাই। কিন্তু সত্যসুন্দরদা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, “আমি না তোমার উপর-ওয়ালা। ডিউটি-চার্ট তৈরি করবার দায়িত্ব আমার না তোমার?”

একরকম জোর করেই বোসদা আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অবসন্ন দেহটা ক্লান্তিভরা রাত্রের অন্ধকারে বিছানার নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে কখন যে ঘুমকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিল খেয়াল করিনি। হঠাৎ মনে হলো ঘরের দরজায় যেন টোকা পড়ছে। ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই দেখলাম, একটা টর্চ হাতে করে সত্যসুন্দরদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, “স্যরি, তোমাকে এমন

সময় ডেকে তুলতে বাধ্য হলাম। তোমাকে ঘরটা এখনি ছেড়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা পরে বলছি। এখন চলো দিকিনি, তোমার বিছানার চাদরটা সোজা করে দিই।”

দ্রুতবেগে বোসদা বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিলেন। আমাকে বললেন, “তাড়াতাড়ি মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নাও।”

বাথরুমের ভিতরে মুখে চোখে জল দিতে দিতেই শুনলাম, বোসদা কাদের বলছেন, “আসুন। আপনারা ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, বিশ্রাম না করলে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।”

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, এক ভদ্রলোক আমার বিছানায় বসে পড়ে জুতো খুলতে আরম্ভ করেছেন। জুতো খুলতে খুলতেই তিনি বললেন, “মিস্ মিত্রের কী ব্যবস্থা হবে?” বোসদা. বললেন, “আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি।”

রাত্রের ম্লান আলোকে ঘূম-জড়ানো চোখে দেখলাম, 'হাল্কা ফাইবারের ব্যাগ হাতে, ফিকে নীল রংয়ের সিল্কের শাড়ি পরে এক তরুণী ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদা তাঁর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, “আসুন।”

ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, “সে কী, আপনি আমার ব্যাগ বইবেন, তা কখনও হয় না।” বোসদা সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, “আসুন।” এবার আমরা বোসদার ঘরের সামনে এলাম। বোসদা ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, “একটু দাঁড়াও, আমি চাবিটা নিয়ে আসি।”

ভদ্রমহিলা লজ্জায় যেন নীল হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। বললেন, “কেন আমার ব্যাগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে এক বিষন্ননয়না সুন্দরীকে আবিষ্কার করলাম। আমারই চোখের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যেন প্রিন্সেস অব স্যাড আইজ ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর দৃঢ় নমনীয় গ্রীবার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম তা স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না। সামান্য হাই তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, “এতো রাত্রে কাউকে এমনভাবে বিপদে ফেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।"

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরেও বৈশিষ্ট্য। নাচের ঘুঙুর যদি আরও চাপা হতো, ট্রামের ঘর্ঘর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের ভেলভেটে আরেকটু অস্পষ্ট হতো, আরেকটু সংযত, তাহলে অনেকটা যেন মিস্ মিত্রের স্বর হতো তারা।

চাবি নিয়ে এসে বোসদা দরজাটা খুললেন। চাপা গলায় বললেন, "আজকের রাতটা কোনোরকমে এখানে কাটিয়ে দিন।"

মিস মিত্র ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "কার ঘর আমি জোর করে অধিকার করলাম?" বোসদা বললেন, "সে-সব পরে খোঁজ করা যাবে, এখন শুয়ে পড়ুন।" ভদ্রমহিলা শুনলেন না। বললেন, "কার ঘর না বললে, আমার ঘুমই আসবে না।" বোসদা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "মি: স্যাটা বোসের।"

"কী বোস?" ভদ্রমহিলার বিষণ্ন চোখে এবার সত্যিই হাসি ফুটে উঠলো। বোসদা বাধ্য হয়ে, এবার নিজেই উত্তর দিলেন, "ছিলাম সত্যসুন্দর, কপালদোষে স্যাটা হয়েছি!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বাসেই থাকতে পারতাম, কিংবা কয়েক ঘণ্টা লাউঞ্জে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু কী যে করলেন আপনি। এখন আপনারা শোবেন কোথায়?"

"আমার তো শোবার প্রশ্নই ওঠে না, মিস্ মিত্র, আমি তো ডিউটিতে থাকবো। আর এই শ্রীমানেরও একটু পরে কাজ রয়েছে।" বাথরুমের দরজাটা খুলে বোসদা বললেন, "চাবিটা একটু শক্ত আছে. সামনের দিকে টেনে একটু জোরে ঘোরানে তাহলেই দরজা খুলে যাবে। টাওয়েলটা ধোপ-ভাঙা, সুতরাং ব্যবহার করতে পারেন।"

মিস্ মিত্রকে নমস্কার করে আমরা দু''জনে বেরিয়ে আসছিলাম। ভদ্রমহিলাও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। কোনোরকমে বললেন, "আপনাকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝে উঠতে পারছি না!"

শুভরাত্রি জানিয়ে বোসদা আমাকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। বললেন, "আর কোনো উপায় ছিল না। তোমাকে ছাড়া কাউকে জাগাবার মতো অধিকারও আমার নেই।"

বোসদা বললেন, "ভদ্রমহিলা হচ্ছেন হাওয়াই হোস্টেস। ওঁদের প্লেনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় হোটেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্লেনের অফিসারদের জন্যে

সাধারণত আমাদের আলাদা ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আজ শোচনীয় অবস্থা। ঘর খালি নেই। তাঁরাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ভদ্রমহিলা একবার বললেন, 'আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই, লাউঞ্জের সোফাতেই গড়িয়ে নিচ্ছি।' কিন্তু তা কখনও হয়? বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকে তুললাম। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো। সকালেই দু'একটা ঘর খালি হয়ে যাবে। তখন এঁদের স্যরিয়ে দেবো।”

আমি বোধহয় আর একটা হাই চেপে রাখার চেষ্টা করছিলাম। বোসদা পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “হোটেলে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে রাত জাগার অভ্যাস রাখা ভাল। রাত্রে কারা জেগে থাকে জানো?” আমি বললাম, “ছোটবেলায় শুনেছি, দুষ্টু এবং অবাধ্য ছেলেরাই রাত্রে জেগে থাকে।”

“ঠিক। পৃথিবীর অবাধ্য দুষ্টু ধেড়ে খোকারাই রাত্রে জেগে থাকে। সারা রাতের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে ভোরের সান্ধ্য মূহূর্তে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।"

কিছুই কাজ নেই, জেগে থাকা ছাড়া। কাউন্টারে আমরা দু''জন জেগে বসে রয়েছি। বসে বসে বোসদা একটুকরো কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছেন। পেন্সিলের আঁচড়ে শাজাহানের লাউঞ্জকে নকল করবার চেষ্টা করছেন। বাইরে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে শাজাহান হোটেলের প্রায়-মিলিটারি পোশাক। তার হাতেও একটা পেসিল ও খাতা।

এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আনন্দে মনটা ক্রমশ ভরে উঠলো। কেউ কোথাও নেই, শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বা যেন আমরাই। এই বিশাল হোটেলের অসংখ্য ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা পরম বিশ্বাসে আমাদের উপর সব দায়িত্ব অর্পণ করে নিঝুম রজনীতে ঘুমিয়ে রয়েছেন। রাতের রেলগাড়ির ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানের মতো অতি দু'রতীর্থের যাত্রীদলকে আমরা দু'জনে যেন কোনো সোনার প্রভাতের দিকে নিয়ে চলেছি। মণিমাণিক্যে ভরা সেই নতুন প্রভাতে এই ঘুমন্ত মহাদেশের তীর্থযাত্রীরা কি পরম বৈভব খুঁজে পাবেন জানি না; কিন্তু আমরা তখন তাঁদের আনন্দে ভাগ বসাবার জন্যে জেগে থাকবো না। হোটেলের দায়িত্ব অন্য কারুর উপর দিয়ে দিনের আলোতে আমরা তখন অবহেলিতা অভিমানিনী রাত্রিকে আমাদের ছোট্ট ঘরে ডেকে আনবার চেষ্টা করবো।

মিস্টার আগরওয়ালা নতুন হোস্টেস রেখেছেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যেও দেখলাম, দু'নম্বর সুইট থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি চিনতে পারিনি। বোসদা কানে কানে বললেন, "ইনি আমাদের দেশের একজন নামকরা শ্রমিকনেতা। আগরওয়ালাদের কারখানাগুলোর শ্রমিকদের ইনিই নেতৃত্ব করেন।" একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। গাড়িটা শ্যামবাজারের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দারোয়ানজী পকেট থেকে নোটবই বের করে কি একটা টুকে নিলেন।

বোসদা হেসে বললেন, "গাড়ির নম্বর আমরা রাতে টুকে রেখে দিই। অতো রাত্রে যারা যাতায়াত করে, তাদের কপালে যে কী আছে তার ঠিক নেই।"

রাত্রি যে শেষ হয়ে আসছে এবার বুঝলাম। লেনিনবাবু একটা খাটো ধুতি পরে গামছা হাতে স্তব পাঠ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এতো সকালে আইন কানুন মানা হয় না তাই; না-হলে হোটেলের কোনো কর্মচারীকে ঐ বেশে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। স্তব পাঠ করতে করতেই তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় চললেন?"

"মায়ের কাছে। মা আমার সব দোষ ক্ষমা করবেন। সারাদিন ধোপার ময়লা ঘে'টে ঘে'টে যত পাপ করেছি, তা এবার মা'র চরণে বিসর্জন দিয়ে আসবো।" বোসদার দিকে তাকিয়ে লেনিনবাবু বললেন, "আপনি তো স্যর সায়েব মানুষ, আপনাকে বলে লাভ নেই। এই ছোকরাকে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানকে অ্যালাউ করুন। ভোরবেলায় স্নানের অভ্যাসটা থাকলে অনন্ত নরকবাসের হাত থেকে বেঁচে যাবে।"

বোসদা মৃদু' হাসলেন। বললেন, "আমি কি ওকে আটকে রেখেছি? ইচ্ছে হলে যাক।" ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "তা হলে চলুন। এই সকালে ঘাটে গিয়ে দেখবেন কত পুরুষ আর মেয়েমানুষ সারারাতের পাপ ধুয়ে ফেলছে। আমাদের হেডবারম্যান রাম সিং এতোক্ষণে স্নান শেষ করে পুজোয় বসে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনি একাই যান।"

উনি চলে যেতে বোসদা বললেন, "পাগল। ফেরবার সময় লোকটা এক ঘটি জল সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। প্রথমে হোটেলের সামনে একটু ছড়িয়ে দেবে। পিছনের দরজা

দিয়ে ভিতরে ঢুকে, বালিশ বিছানার পাহাড়ের উপর জল ছড়িয়ে দিয়ে বলবে, মা দু'র্গতিনাশিনী, দেখিস মা।"

একটা ঘর এই ভোরবেলায় খালি হয়ে গেলো। এক আমেরিকান দম্পতি রাঁচির দিকে চলে গেলেন। বোসদা বললেন, "ওপরে আমাদের একটা ঘর না হলে চলে না। দেখ, দু'জনের কেউ উঠেছেন কি না।"

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, বোসদার ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। হাওয়াই হোস্টেস মিস্ মিত্র এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন। আমার ঘরের দরজাটা খোলা। গুড়বেড়িয়া বললে, "সায়েব উঠে পড়েছেন। চা খেয়েছেন।"

দরজায় নক্, করতেই হাওয়াই জাহাজের ভদ্রলোক বললেন, "কাম ইন" ঢুকে গিয়ে আমি বললাম, "রাত্রে আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে। নিচের একটা ঘর খালি হয়েছে। আপনি চলুন।"

গুড়বেড়িয়ার হাতে মালপত্র চালান করে দিয়ে, ভদ্রলোককে নিচের ঘরে ঢুকিয়ে বোসদাকে খবর দিয়ে এলাম।

বোসদা হেসে বললেন, "এখানে থেকে থেকে ভাগ্যটা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তোমার কপালের জন্যে হিংসে হচ্ছে। ভদ্রমহিলাকে কখন যে বিদেয় করে একটু ঘুমোতে পারবো জানি না।"

আজ এতোদিন পরে বোসদার সেই কথাগুলো মনে পড়লে কেমন হাসি আসে। আশ্চর্যও লাগে। সুজাতা মিত্রের কথা, বোসদার কথা ভাবলে মনটা কেমন হয়ে যায়। আজও কোনো কর্মহীন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আমি যেন সুজাতা মিত্রকে খুব কাছাকাছি দেখতে পাই। অকারণে আমার বয়সী চোখ দু'টো সেই সুন্দর অতীতে ফিরে যেতে চায়। আমি বুঝি, এ অন্যায়, সংসারের নিষ্করুণ পথে চিত্তের এই চঞ্চলতা মানায় না। আমার পরিচিত একান্ত আপনজন সকৌতুকে এবং সস্নেহে অভিযোগ করেন, "তোমার সব ভাল। শুধু এই ছেলেমানুষিটুকু ছাড়া। সংসারের পাঠশালায় এতো শিখেও তুমি সেই কৈশোরেই রয়ে গেলে, বড় হয়ে উঠলে না।" যিনি আমার কাছে বারবার এই অভিযোগ করেন, তিনি হয়তো চান আমার অপরিণত মন কৈশোরের প্রবৃত্তি কাটিয়ে যৌবনের রংয়ে নিজেকে রঙীন

করে তুলুক। কিন্তু কেন জানি না বেশ বুঝতে পারি কৈশোর থেকে সোজা আমি বার্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছি। ওঁদের দু'জনকে স্কুটারের পিঠে ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসতে দেখে আমি সুজাতাদিকে বলেছিলাম "শুনুন জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতা

'কদমে চলেছে দু'ই সাঁঝের তারকা
স্কুটারের পিঠে,
ফাঁপানো চুলের গুচ্ছে লাল ফিতে
ওড়নায় লেপটানো পিঠ অসম্বৃত
অদম্য অকুতোভয় স্কুটারের তরুণ চালক।"

আর আবৃত্তি করতে দেননি, সুজাতাদি আমার কানটা চেপে ধরেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "লাগছে। ছেড়ে দিন।"

বোসদা বলেছিলেন, "আঃ, না হয় বলেই ফেলেছে।" সুজাতাদি বলেছিলেন "ওড়না ও কোথায় পেলো?"

এতোদিন পরে সে-সব স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সুজাতা মিত্রের কাহিনীতে একদিন আমাকে আসতেই হবে। কিন্তু তার আগে কক্‌টেল এবং মিস্টার সরাবজী।

মিস্টার সরাবজী ভারতীয় প্রথার হাতজোড় করে খাঁটি বাঙলায় বলেছিলেন, "আসুন, বসুন। এই বার-এ আপনাকে পেলে আমি আর কিছুই ডর করি না।"

সরাবজী আমাদের নতুন বার ম্যানেজার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পাকা আপেলের মতো টকটকে রং। বয়সের ভারে একটু নয়ে পড়েছেন। অবাক হয়ে বললাম, "আপনি বাংলা জানেন?"

"কী যে বলেন। আমি যখন কলকাতায় এসেছি তখন আপনারা এই ওয়ার্লডে আসেননি, আমার নিজেরই তখন চৌদ্দ বছর বয়স।" সরাবজী তাঁর সাদা প্যান্টের বকলেসটা টাইট করে নিয়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন।

আমি বললাম, "আবগারি খাতাগুলো ঠিক করে রাখা দরকার, ওগুলোর নাম শুনলে ভয় লাগে।"

সরাবজী তাঁর চোখের মোটা চশমাটা খুলে প্রসন্ন হেসে বললেন, "ওদের আমি ভয় পাই না। আমি যদি ডিউটি ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করি, যদি আমি ড্রিঙ্কে জল না মেশাই, যদি আমি কোনো সন্দেহজনক মেয়েকে একলা বার-এ বসে থাকতে না দিই, তা হলে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে আমি কেন ভয় করতে যাবো?"

শাজাহানের বার-এ সরাবজী নিজের হাতে বোতলগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। হেড বারম্যান রাম সিং সায়েবের দিকে তাকিয়ে ছিল। সরাবজী অভ্যস্ত হাতে একটা বোতল আলোর দিকে নিয়ে নেড়ে দেখলেন কতটা আছে, তারপর আবগারি ডিপার্টমেণ্টের স্টক রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে ওঁর যেন একটু সন্দেহ হলো। বললেন, "রাম সিং, খাতায় লেখা চার পেগ, অথচ পাঁচ পেগের মতো মাল রয়েছে মনে হচ্ছে।"

রাম সিং অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "হুজুর, হাতের মাপ তো; কোথাও একটু কম, কোথাও একটু বেশী পড়ে যায়।"

সরাবজী বললেন, "আমি এর ভিতর নেই। নিজের হাতে আমি কাউকে কমও দেবো না, বেশীও দেবো না।"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সরাবজী বললেন, "আমরা, যখন এই লাইনে আসি তখন এক আধ পেগ ড্রিঙ্কের জন্যে কেউ মাথা ঘামাতো না। তখন যার দাম ছ'টাকা ছিল এখন তা ছিয়াশি টাকাতেও পাওয়া যায় না। এখন কাস্টমারকে এক ফোঁটা কম দেওয়া মানে ফাঁকি দেওয়া।"

সরাবজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিজের মনেই বোতলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারপর আমাকে বার-এ একলা রেখে সেলারে চলে গেলেন। মাটির গর্ভে দেড় শো বছরের প্রাচীন একটা অন্ধকার ঘর আছে, সেখানে সাধারণের যাওয়া নিষেধ। সেই অন্ধকার সেলারের কোণে এমন বোতলও আছে যা শাজাহানের প্রতিষ্ঠাতা সিম্পসন সায়েব নিজের হাতে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তারপর শাজাহানের বুকের ওপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা কতবারই তো গড়িয়ে গিয়েছে। সোলা-টুপি এবং খাকি প্যান্ট পরে তরুণ

ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে হিন্দুস্থানের প্রথম রাত্রি শাজাহান হোটেলে কাটিয়েছেন। সেদিন সেই নিঃসঙ্গ সৈনিককে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে এই কুঠুরি থেকেই স্কচ বোতল বেরিয়ে এসেছে। গঙ্গা নদীতে পাল-তোলা জাহাজের বদলে যেদিন কলের জাহাজ দেখা গিয়েছিল, সেদিনও শাজাহানের সেলার থেকে পাঠানো পানীয়তেই উৎসব-রাত্রি মুখর হয়ে উঠেছিল। তারপর খাকি টুপি এবং হাফ প্যান্টপরা একদল লোক হাতে নকশা নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের দলপতি দাড়িওয়ালা ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন স্পেনসেসের বড়াপোচখানায় উঠেছিলেন। আর দলের কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের এই শাজাহানে। বার-এ বসে বসে তাঁরা দিনরাত কাগজে কি সব নকশা আঁকতেন। বারম্যানরা বলতো, পাগলা সায়েবের দল এসেছে — এরা কলের গাড়ি আনবে বিলাইত থেকে। তামাম হিন্দুস্থানের পায়ে এরা বেড়ি পরিয়ে দেবে— লোহার রাস্তা তৈরি করবে, এবং একদিন তার উপর দিয়ে বিরাট বিরাট দৈত্য ছোটাছুটি করবে। দৈত্যদের লড়াই-এ হারিয়ে দিয়ে সায়েবরা লোহার বাক্সে বন্দী করে রেখেছে। দৈত্যরা তাই কিছুই করতে পারবে না, শুধু মাঝে মাঝে মনের দুঃখে নিঃশ্বাস ছাড়বে—আর সেই কালো নিঃশ্বাসে হিন্দুস্থানের সুখের গ্রাম, সোনার ধানক্ষেত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সায়েবরা মনে মনে তা জানেন, মাঝে মাঝে ওঁদের মনে দুঃখ হয়—সেইজন্যে দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকেন। সায়েবরা বিদায় নিয়েছেন। একদিন এই বাধাবন্ধহীন স্ফূর্তিকেন্দ্র শাজাহানের পানাগারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সর্বনাশ হয়েছে। কেউ কোনোদিন যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে—পামার কোম্পানি ফেল করেছে। রাতারাতি অনেক রাজা ফকির হয়েছেন। দেউলিয়া রাজার দলকে মনোবল দেবার জন্যে শাজাহানের সেলার থেকে আবার ব্রাণ্ডি, হুইস্কি এবং জিন-এর বোতল বেরিয়ে এসেছে। হুইস্কির মোহিনী মায়ায় কলকাতা আবার সব ভুলে গিয়েছে। নতুন বড়লাট এসেছেন, নতুন ছোটলাট এসেছেন -আবার পুরনো বোতল ভেঙে নবাগতদের স্বাস্থ্যপান করা হয়েছে। তার পর শাজাহানের কর্তারা একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বড়াপোচখানার নতুন কল এসেছে। লিফট। পায়ে হেটে আর কাউকে উপরে উঠতে হবে না। অবশ্য বড়াপোচখানায় এখন এই লিফট কেবল লেডিজদের জন্যে। তাঁরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে একটা খাঁচার মধ্যে গিয়ে

বসলেন, আর দু''জন বেয়ারা দড়ির কপিকল দিয়ে সোঁ সোঁ করে টেনে তাঁদের উপরে তুলে দিচ্ছে। এর পর কেউ কি আর লিফটবিহীন এই সেকেলে শাজাহানে আসবে? সে-চিন্তাও তাঁরা যখন করেছেন তখন তাঁদের সামনে ছিল শাজাহান হুইস্কি – স্পেশালি বটলড ইন স্কটল্যান্ড ফর হোটেল শাজাহান।

এমনি করেই একদিন শাজাহানের আকাশে নতুন শতাব্দীর সূর্যোদয় হয়েছে। দিন পালটিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গী পালটিয়েছে, পোশাক পালটিয়েছে, রাজা, হোটেলের মালিক, বারমেড, বারম্যান সব পালটিয়েছে, কিন্তু হুইস্কির পরিবর্তন হয়নি। 'আকাশের চন্দ্র সূর্য এবং মাটির হুইস্কি-এদের কোনোদিন পরিবর্তন হবে না'-হবস সায়েব আমাকে একবার বলেছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম, শাজাহানের সেলারে সিম্পসন সায়েব যে এক কেস রেড ওয়াইন রেখেছিলেন, তার একটা বোতল খোলা হয়েছিল সেবার যখন লর্ড কার্জন আমাদের এই হোটেলে পদার্পণ করেলন। তার পর বাকি ক'টা বোতল আজও কোন বৃহৎ অতিথির আবির্ভাব অপেক্ষার শতাব্দীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছে।

সরাবজী একটু পরেই ফিরে এলেন। এখন দু'পুরবেলা–লাঞ্চের ভিড় শেষ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন ক্লাইভ স্ট্রীট কর্তা এই কোণে বুঁদ হয়ে বসে রয়েছেন, লাঞ্চ করতে এসে নেশার ঘোরে অফিসের ঠিকানা ভুলে গিয়েছেন। বেয়ারাকে জিজ্ঞাস করছেন, "টুম জানটা হ্যায়? বিলকুল গড়বড় হো গিয়া।"

বেয়ারা বেচারা বলেছে, "হুজুর, আপনি কোন অফিসে কাজ করেন তা আমি কি করে জানবো?" নেশার ঘোরে সায়েব এবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। "তোমরা এই সব গুড-ফর নাথিং ফেলোদের রেখেছো কেন?"

সরাবজী এবার কাউন্টার থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সায়েবকে বললেন, "তুমি অমুক অফিসে কাজ করো।"

সায়েব চমকে উঠলেন, "এতোক্ষণে মনে পড়েছে আমি ওখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অথচ কোথায় কাজ করি তা মনে করতে না পেরে আমি দেড় ঘণ্টা এখানে বসে আছি।"

সায়েব চলে যেতে, সরাবজীকে বললাম, "কেমন করে বললেন?"

সরাবজী হাসলেন, "এদের প্রায় সবাইকে আমি চিনি। শুধু অফিস নয়, এদের বাড়ির ঠিকানাও হোটেলের লোকদের জেনে রাখতে হয়, রাত্রে প্রায়ই এদের বাড়ি ফিরে যাবার সামর্থ্য থাকে না। ড্রাইভার থাকলে অসুবিধে হয় না, কিন্তু অনেকে যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসেন। তখন গাড়ি পড়ে থাকে, ট্যাক্সি করে আমরা বাড়ি পোঁছে দিই।"

এর পর গল্প করবার মতো সময় আমাদের ছিল না। সন্ধ্যের ককটেলে অনেক কাজ। যদি কখনও আধুনিক এই পৃথিবীতে আদিম সভ্যতার রসাস্বাদন করতে চান তবে শাজাহান হোটেলের ককটেলে আসবেন। মিসেস পাকড়াশীর পার্টিতে আমি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। সরাবজী আমার কানে কানে বলেছিলেন, ককটেলের চারটে অধ্যায় আছে। প্রথম প্রহরে ঠাকুর ঢেকি অবতার, দ্বিতীয় প্রহরে ঠাকুর ধনুকে টঙ্কার, তৃতীয় প্রহরে ঠাকুর কুকুরকুণ্ডলী, চতুর্থ প্রহরে ঠাকুর বেনের পুঁটুলি।

প্রথম অধ্যায়ে অতিথিরা সহজ সাধারণ— তখন—'কেমন আছেন? হাউ ডু ইউ ডু? মিসেস সেনকে দেখছি না কেন! উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিলেন নাকি? পুওর মিস্টার সেন! মেয়েদের এই বয়সটা ডেঞ্জারাস। একটু অসাবধান হয়েছেন কি দেখবেন বাড়ির বউ মিশনে মন দিয়ে বসে আছেন। অসহ্য। যা হোক, মিসেস পাকড়াশী এতোদিনে তা হলে একটা কাজের কাজ করলেন। আরও দু''বছর আগে অনিন্দ্যর বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন ওয়েস্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন—অ্যাভারেজ ম্যারেজেবল্ এজ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে সংসার পাতছে, পেতেই মেটারনিটি হোমে যাচ্ছে। আর ইন্ডিয়াতে বিয়ের বয়স শুধুই বাড়ছে। কিছুদিন পরে হয়তো অ্যান্টি-সারদা অ্যাক্ট পাশ করাতে হবে।... কংগ্রাচুলেশনস মিসেস পাকড়াশী। হোয়াট অ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক?"

নিচ্ছি, মিস্টার ব্যানার্জি। আমি অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিচ্ছি। তা বলে আপনারা লজ্জা করবেন না। আপনারা ওদের দু'জনের হ্যাপি লাইফ ড্রিঙ্ক করুন। ক্যারি অন। শ্যামপেন ককটেলও রয়েছে। আচ্ছা চলি, ওখানে মিস্টার আগরওয়ালা একলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমাদের জন্যে উনি অনেক করেন। রিয়েল ফ্রেণ্ড।"

মিসেস পাকড়াশী চলে যেতেই ব্যানার্জিকে বলতে শুনলাম, “হ্যালো পি-কে, মিসেস পাকড়াশীর পার্টির মাথামুণ্ড, বুঝি না! ড্রেস ইভনিং করা উচিত ছিল। তা না লাউঞ্জ স্যুট। ব্যাড। আফটার অল ইভনিং স্যুট না হলে পার্টির ডিগনিটি থাকে না। ক্যালকাটা যেভাবে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তাতে এমন একদিন আসছে যেদিন তোমারই অফিসের ক্লার্ক লুঙি পরে তোমার পাশে বসে ড্রিঙ্ক করবে। অথচ তুমি কিছুই বলতে পারবে না।”

দ্বিতীয় অধ্যায় একটু ঘোরালো। তখন হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে। শোনা গেলো, 'কেন-যে আমরা কোট প্যান্ট টাই পরে গরমে সেদ্ধ হচ্ছি! কি দরকার এই সব ফরম্যালিটির? বোয়—খিদমতগার — ইধার আও। দো রোব বয় বানাও। স্কচ হুইস্কি, ব্রাণ্ডি শরাব ঔর এ-বিটি। জলদি জলদি খিদমতগার, তুম বহৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়।' '...শ্রীমতী অনিন্দ্যকে দেখছো। ভ্রু নয় তো যেন এক জোড়া ধনু! সহর্ষে সেই ভ্রূধনু ভঙ্গ করে ভদ্রমহিলা কথা বলছেন।' আর একজন বললেন, 'ঠিক হলো না। বলো, মৃগলোচনা সুন্দরী তাঁর যৌবনমত্ত তনুদেহ হিল্লোলিত করে কথা বলছেন।'

তৃতীয় অধ্যায়—হুইস্কির কল্যাণে তখন দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার। তখন চারিদিকে কথার ফুলঝুরি – জানেন, আমার ওয়াইফ কি সিলি? ড্রিঙ্ক করেছি শুনলে কাঁদতে আরম্ভ করে। আরে, এ কী ধরনের ন্যাকামো? সত্যি বলছি, আমি একটা এ ডবল এস্ । মাধব পাকড়াশীও তাই—আবার বাঙালী মেয়ের হাঙ্গামায় গেলেন। মোমের পুতুলটি ছোকরার লাইফ মিজারেবল করে দেবে। হ্যাঁ বাবা, বিয়ে যদি করতে হয় পাঁচ-নদীর তীরে। ওয়াণ্ডারফুল, ওদের মেয়েরা ড্রিঙ্কের কদর বোঝে। রবি ঠাকুরও ওদের বুঝেছিলেন। না-হলে এতো দেশ থাকতে পাঞ্জাবের নামটা জাতীয় সঙ্গীতে আগে ঢোকালেন কেন? পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ—কবি একদম মেরিট অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। ওই দেখ, রাজপাল কেমন মিসেস রাজপালের সঙ্গে বসে মনের সুখে পেগের পর পেগ ফাঁক করে দিচ্ছে। কি নিয়েছে ওরা? প্যারাডাইস্? ওয়াণ্ডারফুল— জিন, অ্যাপ্রিকট আর অরেঞ্জের মিক্সচার; সত্যিই স্বর্গীয়। যে নাম দিয়েছিল তার পেটে সামথিং ছিল, আর ওই নিঃসঙ্গ সুন্দরী, উনি কী টানছেন? ওঁর কদর অনেক, অনিন্দ্য পাকড়াশীর স্ত্রী সম্বন্ধে বোম্বাই-এর ফ্যাশন কাগজে প্রবন্ধ লিখবেন। হোয়াট? হোয়াইট লেডি নিয়েছেন

—জিন আর লাইম? পুওর গার্ল—দেখে মনে হচ্ছে প্রিয়বিরহক্লিষ্ট! ওঁর আসঙ্গমুগ্ধ নারীচক্ষু কাউকে খুঁজে পাক, ওঁর অধর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠুক তখন ওঁকে একটা পুরো গেলাস পিংক লেডি দাও। তাতে থাকবে জিন, সঙ্গে ডিম এবং গ্রেনাডিন। ওয়াণ্ডারফুল। তখন ওঁর মৃগলোচনে কাজলের মসিরেখা ফ্লুওরেসেন্টে পেন্টের মতো জ্বলজ্বল করবে। আরে ব্রাদার, তোমার হলো কি? এরই মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে আছো? তুমিও কি আজকালকার ফ্যাশনেবল লেম্বুপানি সায়েব হয়ে গেলে নাকি? বোকামী কোরো না। এমন সুযোগ রোজ আসবে না। এমন চান্স পাবে না। শ্যামপেন ককটেলে লোক কিছু, তোমাকে রোজ ইনভাইট করবে না। মনে থাকে যেন, এক পেগ বারো টাকা। টেনে নাও ব্রাদার। অক্ষিতারকার কটাক্ষ, স্ফুরিত অধরের হাস্য ভুলে গিয়ে কারণ সাগরে ডুব দাও।'

চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়ে অনেক কম লোক। তৃতীয় বারেই বোল্ড আউট হয়ে অনেকেই পালিয়েছে। হোস্টের তখন যাবার ইচ্ছে, কিন্তু পালাবার উপায় নেই। অতিথিদের মধ্যে ড্রিঙ্ক ছেড়ে উঠবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কেউ নেশার ঘোরে অহিংসপথে সত্যাগ্রহ করে বসে আছেন। আর কেউ হয়ে উঠেছেন হিংস্র। যেন কাঁচের বাসনের দোকানে মত্ত ষাঁড় ঢুকে পড়েছে। গেলাস ভাঙছে, খালি বোতল ছোঁড়াছুড়ি চলেছে। কী যে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। মিসেস পাকড়াশী স্বামীর সঙ্গে সরে পড়েছেন। পাকড়াশী ইন্ডাস্ট্রিজের পি-আর-ও শুধু বিল মেটাবার জন্যে, এবং প্রয়োজন হলে পুলিসের হাঙ্গামা সামলাবার জন্যে রয়ে গেলেন। এক এক করে হলঘর প্রায় শূন্য হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও দু'-একজন সেখানে বসে থাকতে চান। পি-আর-ও বললেন, "সার, বার বন্ধ করবার সময় হয়ে আসছে।"

"শাট, আপ। এ কী ধরনের ভদ্রতা? নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে না খেতে দেওয়া?"

পি-আর-ও বেচারা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতিথিরা কাজ শেষ করবার জন্য ঢকঢক করে আরও কয়েকটা পেগ সেরে ফেললেন, তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। কাঁচের টুকরো পরিষ্কার করতে গিয়ে বেয়ারারা দেখলো, এক কোণে টেবিলের তলায় কে একজন সায়েব ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখলাম, ফোকলা চ্যাটার্জি বেসামাল অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। কোনোরকমে উঠে বেরিয়ে যাবার সময়

বললেন, "খুবই সাবধানী ব্যাটসম্যান। কিন্তু ভাগনের বিয়েতে ইচ্ছে করেই বোল্ড আউট হলাম।"

এর নামই ককটেল পার্টি। ঝলমলে সন্ধ্যায় পুত্র এবং পুত্রবধূকে নিজের দু' দিকে নিয়ে মিসেস পাকড়াশী যখন বার-এ ঢুকেছিলেন, তখন সবটা কল্পনা করে নিতে পারিনি।

অনিন্দ্য পাকড়াশী আজ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে একবার একটু থেমেছিলেন, হয়তো দু'-একটা কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিসেস পাকড়াশী বললেন, "খোকা, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে গল্প করবার সময় নয়, গেস্টরা তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

অনিন্দ্যর সঙ্গে আর কথা বলবার সুযোগ পাইনি। বলবার ইচ্ছেও ছিল না। তবু বার বার হাল্কা হাসির ফোয়ারার মধ্যে, রঙীন মদের সোনালী নেশার ভিতর দিয়ে একটা বিষণ্ণ মহিলার মুখ বার বার অহেতুকভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

মিসেস পাকড়াশীর পার্টিতে আমার হয়তো কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু হোটেলের হয়েছিল—একটা ককটেল থেকে তাঁরা দশ হাজার টাকার চেক পেয়েছিলেন। আবগারি ইন্সপেক্টর হিসেব পরীক্ষা করতে এসে বললেন, "চমৎকার, এই রকম ককটেল যত হয় তত আপনাদেরও লাভ, গভর্নমেণ্টেরও লাভ।"

"বেয়ারাদেরও লাভ।" সরাবজী হাসতে হাসতে বললেন।

"দু'নিয়াতে সবারই লাভ, ক্ষতি কেবল লিভারের," গলার আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি হবস সায়েব!

হবসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। মাথার টুপিটা খুলতে খুলতে সায়েব বললেন, "মার্কোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এক বন্ধুর জন্যে ঘর চাই। কিন্তু ম্যানেজারকে পেলাম না।"

"এর জন্যে ম্যানেজারকে কী প্রয়োজন? আমরা তো রয়েছি।" অভিমানভরা কণ্ঠে আমি অভিযোগ জানালাম। হবস বললেন, "তা হলে ব্যবস্থা করে দাও।"

ওকে নিয়ে বার থেকে বেরোবার পথে সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সরাবজীকে দেখেই মিস্টার হবস যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি! তুমি এখানে?"

সরাবজী ম্লান হাসলেন। "সবই তাঁর ইচ্ছা। আমরা কী করতে পারি?" সরাবজীর সামনে হবস দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোনো ব্যক্তিগত কথা থাকতে পারে আন্দাজ করে আমি এগিয়ে গেলাম। কাউন্টারে খাতায় হবস সায়েবের বন্ধুর কোনো জায়গা করে দেওয়া যায় কি না দেখতে লাগলাম। তিনি এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "কলকাতার হোটেলজীবনকে আমি যতদূর জানি তাতে এইটুকু বলতে পারি, রিসেপশনিস্ট ইচ্ছে করলে সব সময় জায়গা করে দিতে পারে।"

বোসদা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "একদিন সত্যিই তা ছিল। কিন্তু ফরেন ট্যুরিস্ট, বিজনেস-টুর এবং কনফারেন্সের দৌলতে সে-ক্ষমতা কোথায় উবে গিয়েছে। ম্যানেজার নিজেই সব সময় বুকিং-এর উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছেন।"

হবস সায়েবের বন্ধুর অবশ্য কোনো অসুবিধা হলো না। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে জায়গা খালি ছিল, পাওয়া গেলো।

হবস প্রশ্ন করলেন, "সরাবজী কবে থেকে এখানে এলেন?"

"এই কিছুদিন।" আমি বললাম।

"ওঁর মেয়ের কী খবর?"

আমি কিছুই জানি না। সুতরাং বোকার মতো ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হবস এবার প্রশ্ন করলেন, "মার্কো কোথায়?"

"বেরিয়ে গিয়েছেন।"

একটু হেসে তিনি বললেন, "তোমাদের এই হোটেলটা আমি যেন এক্স-রে চোখ দিয়ে দেখতে পাই। বোধহয় তিনি কর্পোরেশন স্ট্রীটে মেকলে পান করতে গিয়েছেন।" লর্ড মেকলের নামে যে কোনো পানীয় আছে তা জানতাম না। সাহেব হেসে বললেন, "পেনাল কোডের রচয়িতা ঐতিহাসিক মেকলে বে'চে থাকলে আঁতকে উঠতেন। বাঙালীরা তাঁর সর্বনাশ করেছে। দেশী মা কালী-মার্কা ধেনোর নাম দিয়েছে মেকলে। তোমাদের অনেক আচ্ছা আচ্ছা কাপ্তেন, ডিম্পল স্কচ, জন হেগ, হোয়াইট হর্স ফেলে মেকলে খেতে যান।"

হবস এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছুক্ষণ দেখেই যাই। মার্কোর সঙ্গে একটু প্রয়োজনও ছিল।"

আমরা দু'জনে লাউঞ্জে বসলাম। বোসদা এগিয়ে এসে বললেন, "ওঁকে কিছু অফার করো। চা বা কফি পাঠিয়ে দেবো? আমরা সামান্য হোটেল কর্মচারী কীই বা ওঁকে দিতে পারি। পৃথিবীর খুব কম লোকেই হোটেল সম্বন্ধে ওঁর থেকে বেশী জানে।"

হবস বললেন, "বেশ, কফি খাওয়াও। উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকে তোমাদের হোটেলে কতবারই তো খেয়ে গেলাম, আর একবার খাওয়া যাক।"

বোসদা আমাদের জন্যে কফির অর্ডার দিয়ে আবার কাজে বসে গেলেন। হবসের মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুকে পড়েছে। বললেন, "ইউরোপের সেরা কোনো ঔপন্যাসিক যদি এখানে এসে কয়েক বছর থাকতেন, তা হলে হয়তো এক আশ্চর্য উপন্যাস লিখতে পারতেন। ওয়েস্টের বহু হোটেল আমি দেখেছি—কিন্তু ইস্টের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সিম্পসন, সিলভারটন, হোরাবিন থেকে আরম্ভ করে তোমাদের মার্কোপোলো, জুনো, এমনকি এই সরাবজী—সব যেন বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাসের এক-একটা চরিত্র।"

হাতে সময় ছিল। সায়েবকেও সময় কাটাতে হবে। তাই বোধহয় গল্প জমে উঠলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "নরি সরাবজী যে কোনোদিন তোমাদের হোটেলে এসে চাকরি নেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ওকে আমি সেই প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকে দেখছি। তখন হাফেসজীর দোকানে ছোকরা ড্রিঙ্ক সার্ভ করতো। আমার মনে আছে, আমাদেরই এক বন্ধু একবার একসাইজ ডিপার্টমেণ্টে রিপোর্ট করেছিল। ওর আসল নাম সরাবজীও নয়—বোধহয় ম্যাডান না ওই ধরনের কি একটা! সরাবের লাইনে থেকে ছোকরা সরাবজী হয়ে গেলো।

ম্যাডানের তখন কত বয়স—চোদ বছরের বেশী নয় বোধহয়। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত চেপে ধরেছিল। অত কম বয়সের ছেলেদের মদের দোকানে চাকরি দেবার নিয়ম নেই, রিপোর্ট করেছে কে, এবার চাকরি গেলো। আমার দুঃখ হয়েছিল। অনেক চেষ্টা

করে সে রিপোর্ট আমি চাপা দিতে পেরেছিলাম। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পার্সীদের মধ্যে এমন দারিদ্র্য তো নেই। ওদের এতো ট্রাস্ট আছে, এতো দান নেবার সুযোগ আছে যে, কোনো কমবয়সী ছেলের পথে ঘোরবার প্রয়োজন নেই।

তাই মনে একটু সন্দেহও জেগেছিল। বিপদ মিটলে একদিন হাফেসজীর দোকানে গিয়েছিলাম। সেদিন বার-এ তেমন ভিড় ছিল না। একটা ছোটো পেগের অর্ডার দিয়ে বসলাম। সরাবজী আমাকে দেখেই ছুটে এলো। আস্তে আস্তে বললে, "আপনি এইভাবে না দেখলে এতোক্ষণে আমাকে চৌরঙ্গীর পথে পথে ঘুরতে হতো।" আমি বললাম, "তুমি এতো কম বয়সে ছোটো কাজ করছো কেন?"

সরাবজী ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বলেছিল, "আমি অরফ্যান বয়, অরফ্যান স্কুলে মানুষ হয়েছি। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই, ওঁরা অত চেষ্টা করলেন, তবু পড়াশোনা হলো না। ওঁরা বলেছিলেন, কোন একজন ইণ্ডিয়ান গ্রামারিয়ান প্রথম জীবনে একেবারে জড়বুদ্ধি ছিলেন, তারপর চেষ্টা করে তিনি সব শিখেছিলেন। আমিও ট্রাই করেছিলাম। কিন্তু হলো না। আমার মাথায় ঢুকলো না। তাই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছি।"

আমি বলেছিলাম, "কোনো ট্রাস্টের সাহায্য নিতে পারো।" সরাবজী রাজী হয়নি। "না স্যর, জন্ম থেকে বাবা মা-ই যাকে সাহায্য করতে রাজী হলো না, সে কি করে অন্যের কাছে সাহায্য চাইবে? সেটা ভাল দেখায় না। গড নিশ্চয়ই চান, আমিই নিজেকে সাহায্য করি। আমি আপনাদের আশীর্বাদে কেবল সেই চেষ্টাই করবো।"

হবস সায়েব আবার একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমরা তো মেয়েদের সব বিষয়ে সমান অধিকার দিয়েছো, তাই না?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সায়েব হাসতে লাগলেন। "এবার তাহলে একটা ছেলেঠকানো প্রশ্ন করি। বলো দেখি, কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা এখনও স্বীকৃত হয়নি?"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। আমার পিঠে একটা হাত রেখে হবস বললেন, "সরাবজীকে জিজ্ঞাসা করো, সে এখনি বলে দেবে, নারী-স্বাধীনতার বিরোধী দলের শেষ

দূর্গ হলো হোটেল। বার লাইসেন্সে লেখা আছে কোনো নিঃসঙ্গ মহিলাকে বার-এ ঢুকতে দেওয়া হবে না। মেয়েরা তোমাদের দেশে একা একা যেখানে খুশি যেতে পারে, এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেও কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু আজও বার-এ কোনো মহিলার একলা প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী থাকলে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে যে কোনো ড্রিঙ্কের আনন্দ উপভোগ করা চলতে পারে।"

মিস্টার হবস হাসতে লাগলেন। বললেন, "সংবিধানের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী এই নিয়ম কোনো মহিলা একবার আদালতে যাচাই করে দেখলে পারেন। তবে নিয়মটা অনেকদিন থেকেই চলছে। এবং যাঁরা আইন করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। নিঃসঙ্গ মহিলারা বার-এ আসতে চান অন্য উদ্দেশ্যে। আর আজও তাঁরা এসে থাকেন। খারাপ বারগুলোতে ঢুকলেই বোঝা যায়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দেহের পসরা সাজিয়ে দেশ বিদেশের মেয়েরা বড়শিতে রুই কাতলা ধরবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।" মিস্টার হবস হাসলেন। "নিয়মটা বোধহয় খারাপ নয়। কিছু পুরুষ শুধু এই আইনের জোরেই করে খাচ্ছে। মেয়ে ধরবার জন্যে ফর্সা জামা এবং ফুল প্যান্ট পরে গরীব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকে। 'হ্যালো ডলি, আজ কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে। যত রাত হোক তোমার জন্যে আমি বসে থাকবো।"

ডলি বলে, পিটারের মাকে কথা দিয়েছি। পিটারকে এসকর্ট হিসেবে নিয়ে যাবো। একটা টাকা দিলেই হবে।'

'আমি বারো আনায় রাজী আছি। আমার পয়সার দরকার। ছোকরা বলে। 'তোমরা যে চিংড়িমাছের মতো হয়ে গেলে। দেখছি, তোমাদের দাম মেয়েমানুষের থেকেও কম। বারো আনা পয়সার জন্যে ওই গুণ্ডা রাজত্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে বসে থাকতে রাজী আছো?"

আবগারী আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে এই এসকর্ট বা সঙ্গীদের না হলে অনেক বার-এ ঢোকা যায় না। আর এইভাবেই ম্যাডান অর্থাৎ সরাবজী কলকাতায় প্রথম অন্ন সংস্থান করেছিল।

হবস বললেন, “সরাবজীর মুখেই শুনেছি, এক ছোকরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছিল। বয়স তার কম—আইন অনুযায়ী এই বয়সের সঙ্গী নিয়েও বার-এ ঢোকা যায় না। কিন্তু হাফেসজী বার-এর মালিক মিস্টার হাফেসজী আইন সম্বন্ধে অত খুতখুতে ছিলেন না। তিনি এসকর্টের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কম বয়সের এসকর্টরা যে দামে সস্তা হয়, এবং বেচারা মেয়েদের পক্ষে খরচের ভার কিছুটা কমে যায়, তা তিনি বুঝতেন। তিনি শুধু বলতেন, 'তোমরা ঐ অসভ্যতাটুকু কোরো না—একটা লেমনেড নিয়ে দু’'জনে ভাগ করে খেও না। এতে হোটেলের সুনামের ক্ষতি হয়, অন্তত দু’টো বোতল সামনে রাখো।'

সরাবজী যখন কলকাতার পথে পথে দু’মুঠো অন্নের জন্যে ঘুরছে তখন ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়। সে বদলী খুঁজছিল। সিনথিয়াকে সে-ই রোজ বার-এ নিয়ে যায়। তার সঙ্গে বসে থাকে; তারপর চারে খদ্দের আসে, দর-দাম ঠিক হয়ে যায়, তখন নতুন আগন্তুককে সিনথিয়ার পাশে বসতে দিয়ে সে কেটে পড়ে। সঙ্গীকে রোজ আসতে হয়, অথচ তার কয়েকদিনের জন্যে খড়্গপুরে যাওয়া দরকার। রেলের কারখানায় জানাশোনা একজন ভদ্রলোক আছেন—তাঁর কাছে চাকরির তদ্বির করতে হবে।

তাই ছোকরা ম্যাডান, অর্থাৎ সরাবজীর সঙ্গে পরিচয় হতে তাকে সিনথিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। বললে, “মাত্র এক সপ্তাহের কাজ কিন্তু। আমি ফিরে এলেই তোমাকে কেটে পড়তে হবে। তখন যেন গণ্ডগোল পাকিও না। দু’ একজন আগে আমাদের লাইনে এই নোংরা চেষ্টা করেছে, মেয়েরা দু’টো মিষ্টি কথা শুনিয়েছে, হয়তো একটা সিগারেট দিয়েছে, তাতেই মাথা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু বাজারে ঠ্যাঙানি বলে একটা জিনিস এখনও আছে। সামনের দু’টো দাঁত যদি ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিই তা হলে সেখানে আর দাঁত গজাবে না, মনে থাকে যেন।

ম্যাডান রাজী হয়ে গিয়েছিল। এখন কদিন তো খেয়ে বাঁচা যাক। সিনথিয়ার সঙ্গে সে প্রথম বার-এ ঢুকেছিল। প্রথমে একটু ভয় ভয় করেছিল। সিনথিয়া একটা পায়ের উপর

আর একটা পা তুলে দিয়ে মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিল, 'দেখি, তুমি লাকি চ্যাপ কি না। হয়তো এখনি কাস্টমার পেয়ে যাবো।'

সরাবজীর কেমন ভয় লাগছিল। এমন বেয়াড়া পরিবেশ জীবনে সে কখনও দেখেনি। সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন অবস্থা যে, মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে কাঁচা ঘুটেতে কেউ আগুন দিয়েছে। দূরে গোটা তিনেক লোক বাজনা বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা ইশারায় মেয়েদের ডাকছে—বসে বসে লেমনেড না গিলে এখানে এসে একটু নাচো গাও। আমাদের বার-এর এমন সামর্থ্য নেই যে, আবার পয়সা দিয়ে নাচ গানের মেয়ে রাখবে। অথচ মিউজিক ও ডান্স লাইসেন্স রয়েছে। প্রতি বছর এক আঁচলা পয়সা দিয়ে লাইসেন্স রিনিউ করতে হচ্ছে।

সরাবজী দেখেছিলেন, বার-এর মধ্যে শুধুই লেমনেড চলেছে। জোড়ে জোড়ে সিনথিয়া এবং তার মতো এসকর্টরাই বসে রয়েছে। ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সিনথিয়া বলেছে, 'রাত ন'টা পর্যন্ত এইভাবে চলবে, তারপর খরিদ্দাররা আসতে শুরু করবে। আজ আবার ভাল জায়গা পেলাম না। একটু দেরি করলেই ভাল জায়গাগুলো অন্য মেয়েরা নিয়ে নেয়। সেলারগুলো একটু কোণ চায়। কোণগলো সব ভর্তি হলে তবে ওরা আমাদের দিকে আসবে।" সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সিনথিয়া বলেছে, 'আমার বাপ, অত ধৈর্য নেই। সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আমি বসে থাকতে পারবো না। আর, রহিমকে কিছু পয়সা দিলে হয়। তাও তো এমনিই মাসে এক টাকা দিতে হয়, আর কতো দেবো?"

সরাবজীর বোধহয় গলা শুকিয়ে আসছিল। সে আর একটু লেমনেড খেতেই সিনথিয়া হাতে একটা টোকা দিয়েছিল। 'হ্যালো ম্যান, তুমি কি আমাকে ডোবাবে নাকি? কতক্ষণ এখানে বসতে হবে ঠিক নেই, আর তুমি এরই মধ্যে অর্ধেক গেলাস সাবাড় করে দিয়েছো। যদি আবার লেমনেড কিনতে হয় তোমাকে পয়সা দিতে হবে বলে দিলাম। আমার পয়সা অতো সস্তা নয়, কোথায় খদ্দের তার নেই ঠিক, অথচ খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়িয়ে চলেছি।'

সরাবজী আর কোনও কথা বলেনি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, সামনে গেলাসের মধ্যে কণাগুলো তখনও মুক্তির স্বাদ পেয়ে নেশাখোরের মতো নাচছে। সিগারেটের গন্ধে

কাসি আসছে। ঘরের মধ্যে এবার দু''জন সেলার এসে ঢুকলো। বিরাট লম্বা—কড়িকাঠে মাথা ঠেকে যায়। সিনথিয়া চেয়ার ছেড়ে তাদের দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু তার ছিপে মাছ আটকালো না। সিনথিয়া ফিরে এসে একটু হাঁপালো, তারপর আবার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা সঙ্গীর মুখের উপর ছেড়ে দিলো। সঙ্গীর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে একমনে জলবিন্দুর রাজ্যে যে সঙ্গীত ও নৃত্য চলেছে তাই দেখছে।

সিনথিয়া বললে, 'ঠিক আছে, এখন আর একটু খেয়ে নাও। কাল থেকে বেরোবার আগে দু''তিন গ্লাস জল খেয়ে আসবে। এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো একঘণ্টা পরেই পয়সা নিয়ে চলে যেতে পারবে।”

আরও কথা হতো। কিন্তু হঠাৎ সিনথিয়া ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লো। হল-এর অরণ্য উল্লাসের মধ্যে কে যেন ছিপি এটে দিলো। বেয়ারা এসে সব মেয়েদের টেবিলের দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো, সবার সঙ্গী আছে তো? না হলে গভরমেণ্টের লোক বিপদে ফেলবে, কী যে ওঁদের মর্জি-মাঝে মাঝে দেখতে আসেন কোনো মেয়ে একলা বসে আছে কি না।

সরাবজী শুনলে ম্যানেজার বলছে, 'দেখুন স্যর। সবার এসকর্ট রয়েছে। জেনুইন কাস্টমার।'

ইনস্পেক্টর এবার ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সিনথিয়া এ-সবে অভ্যস্ত। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সরাবজীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগলো। তারা যেন গল্প করছিল এমন ভাব দেখাবার জন্যে বললে, 'আচ্ছা জন, তারপর কী হলো?”

সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছে। সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। তাকে উঠে পড়তে দেখে ম্যানেজার অসন্তুষ্ট হলেন। ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ’কে সঙ্গে করে আপনি বার-এ এসেছেন?”

সে বেচারা বুঝতে পারছিল না কী উত্তর দেবে! সিনথিয়া কিছু বলেও দেয়নি। সিনথিয়া এবার তার দিকে চোখ টিপলে। সেও কোনোরকমে মাথা নাড়লো।

ইনস্পেক্টর বোধহয় সব বুঝলেন। হেসে বললেন, ‘একেবারে নতুন বুঝি?” ম্যানেজার বললেন, 'কী বলছেন স্যর, জেনুইন কাস্টমার। প্রায়ই আসে।' ম্যানেজারের কানের কাছে

মুখ এনে ইনস্পেক্টর বললেন, 'হ্যাঁ, লেমনেড খাবার এমন সুন্দর জায়গা তো কলকাতায় নেই।'

তারপর খরিদ্দার এসে গিয়েছে। নিজের পয়সা নিয়ে সরাবজী চলে এসেছে। তারই শূন্য স্থানে এসে বসেছে হাফেসজী বার-এর নতুন অভ্যাগত।

পরের দিন সিনথিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। সিনথিয়া বলেছে, "তোমার পয় আছে। গতকালের লোকটা দিল খুলে ড্রিঙ্ক করিয়েছে, তারপরেও টাকাকড়ি নিয়ে ছোটোলোকমি করেনি। মেহনত পুষিয়ে দিয়েছে। এমন খদ্দের রোজ পেলে আমাদের দুঃখের কিছুই থাকবে না।"

সরাবজী আবার গিয়ে বসেছে। সিনথিয়ার পাশে বসে লেমনেড খেতে খেতে সে খদ্দের-এর আবির্ভাব কামনা করেছে। আজও আশ্চর্য সৌভাগ্য। গেলাসে এক চুমক দেবার পরেই আগন্তুক এসে গিয়েছেন। পান-সঙ্গিনী হিসেবে সিনথিয়াকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। সরাবজী গেলাসটা ছেড়েই উঠে আসছিল। সিনথিয়া বললে, 'মুখের জিনিসটা ফেলে দিও না। ওটা শেষ করে চলে যাও।'

পরের দিন সরাবজী আবার সিনথিয়ার কাছে গিয়েছে। রিয়েলি লাকি চ্যাপ!' সিনথিয়া বলেছে। 'কাল কী হলো জানো? খদ্দেরকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম, তার ট্রেন ধরবার তাগিদ ছিল। ফিরে এসে আফসোস হলো, আর একবার গিয়ে বসা যেতো। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যা ভুলই করেছিলাম। একাই ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার সাহস করলে না। বললে, 'আবগারী দারোগারা প্রায়ই আসছে —গোলমাল পাকাবে। তাছাড়া তোমার তো এক রাউণ্ড হয়েও গেলো—অন্য বোনদের করে খাবার সুযোগ দাও।

সিনথিয়া নিজে থেকেই সরাবজীকে কিছু, বেশী পরসা দিয়েছে বলেছে— তুমি অতো ল্যাদাড়ু কেন? টেবিল ছেড়ে চলে যাবার আগে খদ্দেরের কাছে বকশিশ চাইবে। আমিও তখন বলবো, আমার লোককে কিছু দিয়ে দিন। আমরা তো ভদ্র, ঘরের মেয়ে—বাবা মাকে লুকিয়ে এসেছি। পয়সা না পেলে ও বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে, আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।"

সরাবজী তবু পয়সা চাইতে পারেনি। চুপচাপ বসে থেকে সে বার-এর রূপ দেখেছে। মালিকের সঙ্গে পরিচয় করেছে। দেখেছে রাত্রের অন্ধকারে পুলিসের লোকেরা মাঝে মাঝে বার-এ আসে। হাফেসজী ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেন। আদর আপ্যায়ন করেন। কোনো ড্রিঙ্ক করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পুলিস খাতা চায়—বার ইনস্পেকশন বুক। ইংরেজীতে হড়হড় করে পুলিস অফিসার লিখে দেন— Inspected the bar at 11 p.m. Mr Hafesji was in personal attendance. Place full of customers. All ladies had escorts Nothing unusual to report.'

কথা থামিয়ে হবস এবার একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "আজও প্রতি রাত্রে কলকাতার বারগুলোর খাতায় ওই একই মন্তব্য লেখা হচ্ছে।" হবস বললেন, "কয়েকদিন পরেই সিনথিয়ার পুরনো সঙ্গী ফিরে এসেছিল। সিনথিয়া কিছুতেই নতুন এস্কর্টকে ছাড়তে চায়নি। বলেছিল, 'এমন পয়মন্ত ছেলেকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

কিন্তু ম্যাডান রাজী হয়নি। বলেছে, 'আমি অন্যায় করতে পারবো না। ওর কাজ আমি নিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন।

ভগবান এবার বোধহয় একটু মুখ তুলে তাকালেন। সিনথিয়ার 'সঙ্গী হাফেসজীর বার-এ চাকরি পেয়ে গেলো। ম্যাডান নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সকালে যখন বার খোলে তখন কোনোই কাজ থাকে না। হাফেসজীর বার খালি পড়ে থাকে। দু' একজন যদি বা আসে তারা এক-আধ পেগ টেনেই পালায়। আবার দপ্তরে একদল আসে। মফঃস্বলের লোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুন্দরী কলকাতার সান্নিধ্যসুখ উপভোগের সময় নেই তাদের। তারপর রাত্রি। হাফেসজী নিজে এসে কাউন্টারে বসেন। বার-এর রঙ এবং রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়।"

মিস্টার হবস এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?"

বললাম, "মোটেই না। সরাবজীকে চেনবার এমন সুযোগ আপনি না থাকলে কোনোদিন পেতাম না।" "

হবস মাথা নাড়লেন। "আমি নিজেই ওকে বুঝতে পারলাম না। আজ এখানে তাকে না দেখলে হয়তো সরাবজী আমার কাছে আরও পাঁচটা লোকের একটা হয়ে থাকতো।

কিন্তু এখন সে আমারই কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।”

আমি বললাম, “সরাবজীকে আপনি আমার কাছে গল্পের নায়কের মতো করে তুলছেন।”

হবস বললেন, “অবজ্ঞা কোরো না, তোমাদের এই হোটেলের প্রতিটি ইটের মধ্যে এক একটা উপন্যাস লুকিয়ে রয়েছে।”

হবস এবার একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। "বুড়ো বয়সে বকবক করা মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। আর চিন্তার শক্তি যখন উবে যায় তখন কোটেশন দেবার রোগে ধরে। আমারও একটা কোটেশন দিতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের হোটেলেই স্যাটা আমাকে বলেছিলেন, a bar is a bank where you deposit your money and lose it; your time and lose it; your character and lose it; your self-control and lose it; your own soul and lose it.

সবই খরচের খাতায়। এই পচা ব্যাঙ্কে তোমার টাকা, সময়, চরিত্র, সন্তানের সুখশান্তি এবং আত্মাকে গচ্ছিত রেখে খোয়াতে হয়। কিন্তু একজন ফুলে ওঠে। সে হাফেসজী। অন্যের খরচ করা পয়সা হাফেসজীর ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা পড়ে।

ম্যাডান যে কবে সরাবজী হয়ে গিয়েছে খবর পাইনি। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি। তারপর কয়েক বছর পরে হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমাকে দেখেই সে ছুটে এলো। আমার হাত দু’টো জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'আমাকে মনে পড়ছে? আপনার দয়াতে সেবার চাকরিটা রক্ষে হয়েছিল। আমি হাফেসজীর দোকান ছেড়ে দিয়েছি।'

‘সে কি? ঝগড়া হলো নাকি?”

'না, ঈশ্বর মুখে তুলে তাকিয়েছেন! আমি নিজেই একটা দোকান করেছি।'

'বার? সে তো অনেক পয়সা লাগে।'

ঈশ্বর যাকে দেখেন তার তো কিছুই প্রয়োজন হয় না। ধর্মতলায় একটা বার পেয়ে গেলাম। যে মালিক, সে অসুখে ভুগছে। তাকে বিলেত চলে যেতে হলো। তাই আমাকে পার্টনার করে নিয়েছে। আমি দেখাশোনা করবো, তাকে লাভের ভাগ দেবো।'

জোর করে সে আমাকে বার-এ ধরে নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত দেখিয়ে বলেছে, “অনেক শান্ত দোকান। ওখানকার মতো নয়। আমি দেখেছি অনেকে বসে ড্রিঙ্ক করছে কিন্তু হৈ হৈ হট্টগোল নেই।

ম্যাডান বলেছে, 'আমি নাম পালটিয়ে নিয়েছি। শরাবের লাইনেই যখন থাকতে হবে তখন আমি সরাবজী।”

আমি বললাম, কিন্তু শরাবের সঙ্গে নিজে কোনো সম্পর্ক না করলে চলবে

সরাবজী লজ্জায় জিভ কেটেছে। 'কী যে বলেন, আমার ঠোঁট জীবনে মদ স্পর্শ করেনি। হাজার হাজার পেগ মদ বোতল থেকে ঢেলে অন্য লোককে দিয়েছি, কিন্তু তার আস্বাদ কী আমি জানি না।”

আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী আমাকে তার বিয়েতে নেমতন্ন করেছে। বলেছে, “আপনার জন্যেই তো সব। সেদিন যদি হাফেসজীর দোকানে টিকতে না পারতাম, তা হলে আমার কিছুই হতো না।' সরাবজী বলছে, 'যাকে বিয়ে করেছি সে বেচারা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল— হাজার হোক মদের দোকানে কাজ করি।”

সরাবজীর বউকে প্রায়ই মার্কেটে দেখেছি। সত্যি লক্ষ্মী বউ। নিজে রেস্তোরাঁর কাঁচা বাজার করেন। অন্য কারুর হাতে বাজারের ভার দিলেই ঠকাবে। মাংসর দাম বেশী লেখাবে, ওজনে কম দেবে। আমি বলেছি, 'আপনি বাজার করেন?”

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'আমি না দেখলে ও-বেচারাকে দেখবে কে? নিজে বাজার করি বলে জিনিসটা ভাল হয়, খদ্দেররা প্রশংসা করে, অথচ দাম কম লাগে।' আমি প্রশ্ন করেছি, 'আপনি কি দোকানেও স্বামীকে সাহায্য করেন?'

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'ওইখানেই তো মুশকিল। ওখানে আমার যাওয়া সম্পূর্ণ বারণ। আমি একবার বলেছিলাম কিচেনে লোকদের সঙ্গে একটা কথা বলে আসবো। কিন্তু উনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বাজার নিয়ে বাড়ি যাই। মেনু ঠিক করে দিই। উনি সেখান থেকে মালপত্তর নিয়ে দোকানে চলে আসেন। যেদিন কাজে আটকে পড়েন, সেদিন কিচেনের মেটকে পাঠিয়ে দেন। কেউ না এলে আমি টেলিফোন করি, কিন্তু তবু দোকানে

যাওয়ার হুকুম নেই। উনি বলেন, দু'নিয়ার যেখানে খুশি যেতে পারো, কিন্তু আমার বার-এ নয়।'

'আর আপনিও বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিয়েছেন!" আমি উত্তর দিলাম।

মিসেস সরাবজী বোধহয় একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কি সম্পর্ক তা জানেন, তাই ফিসফিস করে সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু উনি বলেন, তোমার দেহে না সন্তান আসবে! বার-এর বাতাস সেই অনাগত অতিথির ক্ষতি করতে পারে।"

হবস এবার বোধহয় হাঁপিয়ে পড়লেন। বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "সরাবজীর সন্তান হয়েছে খবর পেয়েছি। আরও খবর পেয়েছি সমস্ত দোকানটাই সে কিনে নিয়েছে। ওর অংশীদার আর বিদেশ থেকে ফিরবেন না, তাই সামান্য যা সঞ্চয় ছিল এবং স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে দিয়ে সরাবজী বার ও রেস্তোরাঁ কিনে নিলে।

আমার সঙ্গে বার-এ আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী বলেছে, 'এসব আপনার জন্যেই সম্ভব হয়েছে, এই বার আপনার নিজের বলেই জানবেন।'

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। সরাবজী বললে, 'আমার এই বার হাফেসজীর বারের মতো নয়। আমি ভাল জিনিস দিই, জল মেশাই না। মেয়েদের ঢুকতে দিই না। তবুও শান্তি নেই।'

প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

সরাবজী বললে, 'আমার বার সাড়ে দশটায় বন্ধ। কিন্তু বিকেল থেকে যারা বসে থাকে, তারা ক্রমশ গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। প্রথম পেগে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় পেগে আনন্দ, তৃতীয় পেগে লজ্জা এবং চতুর্থ পেগ থেকে পাগলামো। তখন আমার ভাল লাগে না। রোজ কিছু না কিছু গোলমাল লেগেই থাকে।'

সরাবজী বললে, 'আমার বার-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। যারা শান্ত পরিবেশে শান্তিতে ড্রিঙ্ক করতে চায় তারাই আসে। তবু মাঝে মাঝে গোলমাল শুরু হয়ে যায়।

নিজের চোখেই তার নমুনা দেখলাম। বেয়ারা এসে বললে, কেবিনে এক সায়েব ডাকছেন।

সরাবজী উঠে পড়লো। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে আমিও ওর পিছু পিছু গেলাম। ইণ্ডিয়ান সায়েব ঠোঁট বেকিয়ে বললেন, 'নট্টা গুডডা ড্রিঙ্ক, পানি ডালটা।"

জিভ কেটে সরাবজী বললে, 'কী বলছেন আপনি? আমার বার-এ ও-সব জোচ্চুরি চলে না। বলেন তো বোতল পাঠিয়ে দিচ্ছি— তার থেকে আপনার সামনে ঢেলে দেবে।"

খরিদ্দার বললেন, 'পাইব্ পেগস্ আলরেডি ড্রিঙ্ক করেছি, তবু মনে হচ্ছে যেন স্বামী বিবেকানন্দের চেলা।"

কেবিন থেকে বেরিয়ে বার-এর কাউন্টারে আসতে আসতে সরাবজী বললে, ‘আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। এমন কেস রোজই দু’একটা এসে পড়ে, নতুন লোক বুঝতে পারে না।"

একটা হুইস্কির বোতল হাতে করে কেবিনে এসে সরাবজী বললে, 'আমরা ডাইরেক্ট মাল নিয়ে আসি। যদি বলেন, সামনে সীল খুলে সার্ভ করছি।'

আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। শুনলাম, এবার ভদ্রলোক আসল প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন। “গার্ল চাই।"

হবস এবার হেসে ফেললেন। বললেন, “ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে সরাবজী যা উত্তর দিয়েছিল তা কোনো সাহিত্যিকের কানে গেলে বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করতো। সরাবজীর হাত ধরে ভদ্রলোক বললেন, প্লিজ...প্লেজার গার্ল’

সরাবজীও তাঁর হাতটা চেপে ধরলো। তারপর তাঁকে বোঝাতে লাগলো, 'গার্ল'স হিয়ার নো গুড। হাউস গার্ল, গার্লস ইন ইয়োর ফ্যামিলি ফার ফার বেটার। হোটেল গার্লস টেক অল মানি।' সরাবজী নিজের ভাব প্রকাশের জন্যে তারপর যেন অভিনয় শুরু করলে। তুলনামূলক সমালোচনা করতে গিয়ে জানালে, স্ট্রীট গার্লস ডোন্ট লাভ ইউ, দে লাভ ইওর মানিব্যাগ। হাউস গার্ল —মাই সিস্টার ইন ইওর হাউস-লাভ ইউ। ইফ সি হিয়ারস, সি উইল উইপ’–এবার সরাবজী কেঁদে কেঁদে অভিনয় করতে লাগলো। ভদ্রলোক বোধহয় যেন একটু লজ্জা পেলেন। কোনোরকমে মদের বিল চুকিয়ে, একটা পয়সাও টিপস না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

সরাবজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখলেন তো? আগে একলা ছিলাম, তখন সব সহ্য হতো। এখন বয়স হচ্ছে, মেয়ের বাবা হয়েছি, কেমন যেন অসহ্য লাগে।'

আমি কিছুই না বলে ফিরে এসেছি। খবর পেয়েছি, সরাবজীর দোকান এখন ভালভাবেই চলছে। অনেক মদের স্টক ওর। যা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না তাও ন্যায্যমূল্যে সরাবজীর বার-এ পাওয়া যায়। সরাবজী বলেছে, ঈশ্বর ওপরে আছেন, সৎপথে থেকে ব্যবসা করছি। তিনি দেখবেন।”

আরও একদিন সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভদ্রলোক মুখ শুকনো করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাড়িতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি থামিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?”

সরাবজী বললে, ড্রিঙ্ক করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় কেন বলতে পারেন??

বললাম, 'হয়তো অ্যালকহলের রাসায়নিক ফল।”

সরাবজী বললে, 'আমি কান মলেছি! মাতালদের আমি কোনোদিন আর কিছু বলবো না। জানেন, দোকানে আসবে এক সঙ্গে; এক সঙ্গে মদ খাবে, এক সঙ্গে মস্করা করবে, তারপর এক সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। সেদিন রাত ন'টার সময় দু' ভদ্রলোক নেশার ঘোরে প্রচণ্ড চিৎকার করছিলেন। টেবিলে গেলাস বাজাচ্ছিলেন। গান গাইছিলেন। আর একদল লোক—এরা আমার দোকানের লক্ষ্মী, রোজ তিন চারশ টাকার মদ নেন,— তাঁরাও পাশে বসেছিলেন। তাঁদের একজন আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার বার যে তাড়িখানা হয়ে গেলো। ভদ্রলোকেরা এখানে আর ড্রিঙ্ক করতে আসবেন না। হাফেসজীর মেয়েধরা বারের লোকগুলোকে আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওদের সামলান, না হলে আমরা আর আসবো না।'

বাধ্য হয়ে আমি গিয়ে ভদ্রলোক দু''জনের কাছে দাঁড়ালাম। তাঁরা দু''জনে তখন রেডিওতে ক্রিকেট খেলার রিলে করছেন। ইণ্ডিয়া এক ওভারে এম সি সি-কে খতম করে, পরের ওভারে অস্ট্রেলিয়াকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। এক ভদ্রলোক বলছেন, তা হয় না। আর এক ভদ্রলোক বলছেন, আমার যা খুশী তাই করবো। তাতে কার পিতৃদেবের কী? এবার অকথ্য গালাগালির বর্ষণ। আমি বললাম, 'আপনারা এ কি করছেন?”

ওরা বললে, ‘বেশ করছি। তুমি কে হে হরিদাস পাল?”

আমি বাধ্য হয়েই বললাম, 'এ-রকম হৈ চৈ এই বারে চলতে পারে না, এতে অন্য কাস্টমারদের অসুবিধে হয়।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন। অন্য লোকদের ডেকে বললেন, 'জানেন, মাতাল হয়েছি বলে বের করে দেবে বলছে। বারের মালিক-এর এতো বড়ো স্পর্ধা।' অন্য কয়েকজন ওঁদের দলে গিয়ে, চিৎকার করে বললেন, 'মালিকের এতো সাহস! ব্রাদার, আমরা এখনি সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। মদ খেয়ে হৈ হৈ করবে না তো কি গীতা পড়ে শোনাবো?"

সরাবজীর চোখ এবার ছলছল করে উঠলো। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? যারা আমার কাছে কমপ্লেন করেছিল, তারাও টেবিল ছেড়ে ওয়াক-আউট করে গেলো। আমি তাঁদের হাত ধরে বললাম, আপনারা বললেন বলেই, আমি ভদ্রলোককে বারণ করতে গেলাম। ওঁরা কী বললে জানেন?

বললে, আমরা মাতাল মানুষ, নেশার ঘোরে যদি কিছু বলেই থাকি, তা বলে আপনি একজন ভাইকে অপমান করবেন? হু, আর ইউ? কলকাতায় কি আর মালের দোকান নেই? এই দোকানে ঘুঘু চরবে। আমরা এখানে প্রয়োজন হলে পিকেটিং করবো।"

সরাবজী বললে, "প্রায় তিন সপ্তাহ আমার হোটেল বন্ধ, কেউ আসে না। শেষে বাধ্য হয়ে আজ এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বহু কষ্ট করে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছি। হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, যদি আমার কোনো দোষ হয়ে থাকে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আপনারাই আমাকে বলতে বলেছিলেন, তাই ভদ্রলোককে আমি গোলমাল করতে বারণ ছিলাম। ভদ্রলোক রাজী হয়েছেন। আবার দলবল নিয়ে আসবেন। কিন্তু ভদ্রলোক সাবধান করে দিয়েছেন, "মাতালদের কথায় বিশ্বাস করে আর কখনও কাউকে অপমান করবেন না।"

হবস এবার বর্তমানে ফিরে এলেন। বললেন, "এই সরাবজীকেই আমি চিনতাম। বেশ গুছিয়ে এবং ভদ্রভাবে ব্যবসা করছিল। একটিমাত্র মেয়ে, তাকেও বাইরে ইস্কুলে রেখে পড়িয়েছে। তার মেয়েকেও আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানাতে আলাপ হয়েছিল, মেয়েকে সঙ্গে

করে বাবা গিয়েছিলেন। এই পর্যন্তই জানতাম। কিন্তু সরাবজী কী করে ধর্মতলা থেকে শাজাহানে হাজির হলো, জানি না।"

হবস এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমাদের ম্যানেজার মনে হচ্ছে আজ আর ফিরবে না। ব্যাপার কী? হোটেল ছেড়ে প্রায়ই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছেন। একা স্যাটা বোস কী এই হোটেল চালাবে?"

হবস উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "থাক, সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, এটাই আনন্দের কথা।"

আবার যখন ডিউটিতে ফিরে গিয়েছি, সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর টিকালো নাক এবং প্রশস্ত বুকও যেন ঈশ্বরের চরণে বিনয়ে নত হয়ে রয়েছে। কম কথা বলেন তিনি। তবুও আজ তাঁকে আমার বহুদিনের পরিচিত মনে হলো। শাজাহানের বার ম্যানেজারের মধ্যে আর-একজন 'আমি'কে খুঁজে পেলাম। আমারই মতো নিজের পায়ে হাঁটা পথেই তিনি সংসারের দীর্ঘ সমস্যা অতিক্রম করে এসেছেন।

হেড্ বারম্যান বলেছে, "জব্বর সায়েব বাবু,, সব ককটেল হাতের মুঠোর মধ্যে। কতরকমের মিক্সিং যে জানেন।"

আমরা দাঁড়িয়ে দেখেছি বার-এ তিল ধারণের জায়গা নেই। বিজনেসের যন্ত্রপাতিতেও তেল দরকার হয়, সেই আধুনিক লুব্রিকেশন তেল হলো হুইস্কি। বুঁদ হয়ে চোখ বুজে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা গলায় হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছেন, খালি গেলাস আবার বোঝাই হচ্ছে। স্বল্পভাষী সরাবজী আমাকে বললেন, "মৃত" দেহ টিকিয়ে রাখতে হুইস্কির মতো জিনিস নেই। যদি কোনো মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে চাও তবে তাকে হুইস্কির মধ্যে রাখো— আর জ্যান্ত লোককে যদি মারতে চাও তাহলে তার মধ্যে হুইস্কি ঢালো!"

সরাবজীর সঙ্গে ক্রমশ আমার পরিচয় নিবিড় হয়েছে। বুঝেছি, তাঁর মধ্যে বুদ্ধির শাণিত তীক্ষ্ণতা নেই। কিন্তু সৎপথে থাকার তীব্র বাসনা আছে, আর আছে ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস।

সরাবজী যেন আজও সব বুঝতে পারেন না। অন্তরের দ্বন্দ্ব থেকে আজও মুক্ত হতে পারেননি তিনি। এবং সে গল্পের শেষ অংশ আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছিলাম।

বার-এর এক কোণে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন—কবে এই বার-পর্ব শেষ হবে, সুরা-পিয়াসীদের মনে পড়বে তাদেরও বাড়ি আছে, সেখানে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তারা বিল চুকিয়ে উঠে পড়বে, বারম্যানরা চেয়ারগুলো ঠিক করে রাখবে, আমি ক্যাশ বন্ধ করে হিসেব করবো, তারপর ছুটি।

সরল মানুষ সরাবজী। বললেন, "বাবুজী, আমার তো লেখাপড়া হয়নি। কিন্তু যারা পড়াশোনা করে, যারা চিন্তা করে, তাদের আমার খুব ভালো লাগে। আমার স্ত্রীর কাছে আমি দুঃখ করি।" সরাবজী আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা তো তবু বই-টই পড়ো। মানুষ কেন হুইস্কি খায় বলতে পারো?"

আমি বললাম, "মিস্টার স্যাটা বোসের ধারণা, হুইস্কির মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দু'র্বল শক্তি খোঁজে, দুঃখী সুখ খোঁজে, কিন্তু অধঃপতন ছাড়া কেউই কিছু পায় না।"

ছোটছেলের মতো সরল বিশ্বাসে সরাবজী হেসেছিলেন। সরাবজী প্রশ্ন করে ছিলেন, "আচ্ছা, আমরা যারা মদ বিক্রি করি তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেননি?"

আমি পরম বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি চেয়ারে বসে পড়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে সব বলছি। হয়তো তুমি বুঝবে। লেখাপড়া জানি না বলে আমি নিজে উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, সে অনেক লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু নিজের মেয়েকে এ-সব জিজ্ঞাসা করা যায়?"

মেয়েকে সত্যিই ভালবাসেন সরাবজী। তাঁর জীবন মরুভূমিতে একমাত্র মরুদ্যানের মতো সে। বলেছেন, "তুমি আমার মেয়েকে জানো না। এমন বুদ্ধিমতী এবং পণ্ডিত মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না। এবং সে সুন্দরীও বটে," সরাবজী বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন। "কত মোটা মোটা বই যে সে পড়ে। জানো, সে রোজ আমাকে চিঠি লেখে। আমারও খুব বড় বড় চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি যে লেখাপড়া শিখিনি, আমার যে বানান ভুল হয়। মেয়ের কাছে লিখতে লজ্জা হয়। মেয়ে অবশ্যি বলে, 'বাবা, তুমি ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। তুমি আমাকে বড় বড় চিঠি লিখবে।" জানো, সে এখন বিলেতে

পড়ছে।” যে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়ে অনাথ আশ্রম থেকে এসেছিল, তার মেয়ে। গর্বে বৃদ্ধ অশিক্ষিত সরাবজীর বুক ফলে উঠলো।

কোনো মহাপুরুষ বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত রকমের প্রেম আছে তার মধ্যে মেয়ের প্রতি বাবার ভালবাসা সবচেয়ে স্বর্গীয়। 'He beholds her both with and without regard to her sex'. স্ত্রীর প্রতি আমাদের ভালবাসার পিছনে কামনা আছে, ছেলের প্রতি ভালবাসার পিছনে আমাদের উচ্চাশা আছে, কিন্তু মেয়ের প্রতি ভালবাসার পিছনে কিছুই নেই। বইতে পড়া কথাগুলোই আজ সরাবজীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখলাম।

সরাবজীর দুঃখের কথা সেদিনই শুনেছিলাম। সরাবজী কোনোদিন স্ত্রী বা মেয়েকে বার-এ আসতে দেননি।

সকাল ন'টা পর্যন্ত বাড়িতে থাকতেন তিনি। তারপর বাজার নিয়ে রেস্তোরাঁয় আসতেন। দু’পুরে বাড়ি থেকে ভাত আসতো। বিকেলে একবার চা খাবার জন্যে বাড়ি যেতেন। তারপর শুরু হতো বার-পর্ব। যত রাত বাড়বে তত সমস্যা বাড়বে। সাড়ে দশটায় দরজা বন্ধ করা প্রতিদিনই সমস্যার ব্যাপার। অনেকে উঠতে চায় না। অনেকে বলে, বার খুলে রাখো। বলতে হয়, খুলে রাখবার লাইসেন্স নেই। লোকে গালাগালি করে গেলাস ভাঙে। সরাবজী দেখতে পারেন না। কয়েকজনের জন্যে রিকশা বা ট্যাক্সি ডেকে দেন। নেশার ঘোরে হয়তো গাড়ি চাপা পড়বে।

লোকগুলো যখন আসে কেমন সুস্থ। হাসে, নমস্কার করে, কেমন আছে খবর নেয়। কিন্তু তারপরেই ধীরেধীরে রং বদলাতে শুরু করে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে, বলেন, সামান্য একটু খেয়ে বাড়ি ফিরে যান। হাউস গার্লরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বলতে সাহস হয় না।

মেয়ে বলেছে, “বাবা, তোমার দোকানে যাবো।”

“না মা, ওখানে যেতে নেই। ওখানে আমার অনেক কাজ, খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।”

“কেন বাবা, গেলে কী দোষ হয়?”

“ছিঃ, অবাধ্য হয়ো না মা, ওখানে যেতে নেই

বড় হয়েছে মেয়ে, ফুলের মতো বসন্তের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মেয়ে। কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত বিদ্যা অথচ কত সরল। সংসারের কিছুই জানে না। মেয়ে কতবার বলেছে, "বাবা, তোমার মতো আমিও ব্যবসা করবো।" বাবা বলেছেন, "না মা, তুমি প্রফেসর হবে। বিরাট পণ্ডিত হবে। দেশ-বিদেশের লোকরা বলবে, ওই মূর্খ লোকটার মেয়ে কত শিখেছে।"

মেয়ের বিলেত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে ছেড়ে সরাবজী কেমন করে অতোদিন থাকবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু উপায় কী? ডক্টর মিস সরাবজ্জী হয়ে তাঁর মেয়ে যেদিন আবার ফিরে আসবে, সেদিন? সেদিন তো কাগজে তাঁর মেয়ের ছবি বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সে রাত্রে মেয়ের যে কী হলো। সরাবজীর বার-এ তখন তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়েছে। মেঝের উপর তখন একজন শুয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজা বেরোচ্ছে। বেঞ্চের উপর দু''জন গুম হয়ে গেলাস নিয়ে বসে আছে। বলছে, "বেয়ারা, আউর এক পেগ লে আও।"

বেয়ারা বলেছে, "হুজুর, এই পেগের বিলটা। আমরা কী করবো হুজুর, একসাইজ আইন। বিল পরের পর আসবে, আর মিটিয়ে দিতে হবে।"

সরাবজী কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিলেন, "আপনাকে কী দেবো?"

"একেবারে নির্ভেজাল হুইস্কি। যেন গলা দিয়ে নামতে নামতে সব জালিয়ে দেয়।"

বেয়ারারা একা সব সামলাতে পারছিল না। তাই সরাবজী নিজেও ছোটাছুটি করছিলেন। এমন সময় কার আবির্ভাবে মাতালদের মধ্যে যেন চাপা গঞ্জন উঠলো। "কে?" চমকে উঠে সরাবজী দেখলেন তাঁর মেয়ে।

"তুই?তুই এখানে?" সরাবজী কোনোরকমে বললেন।

মেয়ে বাবাকে চমকে দেবার জন্যেই এসেছিল। বাবাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরবে। আর ক'দিন? তারপর কতদিন আর বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ এখন বাবার পাশে বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, "বাবা, তুমি যখন অনাথ আশ্রমে ছিলে তখন তোমাদের মাখন দিতো?"

বাবা বলবেন, "না মা, মাখন কোথায়। তিন টুকরো পাঁউরুটি কেবল।" মেয়ে নিজেও এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখেনি। একটা বিরাট কড়ার মধ্যে কতকগুলো অপ্রকৃতিস্থ লোক যেন টগবগ করে ফুটছে। বাবার হাতের পেগমেজারটা কেঁপে উঠে কিছুটা মদ টেবিলে পড়ে গেলো। মেঝেতে যে লোকটা পড়েছিল সেও এবার উঠে বসে চিৎকার করে বললে, "আমিও একটা বড়া পেগ চাই।" মেয়ে স্তম্ভিত। আনন্দ করে বাবাকে নিয়ে পালাবে বলে ঠিক করেছিল। তার মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। "বাবা, আমার সঙ্গে যাবে না?"

মেয়ের হাত ধরে বাবা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, তাঁর দেহ কাঁপছে। কোনোরকমে বলেছেন, "তুমি বাড়ি যাও। এখন বার বন্ধ করবার উপায় নেই। ওরা রেগে গিয়ে সব ভেঙে দেবে।"

বাড়িতে ফিরে এসে সরাবজী দেখেছিলেন মেয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরের দিন মেয়ের সামনে যেতে তাঁর ভয় করেছে। মেয়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

বিলেত যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মেয়ে কেমন মনমরা হয়ে আছে। সভ্যতার সর্বনাশা রশ্মি যেন মেয়েটার নরম মনকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। সরাবজী ভেবেছেন, মেয়েকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন। বলবেন, "কেন মা তুই এ-সব ভাবছিস, তুই পড়াশুনা কর। তুই কত বড় হবি।"—কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

তারপর যাবার দিনে ভোরবেলায় বোধহয় বাবা ও মেয়ের একান্তে দেখা হয়েছিল। মা তখন ঘুমিয়ে। বাবা নিভৃতে মেয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। "তুই কিছ বলবি? তোর মুখ দেখে ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে তুই আমাকে কিছু বলতে চাস।"

মেয়ের ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠেছে। কোনোরকমে বলেছে, "আমার ভয় করছে, বাবা। যাদের সেদিনকে তোমার দোকানে দেখে এলাম তাদের মা, বোন, স্ত্রী, মেয়েরা হয়তো চোখের জল ফেলছে। তারা কী আমাদের ক্ষমা করবে?"

বাবা চমকে উঠেছিলেন। বলতে গিয়েছিলেন, "আমি কী করবো? আমার কী দোষ? আমি তো আর ওদের টেনে নিয়ে এসে বার-এ ঢোকাচ্ছি না। আমি সৎপথে ব্যবসা করি।" কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

মেয়ে ট্রেনে চড়ে বোম্বাই গিয়েছে। এবং সেখান থেকে জাহাজে বিলেত। কিন্তু সরাবজী নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি চোখের সামনে শুধু মেয়ের বিষণ্ন মুখ দেখতে পেয়েছেন। মেয়ে যেন তাঁকে প্রশ্ন করছে—তারা কী তোমায় ক্ষমা করবে?

মনের দ্বন্দ্বে কাতর হয়ে পড়েছেন সরাবজী। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, "আমি কি বলেছি তোমরা অতো পেগ খাও। এক পেগ খেয়ে উঠে গেলেই পারো। আমি কী করবো, আমি না খাওয়ালে তোমরা অন্য দোকানে গিয়ে খাবে।" তবু মেয়ে যেন তাঁকে প্রশ্ন করছে। তিনি মনে মনে বলেছেন, "ওদের স্ত্রী আর মেয়েরা তো বারণ করলেই পারে। আমি কী করবো? আমি সামান্য মদের ব্যবসায়ী, যত দোষ আমারই হলো?"

কিন্তু কিছুতেই পারেননি। যতই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন ততই যেন একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তাঁর মনের মধ্যে গেথে বসেছে। সেই চিহ্নটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন—যত লোক তাঁর দোকানে এসেছে তাদের মা, বোন, বউ, মেয়ে সবাই চোখের জলে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে। সেই অভিশাপের বিষবাষ্প শুধু তাঁকে নয়, তাঁর সংসার, এমনকি তাঁর মেয়েকেও গ্রাস করছে।

সরাবজী পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন, তারপর একদিন মরিয়া হয়ে বার বিক্রি করে দিয়েছেন। সেই রাত্রেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতে বসেছিলেন, "আমার কী দোষ? ওরা যদি নিজে এসে দোকানে বসে মদ খেয়ে নিজেদের সংসার নষ্ট করে থাকে, তাতে আমার কী দোষ?"

এইখানেই শেষ হলে ভাল হতো। বিক্রির টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে সরাবজী ছোট্ট সংসার চালিয়ে নিতে পারবেন ভেবেছিলেন।

কিন্তু সেখানেই মুশকিল হলো, ব্যাঙ্ক ফেল পড়লো; যেদিন বিক্রির চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন তার দু''দিন পরে।

হয়তো অভিশাপ, হয়তো চোখের জলের ফল।

সরাবজী কী করবেন? মেয়েকে তাঁর পড়াতে হবে। অবশিষ্ট যা আছে তাতে মেয়েকে বিলেতে রাখা যাবে না। কাজ চাই। কিন্তু ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়া লোককে কে চাকরি দেবে?

তাই ঘরে ফিরে আবার বার। সরাবজী ফিসফিস করে আমাকে বললেন, “এবার আমি তো চাকরি করছি। আমি কী করবো? যদি কোনো অভিশাপ কেউ দেয় সে নিশ্চয় আমাকে লাগবে না।”

সরাবজীর চোখে নিশ্চয়ই জল ছিল না। কিন্তু আমার মনে হলো সেখানে দু'ফোঁটা জল রয়েছে। সরাবজী আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চোখ বুঁজে ঈশ্বরকে বোধহয় আর একবার প্রশ্ন করছেন, 'চাকরি করলে নিশ্চয়ই কোনো দোষ নেই? আমাকেও তো সংসার প্রতিপালন করতে হবে।”

আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতভাগ্য সরাবজী উঠে পড়ে এবার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আর আমি সংসারের সৌরমণ্ডলে এক নতুন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারের আনন্দে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এক এক সময় নিজেকে আমার খুব স্বার্থপর মনে হয়। আমার কর্ম-জীবনের সঙ্কীর্ণ পৃথিবীতে যারা একদিন পদার্পণ করেছিল তাদের সুখ-দুঃখের এই সুদীর্ঘ বিবরণ আমার ভাল লাগলেও লাগতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে পাঠক-পাঠিকাদের কেন টেনে আনলাম? আবার ভাবি, ফোকলা চ্যাটার্জি, মিসেস পাকড়াশী, মিস্টার আগরওয়ালার গতায়াত কিছু, আমার পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় হওয়াই ভাল।

এক এক সময় আবার অন্য চিন্তা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে যায়। শাজাহান হোটেলে প্রতিদিন অতিথিদের যে জোয়ারভাটা খেলে, তাদের কোনো পরিচয় তো আমার রচনায় রেখে যেতে পারলাম না। যাদের অতি নিকট থেকে দেখলাম, যাদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমার সুখদুঃখ জড়িয়ে গিয়েছিল, কেবল তাদের কথাই লিখলাম। অথচ যে বিশাল জীবনস্রোত প্রতিদিন আমার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হলো, দর্শকের আসর থেকে তাকে কেবল দেখেই গেলাম, তার সংবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিলাম না। অনাগত কালে কোনো বিরল-প্রতিভা হয়তো বঙ্গভারতীর সেই অতি প্রয়োজনীয় অভাব দূর করবেন। তাঁর লেখনীস্পর্শে পান্থশালার বহু মানুষের কলধ্বনি অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার পেয়ে বর্তমানের কাছে ধরা দেবে, তীব্র ঘৃণাদায়ক অসুন্দেরের মধ্য থেকে সাহিত্যের পরমসুন্দর ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবেন। কাউন্টারে সেদিন কোনো কাজ ছিল না, চুপচাপ বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় বোসদার হাতের স্পর্শে চমকে উঠলাম। বোসদা হেসে বললেন, "কী এতো ভাবছো?"

বললাম, "কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই হোটেলে কোনোদিন যে ঢুকতে পারবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি; অথচ অন্দরে ঢুকে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই নিজের অজ্ঞাতে কখন আমার সত্তা শাজাহানের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।" বোসদা আবার হাসলেন। "তোমরা যে সব সায়েব হয়ে গিয়েছো—পূর্বজন্মে বিশ্বাস করো না। না হলে

বলতাম, আমি এখানে আরও কয়েকবার এসেছি। এই হোটেলের প্রতিটা ঘরের সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচয় রয়েছে।”

“হয়তো তাই।” আমি বললাম, “হয়তো আমিও এখানে আগে এসেছিলাম। হয়তো এমনিভাবেই কোনো বিষণ্ন নয়না করবী গুহ কে আমি দেখেছিলাম। হয়তো আরও কত কনি এবং সাদারল্যান্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।”

“আরও কতজনের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি,” বোসদা খাতা লিখতে লিখতে বললেন। “তবে এইটুকু বলতে পারি, আমাদের চোখের সামনেও অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিজের কাজেই মত্ত থাকি, তার খেয়াল করি না।”

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে, বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, “মাঝে মাঝে আমি ১৮৬৭ সালের কথা ভাবি। আমাদের নয় অন্য হোটেলের কথা। কিন্তু আমাদেরই মতো কোনো এক রিসেপশনিস্টের চোখের সামনে নিশ্চয় তা ঘটেছিল। সেদিনের সেই রিসেপশনিস্টও নিশ্চয় আমাদেরই মতো খাতার মধ্যে ডুবে ছিল, এবং পায়ের শব্দে চমকে উঠে আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একি! এমন অতিথি তো সাহেবী হোটেলে কখনও দেখা যায় না! ভদ্রলোকের গায়ে উড়নি, ভিতরে পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে লাল চটি। হয়তো রাস্তা চিনতে না পেরে নেটিভ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখানেই ঢুকে পড়েছেন। কিংবা, যা দিনকাল, কিছুই বলা যায় না। হয়তো পণ্ডিতও বার-এ বসে ফরাসী দেশের দ্রাক্ষাকুঞ্জের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান!

রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই তার অভ্যস্ত কায়দায় সুপ্রভাত জানিয়েছিল এবং পণ্ডিতের সুগম্ভীর ইংরেজী উত্তরে অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'আই ওয়ান্ট টু সি মিস্টার...' পণ্ডিত বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই চিরাচরিত প্রথা মতো রিসেপশনিস্ট ভিজিটরস স্লিপ এগিয়ে দিয়েছিল। গোটা গোটা অক্ষরে পণ্ডিত সেখানে নাম লিখে দিয়েছিলেন। স্লিপের দিকে তাকিয়ে, আমরা যেভাবে আজও উত্তর দিই, ঠিক সেইভাবেই সেদিনের হোটেল-রিসেপশনিস্ট নিশ্চয় উত্তর দিয়েছিল, ‘ও মিস্টার ডাট্! যিনি সবে বিলেত থেকে এসেছেন? জাস্ট এ মিনিট।

রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণকে জানতো না। কেনই বা এসেছেন? হয়তো বা সামান্য সাহায্যের আশায়। রিসেপশনিস্ট তবুও তাঁকে বসতে বলেছিল। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক হোটেলের নতুন অতিথির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন।

লাউঞ্জে এসে অতিথি অন্য সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন, কিন্তু পণ্ডিতকে দেখে দু''হাতে গলা জড়িয়ে মুখে চুম্বন করলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে বুকে চেপে ধরে ক্রমাগত চুম্বন ও নৃত্য করতে লাগলেন। অপ্রস্তুত পণ্ডিত বলতে লাগলেন, "আরে করো কি, করো কি, ছাড়ো।" বোসদা এবার থামলেন। আমাদের হোটেলের কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাইকেল মধুসুদন ও বিদ্যাসাগরের সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করলে আজও রিসেপশনিস্ট হিসাবে আমার দেহে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমাদের এই শাজাহানেও এমনই কত নাটকীয় মূহূর্তে আমরা হয়তো উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি। তবে মধুসুদনের হোটেলের সেই রিসেপশনিস্টকে আমি হিংসে করি। অসংখ্যের মধ্যে এতোদিন পরে আজও তাকে আমরা মনে রেখেছি। আর সবাই বিস্মৃতির অতলগর্ভে কোথায় তলিয়ে গেলো, যেমন আমরাও একদিন যাবো।"

বোসদার হাত ধরে আমিও ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই হারিয়ে যাওয়া মধ্যাহ্নে ফিরে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে মাইকেল মধুসূদন এবং ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম আজও আমার চোখের সামনে যে-সব ঘটনা ঘটছে, কে জানে তারাও একদিন হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

বোসদা নিজের মনেই চিন্তা করছিলেন। বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম ইতিহাসের দু'টো অংশ—একটা ফলাও করে লেখা হয়, ছাপা হয়। আর একটা চিরদিনই অলিখিত থেকে যায়। সবাই তা জানে, অথচ কেউই তা প্রকাশ করতে সাহস করে না। আমরা বোধহয় আমাদের চোখের সামনে সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করছি।"

আমি বললাম, "কিছুই বুঝতে পারছি না, বোসদা।"

বোসদা উত্তর দিলেন, "এই স্যাটা বোসও পারে না। বইতে বলছে—ইতিহাসের চরিত্রগুলো সত্য, আর ঘটনাগুলো মিথ্যা। আর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে চরিত্রগলো মিথ্যা, কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বোসদা নিজেই প্রতিবাদ তুললেন, "কথাটা নির্ভেজাল সত্য নয়, কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু এও ঠিক যে, সমাজের সব সত্য ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায় না।"

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। বোসদা বললেন, "এতোক্ষণ য়ুনিভার্সিটির হেড্ অফ দি ডিপার্টমেন্টের মতো লেকচার দিচ্ছিলাম! ভগবানের সহ্য হলো না। মনে করিয়ে দিলেন যে, আমি শাজাহান হোটেলের হরিদাস পাল রিসেপশনিস্ট।"

টেলিফোন ধরে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যাটা বলছি।...নিশ্চয়ই, আপনার কোনো চিন্তা নেই, আপনি চলে আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে বোসদা খাতা খুললেন। খাতায় একটা ঘর বুক করলেন।

বললাম, "এখন কে আসছেন?"

বোসদা বললেন, "এমন একজন যাঁর এই কলকাতাতেই ফ্যাশনেবল পল্লীতে বাড়ি আছে, সে-বাড়ির অনেক ঘর খালি পড়ে রয়েছে। তবু তিনি আসতে চান। এই রাত্রের আশ্রয়ের জন্য সামান্য হোটেল-কেরানীর পায়ে পড়তেও তিনি রাজী আছেন।"

"ব্যাপার কী?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"বিপুলা এ-পৃথবীর কতটুকু জানি!" বোসদা মাথা নাড়লেন। "তাঁর নাম শুনলে, কত লোক এখনি এই হোটেলে ছুটে আসবে। আমরা সবাই তাঁকে চিনি!" একটু পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। আমি ফোন ধরতেই পুরুষালী গলায় এক ভদ্রলোক বললেন, "আজ রাত্রে কোনো ঘর পাওয়া যাবে?"

বোসদা আমার হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বললেন, "আপনার নাম?" তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, "স্যরি, কোনো উপায় নেই।"

টেলিফোন নামিয়ে দিতেই আমি ওঁর দিকে তাকালাম। কারণ আজ আমাদের কয়েকটা ঘর খালি রয়েছে। অথচ বোসদা বেমালুম বললেন, "কিছুই খালি নেই।"

মাত্র কিছুক্ষণ পরেই যাঁকে শাজাহান হোটেলের কাউন্টারে এসে দাঁড়াতে দেখলাম, রূপালী পর্দায় ছাড়া অন্য কোথাও তাঁকে যে দেখবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনি চিত্রজগতের উজ্জজ্জ্বল তারকা শ্রীলেখা দেবী। সিনেমার পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু

মনকেমন-করা ছবি আমি দেখেছি। আমাদের হোটেলে কিন্তু মাত্র একবার তাঁর নাম বোসদার মুখে শুনেছিলাম। কোন এক পার্টিতে ফোকলা চ্যাটার্জি এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার গায়ে বমি করে দিয়েছিলেন। পার্টির মধ্যেই শ্রীলেখা দেবীকে উঠে গিয়ে শাড়ির আঁচল ধুয়ে বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল। ঘেন্নায় তাঁর তখন ফেণ্ট হবার মতো অবস্থা! ফোকলা চ্যাটার্জি ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন, "শ্রীলেখা দেবী, কিছু মনে করবেন না। নতুন ককটেল ট্রাই করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা হলো। ব্যাটারা ককটেলের নাম দিয়েছে 'ফিল্মস্টার', কিন্তু ও-সব দেখতেই ভাল, কাছে আনতেই বমি হয়ে গেলো, কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না।"

শ্রীলেখা দেবী কিন্তু শোনেননি। সোজা বলে দিয়েছিলেন, ফোকলা যে পার্টিতে থাকবে সেখানে তিনি যাবেন না। বেচারা ফোকলাকে সেই থেকে ফিল্ম পার্টিতে কেউ নেমন্তন্ন করে না।

ফোকলা দু'একবার আমাকে বলেছেন, "কী হাঙ্গামা বলুন দেখি মশাই। মানুষের শরীর বলে কথা, মাঝে মাঝে গা বমি বমি করবে না? অথচ শ্রীলেখা দেবীর ধারণা, আমি ইচ্ছে করেই ওঁর গায়ে বমি করে দিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে তো জানা-শোনা আছে, ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

ফোকলা চ্যাটার্জি তখন নেশার ঘোরে ছিলেন। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিলেন, "ঠিক হ্যায় মশায়, এ শর্মার নাম ফোকলা চ্যাটার্জি। মাল খেতে না ডাকলে হয়তো বমি করতে পারবো না। কিন্তু কুলকুচি?কোন দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনাদের শ্রীলেখা দেবীর মুখে কুলকুচির জল ছড়িয়ে দেবো, মুখের সব পাউডার তখন ধুয়ে বেরিয়ে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে, আর একটিও কন্ট্রাক্ট পাবে না।"

ফোকলা চ্যাটার্জি সেদিন বিশ্বাস করেননি, কিন্তু শ্রীলেখা দেবীর সঙ্গে আমার সত্যিই পরিচয় ছিল না। আজ প্রথম দেখলাম। বোসদা ওঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর খাতা দেখে ওঁর ঘরের নম্বর বলে দিলেন।

শ্রীলেখা দেবী বলেছিলেন, "আমাকে একটা কাপড় কিনে দিতে পারেন?"

“এতো রাত্রে? দোকানপাট তো সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।” বোসদা বললেন। শ্রীলেখা দেবী বললেন, “এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি। কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি।”

চিত্রজগতের ইতিহাসে আমার এক বিশিষ্ট 'অবদান' আছে। তাঁদের প্রখ্যাত অভিনেত্রীর জন্যে আমি ধর্মতলা স্ট্রীটের এক পরিচিত দোকানের দারোয়ানকে জাগিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে শাড়ি কিনে এনেছিলাম। অতি সাধারণ শাড়ি। কিন্তু তাই পেয়েই শ্রীলেখা দেবী যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

রাত্রে ছাদে বসেছিলাম। বোসদা বলেছিলেন, “শ্রীলেখা দেবী জীবনে অনেক শাড়ি পরেছেন, তাঁর অনেক শাড়ি থেকে দেশের ফ্যাশন তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই শাড়িকে তিনি কোনোদিন ভুলবেন না।”

বোসদা আরও বলেছিলেন, “ভাবছি, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নোট বইতে লিখে রাখবো। যদি কোনোদিন আত্মজীবনী লিখি কাজে লেগে যাবে! এই সত্যসুন্দর বোস সেদিন বো-টাই আর স্যুট ছেড়ে দিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাতারাতি সাহিত্যিক বনে যাবে। দলে দলে গুণমুগ্ধ ভক্ত এই আদি অকৃত্রিম স্যাটা বোসের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে।”

“লেখেন না কেন?” আমি অভিযোগ করেছি।

“লিখে কিছুই করা যাবে না।” বোসদা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “শুনেছি, লেখার জোরে পৃথিবীর কত পরিবর্তনই না হয়েছে, সভ্যতা বারে বারে লেখকের ইঙ্গিতেই নাকি মোড় ফিরেছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। লেখার জোরে এই অন্ধ, বোবা, বৈশ্য সভ্যতার কিছুই করা যাবে বলে মনে হয় না। মাইক দিয়ে চিৎকার করো, মহাভারতের মতো আড়াই সেরী বই লিখে ফেলো, হাজার পাওয়ারের বাতি দিয়ে দোষের উপর আলো ফেলো, তবুও কিছু হবে না।”

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। সত্যসুন্দরদার মধ্যে এমন একটা হতাশ মন যে এমন ভাবে লুকিয়ে আছে, তা জানতাম না। সত্যসুন্দরদা শাজাহানের ছাদ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন; বললেন, “আকাশের দিকে এমনভাবে যুগযুগান্ত ধরে তাকিয়ে থাকলে একদিন হয়তো উত্তর পাওয়া যেতে পারে—আমরা কেন এমন, অন্তরের

ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে সমাজের তথাকথিত সেরাদের অনেকে কেন এই বার এবং ক্যাবারেতে ভিড় করে।"

বোসদা আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়েই বললেন, "যাগযুগান্ত ধরে মানুষ অভাব-অনটনকে জয় করার সাধনা করে এসেছে। সে ভেবেছে প্রতিদিনের জীবনধারণের সমস্যা সমাধান করলে তবে হয়তো পরম নিশ্চিন্তে একদিন আপন আত্মার উন্নতির সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু কী হলো? যাদের জীবনধারণের দু'শ্চিন্তা নেই, যাদের অনেক আছে, তারাই অন্তরে নিঃস্ব হয়ে শাজাহানের রঙীন আলোয় নিজেদের হাস্যকর করে তুলছে। রিডিকুলাস, রিডিকুলাস," বোসদা নিজের মনেই বললেন।

স্তম্ভিত আমার তখন কথা বলবার সামর্থ্য নেই। বোসদা বললেন, "আলডুস হাক্সলে এক বইতে ভারতবর্ষ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। বোম্বাই-এর কোন হোটেলে বই-এর দোকানে তিনি এক বিশেষ শাস্ত্র' সম্বন্ধে অজস্র বই দেখেছিলেন। 'Rows of them and dozens of copies of each.' অথচ হোটেলে যে ঐ-বিষয়ে উৎসাহী ডাক্তাররা বই কিনতে আসেন এমন নয়। হাক্সলে লিখলেন, সাধারণ লোকরাই ওই সব বই কেনে। 'Strange, strange phenomenon! Perhaps it is one of the effects of climate."

বোসদা বললেন, "আমিও ভেবেছিলাম জল-হাওয়ার দোষ। কিন্তু পরে ভেবেছি হাক্সলে সায়েবের নিজের দেশই বা কম যায় কীসে? এ প্রশ্নের কী উত্তর জানি না। তবে ডি এইচ লরেন্সের লেখায় এর সামান্য উত্তর পেয়েছি, পুরো নম্বর না দিলেও তাঁকে পাশ নম্বর দেওয়া যায়: 'the God who created man must have a sinister sense of humour, creating him a reasonable being yet forcing him to take this ridiculous posture, and driving him with blind craving for this ridiculous performance."

বোসদাকে আজ যেন বলার নেশায় পেয়েছে। "কোনো সহজ উত্তর বোধহয় নেই। জীবনের প্রশ্নপত্র অসংখ্য ছেলে-ঠকানো কোশ্চেনে বোঝাই। ওসব বোঝবার চেষ্টা করতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হবে। তার থেকে শ্রীলেখা দেবীর কথা শোনো।"

"আপনি শুতে যাবেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

“যাবো। তুমি তো নাইট ডিউটি দিতে নিচেয় যাচ্ছো। সুতরাং জেনে রেখে দাও। শ্রীলেখা দেবীর স্বামী রাত্রে হয়তো হাজির হতে পারেন। উনিই তখন ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোকও একটা ঘর চাইছিলেন। আমি বলে দিলাম, ঘর খালি নেই। ভদ্রলোককে বিশ্বাস নেই। ওঁর ভয়ে বেচারা শ্রীলেখা দেবীর জীবনে একটুও শান্তি নেই। উনি বলেছেন, 'তোমার সুন্দর মুখের গর্বে তুমি ফেটে পড়ছো! তোমার ওই মুখে আমি অ্যাসিড ঢেলে দেবো।” বলা যায় না হয়তো রাত্রে হাজির হতে পারেন। যদি আসেন, কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।”

বোসদা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মনে হলো অন্ধকারে কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছায়ামূর্তিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথম যে একটু ভয় পেয়ে যাইনি তা নয়। একটু পরেই বোঝা গেলো, ছায়ার মালিক মার্কোপোলোর বেয়ারা মথুরা সিং। মথুরাকে কোনোদিন আমাদের খোঁজে ছাদে উঠে আসতে দেখিনি। মথুরা মুখ শুকনো করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সে আমাদের সেলাম করলে। বললে, “বাবুজী, আপনারা এখনও ঘুমিয়ে পড়েননি?”

“ঘুমোবার উপায় নেই মথুরা, আমার রাত ডিউটি।”

মথুরা বললে, “ঘুমিয়ে পড়লে আপনাদের ডেকে তুলতে হতো। এমন ব্যাপার কখনও তো হয়নি।”

আমরা মথুরার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলাম, মার্কোপোলো সেই যে সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।

“হঠাৎ আজ বেরোলেন কেন?” মথুরাকে প্রশ্ন করলাম।

“আজ যে ডেরাই ডে বাবু। কোথা থেকে গিয়ে সায়েব ধেনো খেয়ে আসবেন। কিন্তু বাবু, এতোদিন থেকে দেখছি, কখনও এতো রাত্রি করেননি।” মথুরা সিং মুখ শুকনো করে বললে।

সত্যসুন্দরদাও যেন চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, “সায়েব তো বেশ ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি। তা জিমি সায়েবকে খবর দিয়েছো? তিনিই তো শাজাহান হোটেলের দু’নম্বর, যদি কিছু করবার থাকে, তাঁকেই করতে হবে।”

মথুরা সিং মানুষ চেনে। সে বিষণ্ন মুখে হাসলো। আস্তে আস্তে বললে, "আমরা ছোটো চাকরি করি হজুর, আমাদের বলা উচিত নয়। জিমি সায়েবকে আপনারা তো চেনেন, ম্যানেজার সায়েবের কোনো ক্ষতি হলে উনি সবচেয়ে খুশী হবেন।"

বোসদা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "তুমি যাও। দেখি কী করা যায়।"

মথুরা চলে যেতে বোসদা বললেন, "মথুরার মানুষ চিনতে বাকি নেই। জিমিটাকে ঠিক বুঝে নিয়েছে। লোকটার অন্তহীন লোভ। বেয়ারাদের কাছ থেকে পর্যন্ত টিপসের ভাগ নেয়। কেউ সাহস করে বলতে পারে না, এখনই চাকরি খেয়ে নেবে। মার্কোপোলো বুঝেও কিছু বলেন না— হাজার হোক পুরনো লোক, ওঁর অনেক আগে থেকে হোটেলে চাকরি করছে। মার্কোপোলোর আর ঠিক আগেকার উদ্যম নেই। ক্রমশ কেমন হয়ে পড়ছেন। দিনরাত চুপচাপ বসে থেকে কী সব ভাবেন। আর সেই সুযোগে জিমিটা পুকুর চুরি আরম্ভ করে দিয়েছে। একজন কিছুটা খবর রাখে, সে হলো রোজী। কিন্তু তাকেও জিমি হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "বিদেশ বিভুয়ে ভদ্রলোক একা পড়ে রয়েছেন। একটা কিছু করা দরকার। হাজার হোক আমাদের নিজেদের শহর।"

বোসদা বললেন, "তুমি নীচে চলে যাও। উইলিয়ম ঘোষ এতোক্ষণে নিশ্চয় কেটে পড়েছে। তুমি কাউন্টার সামলাওগে যাও। আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। হয়তো এখনই ফিরে আসবেন।"

"আপনি তো এখনই ঘুমিয়ে পড়বেন। তারপর যদি দেখি সায়েব তখনও ফিরছেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা হেসে ফেললেন। "আমি ঘুমোচ্ছি না। ঘুমটা আমার কাছে অটোমেটিক সুইচের মতো। সুইচ যতক্ষণ না টিপছি শ্রীমানের সাধ্য কি আমার ঘাড়ে এসে চাপে। তুমি যাও।"

আমি নীচেয় নেমে এলাম। উইলিয়ম ঘোষ কখন বেয়ারাকে বসিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে গেছে।

এখন রাত অনেক। শাজাহান হোটেলও কলকাতার শান্ত সুবোধ শিশুদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাউন্টারে কেবল আমি জেগে রয়েছি। আর কলকাতার কোথাও শাজাহানের ম্যানেজার মার্কোপোলো নিশ্চয়ই জেগে রয়েছেন। তিনি কোথায় গেলেন? ড্রাই-ডেতে বেআইনী মদ গিলে কি শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে পড়লেন? মদ খাওয়াটা অন্যায় নয়; কিন্তু মাতাল হওয়া বেআইনী।

রিজার্ভেশনের খাতার দিকে তাকালাম। আজ রাত্রে কোনো অতিথির বিদায় নেবার কথা নেই। রাত্রের অন্ধকারে কয়েকজন নতুন অতিথি কিন্তু আসছেন। দমদম হাওয়াই অফিস থেকে ফোন এসেছে যে, তাঁদের আসতে সামান্য দেরি হবে। ঠিক এই মুহূর্তে দূর দেশের বিদেশী যাত্রীদের নিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে অতিকায় বিমান কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে।

হাওয়াই অতিথিরা যখন এলেন, তখন মুসাফির রাত্রি কলকাতার রহস্যময় পথে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার চোখে কোথা থেকে ঘুম এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। ব্যাগ রাখবার শব্দে চমকে উঠলাম। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘুমোনো গুরুতর অপরাধ। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে দেখলাম, সুজাতা মিত্র।

এয়ার হোস্টেসের আসমানী রংয়ের শাড়ি পরে সুজাতা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু' হাসছেন। বললেন, "বেচারা।"

আমি লজ্জা পেয়ে, সোজা হয়ে উঠে শুভরাত্রি জানালাম। সুজাতাও হেসে বললেন, "এখন সুপ্রভাত বলুন।" মণিবন্ধের ঘড়িটা সুজাতা মিত্র আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

হাওয়াই হোস্টেস মিস্ মিত্রের সঙ্গীরা খাতায় সই করে ভিতরে চলে গেলেন। সুজাতা মিত্র তাঁদের বললেন, "ডোন্ট ওয়ারি। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে!" লজ্জা পেয়ে আমি বললাম, "মিস্, মিত্র, আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না।"

টানা টানা চোখ দু'টো আরও বড় করে সুজাতা মিত্র পরম স্নেহে বললেন, "আহা রে। আমাকেও কাস্টমারের মতো খাতির করে কথা বলতে হচ্ছে!"

আমি খাতার দিকে তাকাতে তাকাতে বললাম, “আপনাকে এবার খুব ভাল ঘর দিয়েছি, মিস্ মিত্র। রুম নাম্বার দু’শো তিরিশ। গতবার রাত্রে এসে আমাদের মিস্টার বোসের ঘরে থেকে আপনি শাজাহান সম্বন্ধে যে খারাপ ধারণা করেছিলেন, এবার তা নষ্ট হয়ে যাবে।”

হাওয়াই হোস্টেস সুজাতা সহজেই সবাইকে আপন করে নিতে পারেন। আমার মতো একজন অপরিচিত সামান্য হোটেল কর্মচারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হলতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। অথচ শাজাহানে তাঁর সমগোত্রীয়া আরও অনেককে তো দেখেছি। তাঁদের হাইহিলের ঠোকরে শাজাহানের মাটি কম্পমান।

সুজাতা মিত্র আমার কথায় যে একটু রাগ করেছেন, তা বোঝা গেলো। বললেন, “হোটেলে যে বেশীদিন কাজ করেননি, তা তো আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে এসব প্রফেশন্যাল কথা এমন কায়দাদু’রস্তভাবে কেমন করে শিখলেন?”

আমার বেশ ভাল লাগছিল। ওঁর আন্তরিকতা অজান্তেই মনকে স্পর্শ করে। হেসে বললাম, “এতো অল্প সময়ের মধ্যেই যে কাজ শিখতে পেরেছি, তার একমাত্র কারণ মিস্টার স্যাটা বোস।”

সুজাতা মিত্র আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। হাসতে লাগলেন। বললেন, “অদ্ভুত নাম তো।”

বোসদার বিরুদ্ধে কেউ সামান্য ব্যঙ্গ করলেও আমার মনে লাগে। কোথাকার একটা হাওয়াই জাহাজের মেয়ে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, ভাবতেও আমার রাগ হচ্ছিল। বললাম, “ওঁর আসল নাম তো স্যাটা নয়। হোটেলে কাজ করতে করতে নামটা অমন বে'কে গিয়েছে। সত্যসুন্দর বোস, কুলীন কায়স্থ।”

সুজাতা মিত্র প্রখর বুদ্ধিমতী। আমার মুখ দেখেই সব বুঝে নিলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রেখে বললেন, “আপনাদের এই হোটেল তা হলে তো মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। কোথায় সত্যসুন্দর আর কোথায় স্যাটা। আপনি খুব সাবধান। কোন দিন দেখবেন আপনিও হয়ে গিয়েছেন সাঁকো। সায়েবরা হয়তো আপনাকে স্যাংকে বলে ডাকতে আরম্ভ করেছেন।”

আমি ছেলেমানুষীর বশে রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "বটে। কেউ আমার নামে হাত দিয়ে দেখুক না। তখন তার একদিন কি আমার একদিন।"

সুজাতা মিত্র হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার দাদাটি তো বেমালুম নিজের নামটা হাতছাড়া করলেন।"

আমি রেগে বললাম, "বেশ করেছেন। তাঁর নিজের নাম, তা নিয়ে তিনি যা খুশি করবেন, তাতে কার কী?"

সুজাতা মিত্র বললেন, "সেবারে আপনাদের কিন্তু খুব ভুগিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলে এখনও আমার লজ্জা লাগে।"

হয়তো সুজাতা মিত্র আরও কথা বলতেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বোসদা যে কখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। বোসদা প্রথমে বললে, "আরে, আপনি! এই ছেলেটা রাতদু'পুরে আপনাকে বকিয়ে বকিয়ে মারছে তো। বকতে পেলে শ্রীমান আর কিছুই চায় না।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "উনি নিজেকে আপনার সুযোগ্য শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন। অনেক ঠোঁটের ভদ্রতা আপনার কাছ থেকে শিখেছেন। সে-রাত্রে আপনি নিজের ঘর খুলে দিয়ে আমাকে থাকতে দিলেন; আর এখন কি না আপনার শিষ্য ভদ্রতা করে বলছেন, নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হয়েছিল, এবারে ভাল ঘর দিচ্ছি।"

সত্যসুন্দরদা এবার অবাক কাণ্ড করে বসলেন। সত্যসুন্দরদা যে কোনো মেয়েকে এমন কথা বলতে পারেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। সত্যসুন্দরদা গম্ভীরভাবে বেমালুম বলে দিলেন, "অথচ তার জন্যে পরের দিন আপনি একটা থ্যাংকসও দিয়ে যাননি।"

প্রত্যুত্তরে সুজাতা মিত্রের মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তা আজও আমার মনে আছে। যেন ভোরের সূর্য সাদা বরফের পাহাড়ের উপর প্রথম আলোর রেখা ছড়িয়ে দিলো। সুজাতাদি বললেন, "ধন্যবাদ ইচ্ছে করেই দিইনি। যারা নিজের ঘর খুলে অচেনা অতিথিকে শুইয়ে দিয়ে সারারাত জেগে থাকে, তারা নিতান্তই গোঁয়ার, না-হয় বোকা। তাদের ধন্যবাদ দেবার কোনো মানে হয় না।"

"সুযোগ পেয়ে, আইন বাঁচিয়ে, গোঁয়ার, বোকা, আহাম্মক এতোগুলো গালাগালি দিয়ে দিলেন!" বোসদা বললেন।

আমাদের দিকে না তাকিয়েই সুজাতা মিত্র বললেন, "চমৎকার বানাতে পারেন তো। আহাম্মক কথাটা কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসলো।"

এবার আমাকে উদ্দেশ করে সুজাতা মিত্র বললেন, "সেদিন যাবার সময় ধন্যবাদ দেবার জন্য উপরে গিয়েছিলাম। আপনারা কেউ ছিলেন না। এখন দেখছি ভালই হয়েছিল। আপনাদের মতো লোকের ধন্যবাদ প্রাপ্য নয়! আপনারা সত্যি তার যোগ্য নন।"

বোসদা বললেন, "আই অ্যাম সারি, আপনি যে আমাকে খুঁজেছিলেন, জানতাম না।"

আমার তখন বোসদার উপর রাগ হয়ে গিয়েছে। সুজাতাদির পক্ষ নিয়ে বললাম, "কী করে জানবেন? দিনরাত হয় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, ব্যাংকোয়েট, না-হয় টেবিল বুকিং, ফ্লোর শো নিয়ে ডুবে থাকলে অন্য জিনিসের খবর রাখবেন কী করে?"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনাদের চোখে কী ঘুম নেই?"

বোসদা সুযোগ ছাড়লেন না। উত্তর দিলেন, "সাদী বলেছেন, ভাল লোকরা যাতে জ্বালাতন না হন, সেই জন্যে ঈশ্বর দু'ষ্টদের চোখে ঘুম দিয়েছেন।"

সুজাতা মিত্র গম্ভীরভাবে বললেন, "রাত্রে কী দু''জনকেই জেগে থাকতে হয়?" আমি বললাম, "বোসদার জাগবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ম্যানেজারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বোসদা আমাকে বললেন, "ভাবছিলাম থানায় খবর দেবো। কিন্তু তাতে অনেক গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া এইমাত্র মথুরা সিং-এর সঙ্গে আবার কথা বলে এলাম। শুনলাম, দু'-একদিন আগে বায়রন সায়েব এসেছিলেন। দু''জনের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। একবার ওঁর সঙ্গে তুমি দেখা করে এসো। আমি যেতে পারতাম, কিন্তু বাড়ি চিনি না। একা-একা এতো রাত্রে খুঁজে বের করা বেশ শক্ত হবে। তার থেকে তুমি একটা ট্যাক্সি যোগাড় করবার চেষ্টা করো। আমি তোমার ডিউটি দেখছি।"

সুজাতা মিত্র চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, “আমি একটা কথা বলবো? যদি আপত্তি না করেন, তাহলে আমাদের এয়ার লাইনের গাড়িটা নিয়ে যান। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। ও নিশ্চয়ই গাড়ির ভিতর শুয়ে আছে।”

রাত্রের অন্ধকারে জনহীন পথে কোনোদিন কলকাতার রূপ দেখেছেন কী? দূরন্ত ট্রাম বাস শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে কখন কলকাতাকে শান্ত করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সি হয়তো দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে কারা? কলকাতার কোনো সাহিত্যানুরাগী ট্যাক্সিওয়ালা আত্মজীবনী লিখলে হয়তো তা জানা যাবে!

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু থেকে আমাদের গাড়ি চৌরঙ্গীতে এসে পড়লো। রাতের নিয়ন আলোগুলো কলের পুতুলের মতো তখনও জনহীন চৌরঙ্গীর রঙ্গমঞ্চে আপনমনে অভিনয় করে চলেছে। কোন এক দূর্বার আকর্ষণে ড্রাইভারকে ডান দিকে গাড়ির মোড় ঘোরাতে বললাম। কার্জন পার্কের লোহার বেড়ার মধ্যে সার হরিরাম গোয়েঙ্কা তখনও ইনসোমনিয়াগ্রস্ত শ্রেষ্ঠীপতির মতো প্রভাতের প্রতীক্ষায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা আমাকে দেখেও দেখলেন না। এই প্রাচীন নগরীর গোপনতম রহস্যমালা যেন তাঁর হৃদয়হীন ধাতবচক্ষুর কাছে কবে ধরা পড়ে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সার হরিরাম গোয়েঙ্কার নীরস কঠিন দেহে একবিন্দু স্নেহ বা কারুণ্য আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কে জানে কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষকে আমি এতো ভয় করি না। আমার অন্তরের কোথাও তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছেন। নিদ্রা হীন, তৃষিতপ্রাণ হরিরাম দিনে দিনে আরও কঠিন ও কর্কশ হয়ে উঠছেন। তাঁর বিরক্ত চোখের দিকে দূর থেকে তাকালে মনে হয়, সার হরিরাম গোয়েঙ্কা বাহাদু'র কে-টি সি আই ই তাঁর সকল অপ্রিয় অভিজ্ঞতার জন্যে পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে আমাকেই দায়ী করে বসেছেন। দু'নিয়ার যতো দু'র্বিনীত নিম্নমধ্যবিত্ত তাঁকে অবহেলা এবং অপমান করবার জন্যেই যেন দল বেধে আমাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছে, গাড়ি চালিয়ে রাতের অন্ধকারেও তাঁকে বিরক্ত করতে পাঠিয়েছে।

হয়তো আরও অনেকক্ষণ ছেলেমানুষের মতো স্যর হরিরামের সঙ্গে আমার নীরব কথাবার্তা চলতো। কিন্তু এরোপ্লেন কোম্পানির বাস ড্রাইভার আমাকে সাবধান করে দিলে। বললে, "বাবুজী, এখানে এতো রাত্রে কেউ আসবেন নাকি?" বললাম, "না। চলো আমরা এবার এগিয়ে যাই। আমাদের এলিয়ট রোডের দিকে যেতে হবে।"

কার্জন পার্ককে বাঁ দিকে রেখে গাড়ি আবার পূর্ব দিকে মোড় ফিরলো। স্যর সুরেন ব্যানার্জি যেন মনুমেন্টের তলায় সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা করছিলেন। মাইক খারাপ হয়ে গিয়ে তিনি যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই ধৈর্যহীন অকৃতজ্ঞ শ্রোতার দল মিটিং ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অবহেলিত এবং অপমানিত সুরেন্দ্রনাথ হতাশায় অকস্মাৎ প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

কর্পোরেশন স্ট্রীট পেরিয়ে গাড়ি এবার ওয়েলেসলী স্ট্রীটে পড়লো। আমার আবার বায়রন সায়েবের কথা মনে পড়ে গেলো। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। দু'একবার দূর থেকে শাজাহানের ব্যাংকোয়েট রুমে তাঁকে দেখেছি; কিন্তু ইশারায় তিনি কথা বলতে বারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোনো শিকারের পিছনে তিনি গোপনে ছুটছেন, হয়তো কাউকে নিঃশব্দে ছায়ার মতন অনুসরণ করছেন। বার-এ এক বোতল বীয়ার নিয়েও তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেও দেখেননি। আমি যে তাঁকে চিনে ফেলি, এবং তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলি তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

তবু অন্য সময়ে তাঁর খোঁজ নেওয়া আমার উচিত ছিল। অন্তত তাঁর বাড়িতে এসে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেসব কিছুই হয়ে ওঠেনি। শাজাহান যেন বিশাল হাঁ করে আমার সর্বস্ব গ্রাস করে ফেলেছে। আমার কোনো পৃথক সত্তা যেন শাজাহানের ক্ষুধা থেকে রক্ষা পায়নি।

ড্রাইভার বললে, "কোন দিকে বাবু?"

আমি বললাম, "তুমি সোজা চলো, সময়মতো আমি দেখিয়ে দেবো।" ড্রাইভার বললে, "বাবুজী, জায়গা ভাল নয়। এতো রাত্রে গাড়ি দেখলে এখানে অনেক রকম সন্দেহ করে।"

আমি বললাম, “অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলাম দিনের আলোয়। পরিষ্কার মনে করতে পারছি না। আর একটু এগোলে হয়তো গলিটা চোখে পড়বে, তখন চিনতে পারবো।”

শেষপর্যন্ত গলিটা সত্যিই চিনতে পারলাম। সুজাতা মিত্র দয়া না করলে এতো রাত্রে ট্যাক্সি চড়ে এখানে আসতে আমার সাহস হতো না। হাওয়াই কোম্পানির গাড়িটা কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকলো না। নেমে পড়ে আমি বায়রন সায়েবের বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

একটা টর্চ— আনা উচিত ছিল। রাস্তার আলোগুলো পাড়ার ছোকরাদের গুলতির লক্ষ্যস্থল হিসেবে কখনও দীর্ঘ জীবন লাভের সুযোগ পায় না। প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেটাই যে বায়রন সায়েবের বাড়ি তা ভাঙা নেমপ্লেটটা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইলো না। একটু দূরে একটা রাস্তার আলো অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধানী এলিয়ট রোড বয়েজদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তখনও যেন কীভাবে টিকে রয়েছে।

বায়রন সায়েবের দরজা বন্ধ। ভিতরেও কোনো আলো জলছে না। এতো রাত্রে তাঁকে ডেকে তোলা কি উচিত হবে? গঙ্গানাম স্মরণ করতে করতে কলিং বেলটা টিপে ধরলাম।

কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। হয়তো ভিতরে কেউ নেই। একটু ফাঁক দিয়ে আবার বোতাম টিপলাম।

ভিতরে কে এবার একটু নড়ে চড়ে উঠলেন। তারপর নারীকণ্ঠে ইংরিজী অশ্লীল গালাগালি কানে ভেসে আসতে লাগলো: “তুমি যেখানকার জঞ্জাল সেখানে গিয়ে থাকো। মাঝ রাতে আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছো কেন?”

আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালাম। ভদ্রমহিলা তখন আর এক রাউণ্ড ফায়ারিং করছেন। “লজ্জা করে না মিনসে, রোজগার করে তো উল্টে যাচ্ছো, আবার রাতেও জ্বালাতন। যাও, ডাস্টবিনে পারিয়া ডগদের সঙ্গে শুয়ে থাকোগে যাও। সারাদিন আমি খেটে মরবো, তোমার ভাতের যোগাড় করবো, আবার রাতেও খারাপ মেয়েদের মতো জেগে থাকবো, সে আমি পারবো না। তুমি দূর হও, দূর হও।

ততোক্ষণে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছি। মার্কোপোলো তখন মাথায় উঠেছেন। পালাবো কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু তার আগেই ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হলো। দরজা খুলেই ঝাঁটা মারতে গিয়ে ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। স্বামীর বদলে আমাকে দেখে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলেন।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে বলো। আমার স্বামীর নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে। ওগো, কতবার তোমাকে বলেছি তোমাকে ডিটেকটিভগিরি করতে হবে না। এই পোড়া দেশে ও-সব চলবে না। ওর থেকে তুমি খবরের কাগজ ফেরি করো, না হয় বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকো। আমি যতক্ষণ চাকরি করছি ততক্ষণ তোমার কীসের ভাবনা?"

অন্য পল্লী হলে এতোক্ষণে সেই কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ঘরের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু এই আধা-সায়েব পল্লীতে ও-সব বড় একটা হয় না। একজনের প্রাইভেসীতে আর একজন মরে গেলেও মাথা ঢোকান না।

মিসেস বায়রন কাতরকণ্ঠে জানতে চাইলেন, আমি পুলিসের লোক, না হাসপাতালের লোক। এতো রাত্রে এই দু''জন ছাড়া যে আর কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে তা তাঁর কল্পনারও অতীত। বললেন, "কোথায় আমার স্বামী আছে বলো, আমি এখনই যাচ্ছি।"

আমি এবার কোনোরকমে বললাম, "আমি পুলিস বা হাসপাতালের প্রতিনিধি নই। আমি হোটেলের লোক। আমাদের সায়েব মিস্টার মার্কোপোলোকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই খোঁজ করতে এসেছি।"

"ও! তাই বলো," শ্রীমতী বায়রন আবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। "তুমি সেই মোটকা সায়েবের কথা বলছো তো, যে মাঝে মাঝে আমাদের জন্যে স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট নিয়ে আসে। সে মিনসেই তো যতো নষ্টের গোড়া। আমাকে বের করে দিয়ে দু''জনে গুজ গুজ করে কথাবার্তা চালায়। আমার স্বামী বলেন, ওঁর মক্কেল। আমি কিন্তু বাপু শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে চিনতে পারি। সব বাজে কথা। আসলে ওঁর সঙ্গী। দু'ই সাঙাতে মিলে সেই যে বেরিয়েছে, কোথায় কোন চুলোয় গিয়ে পড়ে আছে কে জানে।"

শ্রীমতী বায়রন তখনও অশ্লীল গালাগালি বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু আমার মনে সাহস ফিরে এসেছে। বায়রন সায়েব এবং মার্কোপোলোর তাহলে একটা হদিস পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীমতী বায়রন বিরক্ত হয়ে বললেন, "ও-সব ন্যাকামো ছাড়ো, আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন বলো।"

আমি বললাম, "মিস্টার বায়রন কখন আসবেন, কিছু বলে গিয়েছেন?" "কিছু বলে যাননি। ওই মিনসে আসতেই বেরিয়ে গিয়েছেন। মখে আগুন। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বললে আমার পেট ভরবে না।" এই বলে শ্রীমতী বায়রন দড়াম করে আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হোটেলে ফিরতেই সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। শুধু শুধু রাত্রে কষ্টভোগ করলে। মার্কোপোলো ফিরে এসেছেন। সঙ্গে মিস্টার বায়রনও ছিলেন। তিনিই ওঁকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে, বেয়ারাদের হাতে জমা দিয়ে চলে গেলেন।"

মার্কোপোলো কাউন্টারের সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন এই হোটেলের তিনি এক নতুন আগন্তুক, এখানকার কিছুই চেনেন না, জানেন না। সত্যসুন্দরদা প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, আমাদের সকলের দু'শ্চিন্তার সংবাদও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যে মার্কোপোলো সারাদিন হোটেল মাথায় করে রাখেন, প্রতিটা খুটিনাটির খবর না নেওয়া পর্যন্ত নিজেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, রাতের অন্ধকারে তিনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে সত্যসুন্দরদার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন তোমরা সারারাত জেগে থাকো?"

সত্যসুন্দরদা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "আপনিই তো ডিউটি চার্টে সই করেন।"

মার্কোপোলো হতাশায় মাথা নেড়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইউজলেস। কোনো মানে হয় না। দু'নিয়ার সব লোক যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এমনভাবে বোকার মতো আসর জাগিয়ে রাখবার কোনো মানে হয় না।"

মার্কোপোলোর দৃষ্টি এবার সুজাতা মিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি কিছু বলবার আগেই বোসদা জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভদ্রমহিলা হাওয়াই জাহাজের কর্মী, আমাদের

অতিথি। মার্কোপোলো সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। আরও কথা বলবার ইচ্ছা ছিল বোধহয়, কিন্তু শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

মিস মিত্র বললেন, "আমার খুব মজা লাগছিল। প্রতিদিন মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মেঘের আড়ালে কত লোককেই তো দেখি। কিন্তু আপনাদের এইখানে আরও অদ্ভুত সৃষ্টির আনাগোনা। ইচ্ছে হয়েছিল, একবার আপনাদের ম্যানেজারকে বলি, রাত্রি আর নেই।"

বোসদা প্রথমে হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওঁর জীবনে এখনও রাত্রির অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। ওঁর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়।"

সুজাতা মিত্রকে তখনও কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যে একটু অবাক হয়ে যাইনি এমন নয়। বোসদা বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার গাড়িটা দিলেন, নিজেও এতোক্ষণ জেগে রইলেন।"

সুজাতা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার গুরুদেব এখন আবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। দেখুন যদি ওঁকে সাহায্য করতে পারেন !"

আমি হেসে বললাম, "ওটা ধন্যবাদ জানানোর একটা ফর্ম।"

সুজাতা মিত্রের পিছনের বেণীটা এবার সাপের মতো দু'লে উঠলো। বললেন, "ফর্মাল লোকদের আমরা তেমন পছন্দ করি না।"

বোসদা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "বচ্ছরকার দিন এইভাবে গালাগালি দিচ্ছেন। এই জন্যেই প্যাসেঞ্জাররা দেশী হাওয়াই হোস্টেস পছন্দ করেন না।"

"বটে! যদি পছন্দই না করতো তা হলে আরও নতুন মেয়ে নেওয়া হচ্ছে কেন?"

"তা হলে বোঝা যাচ্ছে নতুন যারা ঢুকেছে তারা অনেক ভদ্র এবং ভালো। বোসদা সকৌতুকে উত্তর দিলেন।

"এ তো উকিলদের মতো কথা বললেন। এখানে আসবার আগে কি আদালতে প্র্যাকটিশ করতেন?"

"আদালতের কথা তুলবেন না। এ বেচারার মন খারাপ হয়ে যায়। আদালতের সঙ্গে একদিন এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।" আমাকে দেখিয়ে বোসদা বললেন।

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। সুজাতা মিত্রের টানা-টানা দু'টো চোখে ঘুমের মেঘগুলো জড়ো হবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। বোসদাও বোধ হয় এবার তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, "আই অ্যাম স্যরি। অনেক রাত্রি হয়েছে। এতোক্ষণ ধরে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।"

একটাও পোর্টার কাছাকাছি ছিল না। সুজাতা মিত্র নিজেই স্যুটকেসটা তুলে নিতে যাচ্ছিলেন। আমি আড়চোখে বোসদার দিকে তাকালাম। বোসদা আমার ইঙ্গিত ঘুঝতে পেরে, তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিলেন। সুজাতা বোধহয় একটু অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু বোসদা আমাকে ডুবিয়ে দিলেন। বললেন, "ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ব্যাগ বইছেন তো হয়েছে কী? কিন্তু শ্রীমান আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালো, যেন আমার মতন এমন সমর্থ কুলি থাকতে কোনো মহিলা তাঁর ব্যাগ বইবেন, তা সে সহ্য করবে না।"

সুজাতা মিত্র এবং বোসদা দু''জনেই এবার সলজ্জভাবে আমার দিকে তাকালেন। তারপর শাজাহানের দ্বারপ্রান্তে আমাকে একলা প্রহরী রেখে দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শাজাহানের নিঃস্তব্ধ রাত্রি এখন আমার পরিচিত হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের এই প্রাচীন পান্থশালা আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এখন আমাকে আর বিস্মিত করে না। পরিচয়ের অন্তরঙ্গতম পর্যায়ে এসে এই প্রাচীন প্রাসাদ তার কোনো রহস্যই প্রিয়বন্ধুর কাছে গোপন রাখেনি।

কিন্তু সে তো কেবল এই প্রাসাদপুরীর ইঁট কাঠ পাথরের কথা। এই নাট্যশালার প্রতি প্রকোষ্ঠে, ঠিক এই মুহূর্তেই কত নাটকের শুরু এবং শেষ অভিনীত হচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে? সে-রহস্য সত্যিই যদি কোনো নিস্পৃহ সত্যানুসন্ধানীর চোখে ধরা দিত, তাহলে পৃথিবীর সাহিত্য অসীম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করতে সাহায্য করতো।

রাত্রের এই কর্মহীন মূহূর্তের সবচেয়ে বড়ো কাজ বোধহয় ছড়ি হাতে করে ঘুমকে তাড়ানো, তাকে কাছে আসতে না দেওয়া। তাই চিন্তার এই বিলাসিতাটুকু নিজের ইচ্ছার

বিরুদ্ধেই মেনে নিতে হয়। কিংবা হয়তো শাজাহানের অশরীরী আত্মা বিংশ শতাব্দীর এই আলোকোজ্জ্বল অন্ধকারে আর কাউকে না পেয়ে বেচারা রিসেপশনিস্টের উপর ভর করে, এবং তার চোখের সামনে অতীতের সোনালী সুতোয় এক নয়নাভিরাম চিন্তার জাল বুনতে শুরু করে।

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। "হ্যালো রিসেপশন? আমি শ্রীলেখা দেবী কথা বলছি।"

শ্রীলেখা দেবী কি রাত্রে ঘুমোননি? হয়তো নিজের ঘরদোর ছেড়ে হোটেলে রাত্রি কাটাতে এসে অস্বস্তি বোধ করছেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে কী ইনস্ট্রাকশন আছে?"

"আজ্ঞে, কাউকে আপনি কত নম্বর ঘরে আছেন বলবো না। এবং আপনার স্বামী যদি আসেন তাঁকে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

শ্রীলেখা দেবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন। প্রশ্ন করলেন, "কেউ কী আমার খোঁজ করতে এসেছিল?"

"এখন রাত্রি রয়েছে, এ-সময়ে কেউ হোটেলে আসে না।"

"বাজে কথা বলবেন না। হোটেলের কতটুকু দেখেছেন আপনি? মিস্টার স্যাটা বেসকে জিজ্ঞাসা করবেন। এর আগে যতবার রাগ করে চলে এসেছি, আমার স্বামী ততবার এই সময়ে এখানে এসেছেন।"

এবার আমার অবাক হবার পালা। শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আপনি বাইরে একটু খোঁজ করে দেখুন তো। আমি ফোনটা ধরে রইলাম।"

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দেখলাম, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর উপরেই গরদের পাঞ্জাবী এবং পায়জামাপরা এক ভদ্রলোক কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনিই যে শ্রীলেখা দেবীর স্বামী তা সিনেমা রিপোর্টারদের ক্যামেরার কল্যাণে এদেশের কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন নেই।

বললাম, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন। "আমি তো মশাই আপনার হোটেলে ঢুকিনি। কোম্পানির রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি, তবু গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছেন?

ফিরে গিয়ে টেলিফোনে খবরটা শ্রীলেখা দেবীকে জানালাম। শ্রীলেখা দেবী এই সংবাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এই খবর না পেলেই তিনি আশ্চর্য হতেন, হয়তো হতাশায় ভেঙে পড়তেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "ওঁকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন।" আমি আমাদের অসুবিধার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই শ্রীলেখা দেবী বললেন, "কিন্তুর কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি ডবল রুমের চার্জ করবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে, আবার বাইরে গেলাম। ভদ্রলোক তখনও একটা থাম ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "এক্সকিউজ মি, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ভিতরে আসুন।"

ভদ্রলোক তাঁর রক্তচক্ষ, এবার আমার দিকে ঘোরালেন। "ধন্যবাদ। ভিতরে খাবার কোনো প্রয়োজন হবে না।"

এবার জানালাম, শ্রীলেখা দেবী তাঁকে ঘরে যেতে বলেছেন। আমি তাঁকে শ্রীলেখা দেবীর ঘর চিনিয়ে দিতে পারি।

"যথেষ্ট হয়েছে," ভদ্রলোক উদাসীনভাবে বললেন। পকেট থেকে দেশলাই বের করে ভদ্রলোক এবার একটা বিড়ি ধরালেন। চিত্রজগতের অসামান্য তারকার স্বামীকে বিড়ি ধরাতে দেখে আমি সত্যিই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

স্ত্রীধন্য ভদ্রলোক তাঁর রাতজাগা ঘোলাটে চোখ দু'টো দিয়ে আমাকে গিলে খাবার চেষ্টা করছেন। বললেন, "স্বভাবটা একটুও পাল্টাতে দিইনি। দু'গ্গাকে নিয়ে যখন কলকাতায় এসেছিলাম, তখন দু''জনে ছোটো শাজাহানে খেয়ে গিয়েছি। অতো সস্তায় কোথাও খেতে পাওয়া যেতো না। তখনও বিড়ি খেতাম, আর এখনও আমি সেই বিড়ি খাই। দু'গ্গাই আপনাদের শ্রীলেখা দেবী হয়েছেন, ছোটো শাজাহান ছেড়ে বড় শাজাহানে এসে উঠেছেন। আমার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

ভদ্রলোক কিছুতেই ভিতরে আসতে রাজী হলেন না। "সেই থেকে এই চারটে পর্যন্ত যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তা হলে আরও কিছুক্ষণ আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হবে না।" ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কাউন্টারে ফিরে আসতে আসতেই শুনলাম টেলিফোনটা আবার বাজছে। শ্রীলেখা দেবীর সামান্য দেরীও সহ্য হচ্ছে না। "হ্যালো, ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?" বলতে হলো, "উনি আসতে রাজী হচ্ছেন না।"

শ্রীলেখা দেবী আর কালবিলম্ব না করে টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, "এ আবার কী ব্যাপার? এই একবস্ত্রে গৃহত্যাগ, আবার রাত না কাটতেই নাটক!"

তবে লোকটা কেমন অদ্ভুত ধরনের। চোখ দু'টো দেখলে সত্যিই ভয় লাগে।

শ্রীলেখা দেবী যে এখনই নিজের ঘর ছেড়ে কাউন্টারে নেমে আসবেন তা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। মেক-আপের বাইরে শ্রীলেখা দেবীর সেই মূর্তি আজও আমি ভুলিনি। চল-টুল উস্কোখুস্কো। মুখেও রাতের সব ক্লান্তি জড়ো হয়ে রয়েছে। যেন স্টুডিওর সেটে কোনো হৃদয়বিদারক দৃশ্যে তিনি অভিনয় করছেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আমার ভয়-ভয় করছে। আপনি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত একটু আসুন না। বলা যায় না, হয়তো সঙ্গে করে অ্যাসিড নিয়ে এসেছে, আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে।"

এমন অবস্থায় হোটেলের কর্মচারীরও কাঁদতে ইচ্ছা করে। হয়তো পুলিস কেসে জড়িয়ে শ্রীঘর বাস করতে হবে। বেশ ভয় করছিল। বছরের কোনো চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মামলার প্রথম অঙ্ক হয়তো আমারই চোখের সামনে অভিনীত হতে চলেছে।

একবার শ্রীলেখা দেবীকে বারণ করলাম। "এমন সময় বাইরে না গেলেই নয়? শ্রীলেখা কোনো উত্তর দিলেন না। সোজা দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর পিছন পিছন চলতে হলো।

দরজার কাছে গিয়ে শ্রীলেখা দেবী আমাকে আর যেতে বারণ করলেন। দু'র থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম শ্রীলেখা দেবী তাঁর স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীলেখা দেবী এবার স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওঁদের মধ্যে

যে কী কথা হলো, তা দূর থেকে আমার বোঝা সম্ভব ছিল না। হঠাৎ মনে হলো শ্রীলেখা দেবী ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আর তাঁর বিব্রত স্বামী তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আরও বোঝবার আগেই দেখলাম ওঁরা দু''জনেই কাঁদতে কাঁদতে একটা গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলেন। কোনো কথা না বলে, শ্রীলেখা দেবীর স্বামী গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছেন।

রাস্তার সামনে দিয়ে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে আমার যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। হঠাৎ খেয়াল হলো, বিলের টাকা দেবে কে? শ্রীলেখা দেবী পেমেন্ট করেননি।

ভয় হলো, এই এক রাত্রির দাম হয়তো আমার মাইনে থেকেই কাটা যাবে। কারণ বিল আদায়ের দায়িত্ব আমার। বিল চাইবার কথা ওই অবস্থার মধ্যে আমার মনে একবারও উকি মারেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে আলোর রেখা রাস্তার উপরে এসে পড়তে শুরু করেছে।

"কালী, কালী, ব্রহ্মময়ী, মা আমার"——ন্যাটাহারিবাবু গঙ্গাস্নানের জন্যে নিচেয় নেমে এসেছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, "মা-গঙ্গায় ডুব দেবার অভ্যেসটা করুন। না হলে পাপের অ্যাসিডে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবেন। এই যে নিত্যহরি ভট্টচাজ এতো পাপ ঘে'টেও আজও মাথা উঁচু করে বালিশ বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা কেবল এই মাদার গ্যাঞ্জেসের জন্যে। রোজ এই নোংরা বডিটা ধুয়ে কেচে পরিষ্কার করে নিয়ে আসছি। কত ময়লা লাগবে লাগুক না।"

আমি চুপ করে রইলাম। নিত্যহরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "গরীব বামুনের কথা বাসি না হলে মিষ্টি লাগবে না। মা জননীকেও কতবার বলেছিলাম, যাই করো মা, সকালে মা-গঙ্গাকে একটা পেন্নাম ঠুকে এসো। তা মা আমার কথা শুনলেন না। ইংরিজী শেখা গেরস্ত ঘরের মেয়ে কপালদোষে পাপস্থানে এসেছিল।"

ন্যাটাহারিবাবুর চোখ দু'টো হঠাৎ ধক্ ধক্ করে জ্বলতে আরম্ভ করলো। "আমি কে বলুন তো মশাই? সাতকূলে তোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু লিনেন সাপ্লাই

করেছি। তা বাবা, থেকে থেকে আমাকেই স্বপ্নে দেখা দেওয়া কেন?"

"হয়তো আপনি তাঁকে ভালবাসতেন, তিনিও হয়তো আপনাকে ভালবাসতেন," আমি বললাম।

ন্যাটাহারিবাবার চোখ দু'টো ছলছল করে উঠলো, তাঁর সযত্নে ঢাকা বেদনাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। "এতো বোকা জাত, মশাই দু'নিয়ায় দেখিনি। বিষ খাওয়া কী কথা গো? আমার বউ—সে মাগীও বিষ খেয়ে মরেছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরিনি বলে। মাকে বলেছিলাম—শিখ পাঞ্জাবীতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বউ আমার বিশ্বাস করলে না। বললে, 'তোমার মুখে কিসের গন্ধ?" বললাম, 'অনিয়নের গন্ধ।'

'অনিয়ন? সে আবার কী?" বুদ্ধিমতী মেয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করলে। রেগে বললাম, 'অনিয়ন মানে পেয়াজ, বাপ তো তোমায় কিছুই শেখায়নি।' তখনও মুখে আমার ভকভক করে দেশী মালের গন্ধ ছাড়ছে। আমার নিজেরই বমি আসবার উপক্রম। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ছোটবেলা থেকে অনিয়ন দেখে আসছে, সব ঘুঝতে পারলে। তারপর ওদের এক অস্ত্র। আমাকে সংশোধন করবার একটা সুযোগও দিলে না। দু'নিয়ার মেয়েদের মশায় আর কোনো ক্ষমতা নেই, শুধু বিষ খেতে জানে।

সেই থেকেই ভুগছি। সেই মহাপাপে বাউনের ছেলে ধোপার ময়লা দু'হাতে ঘে'টে মরছে। আরও খারাপ হতো, হয়তো মাথায় বজ্রাঘাত হতো, কিন্তু মা-গঙ্গা রক্ষা করছেন।"

ন্যাটাহারিবাবু এবার নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর চোখ দু'টো ছলছল করছে। আমার হাতটা তিনি জোরে চেপে ধরলেন। করুণভাবে, পরম স্নেহে বললেন, "খুব সাবধান, বাবা। কার কপালে ভগবানের অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুপ্ত সায়েব যে কী লিখে রেখেছেন, কেউ জানে না।"

ন্যাটাহারিবাবু বিদায় নিলেন। অস্বস্তিতে আমার মন ভরে উঠলো। এতোদিনে ন্যাটাহারিবাবুকে যেন চিনতে পারলাম। এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের রাত যেন আমি কোনোরকমে পেরিয়ে এলাম। কিছুতেই আর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ইচ্ছা করছিল না।

বেয়ারাকে ডেকে তুলে বললাম, "তুমি একটু পাহারা দাও, আমি আসছি।"

ভোর হয়েছে। আমাদের ঘরগুলো যেন সূর্যমিলনের মধুর সম্ভাবনায় নববধুর সলজ্জ মুখের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে।

বোসদা দরজা খুলে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হাসলেন। ওঁর হাসিতে সব সময়ই আমার জন্যে অনেক আশ্বাস লুকিয়ে থাকে। মনে একটু বল পেলাম।

শ্রীলেখা দেবীর ব্যাপারটা বললাম। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "ভয় কী? আমি ওঁর ঠিকানা জানি। দরকার হয় টাকা চেয়ে পাঠাবো। তা অবশ্য দরকার হবে না। তিনি নিজেই চেক পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক একই ব্যাপার আগেও হয়েছে। স্বামীর ভয়ে রাত্রে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার ভোর না হতেই মিটমাট হয়ে গিয়েছে।"

আমার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বোসদা বললেন, "ন্যাটাহারিবাবুর বিশ্বসংসারে কেউ নেই। তাই এখানে একলা পড়ে রয়েছেন। আমাদের পুরনো ম্যানেজারের হুকুম আছে, ওঁকে যেন কখনও চাকরি ছেড়ে চলে যেতে না বলা হয়। যত বয়সই হোক, শাজাহান হোটেলে ওঁর চাকরি চিরকাল বজায় থাকবে।"

বোসদা এবার একটা কাঁচের গেলাস আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বাথরুম থেকে গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে এসো। একটু দেশী মতে চা খাও। গত রাত্রিটা সত্যিই তোমার খুব খারাপ কেটেছে।"

বোসদার ওখানে চা খেয়ে, নিজের বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ দিবানিদ্রার সুখ উপভোগ করেছিলাম জানি না, হঠাৎ গুড়বেড়িয়ার ডাকে উঠে পড়লাম। গুড়বেড়িয়া বললে, কোন এক সায়েব বলা নেই কওয়া নেই, সোজা ছাদে উঠে এসেছেন।

দরজা খুলে বাইরে উকি মারতেই বায়রন সায়েবকে দেখতে পেলাম। তিনি এবার আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, "আন্দাজ করেছিলাম তুমি এখন ঘুমোবে। তবু চলে এলাম। মার্কোর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো।"

“কাল রাত্রে আপনাদের জন্যে আমরা বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম।” আমি বায়রনের জন্যে চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম।

বায়রন বললেন, “কালকের রাত্রিটা হয়তো মার্কো এবং আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

“কেন? বেচারা মার্কোর অন্ধকার দাম্পত্যজীবনে কোনো আলোকপাত করতে পারলেন?”

বায়রন একবার সন্দিগ্ধভাবে বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর বিছানার উপর ভালভাবে বসে বললেন, “ব্যাপারটা তোমার সব মনে আছে? সুশান-এর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে মার্কো মনস্থির করেছিলেন। টাকা দিয়ে সুশানকে তাঁর বিরুদ্ধে ডাইভোর্স মামলা দায়ের করতেও রাজী করিয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার অভিযোগ প্রমাণের জন্যে লিজা বলে একটি মেয়েরও ব্যবস্থা হয়েছিল। তাকে মার্কো কয়েকটা চিঠিও লিখেছিলেন। তারপর যুদ্ধের ঢেউয়ে সেসব কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিল কেউ তার খোঁজ রাখেনি।”

আমি বললাম, “আমার সব মনে আছে। আপনার বাড়িতে বসে মার্কোর হতভাগ্য জীবনের যে বৃত্তান্ত শুনেছিলাম তা কোনোদিনই ভুলবো না।”

বায়রনের মুখে আজ সার্থকতার আনন্দ দেখলাম। বললেন, “সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তো কেবল নামে ডিটেকটিভ। পেশাদার সাক্ষী ছাড়া আমাদের বোধহয় কিছুই বলা যায় না। আমাদের ক্লায়েন্টরা সব রকম চেষ্টা করে, হতাশ হয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং আশা করেন মন্ত্রের শক্তিতে আমরা তাঁদের সমস্যার সমাধান করে দেবো। পুলিস আমাদের কখনও সন্দেহের চোখে, কখনও করুণার চোখে দেখে। আমরা কোনো সাহায্যই পাই না। ওরা হেসে বলে, ছাগল দিয়ে ধান মাড়ানো হলে কেউ আর বলদ কিনতো না! কোনো আশাই করিনি। মার্কোকে যে সত্যিই সাহায্য করতে পারবো, তা ভাবিনি।”

বায়রনের জানাশোনা একজন প্রতিনিধিই খবরটা এনে দিয়েছিলেন। ছাতাওয়ালা গলির একটা অন্ধকার বস্তিতে সে একজন মেয়ের খবর পেয়েছে যে আগে নাকি রেস্তোরাঁয় গান গাইত। ছাতাওয়ালা গলির নাম শুনে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো;

ওই গলি থেকেই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট নিয়ে আমি একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের কোম্পানি যে বাড়িতে একখানা ঘর অধিকার করে ছিলেন, তার অন্যান্য মহিলা বাসিন্দাদের জীবনধারণপ্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণের কারণ ছিল।

এবার সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। শুনলাম, গতকাল রাত্রে ওঁরা দু''জনে সেই মহিলার খোঁজ করতে ছাতাওয়ালা গলিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলার ঘরে 'অতিথি' ছিল। তাঁরা অনেকক্ষণ বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, অতিথি হয়তো বেরিয়ে যাবে, তখন তাঁরা মোলাকাত করবেন।

আমার পক্ষে এবার চুপ করে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বায়রনও যেন কিছু বুঝলেন। বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তিনি যে উত্তর দিলেন, তাতেই আমি চমকে উঠলাম। ওই বাড়িটা! ওই বাড়িটা থেকেই তো আমি ঝুড়ি নিয়ে আসতাম। দু'পুরে আমাদের কোম্পানির মালিক পিল্লাই প্রায়ই থাকতেন না। কিন্তু তাতে আমার অসুবিধা হতো না। বাড়ির করুণ-হৃদয় মহিলারা আমাকে সাহায্য করতেন। ঝুড়িগুলো গুনে গুনে আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতেন। আমার জলতেষ্টা পেলে তাঁদের কাছেই চাইতাম, তাঁরা এনে দিতেন।

বায়রন বললেন, "এখানকার কোনো খবর রাখো তুমি? কাউকে চেনো?"

ও-বাড়িতে একটা মেয়েও নেই, যার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ওরা আমার সহকর্মী ছিলেন। দু'পুরে ছোড়া স্কার্ট পরে, পায়ে খড়ম গলিয়ে নিচু টুলে বসে বসে তাঁরা আমাদের ঝুড়িগুলো রং করে দিতেন। রংয়ের পর রোদ্দুরে শুকোতে দিতেন। আকাশে মেঘ করলে ওঁদেরই উঠোন এবং ছাদ থেকে বাস্কেটগুলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হতো। অতি সৎ মহিলারা। বেচারা পিল্লাই-এর সময় ভাল যাচ্ছিল না, কিন্তু মহিলারা তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। যে রেটে অবসর সময়ে তাঁরা ঝুড়ি রং করে দিতেন সে রেটে কোথাও লোক পাওয়া যেতো না।

আমার সঙ্গে তাঁরা ভাল ব্যবহার করতেন। প্রায়ই বলতেন, "এই রোদে ঘুরে এসেছো, একটু বিশ্রাম নাও, তারপর আবার বেরিও। না হলে শরীর খারাপ করবে।" একজন মহিলা

বলতেন, "আমাদের সম্বল দেহ, আর তোমাদের গতর। এ দু'টোই যত্ন করে রাখতে হবে, না হলে খেতে পাবে না।"

বাড়ির বাইরে ছোট্ট বোর্ডে লেখা ছিল 'সাড়ে দশটার পর এই বাড়ির গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাউকেই ঢুকতে বা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না।' ছাতাওয়ালা লেনের সেই অন্ধকার বাড়িটাতে আমি জীবনের আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু এখানে তার কোনো স্থান নেই, সে অন্য কোথাও হয়তো বলা যাবে।

বায়রন বললেন, "একেই বলে ঈশ্বরের ইচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে চিনতে পারবে; তুমি চলো, আমাকে একটু খোঁজ খবর দাও।"

বায়রনকে নিয়ে সেদিন আমি আমার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়েছিলাম। বায়রন সেই ভোরেই যেতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, এগারোটার আগে গিয়ে লাভ নেই, এখন ওদের দু'পুর রাত। সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

এগারোটার সময় আমাকে দেখে ওরা সবাই প্রায় হৈ-হৈ করে উঠেছিল। বাড়িতে ছোট ছোট গোটা পনেরো খুপরি ছিল। কয়েকটা বড় ঘরকে চাঁচ দিয়ে পার্টিশন করে দু'খানা করে নেওয়া হয়েছে। আমার ফর্সা জামাকাপড় দেখেই ওরা বুঝেছিল, আমার জীবনে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। "লটারির টিকিট পেয়েছো নাকি?" ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল।

আমি বলেছিলাম, "শাজাহান হোটেলে চাকরি করছি।"

"শাজাহান হোটেল!" তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। "ওখানে নাকি সাড়ে আট টাকায় ওয়ান্ডারফুল ডিনার পাওয়া যায়? আমাদের খুব খেতে ইচ্ছে করে। টাকা থাকলে দল বেধে আমরা যেতাম। যুদ্ধের সময় খুব সুবিধে ছিল।" যুদ্ধের পরে যারা এ-লাইনে এসেছে তারা কৌতূহলে সিনিয়রদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। "তখন সোলজারদের বললেই খুশী হয়ে হোটেলে নিয়ে যেতো। আর এখন একটা সিগারেট চাইলেই ভাবে ঠকিয়ে নিচ্ছে। বিল সরকারের মনোবৃত্তি নিয়ে আজকাল কলকাতার লোকরা আনন্দ করতে আসে।"

বললাম, "আপনারা কেউ সুশান মনরোকে চিনতেন? পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় গান গাইতেন।"

“এমন নাম তো আমরা কেউ শুনিনি। পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় যে গান গাইতো সে কোন দুঃখে আমাদের এখানে আসবে?”

আর একজন বললে, “কেন? এলিজাবেথ? ও বুড়ি তো বলে, একদিন সে নাকি গান গাইতো। এখন ভাগ্যদোষে এই ডাস্টবিনে এসে পড়েছে।”

“এলিজাবেথ কে?” আমি বললাম ।

“কেন, মনে পড়ছে না? যে তোমার ঝুড়িগুলোর হিসেব রাখতো। একদিন দু'পুরে বৃষ্টিতে ভিজে এসে যার তোয়ালে নিয়ে তুমি গা মুছলে।”

এবার মনে পড়েছে। এলিজাবেথ লিজা। “কোথায় তিনি?” আমি প্রশ্ন করলাম। “শুয়ে আছে। অসুখ করেছে,” কে একজন বললে। দূর থেকে আমাকে একজন ঘরটা দেখিয়ে দিলো। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজানো ছিল। আমি দরজায় টোকা দিলাম। ভিতর থেকে মিহি গলায় উত্তর এলো, ‘কাম ইন'।

এলিজাবেথ আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। বিছানার উপর সে উঠে বসবার চেষ্টা করলো। ঘরের মধ্যে সব কিছুই কেমন নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে। আগে এমন ছিল না। হাতটা নেড়ে লিজা আমাকে একটা টুল নিয়ে বসতে বললো। আমি বললাম, “চিনতে পারছেন?”

লিজা ম্লান হাসলো। “তা পারবো কেন? তুমি চলে গেলে আর ম্যাগপিলের আয় কমে গেলো। এখানকার কারবারে অনেকে ওকে ঠকালে। মাল নিয়ে গিয়ে আর দাম দিলে না। ম্যাগপিল বাধ্য হয়ে এখান থেকে চলে গেলো। আমারও রোজগার কমে গিয়েছে, ঝুড়ির কাজ করে যা হোক কিছু, আসতো। এখন শোচনীয় অবস্থা, কমবয়সী মেয়েগুলো দয়া করে রেখে দিয়েছে তাই। ওরাই দেখাশোনা করে, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে গোবেচারা খদ্দের পেলে পাঠিয়ে দেয়।” "

লিজা এবার পা নাড়াবার চেষ্টা করলে। “এখন আমার হাঁটবার অবস্থা নেই। শরীর ভাল, কিন্তু পায়ের কষ্ট। অনেকদিন আগে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তখন ভাল ডাক্তারকে দেখাতে পারিনি। জোড়াপট্টি দিয়ে তখন ভাল হয়েছিলাম। এখন গোঁজামিল দেবার ফল বুঝতে পারছি।”

এই লিজাকে আগেও আমি দেখেছি। তার সঙ্গে বেকার জীবনে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু বেচারা মার্কোপোলোর জীবনে অনেকদিন আগে সে-ই যে জড়িয়ে গিয়েছিল তা যদি জানতাম! আমাকে দেখে হয়তো তার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। তাই লিজা এবার গুনগুন করে গান ধরলে। হয়তো এমন কোনো গানের টুকরো যা একদিন কলকাতার প্রমোদবিলাসীদের অন্তরে সাড়া জাগাতো। লিজা বললে, "দাঁড়াতে পারি না। কোনোরকমে দেওয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যাই। মাঝে মাঝে সে শক্তিও থাকে না। তখন বারবারা, প্যামেলা ওরা বেড় প্যানের ব্যবস্থা করে দেয়।"

আমি নিশ্চল পাথরের মতো এই আশ্চর্য জীবনের দিকে তাকিয়েছিলাম। দুঃখের অনুভূতি এখন আমার মনে আর বেদনা সৃষ্টি করে না। মাঝে মাঝে যখন সত্যিই অভিভূত হই, তখন কসাইখানার কথা মনে পড়ে যায়। নিজেকে কসাইখানার প্রতীক্ষারত অসংখ্য ছাগলের একটা মনে হয়, আমাদেরই কাউকে যেন এই মাত্র সেই ভয়াবহ পরিণতির জন্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

লিজা বললে, "কাউকে একটু ডাকি। তোমার জন্যে পাশের দোকান থেকে চা নিয়ে আসুক। হাজার হোক তুমি এখন অতিথি।"

আমি বললাম, "চায়ের দরকার নেই।"

আমার কথায় লিজা বোধহয় কষ্ট পেলো। লিজা তার ক্লান্ত এবং স্তিমিত চোখদু'টো উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করে বললে, "ভাবছো খরচা করিয়ে দিচ্ছো। আমার এখন টাকা আছে। কাল রাত্রেই বেশ কিছু রোজগার করেছি।"

আমি সত্যিই যেন পাথর হয়ে গিয়েছি। আমার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছে।

"কোথায় কাজ করছো?" লিজা প্রশ্ন করলে।

"শাজাহান হোটেলে।"

"শাজাহান!" লিজা যেন সত্যিই খুশী হলো। "আহা ওদের রান্না! একবার খেলে সারাজীবন মুখে লেগে থাকে। ওদের ওমলেট শ্যামপিনো। ওরা তোমাদের বিনা পয়সায় যদি দেয় তাহলে আমাকে একদিন এক প্লেট জাম্বো গ্রীল শাজাহান থেকে এনে দিও তো।"

আমি বললাম, “একদিন আপনাকে খাওয়াবো।”

“কত দাম?” লিজা বিছানায় নড়ে উঠে আমাকে প্রশ্ন করলে।

“টাকা সাতেক হবে,” আমি বললাম।

“অথচ তোমাদের পয়সা লাগবে না!” লিজা বিস্মিত কণ্ঠে বললে। আমাকে পয়সা দিয়েই কিনতে হবে। তবু চুপ করে রইলাম। টাকার কথা শুনলে বেচারা হয়তো খেতে চাইবে না।

চা-এর কাপে চুমুক দিতে কেমন যেন ঘেন্না লাগছিল। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আমার কৃতজ্ঞ মন সহ্য করতে প্রস্তুত থাকলেও অসন্তুষ্ট দেহটা যেন বিদ্রোহ করে উঠছিল।

বললাম, “সুশান বলে কাউকে চিনতেন আপনি?”

“সুশান! সুশান মনরোর কথা বলছো? যে একদিন দোকানে কেক বিক্রি করতো? আমারই জায়গায় যে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল দশ টাকা মাইনেয়? তাকে চিনি না? বলো কী গো?”

আমার মনে হলো লিজা সুশানকে তেমন ভাল চোখে দেখে না। লিজা হঠাৎ বললে, “তুমি তাকে চিনলে কী করে?”

বললাম, “একসাইজ ডিপার্টমেন্টের এক বন্ধুর কাছে তার গল্প শুনছিলাম। থিয়েটার রোডে ফ্ল্যাট নিয়ে সে নাকি অনেক টাকা রোজগার করেছিল।”

লিজার চোখ দু’টো বিদ্যুতের অভাবে ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “সুশান আবার ফিরে এসেছে নাকি? মেজর স্যানন তার পিছনে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে তো। আমি তখনই বলেছিলাম, ওই রকম হবে।”

অনেকদিন আগে আগ্নেয়গিরির প্রকোপে আটলান্টিক মহাসাগরে হারিয়ে যাওয়া এক দ্বীপ হঠাৎ যেন আমারই চোখের সামনে আবার ভেসে উঠছে। এতোদিন অসাধ্য বলে পরিগণিত ছিল, আমিই যেন আকস্মিক তাকে খুঁজে বার করবার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছি।

লিজা বললে, “টাকা দিলে তখন সবই হতো। আমেরিকান সোলজাররা টাকা দিয়ে সব করাতে পারতো। না হলে পুলিসের খাতায় যার অমন খারাপ নাম, তাকে সতীসাধ্বী

সাজিয়ে স্যানন কেমন করে ইলিনয়তে নিয়ে গেলো? ইচ্ছে ছিল বিয়ের কাজটা এখান থেকে সেরে যায়, কিন্তু সাহস করলে না। তখনও কোর্টে ডাইভোর্স' মামলা ঝুলছে। আইনের চোখে তার অন্য স্বামী রয়েছে। ইলিনয়তে সে খবর কে আর রাখছে? আর এতোদিনে নামধাম পালটিয়ে সুশান মনরো যে কী হয়ে গেছে কে জানে। কিন্তু আমি তখনই বলেছিলাম, সব ভাল যার শেষ ভাল। এর শেষ ভাল হবে না।"

একবার লোভ হয়েছিল, লিজাকে সব খুলে বলি। প্রশ্ন করি, মার্কোপোলো নামে কোনো বিদেশীর সঙ্গে শাজাহানের ডাইনিং রুমে তার সান্ধ্যবিহারের কথা মনে আছে কিনা। কিন্তু অনেক কষ্টে সে লোভ সংবরণ করে, সেদিন লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

আরও কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে ছিল। ছাতাওয়ালা লেনে আমার জীবনের এক ফেলে-আসা অধ্যায়কে অনেকদিন পরে খুঁজে পেয়ে আবার খুটিয়ে দেখবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু বাইরে বায়রন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। একলা রাস্তায় এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

"ইউরেকা! ইউরেকা!" বায়রন সায়েব আনন্দে দিশেহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "ইট ওয়াজ গডস্ উইল। না হলে এমন হবে কেন? না হলে তুমিও বা শাজাহানে এসে ভর্তি হবে কেন? এবং তারও আগে তুমি ঝুড়ি বেচাকেনার জন্যে ছাতাওয়ালা গলিতে আসবে কেন?"

একটা ট্যাক্সির দিকে বায়রন সায়েব এবার ছুটে গেলেন। বললেন, "আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। এখনই শাজাহান হোটেল।"

শাজাহান হোটেলে নেমে প্রায় ছুটতে ছুটতে বায়রন উপরে উঠে গিয়েছিলেন। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মার্কোকে সঙ্গে করে আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কাউন্টারে উইলিয়ম ঘোষ তখন ডিউটি দিচ্ছিল। সত্যসুন্দরদারও এই সময়ে থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখলাম না। বেচারা উইলিয়ম! ওর মনটা যে বেশ খারাপ তা ওর মুখ দেখেই বুঝলাম। কলের মতো সে কাজ করে যাচ্ছে। কাছে এসে বললাম, "কাউন্টারে একা হিমসিম খাচ্ছেন, সাহায্য করবো?"

গলার টাইটা একটু টাইট করে নিয়ে উইলিয়ম বিমর্ষভাবে বললে, "এবার থেকে কারুর সাহায্য না নিয়েই পৃথিবীতে চলবার চেষ্টা করবো।" রসিকতা করবার জন্যে বললাম, "শ্রীমতী রোজীরও সাহায্য নেবেন না? শঙ্খ এবং উলুধ্বনির মধ্যে শ্রীমতী কবে মদন দত্ত লেন বাসিনী হচ্ছেন?"

উইলিয়ম এবার যেন আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। "আপনার কানে সব খবরই আসবে, সুতরাং চাপা দিয়ে লাভ নেই। এ জানলে রোজীর সঙ্গে আমি ঘোরাঘুরি করতাম না। শুধু শুধুই এতোদিন আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, আপনাকে ডবল ডিউটিতে বসিয়ে রোজীকে সঙ্গে করে অন্য হোটেলে খেতে গিয়েছি।"

"তাতে মহাভারতের কী অসুদ্ধি হয়েছে?" আমি উইলিয়মকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে প্রশ্ন করলাম।

কাজ থামিয়ে উইলিয়ম বললে, "কৈশোর আর যৌবন পথে পথে কাটিয়ে, এই প্রৌঢ় জাহাজখানা শাজাহানের বন্দরে ভিড়িয়েছিলাম। আর কদিনই বা বাকি? রোজীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পর ভেবেছিলাম, শাজাহান আমাকে এ-লাইনে শিক্ষা দিয়েছে, আমার অন্ন দিচ্ছে এবং লাস্ট বাট দি লিস্ট আমার স্ত্রীকে দেবে। ওর সব ছেলেমানুষী, ওর সব দূর্বলতা সত্ত্বেও আমি সত্যিই রোজীকে ভালবেসে ছিলাম। এখন সে কী বলে জানেন? বলে, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, অন্ততঃ আরও পাঁচ বছর। এর মধ্যে ওর অসুস্থ বাবা মা নিশ্চয়ই চোখ বুজবেন, ওর বোনগলোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তার আগে বিয়ে করে সুখী হবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।"

রোজী! শাজাহান হোটেলের কৃষ্ণকলি টাইপিস্ট, রোজী। এতোদিন ধরে আমি শুধু ঘৃণা এবং অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছি। এই মুহূর্তে সে আমারই ঘরের অতি আপনজন হয়ে উঠছে।

উইলিয়ম বললে, "একদিন রোজী আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি নয়, বস্তি। দেড়খানা ঘরে ওদের যা অবস্থা! সারাক্ষণ তিনটে রোগী দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছে, কাশছে, থুথু ফেলছে। যেন নরককুণ্ড। রোজীর অসুস্থ বাবা মা আমাকে দেখে

বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয়, মেয়ে যেন কোথাও মন দিয়ে না বসে, তাহলে তাঁদের না খেতে পেয়ে মরতে হবে।

"বস্তির অন্য লোকদেরও দেখেছিলাম। অনেকেরই কোঁকড়া চল, একটু পুরু পুরু ঠোঁট। রোজী আমাকে সেদিনই বলেছিল, শাজাহানে যে রোজীকে দেখো, তার শিকড় রয়েছে এইখানে। রোজী আরও বলেছিল, 'তোমাকে আর একটা কথা জানানো উচিত। আমাকে হয়তো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভাবছো, আমিও বাজারে তাই বলে বেড়াই। কিন্তু আমরা আসলে কিন্তলী। এই বস্তির প্রায় সবাই প্রাচীন কলকাতার আফ্রিকান ক্রীতদাসদের বংশধর।"

উইলিয়ম ঘোষ বিস্ময়ে রোজীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রোজী বলেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে সুদু'র আফ্রিকা থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের কোমরে দড়ি বেধে কারা চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নামিয়েছিলেন, তারপর মুরগীহাটার ক্রীতদাসদের বাজারে পচিশ টাকা দামে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার কর্তাব্যক্তিরা তখন সবাই হাট থেকে মনের মতন ক্রীতদাসী কিনতেন। তারও অনেক পরে একদিন আইন করে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু মুক্তি পেয়েও তারা আর কোথায় যাবে? এই কলকাতাতেই রয়ে গেলো। তাদের আলাদা নাম ছিল না, প্রভুর নামে নাম। অনেকদিন আগে রোমের ক্রীতদাসরা যা করেছিল, কলকাতার ক্রীতদাসরাও তাই করলো। ডিকসন সায়েবের ক্রীতদাস ডিকসন সায়েবের নাম নিলে। সেক্সপীয়র সায়েবের ক্রীতদাসও একদিন মিস্টার সেক্সপীয়র নাম নিয়ে বস্তিতে এসে উঠলো। সেই থেকেই চলছে। এই একশ বছরেও সুদূর আফ্রিকার বিচিত্র মানুষের ধারা ভারত সমদ্রের' সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হতে পারলো না। দুঃখ, দারিদ্র্য, অনটন এবং সন্দেহের মধ্যে তারা আজও 'কিন্তলী' হয়েই রইলো।

উইলিয়ম বলেছিল, "আমার কিছুই তাতে এসে যায় না, রোজী, আমরা সবাই তো এতোদিন ক্রীতদাস হয়ে ছিলাম, আমাদের ভারতবর্ষের এই কোটী কোটী মানুষ এতোবছর ধরে অন্য এক জাতের কাছে কেনা হয়ে ছিল।"

রোজী বলেছিল, “তুমি আমাকে আর প্রলোভন দেখিও না। তুমি দয়া করে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো। না হলে, এখনই আমার ইচ্ছে করবে তোমাকে বিয়ে করতে, আমি আর দেরী সহ্য করতে পারবো না।”

উইলিয়ম বলেছিল, “রোজী, আর দেরী করা চলে না। আরও পাঁচ বছর পরে আমার কী থাকবে? আর তোমারও? আখের দু'খানা ছোবড়ার মধ্যে বিয়ে দিয়ে কী লাভ হবে?”

কাউন্টারে খাতা লিখতে লিখতে উইলিয়ম আমাকে বললে, “আমাদের বিয়ে হবে না। রোজীকে বলেছিলাম, তুমি বিয়ের পরও যেমন চাকরি করছো; করো। রোজী বললে, মোটেই না। বিয়ের পর শয়তান জিমিটা আমাকে একদিনও এখানে চাকরি করতে দেবে না। আমার চাকরিটা খেয়ে ছাড়বে। ওকে তো তোমরা চেনো না।"

আমি একটুকরো পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে উইলিয়মকে দেখতে লাগলাম। উইলিয়ম এবার গভীর দুঃখের সঙ্গে বললে, “হয়তো আপনি আমাকে স্বার্থপর বলবেন। কিন্তু আমি আর ধারে ব্যবসা করতে চাই না। এখন আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়স, ওর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে বিয়াল্লিশ। অসম্ভব। জীবনে অনেক ঠকেছি। আমি আর বোকার মতো অপেক্ষা করে ঠকতে চাই না।”

আজ যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, শাজাহানের কোন ঐশ্বর্যে আমি সবচেয়ে লাভবান হয়েছি, তা হলে কোনো দ্বিধা না করেই বলবো-কর্মীদের ভালবাসা। একই কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা নিজেরই অজ্ঞাতে কেমন করে সৃষ্টি হয় বলা শক্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করা যায়, অনেকগুলো প্রাণ কখন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে।

সেই কারণেই বোধহয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম, প্রথম জীবনে রোজী আমার বহু যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। ভুলে গিয়েছি, উইলিয়ম ঘোষ, গুড়বেড়িয়া, ন্যাটাহারিবাবুর সঙ্গে সামান্য কিছুদিন আগেও আমার পরিচয় ছিল না। অথচ আজ তাদের সম্বন্ধে আমি কত জানি।

ন্যাটাহারিবাবু বলেছিলেন, "এ শর্মা হাতের গোড়ায় থাকতে কেন অযথা নিজের বুদ্ধির পাম্পটাকে খাটিয়ে মারেন? অধমকে একবার তু করে ডাক দেবেন! ব্যাপারটা কী জানেন, এটা যে 'বে'র মতন। মনে করুন আপনার কোনো বন্ধুকে পনেরো বছর ধরে জানেন; সে-ই তার এক জানাশুনা মেয়ের সঙ্গে আপনার বে-র সম্বন্ধ করলে। বে-র ক'দিন পরে দেখা যাবে, আপনার ওয়াইফ আপনার সম্বন্ধে বন্ধুর থেকে অনেক বেশী জেনে গিয়েছে। চাকরিটাও তো 'বে'র মতন, আসলে বিবাহের চেয়ে বড়ো বলতে পারেন।"

ন্যাটাহারিবাবুকে আমি ঘাঁটাইনি। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। আমাকে কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "ব্যাপার কী মশাই? স্যাটা বোস দেখলাম ম্যানেজারের কাছে কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি চাইছে। যে লোকটা এই বারো বছরের মধ্যে কখনও বাইরে যায় না, তার আজ হলো কী? গতিক সুবিধে মনে হচ্ছে না। আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় অভ্যেস নেই, সোজা বলে দিলাম।"

ন্যাটাহারিবাবুকে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি তার আগেই বললেন, "একটা জিনিস জেনে রাখবেন—ধোঁয়া, টাকা আর প্রেম কিছুতেই চেপে রাখা যায় না। ঠিক ফুটে

বেরোবেই।”

আমাকে প্রতিবাদের কোনো সুযোগ না দিয়ে তিনি এবার হোটেলের কাজে অন্য ঘরে চলে গেলেন। আর আমার মনে হলো, সত্যসুন্দরদা সত্যিই যেন আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন।

সত্যসুন্দরদা, এতোদিন পরে, আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেদিন সত্যিই সুজাতাদির উপর আমার হিংসে হয়েছিল। শাজাহানের প্রাচীন পান্থশালার এক অপরিচিত যুবককে আপনি উজাড় করে ভালবাসা দিয়েছেন, তবুও যেন তার মন ভরেনি। সে আরও চেয়েছিল।

শাজাহানের সেই সন্ধ্যার কথা মনে আছে আপনার? ছাদের উপর একটা ইজিচেয়ার নিয়ে আপনি বসেছিলেন; একে একে আকাশে তারার দ্বীপগুলো জলে উঠছিল। সেদিন আপনাকে যেন অন্যভাবে দেখেছিলাম। শাজাহানের কাউন্টারে যে একদিন আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেছিল, সুখে দুঃখে যার আশ্রয়ে এতোদিন আমি লালিত-পালিত হয়েছি, এ যেন সেই স্যাটা বোস নয়।

সত্যসুন্দরদা, আপনি যখন আমাকে অমনভাবে পাশে বসতে বলেছিলেন, তখন আরও ভয় পেয়েছিলাম। আপনি যেন কেমন শান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জলভারে নম্র মেঘের মতো আপনার গতি যেন শ্লথ হয়ে পড়েছিল। আপনার মনের গাড়ি তখন যেন ইঞ্জিন বন্ধ করে কোনো ঢাল, পথ দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিল। আমি কোনো কথা না বলে, আপনার পাশে একটা মোড়ায় অনেকক্ষণ বসেছিলাম। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি কিছুই জানি না; অথচ আমাকে সত্যিই আপনি ভালবাসতেন, আমাকে না জানিয়ে কিছুই করতে ইচ্ছে করছিল না আপনার।

আপনি বলেছিলেন, “তোমার সম্বন্ধে মিস্ মিত্রের খুব ভাল ধারণা। মিস্ মিত্র বলছিলেন, তোমার মুখের মধ্যে ছোটোছেলের সারল্যের ছবি আছে।”

আমি লজ্জা পেয়ে একটু হাসলাম। আপনি বললেন, “ভদ্রমহিলাও খুব সরল। হোটেলে চাকরি করতে এসে এয়ার হোস্টেস তো কম দেখলাম না। কিন্তু এমন লাজুক স্বভাবের মেয়ে কেমন করে যে মধ্যগগনে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করেন, জানি না।”

আমি বলেছিলাম, "এক একজনের স্বভাবেই এই স্নিগ্ধ সরলতা থাকে। ইচ্ছে করলেও কাটিয়ে ওঠা যায় না।"

আপনার মনে বোধহয় কথাটা লেগেছিল। সুজাতাদিকে আপনি নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রকৃত প্রেমের ভিত্তিভূমিই এই শ্রদ্ধা। আপনি বলেছিলেন, "আজ বেশ বোকা বনে গেলাম। ভদ্রমহিলা যে অমনভাবে প্রশ্ন করবেন, বুঝিনি। আমার উপর রেগে গিয়েই বললেন, 'এই হোটেলের বাইরেও যে একটা জীবন আছে, তা জানেন কী?"

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। সেখান থেকেই তো আমাদের কাস্টমাররা আসে, আবার সেখানেই তারা ফিরে যায়।"

ভদ্রমহিলা তখন কী বললেন জানো? 'এমনভাবে জীবনটা নষ্ট করছেন কেন? এই হোটেলের ভূতটা আপনাদের ঘাড়ে পুরোপরি চেপে বসেছে। আপনাদের পাল্লার পড়ে ঐ ছেলেটিরও ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনি উত্তর দেননি?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

আপনি বলেছিলেন, "ভেবেছিলাম উত্তর দেবো। কিন্তু পারলাম না। ভদ্রমহিলার সাহস যে এতো বেড়ে যাবে ভাবিনি।"

স্যাটা বোস উত্তর দিতে পারেননি শূনে সত্যই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন যে হতে পারে তা যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। অনেকদিন পরে সেদিন ভিক্টর হুগো পড়তে পড়তে আমার বিস্ময়ের উত্তর পেয়েছিলাম : "The first symptom of love in a young man is timidity; in a girl it is boldness. The two sexes have a tendency to approach and each assumes the qualities of the others."

মনে আছে সত্যসুন্দরদা বলেছিলেন, "আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু আকাশের এই তারার সভার দিকে তাকিয়ে এখন সত্যিই মনে হচ্ছে, শাজাহানের বন্দীশালায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে আমরা পৃথিবীর অনেক আনন্দ এবং আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন বোসদা। বললেন, "বলা যায় না, সুজাতা মিত্র এখানে এসে হাজির হতে পারেন।"

"ভালই তো, তাহলে একহাত ঝগড়া করে নেওয়া যায়," আমি বললাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে বোসদা বললেন, "আজ আবার নাইট ডিউটি। কিন্তু কাজে যেতে ইচ্ছা করছে না।"

বললাম, "আমি থাকতে যাবার দরকার তো নেই।"

বোসদা বললেন, "গত জন্মে নিশ্চয় বহুদিন মা-বাপকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিলাম, তাই এ-জন্মে ফলভোগ করছি। আবার তোমাকে জাগিয়ে, পরের জন্মের হিসেব খারাপ করে দিই আর কী!"

বললাম, "পরোপকার তো হবে। এখন আপনাকে সার্ভিস দিলে সামনের জন্মে এই শ্রীমান সারারাত ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোতে পারবে।"

বোসদা আমার কথা কানে তুললেন না। আস্তে আস্তে বললেন, "এতোদিন নিজের মনে হোটেলের মধ্যে ডুবে ছিলাম। আমার যে বাইরের একটা অস্তিত্ব আছে, একদিন আমিও যে বাইরে থেকে এখানে এসেছিলাম, তা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"আসতে পারি?" ছাদের দরজা দিয়ে উকি মেরে সুজাতা মিত্র প্রশ্ন করলেন। "নিশ্চয়ই। এই বাড়ির ছাদ কিছু আমাদের রিজার্ভ— সম্পত্তি নয়।" বোসদা বললেন।

সিল্কের শাড়িটাকে দ্রুত হাওয়ার হাত থেকে সামলাতে সামলাতে সুজাতা মিত্র আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি উঠে পড়ে নিজের জায়গা ছেড়ে দিলাম। ঘরের ভিতর চলে যাবো ভাবছিলাম।

কিন্তু বোসদা বললেন, "আমার ঘর থেকে মোড়াটা নিয়ে এসে বসো, আড্ডা দেওয়া যাক।"

সুজাতা মিত্র এবার দংশন করলেন : "আপনার সঙ্গে আড্ডা। এখনি লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্ট আমদানি করে বসবেন।"

"কথার মধ্যে যা-ই আনি, আপাতত কি অসময়ে একটু চা আনাতে পারি?" বোসদা এবার জিজ্ঞাসা করলেন।

সুজাতা মিত্র ছাড়লেন না। বললেন, "হোটেলের স্টাফগুলো অনেক সুবিধে ভোগ করে। দেখলে হিংসে হয়। গেস্টরা খেতে পাক না পাক, এরা সব সময় সব জিনিস পায়! পেটুক লোকেরা সেই জন্যেই তো হোটেলের কর্মচারীদের হিংসে করে।"

বোসদা হেসে বললেন, "সব ছোটো ছেলেই তো ওই জন্যে ভাবে বড় হয়ে সে চকোলেটের কারখানায় কাজ করবে।"

সুজাতা মিত্র এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "যেমন আমি চেয়েছিলাম হাওয়াই জাহাজের চাকরি।"

আমি ও বোসদা সুজাতা মিত্রের ছেলেমানুষীভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুজাতা মিত্র বললেন, "আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। বোম্বাইতে থাকতাম। ট্রেনের রিজার্ভেশন না পেয়ে বাবা বোম্বাই থেকে প্লেনে কলকাতা আসবার ঠিক করলেন। আর সেই হলো আমার কাল।"

আমি বললাম, "কেন?"

শাড়ির আঁচলটা হাওয়ার অশোভন কৌতূহল থেকে সামলিয়ে সুজাতা মিত্র বললেন, "প্লেনে উঠেই আমার জীবনের সব ধারা যেন অন্য খাতে বইতে আরম্ভ করলো। সারাক্ষণ আমি পাইলটের ককপিটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্যাপটেন লোকটি ভাল ছিলেন, মজা পেয়ে আমাকে আদর করে, ধৈর্য ধরে সব দেখালেন, গল্প করলেন।"

বোসদা এবার ফোড়ন দিলেন, "সেটা ক্যাপটেন তেমন উদার কিছু করেননি। এমন আকর্ষণীয় মহিলা পেলে, আমিও হয়তো প্লেন চালানো অবহেলা করে, তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করতাম।"

সুজাতা মিত্র রেগে গেলেন। "অমন করলে গল্প বলবো না। শুনছেন একটা ইস্কুলে পড়া বারো বছরের মেয়ে প্লেনে চড়েছে।"

"এর উত্তর বিদ্যাপতির থেকে কোটেশনে দিতে হয়। কিন্তু ভদ্রলোক সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মহিলাদের সম্বন্ধে এতো অপ্রীতিকর উক্তি করেছেন যে, চেপে যাওয়াই ভাল।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হলেও হয়তো অতো আনন্দ হতো না। আমার অটোগ্রাফের খাতায় যখন ক্যাপটেন সই করে দিলেন, তখন মনে হলো

হাতের মুঠোর মধ্যে স্বর্গ পেয়েছি।

“আমি বললাম, 'বাবা, আমি পাইলট হবো।' আমার কথার ওপর কথা বলবার মতো সাহস আমার বাবার ছিল না। অফিসে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, কিন্তু আমার কথার অবাধ্য হতেন না তিনি। বলতেন, 'তুমি আমার ছেলে এবং মেয়ে দু'ই-ই।”

সুজাতা মিত্র এতোদিনে আবার যেন অতীতের নীল দীঘিতে অবগাহনের সুযোগ পেয়েছেন। মধুর স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে সুজাতা মিত্র বললেন, “শেষ পর্যন্ত অঙ্ক জিনিসটাই আমার কাল হলো। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বাবা বলেছিলেন, তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করো, তারপর যে যাই বলুক, তোমাকে পাইলট করবো।”

“কিন্তু ওই অঙ্ক জিনিসটা! পৃথিবীতে ভালো কিছু হতে গেলেই, প্রথমে আপনাকে প্রশ্ন করবে—অঙ্ক জানো? ইঞ্জিনীয়ার হতে চাও, বলবে অঙ্ক জানো? রোগের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার হতে চাও, তখনও অঙ্ক চাইবে। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে ছবি আঁকা শেখার জন্যেও আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল অঙ্কের নম্বর দেখতে চাইবে।”

সুজাতা মিত্র বললেন, “বাংলার প্রথম মহিলা পাইলট হওয়ার দু'র্লভ সৌভাগ্য একটুর জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেলো। কিন্তু নাকের বদলে নরুন পেলাম। আমি বলেছিলাম, 'আমি কিছুতেই ছাড়বো না। আকাশে আমাকে উড়তে হবে। ককপিটে বসে বন্ধু তারাদের নিশানা করে মহাশূন্যে আমি সাঁতার কাটবো। মা, বাবা, তোমাদের কিন্তু টিকিট লাগবে না। তোমরা নিজেদের সীটে বসে থাকবে, মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবে।' মা বলেছিলেন, এতোই যখন তোর ওড়ার নেশা, তখন কোনো পাইলটের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো'খন।”

“অন্যায় কিছু বলেননি তিনি,” বোসদা বললেন। “আপনার ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে একটা বিনা মাইনের শিক্ষিত পাইলট চাকর পেতেন!”

সুজাতা মিত্র রাগ করলেন। “এমন ঝগড়াটে স্বভাব নিয়ে কি করে যে আপনি হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ করেন।”

“জিজ্ঞাসা করুন এই শ্রীমানকে। ভূ-ভারতে সত্যসুন্দর বোসের মতো আর একটি রিসেপশনিস্টের জন্ম হয়েছে কিনা? বিলেতে জন্মালে এতোদিনে ক্লারিজের ম্যানেজার

হতাম। আমেরিকায় জন্মালে ওয়ার্ল্ডর্ফ এস্টোরিয়া হোটেলের বর্তমান ম্যানেজার বেচারার কী যে হতো! কী হে শ্রীমান, আমার সাপোর্টে কিছু বলো।"

আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না। কিন্তু তার আগেই সুজাতা মিত্র অবলীলাক্রমে আমাকেও আক্রমণ করলেন—"ভালো লোককে দলে টানছেন— শুড়ীর সাক্ষী মাতাল!"

এবার নিজেই হাসতে আরম্ভ করলেন সজাতা। আমাকে বললেন, "তুমি কিছু মনে কোরো না, ভাই। তোমাকে কিছু 'মিন' করিনি।"

আমি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছি, বোসদারই দোষ। বললাম, "আপনারই দোষ। কথার মধ্যে আপনি কথা বলেন কেন?"

বোসদা হতাশ হয়ে যেন মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। "দাউ টু ব্রুটাস! একজন এয়ার হোস্টেসের সামান্য মিষ্টি কথায় ভিজে গিয়ে তুমি এতোদিনের বিশ্বস্ত বন্ধুকে ডোবালে? অথচ তুমি বুঝলে না, হাওয়াই হোস্টেসরা আমাদেরই মতো জোর করে ট্যাবলেট খেয়ে হাসেন। হাসাই ওঁদের চাকরির অঙ্গ। যেমন পেটের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেলেও হোটেলের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমাদের দন্তকৌমুদী বিকশিত করতে হয়।"

আমি বললাম, "সুতরাং রিসেপশনিস্ট এবং এয়ার হোস্টেসে কাটাকাটি হয়ে গেলো। যাকে বলে কিনা কাঠে কাঠে।"

বোসদা মৃদু' হাস্যে বললেন, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি যদি শুড়ী হই, তাহলে তুমি মাতাল। হোটেলে চাকরি করি, মদের লাইসেন্স আছে, সুতরাং শুড়ী তো বটেই। অথচ বেচারা তোমার স্টেনলেস স্টিলের মতো শুভ্র চরিত্রে এই মুখরা মহিলা অযথা কলঙ্ক লেপন করলেন।"

আমরা সবাই এবার এক সঙ্গে শাজাহানের ছাদের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হো হো করে হেসে উঠলাম। সুজাতা মিত্র বললেন, "ক্যাপটেনের প্রতাপ কী সে আমরা জানি; আপনারা যেমন ম্যানেজার নামক বস্তুটিকে বোঝেন। কিন্তু তাতে আর হলো কী- হতে চেয়েছিলাম ডাক্তার, হলাম নার্স—পাইলটের বদলে হাওয়াই হোস্টেস"

বোসদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার এক মামা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়েছেন।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "ব্যঙ্গ করছেন, কিন্তু কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে..."

আমরা আবার অট্টহাস্যে ভেঙে পড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই কে যেন ছাদের আলোগুলো হঠাৎ জালিয়ে দিলো। মনে হলো গুড়বেড়িয়া যেন হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

"কে, গুড়বেড়িয়া?" অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বোসদা বললেন।

"হ্যাঁ হুজুর," আমাদের দিকে মাথা নত করে গুড়বেড়িয়া বললে। জানলাম, মার্কোপোলো ডিনারের পরে আমাকে দেখা করতে বলেছেন। আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

গুড়বেড়িয়ার এবার চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে তখনও মূর্তিমান গদ্যের মতো আমাদের কাব্যজগতে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ তুলে গুড়বেড়িয়াকে বললাম, "কী ব্যাপার?" গুড়বেড়িয়া আমতা আমতা করতে লাগলো। সুজাতা মিত্র বোধহয় ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন, "আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি, আপনারা কথা বলুন।"

আমি বাধা দিলাম আর বোসদা বললেন, "শ্রীমান গুড়বেড়িয়া, পৃথিবীর গোপনীয়তম খবরও তুমি এই ত্রিমূর্তির কাছে দিতে পারো। দিদিমণি হাওয়াই জাহাজে আকাশের উপর উড়ে গিয়ে কত খবর নিয়ে আসেন। সে সব গোপন থাকে।

গুড়বেড়িয়া এবার সাহস পেয়ে জানালে, আমি যখন মার্কো সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তখন ইচ্ছে করলেই তার বিশেষ উপকার করতে পারি। এবং সেই বিশেষ উপকারের জন্যে শুধু সে নয়, আরও একজন—শাজাহানের হেড বেয়ারা পরবাসীয়া—আমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। নীরব সাধনা এবং সুগভীর ধৈর্যে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পরবাসীয়ার মন গলেছে –তার কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য তিনি শ্রীমান গুড়বেড়িয়াকে যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ভাবী জামাতার ছুটি ও উন্নতির তদ্বিরের জন্য তাঁর পক্ষে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া পরবাসীয়া তাঁর সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, গুণবতী কন্যার পাণিপ্রার্থী যুবকটির কৌশল এবং বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চান। বিবাহবিলাসী যুবক গুড়বেড়িয়া দুরুদুরু বক্ষে সদর উড়িষ্যার কোনো পল্লী থেকে সেই আদি অকৃত্রিম টেলিগ্রাম- 'মাদার

সিরিয়াস, কাম হোম'—পাঠাবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ভাবী শ্বশুর সম্মতি দিতে পারেননি। কারণ বিবাহোৎসবে তাঁরও উপস্থিতি প্রয়োজন এবং টেলিগ্রাম-পদ্ধতিতে ছুটি তিনি নিজেই নেবেন। একই উপায়ে শ্বশুর-জামাই-এর ছুটি নেওয়া এই শত্রুপরিবৃত পুরীতে বিশেষ বিপজ্জনক।

অপরিচিতা মহিলার সামনে বিবাহঘটিত আলোচনায় বিব্রত গুড়বেড়িয়া এবার দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান করলে: বোসদা সানন্দে বললেন, "ছাদের অধিবাসীদের আজ স্মরণীয় দিন। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হবে জয়! তরুণ গুড়বেড়িয়ার প্রাচীন স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আহা বেচারা।"

বোসদা বললেন, "ম্যানেজারকে বলে ওর ছুটি করিয়ে দিও। লোক কম আছে। সামনে আবার মিসেস পাকড়াশীর ব্যাংকোয়েট। কিন্তু তুমি বোলো, দরকার হয় ছাদে আমরা দিন দশেক নিজেরাই সব করে নেবো—বেয়ারা লাগবে না।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনারা দেখছি গুড়বেড়িয়ার গুণগ্রাহী।"

বোসদা হেসে বললেন, "অল্, দি ওয়ার্লড লাভস্ দি লাভার। গুড়বেড়িয়া বলেছিল—ওই মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না।"

বোসদা উৎসাহে এবার গুড়বেড়িয়াকে চিৎকার করে ডাকলেন। গুড়বেড়িয়া লিফটের কাছে একটা টুলে বসে ছিল। সায়েব ডাকতেই একটু চিন্তিত হয়ে আবার এসে সেলাম করলো। বোসদা বললেন, "তুমি বিয়ের বাজার করতে আরম্ভ করো। ছুটি পাবেই।"

কৃতজ্ঞ গুড়বেড়িয়া আবার নমস্কার করলো। "তোমার বিশেষ কিছু ইচ্ছে থাকলে, জানাতে লজ্জা কোরো না।" বোসদার এই আশ্বাসবাণীতে সাহস পেয়ে গুড়বেড়িয়া তার বহুদিনের একটি গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করলো। বিবাহ উপলক্ষে রঙিন রাঙতায় মোড়া একটা শাজাহান কেক সে নিয়ে যেতে চায়। প্রয়োজন হলে এক টাকা পর্যন্ত খরচ করতেও সে রাজী আছে।

বোসদা বললেন, "জরুর। জুনোকে বলে তিন পাউন্ডের স্পেশাল ওয়েডিং কেক করিয়ে দেবো। তাতে তোমার নাম লেখা থাকবে।"

সৌভাগ্যসূর্যের এমন অভাবনীয় উদয়ে বিস্মিত গুড়বেড়িয়া বাকশক্তিরহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোসদা বললেন, "বিয়ের পর বৌমাকে কলকাতায় আনছো তো?"

"না, হুজুর। এখানে খরচ কত।"

বোসদা বললেন, "আমি তোমার ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মমতাজে ডিউটি পড়লে রোজ বেশ কিছু টিপস পাবে।"

গুড়বেড়িয়া চলে গেলো। সুজাতা মিত্র বললে, "এই একটি জিনিস—Tips" বোসদা বললেন, "আগে তাড়াতাড়ি সার্ভিসের জন্যে লোকে পয়সা দিত। To insure promptitude। আর এখন ইজ্জত রাখার জন্যে — To insurs prestige। আর To insure peace, বেয়ারাদের মধ্যে টিপসের ভাগাভাগির খেয়োখেয়ি এড়াবার জন্যে, অনেক হোটেলে শতকরা দশ বা পনেরো ভাগ সার্ভিস চার্জ বসিয়ে বকশিস বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের এখানেও মার্কোর ঐ ব্যবস্থা চালু করার ইচ্ছে। মন মেজাজ ভাল থাকলে এতোদিনে করেও দিতেন। জিমিটাকে দিয়ে কিছুই হবে না—একটা হতভাগা।"

সুজাতা মিত্র আশ্চর্য হয়েই বোসদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারাভরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আমার মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে উঠলো। কবে, কোথায়, কতদিন আগে আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম; আর সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আজ এই মূহর্তে আমরা তিনজন শাজাহানের ছাদে এসে জড়ো হয়েছি।

সত্যসুন্দর বোসের জীবন-নদী আপন বেগেই এতোদিন ছুটে চলেছিল। কোথাকার এক পরিচয়হীন মেয়ে অকস্মাৎ বহুজনের অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রশ্ন করেই সমস্যাকে জটিল করে তুললো- আপন মনে নেচে নেচে কোথায় চলেছো তুমি?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যে অসংখ্য মানুষের দল শাজাহানের পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করেছে, তারা কেউ তো সাহেবগঞ্জের সত্যসুন্দর বোসকে সে প্রশ্ন করেনি।

সরলা বালিকার গভীর প্রশ্নে মূহূর্তের জন্য বিব্রত নদী উত্তর দিয়েছিল, –কেন? যৌবনের সেই ঊষালগ্নে কলেজকে প্রণাম করে যেদিন স্বেচ্ছায় এই অনন্ত-যৌবনা পান্থশালায়

আশ্রয় নিয়েছিলাম সেদিন থেকেই তো ছুটে চলেছি। আপন ছন্দে মত্ত হয়ে, জীবনের নদী আপন মনেই এগিয়ে চলেছে।

"কিন্তু কোথায়?"

তা তো জানি না। সত্যসুন্দরদার মা, তিনি তো কবে আর এক সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সাহেবগঞ্জের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সত্যসুন্দর বোস তখন ক্লাশ ফাইভে পড়েন। তিনি বেচে থাকলে হয়তো সে প্রশ্ন করতেন। বাবা? তিনি ব্যক্তিত্বের কঠিন আবরণের আড়ালে থেকে, মাসে মাসে মনি-অর্ডারে হোস্টেলের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করেছেন।

সত্যসুন্দরদা যা আমাকেও কোনোদিন বলেননি, আজ তা প্রকাশ করলেন। "জানেন, আমার এক সৎ মা আছেন।"

"তিনি বুঝি এই কোমল স্বভাবের রোমান্টিক ছেলেটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই চিন্তা করেননি?" সুজাতা মিত্র প্রশ্ন করলেন।

কোটি কোটি আলোক বৎসর দূরের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহেবগঞ্জের সত্যসুন্দর বোস অনেকক্ষণ বোবার মতো তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "সে ভদ্রমহিলাকে দোষ দিয়ে কী লাভ? আমার থেকে তাঁর বয়স হয়তো মাত্র কয়েক বছর বেশী। নিজের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা করতে করতেই তিনি নিশ্চয় ব্যতিব্যস্ত।"

আজ পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো শহরেই সত্যসুন্দরদার আপন জন নেই। হোম অ্যাড্রেস বলেও কিছু নেই তাঁর। কর্তব্যের মধ্যে বিধবা সৎ মাকে মাঝে মাঝে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠান।

স্তব্ধতার গুমোট কাটিয়ে শাজাহানের বিষণ্ন আকাশে হঠাৎ ভায়োলিনের করুণ সুর বেজে উঠলো। আমাদের এই আনন্দের হাটে অমন ভাবে কে যেন প্রিয়জনবিরহে রাতের গভীরে সবার অলক্ষ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রভাতচন্দ্র গোমেজ নিজের ঘরে বসে বসে সপ্তদশ, অষ্টাদশ কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো হতভাগ্য সুরগুরুর চরণে সুরের প্রণাম নিবেদন করছেন। হাণ্ডেল, বাক্, বীঠোফেন, সুবার্ট, সুম্যান, ভাগনার, ব্রাহাম, মোৎসার্ট,

শোঁপা, মেণ্ডেলসনের সুরের জগতে যেন কেবলই বেদনা। কোন সুন্দর দেশের বহু শতাব্দীর আগের বেদনাধ্বনি এতোদিন ইথারবাহিত হয়ে এই রাত্রে শাজাহানের শীর্ষদেশে পৌঁচেছে।

আমার পক্ষে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। বেদনাহত, যন্ত্রণাকাতর, জীবনানন্দে বঞ্চিত সঙ্গীতের পাশ্চাত্য ঋষিরা যেন বারে বারে অপমানিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে এবার আমার পর্ণকুটীরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সুজাতা মিত্র ও বোসদা পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি চললাম গোমেজের ঘরের দিকে।

বিজলীবাতির স্তিমিত আলোকে প্রভাতচন্দৰ আপন মনে ভায়োলিন বাজিয়ে চলেছেন। কে তুমি? বাণীর বরপুত্র, কার শাপে স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শাজাহানের নির্বাসনে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করছো? এই মূহূর্তে যে বিদেহী আত্মা তোমার অভিশপ্ত দেহের উপর ভর করে সঙ্গীতের মূর্ছনা তুলছেন তিনি কি ধনীপুত্র মেণ্ডেলসন না, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত শিশুপ্রতিভা মোৎসার্ট? তিনি কি দৃষ্টিহীন মৃত্যুপথযাত্রী জন সিবাস্টিয়ান বাক্? না, ভাগ্যহত বধির বীঠোফেন? অথবা ক্ষয়রোগগ্রস্ত মহমূর্ষ, শোঁপা? আমি যে কিছুই জানি না। জানলে হয়তো তোমার যোগ্য সমাদর করতে পারতাম! মূক বধিরের সভায় তুমি যে সঙ্গীত পরিবেশন করছো। দৃষ্টিহীনের দেশে তুমি যে দীপাবলীর আয়োজন করেছো।

শাজাহানের সামান্য সঙ্গীতজ্ঞ যেন এই মাটির পৃথিবীতে নেই। আঘাত, অপমান, অবজ্ঞা, দুঃখ, যন্ত্রণা, সব বিস্তৃত হয়ে তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দেহদীপাধারে সুরধুনীর আরতি করছেন। আমি দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"কে?" প্রভাতচন্দৰ আমার ছায়া দেখে চমকে উঠলেন। সঙ্গীতের সারস্বত কুঞ্জে মূর্তিমান ব্যাধের প্রবেশে সুরের বিহঙ্গরা মহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

প্রভাতচন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"No more noisy loud word from me-such is my masters' will. Henceforth I deal in whispers. The speech in my heart will be carried on in murmurings of a song."

কাব্যের দেবতা আজ যেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে শাজাহানের সামান্য কর্মচারীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন। আমি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম :

"কোলাহল তো বারণ হলো

এবার কথা কানে কানে

এখন হবে প্রাণের আলাপ

কেবল মাত্র গানে গানে।"

প্রভাতচন্দ্র আবার ভায়োলিন তুলে নিলেন। সেখানে যে সুর বেজে উঠলো তা সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচিত :

"শুধু তোমার বাণী নয় গো,

হে বন্ধু হে প্রিয়,

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার

পরশখানি দিয়ো।"

প্রভাতচন্দ্র এবার চমকে উঠলেন। ডিনারের আজ দেরি নেই। ভারোলিনটা বিছানার উপর ফেলে রেখে, কোটটা হাতে নিয়ে, দরজাটা কোনোরকমে বন্ধ করে, দ্রুতবেগে তিনি নিচেয় নেমে গেলেন। ডিনারের আগে তাঁর খেয়ে নেবার নিয়ম। আজ যে তাঁকে অনাহারে থাকতে হবে তা বুঝলাম।

তারাদের সাক্ষী রেখে সত্যসুন্দরদা ও সুজাতা মিত্র তখনও মুখোমুখি বসে রয়েছেন। আমি বললাম, "মিস্ মিত্র, এবার ক'দিন আছেন?"

সুজাতা মিত্র বললেন, "ক'দিন মানে? আজ রাত্রেই বিদায় হচ্ছি।"

"আবার কবে আসবেন?"

"প্রায়ই আসতে হবে আমাকে। ক'দিন ছাড়াই আপনাদের জ্বালাতন করবো।" বোসদা বললেন, "আপনার জীবনের কথা ভাবলে হিংসে হয়।"

"হিংসেরই তো কথা!" সুজাতা মিত্র উত্তর দিলেন। "কেমন অদ্ভুত জীবন। হয় আকাশে, না হয় হোটেলে। রাতের অন্ধকারে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, আমি তখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এরোড্রোম থেকে হোটেলের দিকে রওনা দিচ্ছি। ভোরবেলায় হোটেল ছেড়ে আবার এরোড্রোম। আজ এ-হোটেল, কাল আর-এক হোটেল, পরশ দিন আর-এক হোটেল।"

বোসদা উত্তর দিলেন, "সেই জন্যেই তো আরবদেশে বলে— Mortal, if thou wouldst be happy, change thy home often; for the sweetness of life is variety, and the morrow is not mine or thine."

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনার সঙ্গে পড়াশোনা বা কোটেশনে পেরে ওঠা আমার কাজ নয়। আমি সামান্য এয়ারহোস্টেস—অ্যাকমপেনেড ব্যাগেজ, টী, কফি, চকোলেট, এলকহলিক ড্রিংকস, ফ্লাইট এই সব বুঝি। হোটেলে কাজ করতে করতে এতো পড়বার সুযোগ কেমন করে পান?"

বোসদা হেসে বললেন, "হোটেল তো পড়বারই জায়গা; কত উঠতি লোককে এখানে পড়তে দেখলাম !" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোসদা বললেন, "আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি। ডিনার শেষ করে একটু গড়িয়ে নিন। মধ্যরাতে আবার তো রওনা দিতে হবে।"

শাড়ির আঁচলটা ঝাড়তে ঝাড়তে সুজাতা মিত্র উঠে পড়লেন। বোসদা বললেন, "শুভ রাত্রি।"

রাগ করে সুজাতা মিত্র বললেন, "অতো ইংরিজী কায়দা আমার ভাল লাগে না।" বোসদা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, "বাংলা কায়দা অনুসরণ করলে বলতে হয় 'এসো।' সেটা কি আপনি বরদাস্ত করবেন?"

কপট ক্রোধে বোসদার দিকে তাকিয়ে, সুজাতা মিত্র এবার আমার সঙ্গে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। লিফটে সুজাতা প্রশ্ন করলেন, "এখানে কতদিন আছেন?" বললাম, "তেমন কিছু বেশীদিন নয়।"

"আর মিস্টার বোস?"

"উনি অনেকদিন। ওঁকে বাদ দিয়ে এই হোটেলের কথা ভাবা যায় না।" "এমন মানুষ কেন যে হোটেলের চার দেওয়ালে বন্দী হয়ে নিজেকে খরচ করে ফেলছেন," সুজাতা মিত্র আপন মনেই বললেন।

লিফট থেকে নামবার আগে সুজাতা মিত্র হেসে বললেন, "আসি ভাই। আবার দেখা হবে।"

নিজের ঘরে মার্কোপোলো বুঁদ হয়ে বসেছিলেন। আমাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুললেন। বিছানায় বসিয়ে আমার পিঠে হাত রেখে এমনভাবে অভ্যর্থনা করলেন যে, কে বলবে তিনি ম্যানেজার এবং আমি সামান্য একজন রিসেপশনিস্ট? বললেন, "লিজাকে তুমি কতদিন জানো?"

"বেশীদিন নয়। এই হোটেলে আসবার আগে কিছুদিন ওঁদের বাড়িতে রোজ ঝুড়ি কিনতে যেতে হতো।"

"লিজা কিন্তু তোমাকে খুব স্নেহ করে। তোমার প্রশংসা করলে"

এই অকারণ ভালবাসায় আমার জীবন-মরুভূমি বার বার শ্যামল সবুজ হয়ে উঠেছে। মানুষের ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। বললাম, "তিনি আমার বহু উপকার করেছেন।"

মার্কো বললেন, "লিজাকে আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। পায়ের একটা এক্স-রে ছবিও তোলালাম। ডাক্তার বলেছেন সেরে যাবে। লিজা তোমাকে খবরটা দিতে বলেছে। আগামী কাল বিকেলে ওকে আবার ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে। অথচ জিমিকেও ছুটি দিয়েছি। ব্যাংকোয়েট হল-এর টী পার্টি তুমি আর স্যাটা ম্যানেজ করতে পারবে না?"

বললাম, "আপনি লিজাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বেচারা যা কষ্ট পায় দেখলে আমার চোখ দিয়ে জল আসে। আমরা টী পার্টি ম্যানেজ করে দেবো।"

মার্কো ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু তাঁর মন ছাতাওয়ালা গলির সেই অন্ধকার বাড়িতে পড়ে রয়েছে। বললেন, "কতদিন পরে লিজাকে দেখছি। ওর দেহ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু ওর চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়েছো? ও-দু'টো আজও হীরের মতো জ্বলে।"

সাংস্কৃতিক সমিতির চা-পান সভা আমরা দু''জনেই ম্যানেজ করছি। দলে দলে সম্মানিত অতিথিরা এবং উৎসাহী সভা-সভ্যরা আসছেন। আজ সমিতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। তাঁদের স্থায়ী উৎসাহদাত্রী মিসেস পাকড়াশীকে বিদেশ যাবার প্রাক্কালে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এই সভায় সহযোগিতা করছেন কলকাতার আরও কুড়িটি প্রতিষ্ঠান—যাঁদের লক্ষ্য শিশুমঙ্গল, নারী জাতির উন্নতি, সামাজিক বৈষম্য দূর ইত্যাদি।

সভা আরম্ভের এক মিনিট আগে মাননীয় সভাপতির সঙ্গে শ্রীমতী পাকড়াশী সাদা ব্লাউজ এবং লালপেড়ে একটা সাদা খদ্দরের শাড়ি পরে ব্যাংকোয়েট হল-এ হাজির হলেন। মিসেস পাকড়াশীর চোখে আজ কালো চশমা নেই; দৃষ্টিতে সেই সপিণীর ভয়াবহতাও নেই।

টেবিলে টেবিলে চা পরিবেশিত হচ্ছে। কেক, স্যাণ্ডউইচ, পেস্ট্রি প্রচুর পরিমাণে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সভাপতি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ কলকাতা, তথা বাংলাদেশ, তথা ভারতের পরম গর্বের দিন। নারী জাতিকে যে সম্মান এবং উন্নতির সুযোগ আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে দিয়েছি, তা ইংলণ্ড আমেরিকাতেও সহজলভ্য নয়। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো নারী ইতিপূর্বে মিসেস পাকড়াশীর মতো আন্তর্জাতিক নৈতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনের সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হননি। ভারতের নারী জাতির সনাতন আদর্শ মিসেস পাকড়াশীর মধ্যে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। ধনীর গৃহবধূ হয়েও, তিনি প্রায় যোগিনী সাজেই সাধারণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন- কলকাতার নোংরাতম বস্তিতে পর্যন্ত তাঁকে হাসিমুখে যখন কাজ করতে দেখি তখন আমাদের ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়ে যায়। তবুও সেই বিদেশিনী মহিলার সংসার ছিল না। আর এই সাধ্বী মহিলা স্বামী এবং জাতি কারও প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেননি।"

আরও অনেক বক্তৃতা হলো। বোসদা কানে কানে বললেন, "শুনে যাও!"

মিসেস পাকড়াশী ঘোমটা সামান্য টেনে দিয়ে বললেন, "আর পাঁচজনের মতো আমি সামান্য একজন গৃহবধূ। সেইটাই আমার একমাত্র পরিচয়। স্বামী পুত্রের সেবা করে যতোটুকু সময় পাই, সারা দেশে আমার যে মা, ভাই, বোন ছড়িয়ে আছেন তাঁদের কথা ভাববার চেষ্টা করি। যে সম্মান বিদেশ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা আসলে আপনাদেরই সম্মান। আমি নিমিত্ত মাত্র। সম্মেলনের পরেই আমার চলে আসবার কথা। নিজের ঘরসংসার, স্বামী পুত্র ছেড়ে গৃহস্থ ঘরের বধু ক'দিনই বা বাইরে থাকতে পারি বলুন? কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ দু'র্গতির কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম – কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন দেশে নারীত্বের প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে তা জেনে আসবো।"

সভায় এবার প্রচণ্ড হাততালি পড়লো। মিসেস পাকড়াশী এবার বললেন, "পরিশেষে, ভারতের চিরন্তন নারীত্বের প্রতি দেশের মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যেন কখনই না ভুলি স্বামীরাই আমাদের সব। লতারও প্রাণ আছে, গাছেরও প্রাণ আছে —কেউ ছোটো নয়। তবু লতা গাছকে জড়িয়ে বড়ো হতে ভালবাসে। আমরাও সেভাবে স্বামীকে জড়িয়েই বড়ো হবো।"

সভা থেকে বেরোবার আগে বোসদার সঙ্গে মিসেস পাকড়াশীর চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। যেন না দেখার ভান করে তিনি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ওদের বিদায় করে দিয়ে, ব্যাংকোয়েট হল-এ ফিরে এসে বোসদা বললেন, "ওঁদের খবর শুনলে তো? এবার আমার খবর শোনো। এক নম্বর স্যুইটের সেই বিদেশী ছোকরাটির কথা মনে আছে তো? সেও অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। একই প্লেনে সেও প্যারিসে যাচ্ছে! পওর মিস্টার পাকড়াশী।"

যেদিন প্রভাতে পরম বিস্ময়ে শাজাহান হোটেলে পদার্পণ করেছিলাম, সেদিন থেকেই ঘড়ির কাঁটা দ্রুত পদক্ষেপে রাত্রের সন্ধানে ছুটতে আরম্ভ করেছে। এবার যেন সত্যিই বেলাশেষের সুর বেজে উঠবে। ক্লান্ত অপরাহ্ণ আমারই অজ্ঞাতে কখন দীর্ঘ বিকল্প ছায়া বিস্তার করেছে। দিগন্তের রঙে শাজাহানের আকাশ যেন রঙীন হয়ে উঠেছে।

এতোদিন শাজাহান আমাকে কেবল মানুষ চেনবার দু'র্লভ সুযোগই দেয়নি: আত্মীয় আবিষ্কারের অপার আনন্দও দিয়েছে। অপরিচিত এই পৃথিবীতে তাই কোনোদিন নিঃসঙ্গ বোধ করিনি। কিন্তু অশুভ চিন্তাগুলো এবার আমার বিনা অনুমতিতেই মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উকি মারছে। আলোকোজ্জ্বল সভাগৃহে এবার একে একে নিভিছে দেউটি। শাজাহানের ঘাটে আমরা সবাই বেলাশেষের শেষ-খেলার প্রতীক্ষা করছি।

সত্যিই আমার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। পান্থশালায় অগণিত অতিথির দিবারাত্রির আগমন নির্গমন এখন আর তেমনভাবে আমার মনে রেখাপাত করছে না। খেয়াঘাটে বসে বসে অতীত দিনের সহযাত্রীদের কথাই অপেক্ষমান যাত্রীর বার বার মনে পড়ছে। আমার হতশ্রী শিথিল স্মৃতি হঠাৎ নবযৌবন লাভ করেছে। বিস্মৃতির ধুলো স্যরিয়ে বিবর্ণ ছবিগুলো আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু'নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়ালেই করবী গুহের কথা মনে পড়ে যায়। রাতের ক্যাবারে উৎসবে দাঁড়ালেই কনি ও ল্যামব্রেটাকে দেখতে পাই। বার-এ দাঁড়ালেই বহু বর্ষ আগের এক অসহায় বারবনিতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছাদে উঠলেই দেখি দীর্ঘদেহ ডাক্তার সাদারল্যান্ড উইলিয়ামস লেনের লোকাল বয়েজদের কথা চিন্তা করছেন।

তবু এরই মধ্যে জীবন চলেছে। অনেকদিন আগে সিম্পসন নামে এক ইংরেজ ভগীরথ যে স্রোতস্বিনীকে আমাদের এই মরুভূমিতে আহ্বান করেছিলেন, তার গতি ধীর হলেও, আজও তা স্তব্ধ হয়নি। মমতাজ-এর বার-এ দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্কের হিসেবনিকেশ করতে করতে সরাবজী তাই মেয়ের কথা চিন্তা করেন, তাঁর নিজেরও যে একটা বার ছিল তা

কিছুতেই ভুলতে পারেন না। উইলিয়ম ঘোষ অন্য এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করেছে। স্টেটসম্যানের এনগেজমেন্ট স্তম্ভে সে সংবাদ পয়সা দিয়ে ছাপানো হয়েছে।

আর বেচারা রোজী, তার বাবা মার অসুখ বেড়েছে। চিকিৎসা করাতে পারছে না। টাকার জন্যে মেয়েটা হন্যে হয়ে উঠেছে।

ফোকলা চ্যাটার্জি প্রায়ই রোজীর সঙ্গে কথা বলেন। আমাকেও জানালেন, "আপনাদের রোজী মেয়েটা বেশ। মিস্টার সদাশিবমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। হাই অফিসার সদাশিবমের হাতে অনেক ক্ষমতা। মশায়, আগে প্রায়ই যেতাম। কিন্তু শুধু ল্যাজে খেলতো। শেষে একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বললে, যা চাইছো তাই করিয়ে দেবো; কিন্তু বিকেলে বড় 'লোনলি' ফীল করি। তা মশায়, দিলাম আপনাদের রোজীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে। এখন প্রায়ই অন্য হোটেলে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করছেন ওঁরা। সদাশিবমের ওয়াইফ বোধহয় লাস্ট এক বছর বাপের বাড়িতে রয়েছে। আমার কী! আমাকেও তো কোটা, পারমিট, অর্ডার যোগাড় করে বেঁচে থাকতে হবে। দু'নিয়ার যত মাল কি শালা পারচেজ অফিসার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আর বুশ-সার্ট-পরা হাই অফিসারই এনজয় করে যাবে? আমাদের মতো সাধারণ ইনোসেন্ট লোকদের কি মালের তেষ্টা লাগে না?"

ফোকলা চ্যাটার্জি বলেছিলেন, "দুঃখের কথা বলবো কি, দেশে আপনারা অভাব অভাব বলেন, অথচ বিজনেস লাইনে আমরা মেয়ে পাচ্ছি না। একজন বাঙালী হিসেবে বলছি, বেঙ্গলী মেয়েদের সবাই চায়! সুযোগ রয়েছে, সুবিধে রয়েছে তবু লাইনে আসবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে ফোকলা চ্যাটার্জির বদনাম হয়ে যাবে।

বাপু আগে খেয়ে পরে সুখে বে'চে থাক, — তারপর তো ধম্ম। হচ্ছেও তাই অ্যাভারেজ বেঙ্গলী মেয়ে আর সেফ নয়—বুকের মধ্যে সব টি-বি। অথচ এমন জাত, ভাঙবে তবু মচকাবে না। বঙ্কিম, রবি ঠাকুর, বিবেকানন্দ এ'রাই জাতটাকে ডোবালেন। এখন অন্য যুগ, এখন প্র্যাকটিক্যাল লোক চাই। একা আমি ফোকলা চ্যাটার্জি কি করবো মশাই? এই দেখুন না, আগরওয়ালা একজন হোলটাইম বাঙালী হোস্টেস চাইছে। ভাল

মাইনে দেবে। দু''হাতে এক্সট্রা ইনকাম। কিন্তু একটা মনের মতো লোকাল মেয়ে পাচ্ছি না। রোজীটা আমাকে খুব ধরেছে। চাকরিটা করে দিতেই হবে। ছুড়ির নাকি অনেক টাকা দরকার। তা ভাবছি ওকেই করে দেবো—আফটার অল পভার্টি নোজ নো কাস্ট। বিপদ আপদে সব মানুষকেই দেখতে হয়। সে যে জাতের হোক। তাই না?"

ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "দেখি কি করা যায়। বেটা সদাশিবমটাই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। মালের রোজীকে ভাল লেগে গিয়েছে, ওকে হাতছাড়া করতে চাইছে না, আমরাও ওকে চটাতে পারি না। এখন ক্রমশ কানে মন্তর দিচ্ছি, একই কাপডিসে বার বার চা না খেয়ে, রোজ ভাঁড়ে চা খাও।"

ফোকলা চ্যাটার্জি যাবার আগে বলেছিলেন, "আপনাকে একটা সুখবর দিই। আমি আগরওয়ালা কোম্পানির ডিরেক্টর হচ্ছি। চুরি-জোচ্চুরি না করেও, কেবল অনেস্ট লেবার দিয়ে মানুষ এখনও উন্নতি করতে পারে।"

সত্যসুন্দরদাও আর-এক আশ্চর্য জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। হাওয়াই কোম্পানির যাত্রী এবং কর্মীবাহী বাসের দিকে আমরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকি। হয়তো এখনই পাড়বিহীন নীলাম্বরী শাড়ি পরে সুজাতা মিত্র আমাদের কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াবেন।

কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা ডান হাতে ধরে, মিষ্টি হেসে সুজাতা বলবেন, "সব ভাল তো?" সত্যসুন্দরদা বলবেন, "আপনার খবর কী বলুন?"

মনের প্রকৃত ভাব চেপে রাখার চেষ্টা করে সুজাতা মিত্র বলবেন, "খুউব ভাল ছিলাম। কোনো চিন্তা ছিল না, উদ্বেগ ছিল না। পৃথিবীর এক দেশে ব্রেকফাস্ট করে, আর-এক দেশে লাঞ্চ খেয়ে, অন্য আর-এক দেশে বিকেলে সিনেমা দেখে ফুর্তিতে ছিলাম।"

কয়েকবার এমন দেখাতেই যে সত্যসুন্দরদার মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম। তবু সত্যসুন্দরদা মাঝে মাঝে দু'শ্চিন্তায় চমকে উঠতেন। অবাধ্য মনটাকে শত চেষ্টাতেও তিনি বশে আনতে পারছিলেন না।

এবিষয়ে আমার কাছেও নিজেকে প্রকাশ করতে সত্যসুন্দরদা বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করতেন। তাই নিজের মনের মধ্যেই নিজেকে বন্দী করে রাখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

সত্যসুন্দরদার দ্বিধার পরিচয় একদিন কাউন্টারেই পেয়েছিলাম। সারারাত ডিউটি করে, আমাকে চার্জ দিয়ে যখন চলে গিয়েছিলেন, তখন দেখেছিলাম প্যাডের ওপর হিজিবিজি করে বোসদা অনেকবার কী একটা লিখেছেন। একটু চেষ্টা করতেই পাঠোদ্ধার হয়েছিল। বোসদার কাছেই কথাটা যে অনেকবার শুনেছি— The wise receptionist keeps the counter between, in spirit as well as in fact. কাউন্টারের বাঁধ বন্যাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না বলেই বোধহয় বোসদা নিজেকে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। তারপর এতোই অন্যমনা ছিলেন যে, কাগজগুলো ছিড়ে ফেলতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

কেন জানি না, আমার খুব ভাল লেগেছিল। সত্যসুন্দরদার মতো মানুষ চিরকাল এমনভাবে শাজাহানের অপরিপূর্ণ জীবনযাপন করবেন, তা ভাবতে সত্যিই আমার মন খারাপ হয়ে যেতো।

যখন হয়, তখন বোধহয় এমনি করেই হয়। তখন কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মুখে চেয়ে যা ঘটবার, তা থমকে দাঁড়ায় না। তাই সুজাতা মিত্র এবার ঘন ঘন হাওয়াই ডিউটিতে কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেছেন। তিনি যে কবে আমার সুজাতাদি হয়ে গিয়েছেন, তা-ও বুঝতে পারিনি। গল্প করতে ভালবাসেন সুজাতাদি। হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন সুজাতাদি। সুতরাং আমার সঙ্গে ভাব জমে উঠতে বেশী দেরী হয়নি।

আমাদের ডিউটি-রস্টারও সজোতাদির জানা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘরে স্নান শেষ করে, সুজাতাদি আজকাল লজ্জা কাটিয়ে সোজা উপরে চলে আসতেন। আমাকে বলতেন, “চোখ বোজো।” আমি চোখ বুজতাম। সুজাতাদি বলতেন, “হাঁ করো,” আমি হাঁ করতাম। সুজাতাদি সঙ্গে সঙ্গে মোড়ক খুলে একটা চকোলেট কিংবা লজেন্স মুখে ফেলে দিতেন। স্বাদ নেবার জন্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করতাম। দ্রুত আঙুল স্যরিয়ে নিতে নিতে তিনি বলতেন, “এখনি আমার আঙুলটা কামড়ে দিয়েছিলে আর কি। যা লোভী ছেলে!”

আমি বলতাম, "লোভী বলছেন কেন? বদনাম যখন হয়েছে, তখন আর একটা চাই।" সত্যদাকে বলতেন, "এবার চোখ বুঁজে, আপনি হাঁ করুন।" সত্যদা মাথা নাড়তেন। "না দেখে আমি ওভাবে কিছু মুখে পুরতে চাই না। শাজাহানের একটা মূল্যবান জীবন ওইভাবে রিস্ক করতে পারি না।" সুজাতাদি বলতেন, "ঠিক আছে, এতোটুকু যখন বিশ্বাস নেই, তখন খেতে হবে না।" আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি, "যখন আপনাদের মধ্যে গণ্ডগোল চলছে, তখন আপনাদের ভাগের চকোলেটগুলোও আমাকে দিন!" বোসদা বলেছেন, "ওরে দু'ষ্ট, ছোকরা। না মিস্ মিত্র, আমার চকোলেটের ভাগটা আমাকে দিন।"

সুজাতাদি যেদিন কলকাতায় থাকতেন, সেদিন আমাদের ছাদটা একেবারে পালটিয়ে যেতো। বোসদার ঘরের মধ্যে সুজাতাদি হয়তো জোর করে ঢুকে পড়তেন, সব কিছু খুটিয়ে দেখে আমাকে বলতেন, "আপনার দাদার যেমন সাজানো গোছানো স্বভাব, তাতে মেয়েরাও লজ্জা পাবে।"

বললাম, "ভালই হলো। এতোই যখন প্রসন্ন হয়েছেন, তখন আজকের রাতের তিনখানা সিনেমা টিকিটের দাম আপনি দিন!"

সুজাতাদি বলেছেন, "গ্লাডলি।" হ্যান্ডব্যাগ খুলে সুজাতাদি পয়সা বের করতে যাচ্ছিলেন। বোসদা বললেন, "আপনিও যেমন। আপনি আজ আসবেন বলে চারদিন আগে শ্রীমান নাইট শোয়ের তিনখানা টিকিট কেটে রেখেছে।" সুজাতাদি বলেছেন, "ছিঃ, বয়সে ছোটো না!"

"আজকালকার ছেলে-ছোকরারা সেসব যদি মানতো!" বোসদা বললেন। ছবিটা বড়ো ছিল। বারোটার আগে শেষ হয়নি। মেট্রো সিনেমা থেকে বেরিয়ে সেদিন যেন চৌরঙ্গীকে আমরা আরেক রূপে দেখেছিলাম। ট্যাক্সি করতে যাচ্ছিলাম, বোসদা হাঁটবার প্রস্তাব করলেন।

মধ্যরাত্রে কলকাতাকে আমি নানা দিনে নানাভাবে দেখেছি। কলকাতার সেই রূপকে সত্যিই আমি ভয় করি। কিন্তু আজ অন্য রকম মনে হলো! চৌরঙ্গী ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর মোড়ে স্যর আশুতোষের স্ট্যাচুর সামনে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। ওইখানে দাঁড়িয়েই

আমরা একটা স্কুটার যেতে দেখলাম। কলকাতার রাস্তায় তখনও স্কুটারের ছড়াছড়ি ছিল না। বোসদা বললেন, “হায় রে, আমার যদি এমন একটা স্কুটার থাকতো!”

সেই সামান্য রসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে সুজাতাদি যে সত্যই বোসদার জন্যে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করবেন, তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। সুজাতাদি আমার চালাক মেয়ে, তাই প্রথমেই বলেছিলেন, “আমি একটা কাজ করে ফেলেছি; তার জন্যে আমাকে যদি একটা কথাও বলেন তাহলে আমি সত্যিই দুঃখ পাবো।”

বোসদা প্রথমে ঠিক বুঝতে না পেরে বলে ফেলেছিলেন, “ভুল মানুষ মাত্রই করে। তার জন্যে আপনাকে বকতে যাবো কেন?”

ঠিক তারপরই সুজাতাদি স্কুটারের কাগজপত্তর বোসদার হাতে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, দু''একদিনের মধ্যে যখন গাড়িটা এসে পৌঁছবে তখন সুজাতাদি কলকাতায় থাকতে পারবেন না। এবার ফিরতেও সপ্তাহখানেক দেরি হবে। তার মধ্যে চালানোটা যেন ভাল করে অভ্যাস করা থাকে। তবে কলকাতার গাড়ি-ঘোড়ার যা অবস্থা, এখানে স্কুটারের কথা ভাবলেই ভয় হয়!

নিজের প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ বোসদা রাগে গুমরে গুমরে মরছিলেন, কিন্তু কিছুই বলতে পারছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত অভিযোগ করলেন—“কী একটা ছেলেমানুষি করলেন, বলুন তো!”

সুজাতাদি হেসে বলেছিলেন, “সব দোষ ব্যুমেরাঙের মতো আপনার কাঁধেই ফিরে আসবে। কারণ হোটেলের কেউ তো আর স্কুটারের পিছনে আমার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারবে না!”

“আর জানলে আপনাদের দু''জনেরই এখানে টেকা মুশকিল হবে!” আমি বলেছিলাম।

সে-রাত্রে ছাদে বসে বসে অনেক কথা হয়েছিল। গুড়বেড়িয়া দেশে গিয়ে নববন্ধুর মোহিনী মায়ায় ছুটি বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। মায়ের শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে তাই আর একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। গুড়বেড়িয়ার অনুপস্থিতিতে আমিই বেয়ারার কাজ

করছিলাম। ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করেছিলাম, "মেমসায়েবের কোনো অর্ডার আছে?"

মেমসায়েব বলেছিলেন, "বেশী পাকামো না করে, ঐখানে চুপচাপ বোসো। না হলে কানমলা খাবে।"

কান বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "মলুন - আমার একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে থাকবে। পৃথিবীর প্রথম দায়িত্বশীল হোটেল রিসেপশনিস্ট, যার কর্ণ জনৈক মহিলা অতিথি কর্তৃক মলিত হয়েছিল!"

জোর করে একটু চা আনিয়েছিলাম। সে চা-এর ট্রে সুজাতাদির সামনে দিয়ে বলেছিলাম, "আমরা গ্যাঁট হয়ে বসলাম। আপনি টী তৈরি করে সার্ভ করুন।" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বোসদা আবার বলেছিলেন, "কী ছেলেমানুষি করলেন বলুন তো? এই স্কুটার নিয়ে কী করবো, রাখবো কোথায়?"

"এতো বড়ো হোটেল, যেখানে ডজন ডজন মোটর দাঁড়াতে পারছে, সেখানে একটা স্কুটার রাখা যাবে না! এ আমি বিশ্বাসই করি না। আর ওটা নিয়ে কী করবেন? মাঝে মাঝে এই জেলখানা থেকে বেরিয়ে, গড়ের মাঠের উদার উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবেন। সকাল, দু'পুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি হোটেল হোটেল করে নিজেকে অবহেলা করবেন না।"

বোসদা তখনও গম্ভীর হয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুজাতাদি বলেছিলেন, "যদি কোনো দোষ করে থাকি, কী করে অপরাধ মার্জনা সম্ভব বলুন?"

"আপনার শাস্তি হলো একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া, সেদিন যেমন গুনগুন করে পার্কে গাইছিলেন। এটাও আপনার একটা রেকর্ড হয়ে থাকবে, প্রথম অতিথি যিনি হোটেলে গান না শুনে, নিজেই গান শুনিয়েছিলেন,"—আমি বললাম। সুজাতাদির আপত্তি ছিল না। কিন্তু বোসদা বারণ করলেন। বললেন, "ছাদে আরও অনেক লোক আছে। জানাজানি হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে।"

সুজাতাদি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়েছিলেন। আমরা দু''জনে তখনও স্থির হয়ে বসে রইলাম। বোসদা বললেন, "ওহো, তোমাকে বলা হয়নি। বায়রন সায়েব ফোন

করেছিলেন। উনি আজই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া নাকি বিশেষ প্রয়োজন।”

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। বোসদা গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমার যেন তেমন ভাল মনে হচ্ছে না। যেন বিরাট পরিবর্তনের সবুজ সিগন্যাল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।”

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম ! বোসদা বললেন, “মার্কোর ব্যাপার-স্যাপার তেমন সুবিধে নয়। কয়েকদিন রাত্রে হোটেলেই ফেরেননি। ছাতাওয়ালা লেনেই সময় কাটিয়ে এসেছেন। জিমিটাও এই সুযোগে ভিতরে ভিতরে দল পাকাবার তালে রয়েছে।”

আমি বললাম, “বায়রনের সঙ্গে দেখা হলে কিছুটা হয়তো জানা যাবে।” বোসদা বললেন, “হাজার হোক মানুষটা ভাল। ওঁর দুঃখ দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়।”

সেই রাত্রেই বায়রন সায়েব দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সাক্ষাতের সব বিবরণ আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এতোদিন পরে লিখতে বসেও চোখের জলকে বাধা দিতে পারছি না। চোখের জলে নিজেকে প্লাবিত করা হয়তো পুরুষের পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু কেমন করে বোঝাবো, অপরিচিতের অযাচিত প্রীতি কেমনভাবে নিশ্চিত অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করে আমার জীবনকে বার বার সজীব ও সরস করে তুলেছে! গভীর গহন অন্ধকারে হৃদয়হীন জীবন-দেবতার মুখোমখি যারা দাঁড়িয়েছে, হয়তো একমাত্র তাদেরই পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। কিংবা আমার অক্ষমতা। যা অনুভব করি, বুকের প্রতিবিন্দু নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কথা বলতে চাই, তা যদি সত্যিই আমি প্রকাশ করতে পারতাম, অন্তত তার কিছুটাও যদি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম, তাহলে সত্যিই আমার আনন্দের শেষ থাকতো না। জীবনের চরমতম পরীক্ষার মহূর্তে কোনো অচেনা পাঠকের অন্ধকার মনে সামান্য আশার আলো জ্বালাতে পারলে, বায়রন সায়েবের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বায়রন আমার ঘরে ঢুকে বসে পড়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “মার্কোর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি আমি। মনে মনে দুঃখ ছিল, বেচারার কিছুই করে উঠতে

পারলাম না। যদি বা সুশানের খবর পাওয়া গেলো, তাতে কিছুই লাভ হলো না। সুশান তো আর আমাদের নাগালের মধ্যে নেই। সুতরাং পুরনো ডাইভোর্স মামলার মাধ্যমে মুক্তি পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।" বায়রন একটু থামলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু ঈশ্বর এমনি করেই বোধহয় অভাজনদের উপর কৃপাবর্ষণ করেন।"

আমি ওঁর মুখের দিকে পরম কৌতূহলে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, 'একদিন সবাই জানতে পারবে। তবে তোমার বোধহয় আগে থেকে জানবার অধিকার আছে।" বায়রন একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, "তোমরা বলো রাম না জন্মাতেই রামায়ণ গাওয়া হয়েছিল। মার্কোর জীবনেও প্রায় তাই হলো। লিজাকে একদিন সাক্ষী হিসাবে খাড়া করবার জন্যে, পয়সা দিয়ে ওকে নিয়ে প্রেমের অভিনয় করেছিলেন মার্কো। আর এতোদিন পরে, মার্কো সত্যিই লিজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। লিজা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তারপর যখন সে সত্যিই বুঝলো মার্কোর মনে কোনো কু-অভিসন্ধি নেই, তখন সে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল।

তুমি যদি দেখতে মার্কো কিভাবে অসুস্থ লিজার সেবা করেন। সেদিন নিজের চোখে দেখলাম, দু'হাতে তার বমি পরিষ্কার করছেন মার্কো। কী আছে ও শরীরে? মার্কোপোলোকে দেবার মতো কোনো নৈবেদ্যই তার নেই। তবু মার্কো ওর মধ্যে কি যে খুঁজে পেয়েছেন!

মার্কো বলেন, 'মনে আছে যেদিন প্রথম সুশানের সঙ্গে তোমার বাড়িতে গিয়ে ছিলাম?'

লিজা বলে, 'তোমার কাছে টাকা চাইতে সেদিন আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল কিন্তু আমার কাছে তখন একটা আধলাও ছিল না। বাথরুমে পিছলে পড়া সেই যে আমার কাল হলো; তারপর থেকে আর নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারলাম না।'

বায়রন বললে, "ওঁরা দু''জনে এক সঙ্গে থাকবেন ঠিক করেছেন। এই ক'দিনের চিকিৎসাতে লিজা অনেক পালটিয়ে গিয়েছে, দেখলে তুমিই অবাক হয়ে যাবে। লিজার একদিন শাজাহানে আসবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মার্কো রাজী হননি। অন্য কেউ কিছু না

বলুক, জিমিকে চিনতে তাঁর তো বাকি নেই। ম্যানেজারের বদনাম হোটেলের বদনামে রূপান্তরিত হতে বেশী সময় লাগে না।"

বায়রনের মুখেই শুনলাম, মার্কোর বিদায় সংবাদ আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই পাবো। লিজাকে বিয়ে করা এখানকার আইনে সম্ভব নয়। অথচ বিয়ে না করে, এক সঙ্গে থাকবার মতো প্রবৃত্তি তাঁর নেই। তাই মার্কো অন্য পথ বেছে নিয়েছেন। আফ্রিকান, গোল্ডকোস্টে একটা চাকরি যোগাড় করেছেন। সে-দেশে এখনও বহুবিবাহে আপত্তি নেই। আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপ এবং সভ্য এশিয়া থেকে দূরে আফ্রিকার স্বল্পালোকিত সামান্য শহরের এক সামান্য হোটেলে ভাগ্যহত মার্কো এবং জনম দুঃখিনী লিজা স্বামী-স্ত্রী রূপে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেবে—আইনের অননুমোদনের জন্যে তারা আর ভারত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে থাকবে না।

বায়রন এবার একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমারও ভাল হলো। ওঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম বলে, এতোদিন আমার পক্ষেও নড়া-চড়া সম্ভব হচ্ছিল না। আমারও দায়িত্ব শেষ হলো; এবার আমারও বিদায় নিতে কোনো বাধা রইলো না।"

"মানে?" বিস্ময়ে আমি বায়রনের মুখের দিকে তাকালাম।

বায়রন বেদনার্ত স্বরে বললেন, "যতোদিন প্রফেশনে ছিলাম, ততদিন কখনও বলিনি। আজ বলছি, কলকাতায় আমাদের সমাদরের কোনো সম্ভাবনা নেই। এদেশের লোকেরা নভেলে, সিনেমায়, থিয়েটারে প্রাইভেট ডিটেক্টিভদের সমাদর করতে রাজী আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের কথা একবারও মনে করে না। অথচ অস্ট্রেলিয়ায় তেমন নয়। সেখানে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের অনেক সুযোগ রয়েছে। ডিটেকশন কোম্পানিতে আমি মাসিক মাইনের চাকরিও নিতে পারি। তেমনই একটা চাকরি এতোদিনে যোগাড় হয়েছে। এখন তারই ভরসায় পাড়ি দিচ্ছি। পরে সুযোগ বুঝলে আবার প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করবো।"

বায়রনের হাত দু'টো আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, "ঈশ্বর যে এতোদিনে আপনার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন, ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আপনি এতোদিনে সত্যি সুখী হবেন।"

"কেমন করে বুঝলে?" বায়রন বেদনার্ত হাসিতে মুখে ভরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

"কেমন করে বুঝলাম? আইনের ভাষায় বলতে গেলে, নজীর আছে।"

"নজীর?" বায়রন আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন।

"যার সুখ শান্তি পাবার প্রয়োজন ছিল, অথচ যাঁর দুঃখ আমাদের মর্মবেদনার কারণ হয়েছিল এমন একজন ভদ্রলোক বহু বছর আগে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন।"

"কে তিনি?" বায়রন প্রশ্ন না করে থাকতে পারেননি। তখন বলেছিলাম, "তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ না। কিন্তু আমার পক্ষে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, তিনি ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসের একটা চরিত্র মাত্র। তাঁর নাম মিস্টার মিকবার।"

কোনো কর্মহীন অলস অপরাহ্নে, আত্মীয়হীন গৃহকোণে নিঃসঙ্গ আপনি কখনও কি বহুদিন আগের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের কথা চিন্তা করেছেন? প্রকৃতির বিশেষ কোনো পরিবেশে মনের মাটিতে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন লোভী মনের কাছে পাওয়া থেকে না পাওয়াটাই হয়তো বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু স্মৃতির ভারে জর্জরিত বিষণ্ন মন যখন সুযোগ বুঝে সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে, তখন পাওয়া এবং না পাওয়া থেকে, পেয়ে হারানোর বেদনা আরও বড়ো হয়ে ওঠে। শাজাহানের বিস্ময়ভরা পরিবেশে একদিন যাদের পেয়েছিলাম, সত্যিই যে তাদের হারাতে হবে, তা বুঝিনি।

হাওড়া স্টেশনের ট্রেনের কামরায় বায়রনকে যেদিন তুলে দিয়েছিলাম সেদিন সত্যিই হারিয়ে যাওয়ার বেদনা অন্তরে অনুভব করেছিলাম। ট্রেনের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বায়রন শেষবারের মতো সত্যসুন্দরদা এবং আমার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। তিনি আমার কেউ নন, এমন কিছু দীর্ঘদিনের পরিচয়ও ছিল না, তবু শূন্যতা বোধ করেছিলাম।

কিন্তু সেই যে শুরু তা কেমন করে জানবো! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোসদাকে বলেছিলাম, "এবার পা চালানো যাক, সেই কখন হোটেল থেকে দু''জনে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছি।"

সত্যসুন্দরদা কিন্তু কোনো ব্যস্ততা দেখালেন না। বললেন, "উইলিয়ম রয়েছে, জিমি রয়েছে, ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, আমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। শাজাহানের চা ছেড়ে হাওড়া স্টেশনের চা কেমন করে সত্যসুন্দরদার ভাল লাগবে?

রেস্তোরাঁয় ঢুকতে ঢুকতেও কিছু বুঝতে পারিনি। চেয়ারে বসে সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আমি সত্যসুন্দরদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা একটু লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েই বললেন, "কী ছিলাম আর এখন কোথায় হাজির হয়েছি। নিজেকে এতোদিন লোহার

তৈরি বলে মনে করতাম। এখন বুঝলাম, সব ভুল।”

বোসদার কথায় আশ্চর্য হয়ে ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বোসদা এবার সঙ্কোচ কাটিয়ে বললেন, “তুমি আমার ছোটো ভাই-এর মতো; শাজাহান হোটেলে তুমি আমার একমাত্র বন্ধুও বটে। তোমার পরামর্শ আমার প্রয়োজন।”

প্রয়োজনের সময় বোসদা যে আমার কথা ভেবেছেন তা মনে করে সত্যিই আমার আনন্দ হলো।

একটা খালি ডিস নাড়তে নাড়তে বোসদা বললেন, “এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। আর মুলতুবী রাখলে চলবে না। সুজাতাকে আজই উত্তর দেবো বলে কথা দিয়েছি। এতোদিন সহজভাবে কাটিয়ে এসে এবার যে মনটা আমার বিদ্রোহ করে উঠবে তা কল্পনারও অতীত ছিল।”

“ভালোই তো, আপনি তো কোনো অন্যায় করছেন না।” আমি বললাম।

ডিসটা নিয়ে খেলা করতে করতেই বোসদা হাসলেন। চকচকে টেবিলের রঙীন কাচে সত্যসুন্দরদার সেই ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে, তার সঙ্গেই তিনি যেন বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করছেন। নিজের মনেই বোসদা বললেন, “ন্যাটাহারিবাবুর কাছে শুনেছিলাম প্রেমরোগ অনেকটা হামের মতো— কমবয়সে স্বাভাবিক, কিন্তু বেশী বয়সে দু’শ্চিন্তার কারণ। কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যে নয়, তা এখন বুঝতে পারছি।”

আমি আবার বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা বললেন, “একদিকে ভদ্রমহিলার মতো মেয়ে খুঁজে পাওয়া শক্ত। চাকরিও করেন, কাজও করেন, অথচ মনের মধ্যে ছেলেমানুষ। বাধাবন্ধনহীন এই ঝোড়ো হাওয়ার ভাবটুকু আমার ভাল লাগে। এই গুণটা সুজাতার মধ্যে তুমি লক্ষ্য করোনি?”

“ওঁর কোনো দোষ দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। চকোলেট খাইয়ে খাইয়ে আমার নিরপেক্ষ বিচারশক্তি উনি নষ্ট করে দিয়েছেন!”

হাসবার চেষ্টা করেছিলেন বোসদা, কিন্তু হাসতে পারলেন না। মনের চিন্তাগুলো দল বে'ধে গায়ের জোরে হাসির গলা চেপে ধরেছে। চাপবারই কথা। বোসদা বললেন, “আমাকে ঠিক করতে হবে, শ্যাম রাখবো, না কুল রাখবো—চাকরি, না সুজাতা?”

তাঁর অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও বোসদা শাজাহান হোটেলকে ভালবেসেছিলেন। কোনো এক সামান্য পরিচিতা মৃগনয়নার জন্যে তাঁকে যে হোটেলের সিংহাসন ত্যাগ করার কথা ভাবতে হবে কেউ কী কোনোদিন তা জানতো? বোসদা বললেন, "সুজাতার ধারণা শাজাহানের রিসেপশন টেবিলে দাঁড়িয়ে আমি নিজের ক্ষমতার অপচয় করছি। এখনও পালাবার সুযোগ আছে যে অভিজ্ঞতা এখান থেকে যোগাড় করেছি তাতে এয়ারওয়েজেই ভাল চাকরি পাওয়া যেতে পারে।"

এ-সব কী বলছেন বোসদা? আমার যেন মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বোসদা বললেন, "সুজাতার সঙ্গে এখনও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা হয়নি; কথা বলবার সময়ও আসেনি। তবে যদি সত্যিই কোনোদিন আমাদের মনস্থির করতে হয়, সেদিন শাজাহানে চাকরি করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"বিয়ের পর এয়ার হোস্টেসের চাকরি থাকবে না। শাজাহানের ম্যানেজারও কিছু ছাদের ঘরগুলোকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে পরিবর্তিত করবার অনুমতি দেবেন না। যা মাইনে পাই তাতে কলকাতায় আধখানা ঘরও কেউ ভাড়া দেবে না।"

"ক্যাপ্টেন হগকে দেখেছো নিশ্চয়। আমাদের এখানে প্রায়ই এসে থাকেন। হাওয়াই জগতের বিশিষ্ট লোক। যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সুজাতার সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে। আমার উপরে খুবই সন্তুষ্ট। আমাকে এরোড্রোম বা বুকিং অফিসে একটা ভাল চাকরি দিতে রাজী আছেন। দমদম, উইলিংডন, সান্টাক্রুজ, না কোথায় যেতে হবে ঠিক নেই, কিন্তু সুজাতার ধারণা এখানকার থেকে অনেক কম কষ্ট করে আমি অনেক নাম অর্জন করতে পারবো!" বোসদা এবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

কী বলবো আমি? বোসদা নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। চায়ের কাপটা অবহেলাভরে দূরে স্যরিয়ে দিয়ে বললেন, "শাজাহানের বাইরে আমি বে'চে রয়েছি এ-কথা কিছুতেই ভাবতে পারছি না। নাই-বা হলো বড়ো চাকরি; নাই-বা পাওয়া গেলো অনেক টাকা। কিন্তু বেশ সুখে রয়েছি। এমন স্বাধীনতা, প্রতিমুহূর্তে জীবিকার এমন রোমাঞ্চ আর কোথায় পাবো?"

‘না’ বলতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। আমাদের এমন নিশ্চিন্ত সংসার থেকে বোসদার মতো শুভার্থীকে হারাতে আমার স্বার্থপর মনটা কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন করে তাঁকে সুখ এবং পরিপূর্ণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো? বললাম, “না বোসদা, আপনি যান। সুযোগ জীবনে সব সময় আসে না। দেরিতে হলেও সে যখন এসেছে তাকে গ্রহণ করুন।”

তাঁর দু’টো উষ্ণ হাত দিয়ে বোসদা আমার হাতদু’টো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, “গত জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার আপন ভাই ছিলে। এতোদিন শাজাহানে কাজ করছি। কখনও কাউকে এতো ভালবাসিনি। সেই যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম, সেই মূহূর্তেই আমি হেরে গেলাম—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।”

বোসদার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠলো না। কেমন করে বোঝাবো, আমার জীবনের কতখানি অংশ তিনি জুড়ে রয়েছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আমার শাজাহান-অধ্যায়ের কী অবশিষ্ট থাকে?

বোসদার চাকরির ব্যবস্থা যে পাকা হয়ে গিয়েছে, তা তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম। হোটেলকে কবে নোটিশ দেবেন ভাবছিলেন। বললাম, “দেরি করবেন না। শাজাহানে অনেক পরিবর্তন আসছে। মার্কোরও যাবার সময় আসন্ন।”

বোসদা শুনে চমকে উঠেছিলেন। “মার্কো চলে যাচ্ছেন? এবার নিশ্চয়ই জিমির বহুদিনের স্বপ্ন সম্ভব হবে। শাজাহানের গদীতে এবার সে জাঁকিয়ে বসে রাজ্য চালাতে পারবে। একদিক থেকে নৈরাজ্যও বলতে পারো।”

বললাম, “এমন কথা বলছেন কেন?”

“লোকটাকে চিনতে আমার অন্তত বাকি নেই। যেমন চোর, তেমন কু’ড়ে, তেমন হিংসুটে, তেমন অপদার্থ। দল পাকাবার রাজা। আমাকে এখনই তাহলে কথা বলতে হয়। মার্কো থাকতে থাকতে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট না হলে, আমাকেও ভুগতে হবে।”

মার্কোর সঙ্গে বোসদা যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমি ছাদের উপর সুজাতাদির সঙ্গে বসেছিলাম। সুজাতাদি একটু পরেই নাইট ফ্লাইটে চলে যাবেন। সুজাতাদি বললেন,

“তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না? বোধ হয় আমি তোমাদের সাজানো জীবনে বিপর্যয় এনে ভুল করলাম।”

আমি বললাম, “সুজাতাদি, কেন আর কষ্ট দিচ্ছেন? একদিন আমারও সব সহ্য হয়ে যাবে।”

“তখন হয়তো আমার কথা, তোমার দাদার কথা তোমার মনে পড়বে না। নতুন মানুষদের সঙ্গে বসে এই শাজাহানের ছাদে গল্প করবে।”

আমি বললাম, “অনেকদিন পরে মনে পড়বে এক শাপভ্রষ্ট পুরুষকে কোনো অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা শাজাহান আশ্রম থেকে উদ্ধার করেছিলেন। নারীর কল্যাণপর্শে পাষাণে রূপান্তরিত এক পুরুষ-অহল্যা আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল।”

সুজাতাদি চুপ করে রইলেন। আজ আমাদের সত্যিই কথা বলবার মতো মনের অবস্থা নেই। সুজাতাদি ও বোসদার মধ্যে হাইফেনের মতো এতোদিন আমি ছিলাম। আমারও বোধহয় কিছু কর্তব্য আছে। তাই প্রশ্ন করলাম, “চাকরি তো হচ্ছে। আপনাদের নিজেদের পরস্পরকে যাচাই করা শেষ হলো কী?”

সুজাতাদি বিষণ্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, “আমি তাড়াতাড়িতে বিশ্বাস করি না ভাই। সময় একদিন নিশ্চয় সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।”

আমি বলেছি, “আপনার বাড়িতে কিছু, বলেছেন?”

সুজাতাদির মুখে এবার আরও বিষণ্ন হয়ে উঠলো। “বাড়ি বলতে লোকে যা বোঝে তা তো আমার নেই ভাই। তোমার দাদার মতো আমিও আত্মীয়হীন। তোমার দাদাকে যেমন ছুটি নিয়ে কোনোদিন দেশে যেতে দেখোনি, আমিও তেমনি ছুটির কথা ভাবি না। মাত্র সেবার এতোদিন পরে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করলাম। তোমার দাদার তবু সাহেবগঞ্জ আছে, ইচ্ছে করলে যেতে পারেন। পদ্মার ওপারে, আমাদের সে উপায়ও নেই।”

বললাম, “সুজাতাদি, আর কেউ না থাক আমি আছি। পৃথিবীর মানুষদের কাছে এতো নিয়েছি যে, দেবার কথা ভাবলে ভয় হয়; কত জন্ম ধরে আমাকে এর সুদ গুণতে

হবে ঠিক নেই। যদি কারুর জন্যেও সামান্য কিছু করতে পারি, বোঝাটা হয়তো একটু হাল্কা হবে।”

সুজাতাদি বললেন, “অনেক করেছো ভাই। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে বলো?”

বোসদাকে এবার ফিরে আসতে দেখলাম। অন্ধকারেও ওঁর মুখে বিষণ্নতার ছাপ দেখলাম। একটা মোড়ার উপর বসে উনি শাজাহানের আকাশকে শেষবারের মতো খুটিয়ে দেখতে লাগলেন। আমরা কোনো প্রশ্ন করবার মতো সাহস না পেয়ে ওঁর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম। সুজাতাদির ইঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত আমিই বললাম, “কী হলো?”

সত্যসুন্দরদা একটা সিগারেট বের করে, উদাসভাবে দেশলাইয়ের বাক্সে সেটা ঠুকতে লাগলেন। নিজের মনে ভাবতে ভাবতেই সিগারেটে আগুন দিলেন, তার পর বললেন, “কোনো জিনিস তৈরি করতে কত সময় লাগে, অথচ ভাঙতে এক মুহূর্তই যথেষ্ট। কোটি কোটি দিনরাত্রির মুহূর্ত থেকে তিলে তিলে শাজাহানের যে মধু সংগ্রহ করেছিলাম; এক কথায় তা ঝড়ে উড়ে গেলো। মার্কোপোলো বললেন, ‘আমি তোমার পথের প্রতিবন্ধক হবো না। পিছনের ব্রীজ পুড়িয়ে দিয়ে, সামনে এগিয়ে যাও ইয়ংম্যান। এমন কি যদি চাও তুমি আমার সঙ্গে আফ্রিকান গোল্ডকোস্টে আসতে পারো। সেখানে দু''জনে মিলে আমরা নতুন হোটেল গড়ে তুলবো। অনেকদিন আগে মিস্টার সিম্পসন যা করেছিলেন, আমরা এই শতাব্দীতে দু''জনে মিলে আফ্রিকাতেও তাই করবো। আমার কাগজে মার্কো সই করে দিয়েছেন। ভদ্রলোক এখন খুবই ব্যস্ত রয়েছেন। জিমিকে চার্জ— বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে।”

বোসদার বিদায় অভিনন্দনের জন্যে আমরা ছোটো শাজাহানকেই নির্বাচন করেছিলাম। শাজাহানের সামান্য কর্মচারীরা বলেছিল, “বাবুজী তামাম দু’নিয়ায় স্যাটা বাবুর মতো লোক মিলবে না। উনি আমাদের জন্যে কতো করেছেন। সায়েবদের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, ওঁর জন্যেই আমরা এখন ফ্রি চা পাচ্ছি। নিজের পয়সা দিয়ে কতজনের যে চিকিৎসা করিয়েছেন। উনি না থাকলে রহিমের পায়ের ভেরিকোজ ভেন কোনোদিন কি সারতো? আমরাও হুজুর ওঁকে ব্যাংকোয়েট দেবো।”

ওদের সাধ্যমতো চার আনা করে চাঁদা তুলেছিল। পৃথিবীর কোনো হোটেলের কোনো কর্মচারীর বোধ হয় এমন ব্যাংকোয়েটে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়নি। সে যে আমাদের

অকাল-ব্যাংকোয়েট। হোটেলের ছুটি নেই—ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের সময় লোকদের মরবার ফুরসত থাকে না। তাই ছোটো শাজাহানে মধ্যরাত্রে সেই বিদায়সভার অধিবেশন বসেছিল। সেদিন রাত্রে তার আগে কেউ খায়নি। ছোটো শাজাহানের বয়রা অতক্ষণ থাকতে রাজী হয়নি, তাই আমাদের সব কর্মীরাই পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। টিনের বড়ো ঘরে, ষাট পাওয়ারের আলোতে সেদিন যে ব্যাংকোয়েট হয়েছিল, তা সত্যিই কোনোদিন ভুলবো না। ন্যাটাহারিবাবুর ইচ্ছে ছিল সব গেলাসে একটা করে ন্যাপকিনের ফুল দেবেন। কিন্তু অতো ন্যাপকিন কোথায় পাবেন? আমাদের সবার জন্যেই কলাই করা থালা, আর মাটির ভাঁড়। কিন্তু বোসদার জন্যে ভাল কাঁচের ডিস, ছুরি, কাঁটা। সত্যসুন্দরদার গ্লাসে ন্যাপকিনের ফুলও রয়েছে। ন্যাটাহারিবাবু আমাকে বললেন, "কী ফুল করেছি দেখছেন তো— শূয়োরের মাথা নয়, বিশপ।"

খেতে বসে দামী ক্রকারি দেখে সত্যসুন্দরদা অসন্তুষ্ট হলেন। রহিমকে ডেকে বললেন, "ভাল করোনি। শাজাহান থেকে ডিস, ছুরি, কাঁটা কেন আনতে গেলে, যদি কথা ওঠে?"

রহিম বোসদার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, "না হুজুর, বড়ো শাজাহান থেকে আমরা কিছুই আনিনি। এগুলো আপনার জন্যে নিউ মার্কেট থেকে আমরা কিনে এনেছি।"

আমি দেখলাম বোসদার চোখদু'টো সজল হয়ে উঠেছে। আমার দৃষ্টি এড়াবার জন্যে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমাদের এই আয়োজন সামান্য হলেও ব্যাংকোয়েটের সব আভিজাত্যই আছে। হাত দিয়ে খেতে খেতে সেই কথাই মনে হচ্ছিল। বোসদাও কাঁটা চামচ স্যরিয়ে হাত দিয়ে খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তরা রাজী হয়নি। বলেছিল, "না হজুর, যোগাড় করতে পারলে আমরা সবাই কাঁটা চামচ দিয়ে খেতাম। এটা যে ব্যাংকোয়েট।" ব্যাংকোয়েটে একটি মাত্র জিনিসের অভাব ছিল। সেটি সঙ্গীত। কিন্তু তার অভাবও যে অমনভাবে মিটে যাবে আশা করিনি।

আমাদের উৎসবের মধ্যেই মিস্টার গোমেজ হঠাৎ সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে হাজির হলেন। "কী ব্যাপার, আমাকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। আমাকে ডাকা হয়নি কেন?"

বেয়ারাদের একটু গানবাজনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোটো শাজাহানের নোংরা পরিবেশে তারা গোমেজ সায়েবকে নেমন্তন্ন করতে সাহস করেনি।

প্রতাপচন্দ্র ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে বললেন, "জেণ্টলমেন, আমার সামর্থ্য থাকলে মিস্টার স্যাটা বোসের এই বিদায়সভায় আমি ভায়োলিন কনসার্টের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নেই। লোকবল থাকলেও, যন্ত্র নেই। গত তিনদিন ধরে মিস্টার স্যাটা বোসের অনারে আমি একটা বিশেষ সুর কম্পোজ করেছি। নাম দিয়েছি—ফেয়ারওয়েল। ফেয়ারওয়েল টু ডিনার, ডান্স, ক্যাবারে; ফেয়ারওয়েল টু ক্যান ক্যান, হুলাহু, রক অ্যান্ড রোল। নাউ জেন্টলমেন, দিস ইজ পি সি গোমেজ প্রেজেন্টিং টু ইউ এ ভায়োলিন রিসাইটাল—দি ফেয়ারওয়েল কম্পোজড অন দি অকেশন অফ্, ফেয়ারওয়েল টু মিস্টার স্যাটা বোস।"

সব কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে যেন স্তব্ধতায় রূপান্তরিত হলো। আমরা সবাই বিস্মিত হয়ে গোমেজ এবং তাঁর সেই আশ্চর্য যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঐ যন্ত্রের ভাষা শেখবার সুযোগ আমাদের কারুরই হয়নি। কিন্তু তবুও আমাদের কারুরই আজ বোঝবার অসুবিধা হলো না। সে আমাদের সকলেরই মনের কথা বলছে।

সান্টাক্রুজ থেকে বোসদার প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম।

“প্রিয় শংকর,

এয়ারওয়েজের দৌলতে এখানের এক হোটেলে এসে উঠেছি। ধোপার ছেলে এবং রাজপুত্রর সেই গল্পটা বার বার মনে পড়ছে। কাপড় কাচতে কাচতে বিরক্ত হয়ে যে ভগবানের কাছে মুক্তির প্রার্থনা করেছিল, ভগবান তাকে বর দিয়ে রাজপুত্র করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপুত্রর কিছুই ভাল লাগে না। মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র সবাই আসে, কিন্তু রাজপুত্র মনমরা হয়ে বসে থাকেন। শেষে আর থাকতে না পেরে রাজপুত্র বললেন, ‘এসো ভাই আমরা কাপড় কাচা, কাপড় কাচা খেলি।' রাজপুত্র সেজে হোটেলের লাউঞ্জে বসে রয়েছি; তোমাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর কাপড় কাচা, কাপড় কাচা খেলতে ইচ্ছে করছে।

তোমার সুজাতাদি এখানে ডিউটিতে এসেছিলেন। একদিন দেখা হয়েছে। যা যা ঘটবে তা অবশ্যই তোমাকে জানিয়ে যাবো। ঘর-সংসারের কথা তেমন খুঁটিয়ে ভাববার অবকাশ কোনোদিন পাইনি—এখন ক্রমশঃ লোভ বাড়ছে।

তোমরা আমার ভালবাসা জেনো।”

কয়েকদিন পর বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় সুজাতাদি আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। “এই যে শ্রীমান। খবর কী?” তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম, “যাক, তাহলে এখনও সব ভুলে যাননি।” সুজাতাদি হেসে বলেছিলেন, “একেই বলে নেমকহারাম। হাজার মাইল ফ্লাইট ডিউটি করে হোটেলে এসেই একবস্ত্রে তোমার ঘরে চলে এসেছি। না এসেও বা উপায় কি? তোমার দাদার অর্ডার, প্রথমেই ওদের খোঁজখবর নেবে।”

“দাদা কেমন আছেন?” প্রশ্ন করলাম। সুজাতাদি বিষণ্ণভাবে বললেন, “ও প্রশ্ন কোরো না। এক মাটির গাছকে শিকড় সুদ্ধ তুলে নিয়ে অন্য মাটিতে লাগাতে গিয়ে বোধহয় ভুলই

করেছি। তোমার দাদা আর সেই আমুদে রসিক দাদা নেই। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকেন। মুখে অবশ্য স্বীকার করতে চান না।”

আমি বলেছি, “দাদা যাতে আর মনমরা না হতে পারেন, সে ব্যবস্থা করুন!” সুজাতাদি একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, “সেটা তো তোমার দাদার উপর নির্ভর করে। আমার কী, আমি তো এখনই চাকরি ছেড়ে দিতে রাজী আছি।”

“তা হলে বাধাটা কোথায়? দাদার প্রোবেশন পিরিয়ড! ছ'মাস পরে, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিবেন মুক্তির স্বাদ !”

সুজাতাদি চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, “অনুমতি করলে সাহিত্যিক ঢঙে বলতে পারি, আর কয়েক মাস পরে কোনো নভোচারিণী আমার সত্যসুন্দরদার স্বপনচারিণী হবেন!”

সুজাতাদি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, “বড্ড ফচকে হয়ে যাচ্ছো, এবার কানমলা খাবে।”

রোজীকে খুব খুশী মেজাজে দেখছিলাম। সে বললে, “আর আমার চিন্তার কারণ নেই। জিমি ম্যানেজার হচ্ছে। জিমির বিদ্যের দৌড় আমার জানা আছে। চিঠিপত্তর লেখা আমাকে না হলে চলবে না।”

আমি কোনো উত্তর দিইনি। রোজীর মুখেই শুনেছিলাম মার্কোর বিদায় নেবার সময় আগত।

দীর্ঘদেহী মার্কোর বিদায় দিন আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে। বাইরে শাজাহানের গাড়িতে মালপত্তর উঠে গিয়েছিল। বেয়ারারা প্যান্ট্রির সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য কর্মচারীরাও বাদ যায়নি। সাদা প্যান্ট এবং হাফ শার্ট পরা মার্কোকে অনেকটা নৌবহরের ক্যাপটেনের মতো দেখাচ্ছিল। মার্কোর পাশে জিমিও দাঁড়িয়েছিল। মার্কো একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর বললেন, “কীপ দি ফ্লাগ ফ্লাইং। যদি কোনোদিন কোনো কাজে অনেক দিন পরে শাজাহান হোটেলে আমি আসি, তা হলে যেন দেখি জিমির নেতৃত্বে শাজাহান আরও উন্নতি করেছে।” জিমিকে মার্কোপোলো গম্ভীরভাবে বললেন, “লুক আফটার মাই বয়েজ।”

মার্কোপোলোর বিদায়ের পর মনে হলো এক শূন্য অভিশপ্ত প্রাসাদে আমি

একলা বাস করছি। শীতের দিনে ভোরবেলায় আমরা যখন এখানে প্রবেশ করেছিলাম, তখন পান্থশালা 'আমাদের প্রিয় এবং পরিচিত জনে পরিপূর্ণ ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রেকফাস্টের পর বিদায় নিলেন। দু'পুরের লাঞ্চের পরে আরও কয়েকজনকে দেখতে পেলাম না। অপরাহ্ণে চায়ের পর অনেকে অদৃশ্য হলেন। রাতের ডিনারের সময় সমাগত। এখন কেউ নেই। সমাজ, সংসার, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন সবাইকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে বৃদ্ধ গৃহস্বামী যেন একা রাতের জনশূন্য ডিনার টেবিলে এসে বসেছি।

মার্কোপোলোর বিদায়ের পর জিমি এবার নিজমূর্তি ধারণ করছে। জিমি বলছে, পুরনো কায়দায় আর হোটেল চলবে না। খোল নলচে দু'ই পাল্টে হোটেলকে নতুন করে তুলতে হবে। সত্যসুন্দরদার জায়গায় আধুনিক পদ্ধতিতে তাই একজন রুজলিপস্টিক-চর্চিতা যুবতী মহিলাকে আমদানি করেছেন।

ওই পোস্টে রোজীর বসবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জিমি সোজা বলে দিয়েছে, তোমার ঐ ছিরিতে হোটেলের প্রধানা রিসেপশনিস্ট হওয়া যায় না। কাউন্টারে উইলিয়ম ঘোষ এবং আমি কেবল টিমটিম করে জ্বলছি। উইলিয়মকে অবশ্য জিমি এখন বেশীর ভাগ সময় অ্যাকাউন্টের কাজে লাগাচ্ছে। টাকা-কড়ি জমা নেওয়া, চেক ভাঙানো এই সবই তাকে বেশী করতে হয়।

এরই মধ্যে উইলিয়মের কাছে শুনলাম, মিস্টার আগরওয়ালা হোটেলের কন্ট্রোলিং শেয়ার বিলেতের অংশীদারদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। মিষ্টার আগরওয়ালার কথা উঠলেই জিমি যেভাবে বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়ছিল তার থেকেই ব্যাপারটা বোধহয় আমাদের আন্দাজ করা উচিত ছিল।

উইলিয়ম বলেছিল, "আপনার ভাল হলো। মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জিই সব দেখাশোনা করবেন। আপনার সঙ্গে তো ওঁর খুব জানাশোনা।"

ফোকলা চ্যাটার্জি' একদিন হোটেল দেখতে এলেন। জিমিকে প্রচুর আদর করে.. বললেন, "আমরা কিন্তু ইউরোপীয়ান ম্যানেজমেন্টই রাখতে চাই। তবু সবকিছু যেন মডার্ন হয়—সিম্পসন সায়েবের ধাঁচে আজকাল হোটেল চলে না। তখন মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে

অন্তঃপুরে বসে থাকতো। এখন তারা রাস্তায় বেরিয়েছে।" জিমি গদগদ হয়ে বলেছে, “যা বলেছেন, মিস্টার চ্যাটার্জি।” পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফোকলা বলেছেন, “আমাদের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা পাবেন না। আপনার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আমরা নাক গলাতেও আসবো না। মিস্টার আগরওয়ালা চান, এবং আমিও চাই, আপনি অ্যাট্রাকটিভ গার্লস নিয়ে আসুন-সর্ব জাতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠুক এই শাজাহান হোটেল।”

অনেক অজানা মুখেই হোটেলটা ক্রমশ ভরে উঠছে। এখন সব-কিছুই গোপনে হয়। ফোকলা চ্যাটার্জি— আমাকে দেখেও দেখতে পান না। মাঝে মাঝে সত্যসুন্দরদা, বায়রন এবং মার্কোপোলো সায়েবের কথা মনে পড়ে। তাঁরা পাশে থাকলে আজ এতোখানি অসহায় বোধ করতাম না।

কিন্তু পৃথিবীতে কে কাকে চিরদিন দেখতে পারে? গোমেজ বলেন, “একমাত্র অলমাইটি ছাড়া কারুর উপরেই তুমি চিরদিনের জন্যে নির্ভর করতে পারো না।”

নিজের ঘরে আলো না জ্বালিয়ে গোমেজ নিঃশব্দে বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, “এতোদিনে বোধহয় আমি নিজের ভুল বুঝতে পারছি। ঈশ্বর ছাড়া কারুরই জন্যে আমরা সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারি না। উই শুড ওনলি সার্ভ আওয়ার গড।”

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গোমেজ বললেন, "শাজাহানে আজ আমার শেষ কনসার্ট।”

আমি চমকে উঠেছিলাম। গোমেজ বললেন, “এরা আমাকে আর পছন্দ করছে না। সাফিসিয়েন্টলি চীয়ারফুল মিউজিক আমার যন্ত্র থেকে বেরিয়ে শাজাহানের হল ঘরকে প্রতিদিন যৌবনের রংয়ে রাঙিয়ে তুলতে পারছে না। জিমি এবং চ্যাটার্জি বলেছেন, আই মাস্ট গিভ দেম চীয়ারফুল মিউজিক অর কুইট।”

“আই মাস্ট কুইট। সাচ ইজ মাই মাস্টারস, উইল। সেদিন ব্যাণ্ডেল চার্চে এক তীর্থযাত্রী ফাদারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে একটা ছোট্ট

চার্চের মিউজিকের দায়িত্ব আমার উপর দিতে চান। ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ আমি মাথায় তুলে নিয়েছি।"

আমার চোখে জল আসছিল। কিন্তু গোমেজ এবার উঠে পড়লেন। "আজ শেষ রজনী। আই মাস্ট গেট রেডি মাই লাস্ট কনসার্ট। আই ডোন্ট নো হোয়াই, কিন্তু বার বার আমার লণ্ডনের সেই অন্ধকার রাত্রের শোঁপার লাস্ট কনসার্টের কথা মনে পড়ছে।"

গোমেজ আজ তাঁর ওয়ারড্রোবের সেরা স্যুটটি পরেছেন। তাঁর ছেলেদের জামাকাপড়ের ইস্ত্রিতেও একটু খুত নেই। হাতির দাঁতের বাঁধানো ছোট্ট ছড়িটাও আগের থেকে অনেক বিশ্বাসের সঙ্গে ধরেছেন।

ক্যাবারে শুরু হতে তখনও দেরী রয়েছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, সমাগত অতিথিদের নমস্কার জানিয়ে গোমেজ বললেন, “লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আই উইল নাও ট্রিট ইউ টু সাম চীয়ারফুল মিউজিক।”

সঙ্গীত শুরু হলো। এ কি সেই প্রতাপচন্দ্র গোমেজ, যাঁকে এতোদিন ধরে আমি শাজাহানে দেখে আসছি? এমন রক্ত-আগুন-করা চটুল সুর শাজাহানের এই ঐতিহাসিক প্রমোদকক্ষে বোধহয় কোনোদিন বেজে ওঠেনি। উপস্থিত পুরুষ অতিথিদের বিলাসী বক্ষে পার্বত্য উপজাতির রণদামামা বেজে উঠলো। এমনই কোনো সুরের তালে তালে পা মিলিয়ে ঊর্বশী জিতেন্দ্রিয় ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করতেন। শাজাহানের অতিথিরা আর স্থির থাকতে পারছেন না। মনের নিষেধ অমান্য করেই তাদের দেহ দু'লতে শুরু করেছে। মেঝের কার্পেটে জুতোপরা-পাগুলো তাল ঠুকছে। কিছুক্ষণ এমন চললে হল-এর সবাই ডিনার ড্রিংক ফেলে রেখে শাজাহানের ঐতিহাসিক জলসাঘরে নাচতে শুরু করবেন।

গোমেজের খেয়াল নেই। তিনি একমনে কারুর দিকে না তাকিয়ে ক্রমশই সঙ্গীতের গতি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আর আমার মনে হলো সেই মুহূর্তে যুগযুগান্তের নামহীন পরিচয়হীন সংখ্যাহীন যৌবনবতী আনন্দদাত্রীরা একই সঙ্গে মমতাজ হল-এ হাজির হয়েছেন, তাঁদের বহুজনদৃষ্টিধন্য দেহকে আবার প্রকাশ্যে নিবেদনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঐ তো আমি কনিকে দেখছি, প্যামেলাকে দেখছি, ফরিদাকে দেখছি, আরও অনেকে ভীড় করে রয়েছে, যাদের বোসদা কিংবা ন্যাটাহারিবাবু হয়তো চিনতে পারতেন। আজ যেন থিয়েটারের

কম্বিনেশন নাইট। সম্মিলিত রজনীতে শাজাহানের যুগযুগান্তের অতিথি এবং প্রমোদ বিতরণকারিণীরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। একই ছবির উপর যেন অসংখ্য ছবি সুপার-ইম্পোজ করা হয়েছে। শাজাহানের এই বিশেষ ব্যাংকোয়েটে কেউ বাদ নেই। করবী আছেন, সাদারল্যাণ্ড আছেন, ক্লাইভ স্ট্রীটের সায়েবরা আছেন, সুরাপাত্র হাতে বার-বালিকারা আছেন, আরও অসংখ্য অপরিচিত জনরা আছেন।

হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও শুনতাম। কিন্তু বেয়ারা এসে আমাকে ডাকলো — জিমি সায়েব সেলাম দিয়েছে।

কাউন্টারে রোজী এবং আমাদের নতুন মহিলা রিসেপশনিস্ট দাঁড়িয়েছিলেন। নতুন মহিলাটি ছোট্ট আয়নার সামনে 'প্রসাধনের ফিনিশিং টাচ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। আর রোজী আপন মনে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। আমাকে দেখেই রোজী চমকে উঠলো। আমার দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। “কিছু বলবে?” আমার প্রশ্নে রোজী আরও ভয় পেয়ে গেলো। সে আবার আমার দিকে তাকালো।

জিমির ঘরে মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি ও বসেছিলেন। জিমি বললে, “আই অ্যাম স্যরি, তোমাকে এই সময় ডেকে পাঠালাম। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি— এখনই ক্যাবারেতে গিয়ে বসবেন। ওঁকে ঐসব খুটিয়ে স্টাডি করতে হচ্ছে। তাছাড়া আজ মাসের শেষ তারিখ। তোমার এবং আমাদের পক্ষেও সুবিধে। তোমাকে কাল থেকে আমাদের প্রয়োজন নেই।”

পাইপটা মুখ থেকে বের করে ফোকলা বললেন, “দাড়িগোঁফওয়ালা পুরুষদের দিয়ে রিসেপশনে যে কাজ চলে না, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারছ নিশ্চয়। উইশ ইউ সাকসেশ ইন লাইফ। জীবনে উন্নতি করো এই প্রার্থনা। ফাইলে দেখলাম মার্কো তোমাকে পিওরলি টেম্পরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। দ্যাট মিনস্ এক মাসের মাইনেতেও তুমি এনটাইটেলড নও। কিন্তু নিউ ম্যানেজমেন্ট পুরনো দিনের শোষণে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা সোসালিস্ট সোসাইটি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে চান। সেই জন্যে তোমাকে এক মাসের এক্সট্রা মাইনে দেওয়া হচ্ছে।”

জিমি আমার দিকে একটা নোট 'ভর্তি' খাম এগিয়ে দিলেন। আমাকে কিছু, বলবার সুযোগ না দেবার জন্যই ফোকলা বললেন, "গুড, নাইট"

আমার পৃথিবীটা দু'লতে আরম্ভ করেছে। ছাদে উঠে দেখলাম রোজী আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার কাছে এসে সে বললে, "আই অ্যাম স্যরি। বিশ্বাস করো, আমি চিঠি টাইপ করার সময় জিমিকে বারণ করেছিলাম। ওর হাত চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু জিমি মিস্টার চ্যাটার্জিকে আগে থেকেই বুঝিয়ে রেখেছে। কাউন্টারে ওরা মেয়ে রাখবে।"

আকাশে তারা উঠেছে। সেই তারার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি আর কী করবে রোজী? তোমায় ধন্যবাদ।"

কিন্তু আমার দুঃখের সেই যেন শুরু। আরও সংবাদ যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তা বুঝিনি। গুড়বেড়িয়া তখনও কিছু জানতে পারেনি। গুড়বেড়িয়া বললে, "বাবু, আপনার একটা চিঠি এসেছে।"

সত্যসুন্দরদার চিঠিটা সম্পূর্ণ পড়বার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। হাত থেকে' ফসকে চিঠিটা মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। গুড়বেড়িয়া আমার সামনেই দাঁড়িয়ে, ছিল। সে চিঠিটা তুলে আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললে, "কী হয়েছে, বাবুজী?"

সংসারে এই হয়। আমি যাদের ভালবাসি, যারা আমায় ভালবাসে তাদের কোনো দিন সুখী হতে দেখলাম না। সত্যসুন্দরদা লিখেছেন-

"প্রিয় শংকর,

আর কাকে লিখবো? আর কাকেই বা আমার লিখবার আছে: তোমার সুজাতাদির চিতাভস্ম আরবসাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে এইমাত্র ফিরে এলাম। গতকাল গভীর রাত্রে টেলিফোনে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল দিল্লীর হোটেল থেকে উইলিংডন বিমানবন্দরে যাবার পথে এক ভয়াবহ মোটর দু'র্ঘটনায় এয়ার হোস্টেস সুজাতা মিত্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিমান কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী নেকস্ট অফ কিন্ দের যে তালিকা থাকে, সুজাতা মিত্রের নামের পাশে সেখানে আমারই নাম লেখা ছিল।

পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে সুজাতার কাছে আমি সবচেয়ে প্রিয় হলাম। হাওয়াই কর্তৃপক্ষ সৌজন্যের কার্পণ্য করেননি। সুজাতার শেষ ইচ্ছামতো তার মৃতদেহও বিশেষ বিমানে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সব স্মৃতিকে এখন দীর্ঘস্থায়ী এক স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। নিজের চাকরি এবং স্বার্থের কথা ভেবে, বিয়েটা আমি পিছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কোনো দ্বিধাই করেনি। শুনলাম, সুজাতার অফিসে ক্ষতিপূরণের টাকাও আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সর্বদা দাঁড়িয়ে থেকে জীবনকে সে অনেকে সহজভাবে নিতে পেরেছিল। আমার মতো স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজেকে ছোট মনে করেনি।

এখন আমাকে বড়লোক বলতে পারো। কিন্তু রাজপুত্র আবার ধোপার ছেলেতে রূপান্তরিত হলো। এখানে একলা টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শাজাহানে ফেরবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে উপায় নেই। তাই আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূলে মার্কো যে হোটেল গড়ে তুলছেন সেখানেই যাবার সংকল্প করেছি।

আগে বলিনি, আজ তোমাকে জানিয়ে যাই, হয়তো কোনোদিনই না হলে সে সুযোগ পাবো না। সুজাতা তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতো। সে বলেছিল, দেখে নিও, he is an exceptional person "

একসেপশনাল! অসাধারণই বটে! শাজাহানের ছাদের ঘরগুলো একসঙ্গে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো। সত্যসুন্দরদার চিঠিটা আমি পকেটে পুরে ফেলেছিলাম। কিন্তু মনে হলো ওরা সবাই জেনে ফেলেছে। সুজাতাদির ঔদ্ধত্য এবং আমার দুঃসাহস দেখে ওরা হেসে গড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু এই বাড়ির প্রতিটা ইট যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে —শাজাহান থেকে চাকরি যাওয়া এই একসেপশনাল লোকটিকে তোমরা চিনে রাখো। পাগলের মতো আমি নিচেয় নামতে শুরু করেছি।

রাতের অন্ধকারে, ক্যাবারে উৎসবের শেষে, শাজাহান ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু শাজাহানের টেবিল, চেয়ার, সিড়ি সবাই যেন আমাকে দেখে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা

করছে।

আমার এতোদিনের পরিচিত কাউণ্টারটাও আমাকে বুঝলো না। সেও হাসছে, বলছে, লজ্জা করে না—কোথাকার কোন একটা মেয়ে প্রেমে মাতাল অবস্থায় কাকে কি বললে, আর গাধা তুমি সেইটা বিশ্বাস করলে!

মধ্যরাতের সেন্ট্রাল এভিন্যু, ধর্মতলা স্ট্রীট, চৌরঙ্গী রোড সবাই গভীর ঘুমে অচৈতন্য। শুধু শাজাহানের নিয়ন আলো একজন বরখাস্ত কর্মচারীকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন নিভছে আর জ্বলছে।

এখন আমার কিছু হারাবার ভয় নেই। আমার যা ছিল সবই বিসর্জন দিয়েছি। তবু লজ্জার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছি না। অনেকদিন আগে ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের একটা অশিক্ষিত দাবোয়ান এইভাবে আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল। আর আজ সমস্ত স্থাবর কলকাতা সুযোগ পেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছে—ঐ চলেছেন, ঐ তোমাদের একসেপশনাল পার্সন চলেছেন।

সেন্ট্রাল এভিন্যু, চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে পাগলের মতো হাঁটতে হাঁটতে থিয়েটার রোডের মোড়ে কখন হাজির হয়েছি খেয়াল করিনি। ইলেকট্রিক আলোর পোস্টগুলোও পথের ধারে আমাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি।

এখন যেখানে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, সীমাহীন আকাশের সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্কের সংবাদ যেখানে রয়েছে, ঠিক সেইখানেই আমি সাধারণ চোখেই আকাশের তারাদের সঙ্গে সেদিন সংযোগ স্থাপন করেছিলাম। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে যাবার পথে বিশাল বনস্পতি দল আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল। ওরা বলেছিল, "আমরা জানি না, হয়তো তুমি অসাধারণ, কে জানে!" গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সুদু'র আকাশের তারারাও যেন সেই মতে সায় দিয়েছিল—"আমরা হাসবো না, আমরা ব্যঙ্গ করবো না। কে জানে কোথায় কী আছে - আমরা শুধু নীরবে দেখে যাবো।" আগামী যুগে প্ল্যানেটেরিয়ামের কোনো কল্পনাপ্রবণ দর্শক সীমাহীন গগনের ইশারা থেকে কোনো নবজীবনের ইঙ্গিত পাবেন কি না জানি না। কিন্তু সেই জনহীন রাত্রে দু'র আকাশের তারারা আমাকে নতুন জীবনের আশ্বাস দিয়েছিল।

বিস্ময়ভরা এই ভুবনে সেই মুহূর্তে আমি যেন নতুন করে জন্মগ্রহণ করলাম। সেই মুহূর্ত থেকেই এই পৃথিবীকে, এই শাজাহান হোটেলকে যেন অন্যরূপে দেখতে শুরু করলাম।

সুজাতাদি, করবী গুহ, কনি, গোমেজ, সত্যসুন্দর বোস, কারুর জন্যেই আমি আর বিধাতার আদালতে অভিযোগ করবো না। আমি কেবল নিজেকে প্রকাশ করবো। যে অসংখ্য প্রাণ আমাদেরই মতো নানা দুঃখে জর্জরিত, তাদের সঙ্গে নিজের দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেবো।

শান্ত মনে আবার চৌরঙ্গী পেরিয়ে সেন্ট্রাল এভিন্যুর পথে এসে দাঁড়িয়েছি। দূরে নিয়ন-শোভিত শাজাহানের ক্লান্তিহীন ত্রিনয়ন তখনও জলছে আর নিভছে। শেষবারের মতো সেই আশ্চর্য জগতের দিকে তাকিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতিতে আমার মন ভরে উঠলো। অনেকদিন আগের এক পুরনো ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমাদের এই কলকাতা দেখতে এসে ইংরেজ কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং আর এক প্রাচীন হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ভয়াবহ শহরের ভয়াবহ রাত্রির সঙ্গে পরিচিত হয়ে, গভীর রাত্রে হোটেলে ফেরবার পথে 'আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তারই কাছাকাছি কোথাও তিনিও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত কবি এইখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : All good Calcutta has gone to bed, the last tram has passed, and the peace of the night is upon the world. Would it be wise and rational 'to climb the spire of that kirk and shout: O true believers? Decency is a fraud and sham. There is nothing clean or pure or wholesome under the stars, and we are all going to perdition together. Amen!

মধ্যরাতের কলকাতায় দাঁড়িয়ে কর্মহীন, আশ্রয়হীন আমিও হয়তো সেই একই সর্বনাশের প্রার্থনা করতাম। কিন্তু অনেক অভিযোগ ও বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই তা পারলাম না।

সর্বনাশ, অধঃপতন ও ধ্বংসের চিন্তায় পুলকিত পাশ্চাত্ত্যের গর্বিত কবি পরম ঘৃণায় বলেছিলেন, আমেন—তাই হোক। কিন্তু আকাশের অগণিত নক্ষত্র আমাকে আশা দিলো,

বল দিলো। আমি বুঝলাম, আমাদের সামনে উদার অনন্ত সময় রয়েছে। মঙ্গলের স্পর্শে আমাদের এই পাপপঙ্কিল নগরীও একদিন নিশ্চয় পবিত্র হয়ে উঠবে।

শেষবারের মতো পিছন ফিরে আমার প্রিয় পান্থশালার দিকে তাকালাম। শাজাহানের ক্লান্তিহীন লাল আলো তখনও জ্বলছে আর নিভছে। আমি এগিয়ে চললাম।

* * * * *

লেখক পরিচিতি

আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ৯ জুন ২০১২
লেখক : গৌতম ভট্টাচার্য

চৌরঙ্গী-র জন্মভূমিতে

দ্রুত আমরা একমত হলাম, লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে বাঙালি অবশেষে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছে!

কার্জন সেই কবে ১৯০৫-এ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন বাঙালিকে। আর এই ২০১২-তে বাঙালি কিনা কার্জন পার্ক-কেই দ্বিখণ্ডিত করে ছেড়েছে। এক দিকটা ঘাস। এক দিকটা ধুলো আর সারি সারি রেলিং।‘চৌরঙ্গী’ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট তাঁর আঁতুড়ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বার কয়েক নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হব হব। “ট্রামগুমটি তখনও ছিল। ঘোড়াগুলোকে শুধু এখানে পরিচর্যা করা হতো। যারা ট্রামটাকে টানত টালিগঞ্জ অবধি...কাশী বিশ্বনাথ সংঘের ট্যাঙ্কার থেকে এই জায়গাটায় জল দিত। বেকার দেখে মায়াদয়া হলে সঙ্গে একটা বাতাসা।” নস্টালজিয়ার নেটওয়ার্ক অবশ্য দ্রুতই উড়ে গেল পারিপার্শ্বিকে।“পার্কটা আগেও দুর্দান্ত পরিচ্ছন্ন কিছু ছিল না। জ্যোতিষী বসত। বুটপালিশ-ওয়ালা। দেহপসারিণীরা ঘুরত। কিন্তু এত ধুলো, এত সব রেলিং ছিল না। এখন তো শুনছি এক হাজার ইঁদুরও মাটির তলায় থাকে,” বললেন আতঙ্কিত শংকর।

সন্ধে পৌনে সাতটা এতই ক্ষতবিক্ষত করা গরম, সন্ধে না মাঝদুপুর গুলিয়ে যেতে পারে। যেমন পাঠকের গুলিয়ে যায় ‘চৌরঙ্গী’ আসলে কোন হোটেলকে কেন্দ্র করে লেখা? এমনিতে জুনের আরও একটা স্বাভাবিক দিন যাকে অস্বাভাবিকতার মাত্রা দিতে স্রষ্টা নিজে চলেছেন ৫০ বছর পর তাঁর সৃষ্টির উৎসমুখে। ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক চলতে চলতে ‘চৌরঙ্গী’ বই হয়ে বেরোয় ১৯৬২-তে। আমরা যে ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে আপাতত কার্‌জন পার্ক ভ্রমণ স্তব্ধ করেছি তাঁর জন্ম ঠিক একশো বছর আগে। স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর। ইনি শিকাগো ধর্ম মহাসভা থেকে স্বামীজি ফেরার পর শিয়ালদহ

স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী'র সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা অবশ্য সে জন্য নয়। উপন্যাসের নায়ক অসহায় বেকারিত্বের মধ্যে রাজভবনের বিপরীতে এই স্ট্যাচুর তলায় বসে দিন গুজরান করত। আর মূর্তির কাছে প্রার্থনা করত। ফিল্মে যে চরিত্রটাকে চিরবিখ্যাত করে রেখেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

হঠাৎই তার সামনে হাজির হয়ে যায় অ্যাটাচি কেস হাতে কোট-প্যান্ট পরা পূর্ব-পরিচিত এক সাহেব। নাম বায়রন। বাররন সাহেবই শাজাহান হোটেলে নিয়ে গিয়ে চাকরি জুটিয়ে দেন শংকরের।

স্যার হরিরামের পাদদেশে বসে ৫০ বছর পর লেখকের স্বীকারোক্তি, “আসলে গল্পের শুরুটা এখানে নয়। বইতে যা-ই থাক, ‘চৌরঙ্গী'-র প্রথম দৃশ্য হওয়া উচিত কে. সি. দাশের দোকানের বাইরে।” প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই লাগল বলা যায়। এতটা ‘মেক বিলিভ’। যাকে পাত্তা না দিয়ে লেখক বলে গেলেন, “বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে নীচের একটা বইয়ের দোকানে বই উল্টোচ্ছি। হঠাৎ লাইনগুলো চোখে এল :

‘Our life is but a winter's day:
Some only breakfast and away;
Others to dinner stay and are full fed;
The oldest man but sups and goes to bed;
He that goes soonest has the least to pay.'

সামনে বৃষ্টির মধ্যে গ্র্যান্ড হোটেলের মাথাটা ভেসে উঠে একটা অপূর্ব মাত্রা যোগ করেছে। দ্রুত মাথায় খেলে গেল, ‘আরে আমার তো হোটেলে এত সব অভিজ্ঞতা। হোটেল নিয়ে বই লিখলে কেমন হয়?” ‘কত অজানারে’র চমকপ্রদ আবির্ভাবী সাফল্যের পর শংকর তখন দ্বিতীয় বইয়ের বিষয় কী হবে, চূড়ান্ত হাবুডুবু খাচ্ছেন। চারপাশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও চলছিল ‘আরে এ মালটা ওয়ান-বুক অথর'।

পাঁচ লাইনের একটা ইংরেজি উদ্ধৃতি আর বর্ষার সিলুয়েটে গ্র্যান্ড হোটেল—অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল ‘চৌরঙ্গী' উপন্যাস। কে জানত সেদিন গঙ্গা থেকে টেমস—একদিন সর্বত্র সেই সন্তানের মহিমা ছড়িয়ে পড়বে?

কিন্তু শাজাহান হোটেলটা কি তা হলে গ্র্যান্ড? আগে যে শোনা যেত গ্রেট ইস্টার্ন? ফিল্মটা তো শোনা যায় গ্র্যান্ডে শ্যুটিং হয়েছিল। শংকর তা হলে কোথায় কাজ করতেন?

সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে উত্তর দেওয়ার অবকাশ নেই। মুখে রহস্য জড়ানো হাসি এনে শংকর বললেন, "কোনওটাই না।" উপন্যাসের প্রকৃত উৎপত্তিস্থলের দিকে এবার আমরা ধাবমান। সাবেকি ওয়েলেসলি প্লেস। রাজভবনের সিংহদুয়ার থেরে হাঁটা দূরত্ব। সাদা বাড়িটা দেখলে মনে হওয়ার কোনো উপায় নেই এমনকী আধুনিক আমলেও পশ্চিমি-সমাজে তোলপাড় ফেলে দেওয়া অনূদিত উপন্যাসের জন্মভূমি এই জায়গাটা যে হতে পারে!

দু'-দু'টো ব্যাঙ্ককে ঘাড়ে বইছে সে এখন—ইউকো আর সেন্ট্রাল। পাশে এটিএম এবং 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'-এর অফিস। এতই গতানুগতিক, নিত্যনৈমিত্তিক চেহারা রং চটে যাওয়া সাদা বাড়িটার যে ওই লোকেশনে 'একদা রামধনু-রঙা আবেগ তৈরি হতে পারে! এত নাচ, এত গান, এত দুঃখ— হাজারো আলোর এমন ঝাড়বাতি থাকতে পারে ভাবাই যায় না।

কে. সি. দাশ থেকে অতটা রাস্তা ঘাম জবজবে গরম আর ভিড়ের যৌথ আক্রমণকে সহ্য করে পৌঁছতে, পৌঁছতে যথেষ্ট ক্লান্ত লাগছে। ঊনআশি বছরের ঔপন্যাসিকের তো শার্ট ঘামে জবজবে। কিন্তু স্পটটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যেন নিমেষে ষাট বছরেরও বেশি ফিরে গিয়েছেন। ঘাম কোনো ফ্যাক্টরই হচ্ছে না। আনমনে বললেন, "কাঠের সিঁড়ি ছিল। নীচটা রিসেপশন। বাঁ পাশে লিফট। ছাদে ক্যাবারে হতো। আমরা ওই লিফটটা দিয়ে ওপরে উঠতাম।"

দৃশ্যান্তরে যেন ১৯৫০-এর কলকাতা। যখন হাইকোর্টে ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের বাবু শংকর তাঁর সাহেবের সঙ্গে এখানে নিয়মিত দেখা করতে আসতেন। বেশি দেরি হয়ে গেলে রাতে বার কয়েক থেকেওছেন। হোটেলের নাম ছিল স্পেনসেস। এই গল্পের শাজাহান হোটেল। পাছে হোটেল কর্তৃপক্ষ মামলা-টামলা করেন সেই ভয়ে লেখক স্বদেশি নাম বাছেন। বহু বছর তাঁর ভয় কাটেনি যে কোথাও হোটেলের আইডেন্টিটি বেরিয়ে যায়নি তো? টানা দু'বছর বারওয়েল এখানে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীমতী বারওয়েলও স্পেনসেসে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যান। টিন-এজ ছাড়িয়ে যৌবনে পড়া শংকর তখনও নিয়মিত আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নায়ডু। বারওয়েলদের

পারিবারিক বন্ধু। হোটেল থেকে হাঁটা দূরত্বের রাজভবনে প্রায়ই গিয়ে চা খেয়ে আসতেন মিসেস বারওয়েল। 'চৌরঙ্গী' বই হয়ে বার হয়েছে খবর পাওয়ার অনেক বছর পরে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন। অবশ্য জেনে যেতে পারেননি তাঁর নিজের দেশে পেঙ্গুইন ইংরেজি সংস্করণ বার করার পরে কী পরিমাণ জনপ্রিয়তা স্পেনসেস হোটেলের দৃশ্যপট পেয়েছে। পরে তা অনূদিত হয়েছে ইতালিয়ানে। বিবিসি চ্যানেল ফোর-এ নাটক হয়েছে। শিগগির-ই ফরাসি ফাষায় অনূদিত হচ্ছে। স্পেন আর চিনে শিগগির-ই ছড়িয়ে পড়বে।

কী রহস্যময়তা আছে পঞ্চাশ দশকের ঘোড়ায় টানা ট্রামের কলকাতার লুপ্ত হোটেলের যে আজও আধুনিক ইন্টারনেটের জেটসেট পশ্চিমী পৃথিবীতে তাকে নিয়ে মানুষ আন্দোলিত হয়? নামী ইংরেজ সমালোচক লিখেছেন, "চৌরঙ্গী" ইজ আ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি আরবান ফেয়ারি টেল। ইট কুড হ্যাভ হ্যাপেনড এনিহ্যোয়্যার ইন দিস ওয়ার্ল্ড।' 'গার্ডিয়েন' পত্রিকা বলেছে, "চৌরঙ্গী" : আ লাভলি চার্মিং বুক, ব্রিমিং উইথ লাইফ অ্যান্ড ফুল অফ দ্য আনএক্সপেকটেডনেস অফ অ্যা ক্লোজলি অবজার্ভড ওয়ার্ল্ড।'

কিন্তু এই মুহূর্তে নিকুচি করেছে শক্ত শক্ত ওই সব ইংরেজি উদ্ধৃতি নিয়ে ভাবতে। জনপ্রিয়তা আন্দাজে দুই বাংলার বাঙালিদের বরঞ্চ অনেক অসমাপ্ত জিজ্ঞাস্য আছে। 'গার্ডিয়েন'-এর আঁতেল বুক রিভিউয়ের চেয়ে সেই সহজ প্রশ্নগুলো বেশি ইম্পর্টান্ট।

স্পেনসেস হোটেলের চাকরিতে কবে ঢুকলেন শংকর?
ছিলেনই বা কত দিন?
স্যাটা বোসকে সেখানেই পেলেন?
বইয়ের বাকি চরিত্রগুলোও সেখানেই হাজির ছিল?

মরমি অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। কেন না নিচু গলায় লেখক বললেন, "একদিনও চাকরি করিনি। হোটেলে নিয়মিত যাতায়াতের সুবাদে অনেক কিছু জানা ছিল। বাকিটা প্রচুর দৌড়ঝাঁপ আর রিসার্চ করে জেনে নিই।" বাঙালির বহু দশকের সযত্ন-চর্চিত মিথ যেন ওই সন্ধে-রাতের মিলনস্থলে অবসৃত ওয়েলেসলি প্লেসে ভেঙে পড়ল!

কিন্তু স্যাটা বোস কে? প্রশ্নটা তো থেকেই গেল। সত্যি এই হোটেলে কাজ করতেন? মিসেস পাকড়াশি কি যাঁকে শোনা যায়, সেই বহুবিখ্যাত সোস্যালাইট মহিলা? নিত্যহরিবাবু— বাঙালির আরেক অবিস্মরণীয় চরিত্র? সুজাতা মিত্র নামে সত্যি কোনো এয়ারহোস্টেস ছিলেন?

সৃষ্টির অর্ধ-শতাব্দী পরেও লেখককে দেখে মনে হল জাদু-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে চান না। ভাসা, ভাসা কিছু উত্তর দিলেন। যেগুলো জুড়ে একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি কখনওই হয় না। রহস্য ভাঙে অথচ ভাঙে না। সেই আলোছায়া আবছায়া। আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট নয়। বোঝাই যাচ্ছে, পুরোপুরি স্পষ্ট করাতে স্রষ্টার আগ্রহ নেই। ফিরতি পথ-পর্যটনে রাজভবনের নুড়িগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল বইয়ের উপসংহারটা আজও সত্যি।

'শাজাহানের (স্পেনসেস) ক্লান্তিহীন লাল-আলো তখনও জ্বলছে আর নিভছে।

আমরা এগিয়ে চললাম।'

আনন্দবাজার পত্রিকা

শনিবার, ৯ জুন ২০১২

সাক্ষাৎকার : গৌতম ভট্টাচার্য

জীবনটাই তো একটা চৌরঙ্গী

পত্রিকা : উত্তমকুমারের স্যাটা বোস কেমন লেগেছিল?

শংকর : উজ্জ্বলা-তে একসঙ্গে দেখেছিলাম। বেরোনোর সময় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হল আপনার?' বললাম, 'স্যাটা বোস যে ধারণায় লিখেছি আপনি তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন'। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এ বার কিন্তু আমি লিখে দিতে বলব। তখন আপনিই ফ্যাসাদে পড়বেন।' উত্তম খুব রসিক ছিলেন।

পত্রিকা : 'চৌরঙ্গী'র আগে উত্তমকে চিনতেন?

শংকর : উত্তমের সঙ্গে আলাপ ছিল। ওঁর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতেও গেছি। শুনেছি উত্তম নিয়মিত গ্র্যান্ড হোটেলে এসে চরিত্রের জন্য আগে তৈরিও হয়েছিলেন।

তবে উনি সিনেমাটা করছেন বলে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য ছিল না আমার মধ্যে। ইন ফ্যাক্ট একদিনও শ্যুটিংয়ে গেছি বলে মনে পড়ে না। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় পরামর্শ দিয়েছিলেন নিজের বইয়ের শ্যুটিংয়ে কখনও যাবে না। আউটডোরে তো নয়ই। কেন বলেছিলেন জানি না।

পত্রিকা : স্যাটা বোস যে কোনো বাঙালি তরুণের স্বপ্নের বড়দা। বাস্তবের কোন চরিত্রকে দেখে লিখেছিলেন? তিনি আজ জীবিত?

শংকর : ইস্টার্ন রেলওয়েতে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সত্যসুন্দর বসু। আমি তখন ওখানে চাকরি করি। মিড্‌ডল র‍্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে খুব মিশতেন। স্কাউটিং করতেন। স্মার্ট লোক ছিলেন। কায়দা করে ইংরেজি বলতেন। সব সময় বলতেন আমার নাম স্যাটা বোস। খুব পপুলার ফিগার ছিলেন। আমি অবশ্য দূর থেকে দেখেছি। অতটা আলাপ ছিল না। আবার স্পেনসেস হোটেলে একজনকে

পেয়েছিলাম, যিনি পরে গ্রেট ইস্টার্নে চলে যান। তাঁর মধ্যে একটা অভিভাবক সুলভ ব্যাপার ছিল। তাঁরও ধারণা ছিল ওঁকে ভিত্তি করে লিখেছি। 'চৌরঙ্গী' বার হওয়ার পর অনেকে তো ওঁকে বলতেই শুরু করে, 'এই যে স্যাটাদা আসুন'। উনি সেটা খুব উপভোগও করতেন।

পত্রিকা : আপনার জীবনে স্যাটা বোস কে?

শংকর : আমি বেশ কয়েকজন স্যাটা বোস পেয়েছি। পরের দয়াতেই তো যা কিছু হয়েছে। এই বইটা নিয়ে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, একদিন জিপিও-র সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে। মাথায় কিছু আসছে না। হঠাৎ দেখি অমিয়দা। অমিয় চক্রবর্তী তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে কালেকটর অফ এক্সাইজ। অমিয়দা বললেন, 'কী হে, তুমি নাকি হোটেল নিয়ে বই লিখছ। জিপিও-র পেছনে লাল বাড়িটায় উনি বসতেন। টানতে টানতে নিয়ে গেলেন সেখানে। বললেন, 'না জেনে যা-তা লিখবে আর তোমার জন্য আমার বদনাম হয়ে যাবে। আমি সেই ঝুঁকি নেব না।' অমিয়দা তখনই ব্যবস্থা করে দিলেন। পরের দু' বছর কলকাতার সমস্ত বারে বিনা অনুমতিতে যাওয়ার, বললেন, 'এক্সাইজের লোক হয়ে সর্বত্র যাবে। খাতা দেখবে। হিসেব করবে। দরকার হলে পিক-আপ গার্লসদের সঙ্গে কথা বলবে।' ওঁর দয়াতেই আমি কলকাতার সব বার চষে ফেলি।

পত্রিকা : একটা রটনা বহু কাল আছে, যে মিসেস পাকড়াশি হলেন লেডি রাণু...

শংকর : এটাকে স্ক্যান্ডাল ভ্যালুর মধ্যে ফেলে দেখা ঠিক হবে না। এ ভাবে বলাটা অন্যায় হবে। স্ক্যান্ডাল ভ্যালুর ওপর ভালো সাহিত্য টিকে থাকে না। 'চৌরঙ্গী' বেরোবার পরেও লেডি রাণুর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। কোনোদিন কিছু বলেননি। কমিউনিস্টরাও ওঁকে লেডি রাণু বলতেন। ওঁর একটা ওল্ড ওয়ার্ল্ড ডিগনিটি ছিল।

পত্রিকা : আর আপনার নিজের চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়?

শংকর : ভালো লাগেনি। খারাপও না। ছেড়ে দিন, মানুষটা চলে গেছেন।

পত্রিকা : হোটেলে আপনি যে কখনও কাজ করেননি—কোথাও তো বলেননি?

শংকর : কাউকে বলিনি। ইন ফ্যাক্ট হোটেলে সেই সময় পয়সা দিয়ে কখনও থাকিওনি। অ্যাফোর্ড করা সম্ভব ছিল না। তবে রাত্তিরে বাস বন্ধ হয়ে গেলে বার কয়েক

মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়েছি।

পত্রিকা : তা হলে ভেতরের ব্যাপার এত কিছু জানলেন কী করে?

শংকর : কম বয়সের একটা সুবিধে, অবারিত গতি থাকে। সব জায়গায় সমান গ্রহণযোগ্যতা থাকে। স্পেনসেস হোটেলের মধ্যে আমি সর্বত্র ঘুরতাম। তারপর কর্মীদের কেউ কেউ চলে গেল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। সেখানেও ওদের সঙ্গে আড্ডা মারতে নিয়মিত গেছি।

পত্রিকা : নিত্যহরিকে কোথায় পেলেন? স্পেনসেসে?

শংকর : (হাসি) নিত্যহরি আমায় খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাস লিখতে শুরু করে একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিলাম। আর এগোতে পারছি না। মাথায় কিছু ঢুকছে না যে রিসেপশন থেকে গেস্ট ওপরে যাওয়ার পর আমি তাকে কী করে খুঁজে পাব? ঘরে ঢুকব কী করে? আমি তো রিসেপশনিস্ট। আর ফার্স্ট পার্সনে লিখছি।

তারপর একদিন হাওড়ার যে বাড়িতে থাকতাম, আমি গভীর রাতে টয়লেটে গেছি। ফিরে এসে দেখি যে বালিশটায় শুয়েছিলাম একটা বেড়াল সেটাকে ফালা ফালা করে ফেলেছে। ওই পড়ে থাকা বালিশটা দেখে মনে হল এটা আমার সম্বল হতে পারে। ঘরের মধ্যে কী হবে নিত্যহরি তো সেটা জানতেই পারবে।

পত্রিকা : মার্কো পোলো, সুজাতা মিত্র, এদের কোথা থেকে পেলেন?

শংকর : সবই এদিক-ওদিক ছোটবেলায় দেখা। কিছু যৌবনে।

পত্রিকা : 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের শেষের আগের লাইনটার মানে কী? 'শাজাহান হোটেলের লাল আলোগুলো তখনও জ্বলছে নিভছে।'

শংকর : মানে জীবনের শেষ হল না এখানে।

পত্রিকা : 'চৌরঙ্গী' বই হয়ে বার হওয়ার পর? প্রথম দিন থেকেই জনপ্রিয়তা?

শংকর : প্রথম দিন থেকেই শক্তিমানদের নাকউঁচু ঘেন্না। প্রথম দিন থেকেই সমালোচনা—যে রেস্টুরেন্ট আর রেস্তোরাঁর তফাত বোঝে না, সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই। এক নামী লেখিকা 'দেশ' সম্পাদককে চিঠি পাঠালেন অশিক্ষিতের উপন্যাস অভিযোগ করে। বললেন, যে লোকটা 'ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'-এর সঙ্গে 'বেড অ্যান্ড

ব্রেকফাস্ট'কে গুলিয়ে ফেলতে পারে সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই। পাঠকরা যেমন ঢেলে দিয়েছেন, সমালোচকেরাও তেমনই ঢেলে আক্রমণ করে গেছেন। মানুষ বলে কেউ মনে করেনি। কোনো পুরস্কার দেয়নি। ভুল বললাম। একটা পুরস্কার 'চৌরঙ্গী' পেয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বাইন্ডিং-য়ের জন্য (দুঃখের হাসি)।

পত্রিকা : আজ ১১১ সংস্করণ উধাও হয়ে যাওয়ার পর কী মনে হয়? বইটার মধ্যে কী সর্বজনীন আবেদন আছে যে সর্বত্র সকলকে অ্যাপিল করছে?

শংকর : কী জানি কী আছে। কিছু একটা বোধহয় আছে যেটা লোককে টানে। আমায় যখন ইংল্যান্ডে জিজ্ঞেস করা হল, এত বছর পর ইংরিজি অনুবাদ হল কেন? আমি উত্তর দিলাম, আমার সাহিত্যজীবন শুরু হয় হাওড়া স্টেশন থেকে। সেখান থেকে আমায় ট্রেন নিয়ে যায় আসানসোল। ওখানেই থেমে ছিল। অনেক বছর বাদে পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া আমায় নিয়ে গেল দিল্লি। দিল্লি থেকে ছড়িয়ে পড়লাম গোটা দেশে। আধুনিক বাঙালির কাছে। এর পর আমার ব্রিটিশ প্রকাশক আমায় নিয়ে গেলেন লন্ডন হয়ে গোটা পৃথিবীর কাছে। রাশিয়ায় প্রথম বেরোল। তারপর একে একে ইংল্যান্ড, এবার ইতালি, ফ্রান্স।

পত্রিকা : আজ কী মনে হয় আসানসোল থেকে আরও আগেই দিল্লির ট্রেন ধরা উচিত ছিল না?

শংকর : না, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম ভাগ্যে আসানসোলের বাইরে যাওয়া নেই।

বিদ্বজ্জনেরা তো আমায় পাত্তাই দেননি। কেউ কেউ তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন ওয়ান-বুক অথর বলে। অন্নদাশঙ্কর রায়কে শান্তিনিকেতনে 'কত অজানারে' পাঠিয়েছিলাম। উত্তরে উনি লিখে দেন, 'আপনার জীবনের প্রথম সাফল্যটি যেন জীবনের শেষ সাফল্য না হয়'। আজও জানি না আশীর্বাদ না আশঙ্কা কোন সেন্টিমেন্ট থেকে কথাটা লিখেছিলেন।

চারদিকের সমালোচনায় আমি এত ভেঙে পড়েছিলাম যে আমার মা বলেছিলেন ওয়ান-বুক অথরদের মধ্যেও তো বড় বড় নাম আছে। এত দুঃখ আর যন্ত্রণা পেয়েছিলাম যে আজও ভুলতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল নিজের লোকেরা এত ঘেন্না করল! কেউ আবার বলেছিল আর্থার হেইলির নভেল থেকে আমি চুরি করেছিলাম। মজার কথা

হল বইটা আমি আজ অবধি পড়িনি। আর ওই উপন্যাসটাও লেখা হয় 'চৌরঙ্গী' লেখার চার বছর বাদে।

সেই সব তিক্ততা ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। নিজে থেকে মিটমাট করতেও যাইনি। কোথাও একটা মিডল ক্লাস অ্যারোগেন্স বোধহয় ছিল। কয়েক বছর আগে ভোডাফোন সংস্থা ইংরিজি 'চৌরঙ্গী'কে একটা পুরস্কার দেয়। আমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছে করেনি।

পত্রিকা : এই কনট্রাডিকশন সম্বন্ধে আজ লেখক জীবনের শেষ দিকে এসে কী মনে হয়? পাঠকসমাজ সব সময় নেয়, সমালোচক কোনো সময় নেয় না।

শংকর : কনট্রাডিকশনটা মেনে নিয়েছি। আজ নয়, অনেক দিন। ওয়ান-বুক অথর হওয়ার অপবাদটা কাটাতে পেরেছি। আমার স্কুলের মাস্টারমশাই বলতেন, এমন ভাবে লিখবে যেন রাজভবনের সামনে যে শক্ত নুড়িপাথরগুলো আছে সেগুলো পাঠকের কাছে বিচি-ছাড়া-খেজুরের মতো নরম হয়ে যাবে। চিন্তাশীল হৃদয়ের জন্য সহজ আবেদনের গান বানানোই তোমার পরীক্ষা।

মাস্টারমশাইয়ের কথা মেনেই সাধনা করে গেছি। কোনো মতেই কম্প্রোমাইজ করিনি। এখন সামনে আরেকটা পরীক্ষা। মরে যাওয়ার পর পাঁচটা বছর যেন টিকে থাকতে পারি। আর সব পেশার লোকদের মৃত্যুর পরে মৃত্যু আছে। লেখক সমাদৃত হলে তার মৃত্যু নেই। বাংলা সাহিত্যে দেখুন না, বেস্টসেলার লেখকরা প্রায় সবাই মৃত। আমার খালি মনে হয়, জীবদ্দশায় যে যা বলেছে, বলছে। মৃত্যুর পর পাঁচটা বছর আমার পরীক্ষা।

মিটারটা তো তখনই ডাউন হবে।

পত্রিকা : 'চৌরঙ্গী'তে একটা গান আছে—'বড় একা লাগে, এই আঁধারে/মেঘের খেলায়, আকাশ পারে'। এটা কি মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের জীবনেরও গান?

শংকর : নিঃসঙ্গতা কোথাও একটা রয়ে গেছে খুব সত্যি কথা। সেটাকে তীব্র অভিমানও বলতে পারেন। এখন মনে হয়, না থাকলেই ভালো হতো। যা পেয়েছি সেটাই বা কম কী? আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়, এখানকার লোকেরা কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে সাহেবরা ভালো না বললে হতাশ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ জিনিস হয়েছে, সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে। সাফল্যের সিলমোহর যেন ইওরোপকেই দিতে হবে।

পত্রিকা : সাহিত্যিকদের মধ্যে কি আপনার কোনো বন্ধু নেই?

শংকর : অনেকে ছিলেন, চলে গেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, বিমল মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকা : আপনি যাঁদের নাম বলছেন, এঁরা তো কেউ আপনার জেনারেশনের নন। আপনার প্রজন্মের লেখকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই কেন?

শংকর : খুব বেশি যাতায়াত ছিল না। আসলে সেই হাওড়া থেকে বাসে-ট্রামে যাতায়াত করে, চাকরি করে হয়ে ওঠেনি।

পত্রিকা : সুনীল, শীর্ষেন্দু, বুদ্ধদেব, সঞ্জীব—এই সব আড্ডায় আপনি কখনও নেই কেন? 'বুধসন্ধ্যা'-তেই বা আপনার কখনও পা পড়েনি কেন?

শংকর : আমি একটু লাজুক লোক। এড়িয়ে গেছি বোধহয়। এ সব নিজে থেকে যেতে-টেতে হয়। কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ হয় যখন 'চৌরঙ্গী' শ্রেষ্ঠ বাইন্ডিংয়ের জন্য পুরস্কার পায়।

পত্রিকা : অকাদেমি জাতীয় পুরস্কার কখনও পাননি বলে আক্ষেপ আছে? মনে হয় প্রাপ্য দেওয়া হয়নি আপনাকে?

শংকর : যখন মনে হয় সৈয়দ মুজতবা আলি, বিমল মিত্র, শরদিন্দু — এঁরা অকাদেমি পাননি, তখন আর খারাপ লাগে না। তা ছাড়া পুরস্কার তো চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা তো বিয়ের যৌতুক নয় যে জোর করে কেউ দাবি করবে। অবশ্য এখানে তো যৌতুকই হয়ে গেছে। একটা বড় পুরস্কার পাওয়ার জন্য, একজন লেখক নাকি শুনেছি বলেছিলেন, যিনি সদ্য সেকেন্ড বিয়ে করেছেন। যে এটা না পেলে বউয়ের কাছে প্রেস্টিজ থাকছে না। আরেকজন বলেছেন খুব অসুস্থ, জীবন থাকতে থাকতে পেয়ে গেলে ভালো হয়।

পত্রিকা : দিনের শেষে জীবনটা কি তাহলে একটা 'চৌরঙ্গী'?

শংকর : জীবনটাই 'চৌরঙ্গী'। তা ছাড়া আর কী? সংসারে যে যত বেশি থাকবে, যে যত বেশি দেরি করবে তাকে তত বেশি বিল মিটিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান

রবিবার ১০ জুন, ২০১২

পঞ্চাশে চৌরঙ্গী

শংকর

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনারা সকলে আমার নমস্কার ও ভালবাসা গ্রহণ করুন। ১০ জুন ২০১২ চৌরঙ্গী উপন্যাসের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আমার প্রিয় প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং আমার অন্যতম ইংরিজি প্রকাশক পেঙ্গুইন ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় স্টারমার্ক সভাঘরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলা কথাসাহিত্যে যে সুবর্ণযুগ এসেছে তা সেই সময়কার পূজনীয় লেখকবৃন্দ, প্রকাশক, পাঠক ও বিদ্বজ্জনেরা কেউ বুঝতে পারেননি। স্বর্ণযুগের অদ্বিতীয় স্রষ্টাদের এবং মৃত ও বিস্মৃত মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালি লেখকদের আজকের এই স্মরণীয় দিনে আমি প্রথমেই নতমস্তকে স্মরণ করতে চাই।

সেযুগের খ্যাতিমান লেখকরা ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ এবং অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন আত্মপ্রচারবিরোধী, তাই নিজের বইয়ের ‘লঞ্চ’-এ উপস্থিত হওয়াটা সেই সময়ে সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। আজ সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, নিজের বইয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমিও উপস্থিত হয়েছি, নিজের সম্বন্ধে দুটো ভাল কথা শুনব বলে নয়, নিজের বইয়ের প্রচারের জন্যও নয়, শুধু এই ভেবে যে বাংলা উপন্যাস তাহলে সবসময় স্বল্পায়ু হয় না। সময়ের সব অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে কোনো কোনো বই কখনও কখনও চরম দুঃসাহসে কঠিন কাঁটাতার পেরিয়ে শতাব্দীর সীমানার দিকে এগিয়ে যাবার দুর্লভ সৌভাগ্যও অর্জন করে।

আমার স্বল্পবাক ও সুরসিক প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে আমার সংশয় কাটাবার জন্য বললেন, বেশ কিছু সংখ্যায় না হলেও সামান্য কিছু বাংলা উপন্যাস এবং গল্পসংগ্রহ

অর্ধশতাব্দীর বেড়া পেরিয়ে পাঠকের আনন্দবর্ধন করেছে, কিন্তু এখানে যা বাড়তি পাওনা তা হলো চৌরঙ্গী এবং তার লেখক উভয়েই পঞ্চাশ পেরিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন।

বহু বছর আগে এক রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থা আমার দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সংশয়ী হয়ে বাড়তি প্রিমিয়াম দাবি করেছিলেন, আমাদের পারিবারিক ইতিহাসও তাঁদের খুব ভরসা দেয়নি, তবু আমি সাতাত্তর পেরিয়ে আজও বেঁচে রয়েছি এবং আজও ফাউন্টেন-এ কালি ভর্তি করে পাতার পর পাতা লিখতে আমার বেশ ভাল লাগে।

আমাদের সাহিত্যের বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় স্রষ্টা ইদানীং সত্তরের সীমানা অতিক্রম করে বেঁচে থেকেছেন, তবু তাঁরা তাঁদের স্মরণীয় কীর্তির পঞ্চাশতম বছরে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কারণ তাঁদের অনেকেই নিতান্ত অল্প বয়সে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেননি। আমার গর্ভধারিণী জননী আমার ওপর খুব বিরক্ত হলে যে শব্দটি প্রয়োগ করতেন তা হল ‘অকালপক্ক’। এই অকালপক্কতাই আমার শক্তি এবং আমার দুর্বলতা। ১৯৪৭ সালে বাবা যখন হাওড়ায় আচমকা মারা গেলেন তখন আমার বয়স তেরো বছর। এর পরেই আমার নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রামের শুরু। সতেরো বছর বয়স থেকে লিখে কিছু উপার্জন শুরু করি। ডিসেম্বর ১৯৫০-এ আনন্দবাজার রবিবাসরীয় সংখ্যায় আমার লেখার প্রকাশ এবং তার পর ছয়দশকের বেশি সময় ধরে সেই সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এঁদেরই ‘দেশ’ পত্রিকা আমার সৃষ্টিসঙ্গী—তারও জন্ম ১৯৩৩—-এবং সেখানে আমার সিরিয়াস সাহিত্যতীর্থযাত্রার শুরু ১৯৫৪ সালে। অল্পবয়সে খ্যাতির স্বাদলাভ সবসময় ভাগ্যবান লেখকের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়— হাজার তার হাঙ্গামা, কিন্তু এতদিনে একটা সুফল পাওয়া গেল—বইয়ের পঞ্চাশ বছরে আনন্দ উৎসবে লেখকের সশরীর উপস্থিতি।

এই উপলক্ষে আপনাদের কী এমন বলা যায় যা আজও বলা হয়নি? যা এই দীর্ঘসময় ধরে একান্তে অনুভব করেছি তা হলো, আমাদের এই বাংলায় লেখকের তীর্থযাত্রা বড়ই নিঃসঙ্গ। যারা সংসারজীবনে নানা দুঃখের মধ্যে কাটিয়ে সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপেই অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি লাভ করে তারা যেমন ভাগ্যবানও বটে তেমন দুর্ভাগাও বটে। ভয়টা

হলো কিছু পেয়ে তা হারানোর ভয়। আমার প্রথম বই 'কত অজানারে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের স্নেহপ্রশ্রয় লাভ করেছিল। বইয়ের এক কপি ডাকযোগে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়কে পাঠিয়েছিলাম, তিনি পত্রযোগে আশীর্বাদ করেছিলেন, "আপনার প্রথম সাফল্য যেন জীবনের শেষ সাফল্য না হয়।"

প্রায় একই সময়ে, এখনকার বাংলা সাহিত্যের শেয়ার মার্কেটে সব ওঠানামার ক্ষমতা যাঁদের হৃদয়হীন নিয়ন্ত্রণে ছিল তাঁরা বেঁকে বসলেন। আমার নিতান্ত কম বয়স এবং বেঁচে থাকার জন্য নিদারুণ সংগ্রামের দিকে তাঁরা নজর দিলেন না, একজন নামহীন পরিচয়হীন অল্পবয়সি লেখকের আচমকা এবং অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তাঁরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে যথাসময়ে ফতোয়া দিলেন, উকিলের এই মুহুরী নিজের অভিজ্ঞতা ভাঙিয়ে কোনোক্রমে একখানা লটারি পেয়ে গিয়েছে—ব্যারিস্টার বারওয়েলের এই বাবুটি 'নাথিং মোর দ্যান এ ওয়ানবুক অথর'। আরো যা ব্যাখ্যা—লেখকদের কেউ কেউ আলুগাছ, একবার ফল দিয়েই শুকিয়ে যায়, জাত লেখকরা বেগুনগাছ, অনেকদিন ধরে টুকটুক করে তারা বেগুন দিয়ে বঙ্গসরস্বতীর আঙিনা ভরিয়ে দেন।

মস্ত এক উদ্বেগের মধ্যে চৌরঙ্গীর উপাদান সংগ্রহ করতে নেমেছিলাম। ঈশ্বরের কাছে আমার তখন একমাত্র প্রার্থনা—বিত্ত চাই না, স্বীকৃতি চাই না, দীর্ঘজীবনও চাই না, শুধু আমাকে ওয়ানবুক অথরের গ্লানি থেকে মুক্ত করে দাও।

ঈশ্বরের কাছে শত শত প্রণাম; চৌরঙ্গী আমাকে সেই গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতা থেকে কখনও মুক্তি পাইনি। বাংলার সীমানা পেরিয়ে জন্মভূমি ভারতের নানা প্রান্তে নানা ভাষার পাঠক আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, আমি যেন অকালমৃত্যুর মস্ত ফাঁড়া থেকে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছি। জানা-অজানা সেই সব পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে আজ নতমস্তকে স্মরণ করতে চাই, বলতে চাই, লেখকের কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, সব ভাষার সব পাঠকই তার নিতান্ত আপনজন। আমার মা রসিকতা করতেন, বাংলার পাঠকরা তোকে কেবল লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, কিন্তু হিন্দির যে অচেনা পাঠক নিজের ঠিকানা না জানিয়ে তোকে আগ্রা থেকে ডাকে রেওড়ি পাঠিয়েছে সেই তো তোর শ্রেষ্ঠ পাঠক!

ভেবেছিলাম, একজীবনে ট্রেনে চড়ে প্রত্যেক স্টেশনে হল্ট করতে করতে হাওড়া থেকে আসানসোল স্টেশনে পৌঁছনো গেল, সেটাই বা আমার মতন সামান্য মানুষের পক্ষে কম পাওনা কী? বহু বছর তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম।

তারপর হঠাৎ এক তরুণ পাঠক স্বেচ্ছায় চৌরঙ্গীর ইংরিজি করে ফেললেন, সুধাংশুবাবু স্বতোপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে সামান্য সাম্মানিক দক্ষিণা দিলেন, কিন্তু সেই পর্যন্ত। আর এগোয়নি। বহুদিন সেই ভাবেই কাটছিল, যার কারণ নিম্নবিত্ত বাঙালি লেখকের ক্ষমাহীন আত্মসম্মানবোধ অথবা ঔদ্ধত্য—যার প্রয়োজন তাকে আসতে হবে, বাংলার লেখক যত সামান্যই হোক কারও দরজায় কড়া নাড়বে না।

বিক্রম শেঠের উৎসাহে পেঙ্গুইন ইন্ডিয়ার ট্রেন আমাকে বিলম্বে হলেও দিল্লি পৌঁছে দিল। সেখান থেকে আধুনিক ভারতের সেইসব বড় বড় শহরে যেখানে নবভারতের ইংরিজিপ্রেমী পাঠক-পাঠিকারা ছড়িয়ে আছেন। তারপর ইংলন্ডে, সেখান থেকে গ্রোভ আটলান্টিক প্রকাশন সংস্থার উৎসাহের পরিষেবা বিভিন্ন সব শহরে। তারপর ইতালি। এবার ফ্রান্স, স্পেন এবং সবচেয়ে যা আনন্দের—চিন। বেজিং এক্সপ্রেসে চিনে পৌঁছনো আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে বড়ই আনন্দদায়ক। সেই কবে গত শতকের তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ সবান্ধবে সাংহাই উপস্থিত হয়েছিলেন। চিন দেশ সম্পর্কে আমার আগ্রহ অনেকদিনের। বৌদ্ধযুগ থেকে ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে চিনের বিপুল আগ্রহ, এর একপর্বে রয়েছেন বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি লেখক অতীশ দীপঙ্কর। এঁদের নিয়ে একখানা বইও লিখে ফেলেছি। একালের চিন আমাদের একালের সাহিত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমরাও চিনের সাহিত্য সম্পর্কে বড় বেশি খোঁজখবর নিই না। একমাত্র ভরসা রবীন্দ্রনাথ নামক সেতুটি—তাঁর ওপর আমরা বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে রয়েছি আজও।

বন্ধুগণ, বয়স বাড়লে মানুষ একটু বেশি কথা বলে, এই আশঙ্কায় আমি যথাসময়ে ব্রেক কষতে চাই। যে উপন্যাস নিয়ে আজকের এই আনন্দোৎসব তা আমাকে অনেক দিয়েছে।

১০ জুন ১৯৬২ আমার জীবনে আর এক কারণে স্মরণীয়। চৌরঙ্গী'র প্রকাশ দিনেই আমার বিবাহ। বইটি প্রস্তুত দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে অপরাহ্ণে উত্তরপাড়ায় বিবাহ বাসরে

গিয়েছিলাম। বন্দনা বেঁচে থাকলে আজ আমাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকীও পালন করা যেত। কিন্তু ঐ যে বলছিলাম, আমার ব্যক্তিজীবন, চিন্তাজীবন ও সাহিত্যজীবন উদাসীন সৃষ্টিকর্তার খেয়ালে চিরদিনই নিঃসঙ্গতায় ভরা, শত চেষ্টা করেও এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে পারিনি। কিন্তু আজ আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, আপনাদের ভালবাসায় বন্দি হতে পেরে, বহু বছর পরে এই ক্লান্ত লেখকটি আপনাদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য দুটি হাতই উপরের দিকে তুলে দিতে চাইছে। আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন, আমার শত দোষ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এই স্মরণীয় দিনে আমাকে দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

শংকর

স্থান : স্টারমার্ক,

সাউথ সিটি-মল, কলকাতা

৯ জুন, ২০১২